বাঙ্গলা কীর্তনের ইতিহাস

বাঙ্গলা কীর্তনের ইতিহাস

হিতেশরঞ্জন সান্যাল

সেণ্টার ফর স্টাডিজ ইন সোশ্যাল সায়েন্সেস্, কলকাতা-র পক্ষে
কে পি বাগচী অ্যাণ্ড কোম্পানী
কলকাতা

প্রথম প্রকাশ ১৯৮৯

কে পি বাগচী অ্যাণ্ড কোম্পানী
২৮৬ বি. বি. গাঙ্গুলী স্ট্রীট,
কলকাতা-৭০০০১২

সেণ্টার ফর স্টাডিজ ইন সোশ্যাল সায়েন্সেস্, কলকাতা, ১০ লেক টেরাস,
কলকাতা ৭০০০২৯-এর পক্ষে সুশান্ত ঘোষ, রেজিস্ট্রার কর্তৃক
প্রকাশিত। শ্রীঅরবিন্দ প্রেস, ১৬ হেমেন্দ্র সেন স্ট্রীট,
কলকাতা ৭০০০০৬ হইতে মুদ্রিত।

এই বইয়ের পশ্চাৎপট সম্বন্ধে কিছু কথা

এই বইয়ের সম্বন্ধে এ ধরনের কিছু লেখার কোনও কথা ছিল না। কিন্তু হিতেশরঞ্জন সান্যাল ২৩শে নভেম্বর ভোররাত্রে মাত্র আটচল্লিশ বৎসর বয়সে দেহত্যাগ করেন। তিনি এই বইটি সম্পূর্ণ লিখে যেতে পেরেছিলেন। কিন্তু তার ছাপার কাজ তিনি দেখে যেতে পারেন নি। এই বইয়ের প্রুফ দেখা এবং প্রেসের কাজ তত্ত্বাবধান করেছেন কলিকাতা সমাজ বিজ্ঞান চর্চা কেন্দ্রের শ্রীনৃপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীগৌতম ভদ্র এবং শ্রীঅরুণ ঘোষ। সংস্কৃত শাস্ত্রাদি থেকে উদ্ধৃতিগুলির শুদ্ধতা দেখে দিয়েছেন ডঃ সুকুমারী ভট্টাচার্য। অনুক্রমণিকাটি শ্রীমতী মনীস্বিতা সান্যাল প্রস্তুত করেছেন। কলিকাতা সমাজ বিজ্ঞান চর্চা কেন্দ্রের পক্ষ থেকে তাঁদের সকলকে আমার ধন্যবাদ জানাই।

অমিয় কুমার বাগচী

মুখবন্ধ

অগ্রজপ্রতিম সুহৃদ হিতেশরঞ্জন সান্যাল মহাশয়ের পুস্তিকাটির মর্মভাব রসগ্রাহী ভক্ত-জনোচিত নয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষণাপত্রের ছকও তাঁর অভীষ্ট নয়। গত তিন দশক ধরে তিনি নানা বিষয়ে প্রবেশ করেছেন, তাঁর অনুসন্ধিৎসা ব্যাপ্ত হয়ে আছে বাঙ্গলার গ্রামে গঞ্জের জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের ইতিহাস রচনায়, আঞ্চলিক স্থাপত্য ও ভাস্কর্যের রীতির নানা উৎস সন্ধানে, গান্ধীবাদের সামাজিক তাৎপর্য বিশ্লেষণে অথবা বৈষ্ণব ধর্মের ইতিবৃত্ত বর্ণনায়। এতসবের মধ্যেও সান্যাল মহাশয়ের প্রধান জিজ্ঞাসা দুইটি। প্রথমত, বাঙালী জাতি তথা সংস্কৃতির প্রতিষ্ঠা, সাফল্য ও ব্যর্থতা; কি করে একটি আঞ্চলিক সংস্কৃতি আর সত্তা গড়ে উঠেছে, কি করে সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে সেই সংস্কৃতির প্রসার, সঙ্কোচন আর বিপর্যয় ঘটেছে। অর্থাৎ গোদা ভাষায় বাঙ্গালী জাতি আর সংস্কৃতির আত্মপ্রতিষ্ঠা এবং মার খাবার কাহিনী তাঁকে নানাভাবে নাড়া দেয়। দ্বিতীয়ত, শিল্পায়ন আর তথাকথিত নাগরিক আধুনিকতার প্রতিপক্ষে গ্রাম সমাজের সংঘশক্তি, লোকশক্তি আর দেশজ সংস্কৃতির জোরকে তুলে ধরা, পল্লীসমাজের মধ্যে পুনর্গঠনের উদ্যমের সূত্রকে খুঁজে বার করার আকুলতা তাঁর সব রচনাতেই উপস্থিত থাকে। তাঁর রচনায় শিক্ষাগুরু নীহাররঞ্জন রায় আর মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধীর প্রভাব যে কোন তন্নিষ্ঠ পাঠকের চোখ এড়িয়ে যাবার নয়।

উপর্যুক্ত প্রশ্ন দুটির উত্তর খোঁজার তাগিদেই লেখক কীর্তনের সামাজিক ইতিহাস লিখেছেন। তাঁর জিজ্ঞাসাই তাঁকে অশেষজ্ঞ পণ্ডিত প্রজ্ঞানানন্দ, হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় বা খগেন্দ্রনাথ মিত্রের মূল্যবান গ্রন্থের তুলনায় ভিন্ন স্বাদের বই লিখতে প্রণোদিত করেছে। তাঁর মতে, কীর্তনের মধ্যে হিন্দু বাঙ্গালীর ধর্মীয় তথা সাংস্কৃতিক আন্দোলনের ইতিহাস বিধৃত আছে। এই আন্দোলন গ্রামীণ সংস্কৃতির নানা ধারাকে পুষ্ট করেছিল। তার চেয়েও বড় কথা, কীর্তনের পদ রচনায়, গায়কীতে আর রসগ্রহণে সমাজের নানা স্তরের লোক অংশীদার হতো। এই সমাবেশ থেকেই জন্ম নিত সংঘশক্তি এবং মানুষের আত্মমর্যাদা ও আত্মপ্রতিষ্ঠাবোধ। ফলে কীর্তন হয়ে দাঁড়িয়েছিল অভয়ের মন্ত্র, যে অভয় নিপীড়িত মানুষ পায় তার আত্মমর্যাদা বোধের উন্মেষে, সমবেত শক্তির জোরে। বৈষ্ণব আন্দোলনের নানা আশপাশ আলোচনার মধ্যে, নানা পর্বকে বিশ্লেষণ করার মাঝে কীর্তনের এই তাৎপর্যকেই হিতেশরঞ্জন সান্যাল মহাশয় তুলে ধরেছেন।

তাঁর রচনায় অন্যান্য আকর্ষক দিকের ইঙ্গিত আছে। বৈঠকী গানকে আসরের গানে রূপান্তরের পেছনে কাজ করেছিল সাম্প্রদায়িক সমন্বয়ের ধারণা। গোস্বামী শাস্ত্র কঠোরভাবে কীর্তনের রসাভাসকে বেঁধে দিয়েছিল, তার গায়কী রীতি ছিল মার্গ। কীর্তনের মাধ্যমে বৈষ্ণব দর্শন প্রচারিত হত, নানা তত্ত্বের ব্যাখ্যা চলত। আবার দেশজ প্রভাবে কীর্তনকেই ক্ষেত্র বিশেষে রূপান্তরিত হতে হয়েছিল ঝাড়খণ্ডী গায়কীতে বা ঢপকীর্তনের রীতিতে। শ্রোতাদের কাছে তত্ত্ব কথা বোধগম্য করার খাতিরে সংযোজিত হয়েছিল আখর, মনোহরসাহীতে করা হয়েছিল কিছু রদবদল। প্রথমদিকে কীর্তনীয়াদের মধ্যে উচ্চজাতের প্রাধান্য থাকলেও পরে নানা নিম্নবর্ণের লোক এসেছিলেন। সংস্কৃতির এই রূপান্তরের ইতিহাস ভবিষ্যৎ গবেষকের রচনায় আরো স্পষ্ট হয়ে উঠবে বলে বিশ্বাস।

বৈষ্ণব ধর্মে ছিল নানা মতভেদ, গৌড় মণ্ডল আর ব্রজমণ্ডলের ধারণায় ছিল নানা বিরোধ। তন্ত্র আর বৌদ্ধ সহজ সাধনার উপাসকদের উপস্থিতি আরো জটিলতার সৃষ্টি করেছিল। এই নানা মতের সমর্থকরা কীর্তনকে সমভাবে দেখেন নি, গোস্বামীদের কাছে কীর্তনের যা মূল্য, নিত্যানন্দের কাছে কীর্তনের মাহাত্ম্য তাই ছিল না। কিন্তু শেষ পর্যন্ত সব বৈষ্ণব দল আর আখড়া কীর্তনকে তাদের ধর্মাচরণের প্রধান অঙ্গ বলে স্বীকার করেছিলেন, প্রেম ভক্তির সহজলভ্য সাধারণের আচরণীয় পথ হিসাবে মেনে নিয়েছিলেন। সম্প্রদায়গুলির বিবর্তনের ইতিহাসে কীর্তনের এই ভূমিকার কথা সান্যাল মহাশয় বিশদভাবে আলোচনা করেছেন। আবার তিনিই জানিয়েছেন যে চৈতন্যদেবের তিরোধানের অব্যবহিত পরে কীর্তনের বিবর্তন প্রসঙ্গে বিশেষ কিছু তথ্য পাওয়া যায় না। যা কিছু তথ্য পাওয়া যায়, তা তিনি এক জায়গায় গুছিয়ে দিয়েছেন, এ বড় কম কথা নয়।

তবু প্রশ্ন থেকে যায়। নানা মতে দীর্ণ বৈষ্ণব সাধনাজাত কীর্তনের পদেও নানা ভাবের সংঘাত নিশ্চয় ছিল। গৌরনাগরবাদী অথবা গোস্বামীভক্তরা নিশ্চয় একই চিন্তায় এক ধরনের পদ গাইতেন না! আবার কীর্তনে নানা ভাবের স্থান আছে, রস শাস্ত্রানুযায়ী তা বিধিসম্মত। জীবনের নানা অভিজ্ঞতায় বা বোধে কখন কি পদ গাওয়া হবে, তা কিন্তু কীর্তনীয়ারা জানতেন। বৈষ্ণবদের তথা গ্রাম-বাংলার মানুষের নানা সুখ দুঃখের মুহূর্তে উপযোগী নানা পদ গাওয়া হত, তা সেই ক্ষণে উপযোগী আবেশ তৈরী করত, শ্রোতাদের ভাবমোক্ষণ হত। আবার হিতেশবাবুর রচনায় আত্মমগ্ন 'উদ্দণ্ড' নৃত্য আর কীর্তনের কথাও আছে। যে কোন মরমিয়া ধর্মে এই জাতীয় নৃত্য, গীত আর ভাবাবেশের নানা সামাজিক অর্থ

সাম্প্রতিক কালের নৃতাত্ত্বিক গবেষণায় ধরা পড়েছে। সমসাময়িক পীরবাদে, "উরসের" নানা অনুষ্ঠানে, 'সমা' বা সঙ্গীতানুষ্ঠানের রীতি আমাদের অন্য অনুষঙ্গ আর প্রতিষঙ্গের কথা ভাবতে সাহায্য করে। পদাবলী কীর্তনের এই জাতীয় বিশ্লেষণ কিন্তু হিতেশবাবুর রচনায় নেই। তাঁর গবেষণার সূত্র ধরে অন্যকে এগিয়ে আসতে হবে, খুঁজতে হবে কীর্তনের মাধ্যমে কোন ধাঁচের মনের জগৎ, কী রকম ভাবের জগৎ গৌড় জনবাসীর কাছে উন্মোচিত হয়েছিল।

বাঙ্গলাদেশ গানের দেশ। কীর্তন, ভাটিয়ালি, মুর্শিদা থেকে শুরু করে রবীন্দ্রনাথ, দ্বিজেন্দ্রলাল, অতুলপ্রসাদ, রজনীকান্ত, সলিল চৌধুরী, হেমাঙ্গ বিশ্বাস-দের রচিত গান নিয়ে আমাদের গর্বের অন্ত নেই। গানের রীতি আর প্রকরণ নিয়ে বেশ কিছু লেখালেখি হয়েছে। শ্রোতার রসাস্বাদনের অভিজ্ঞতা অনুপম ভাষায় অমিয়নাথ সান্যাল মহাশয় তাঁর রচনায় লিখে গেছেন। কিন্তু আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটে বাংলা গানের আলোচনা সুসংহতভাবে এতাবৎকাল হয়নি। কীর্তন গানের ক্ষেত্রে হিতেশরঞ্জন সান্যাল মহাশয় এই দরকারী কাজটা শুরু করলেন। আশা করি এই পথ মহাজনের পদচারণায় প্রশস্ত হয়ে উঠবে।

গৌতম ভদ্র

হিতেশরঞ্জন সান্যাল মহাশয়ের অনুরোধক্রমে ১৯৮৮ সালের জুলাই মাসে আমি লেখাটি লিখেছিলাম। এই মুখবন্ধটি তাঁর অনুমোদন লাভ করেছিল।

সূচীপত্র

সংক্ষেপ-সূত্র

গৌরাঙ্গবিজয়	গৌ. বি
চৈতন্যচরিতামৃত	চৈ. চ.
চৈতন্যভাগবত	চৈ. ভা
চৈতন্যমঙ্গল	চৈ. ম.
নরোত্তমবিলাস	ন. বি.
পদকল্পতরু	প. ক.
প্রেমবিলাস	প্র. বি.
বিবর্তবিলাস	বি. বি.
ভক্তিরত্নাকর	ভ. র.

মঙ্গলাচরণ

আজানুলম্বিতভুজৌ কনকাবদাতৌ
সঙ্কীর্ত্তনৈকপিতরৌ কমলায়তাক্ষৌ
বিশ্বম্ভরৌ দ্বিজবরৌ যুগধর্ম্মপালৌ
বন্দে জগৎপ্রিয়করৌ করুণাবতারৌ ॥

*

জয়তি জয়তি দেবঃ কৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্রো
জয়তি জয়তি কীর্ত্তিস্তস্য নিত্যা পবিত্রা।
জয়তি জয়তি ভৃত্যস্তস্য বিশ্বেশমূর্ত্তে
জয়তি জয়তি নৃত্যং তস্য সর্ব্বপ্রিয়াণাম্ ॥

(চৈতন্যভাগবত)

[যাঁহাদের বাহুদ্বয় আজানুলম্বিত, দেহকান্তি সোনার মতো, দুই চোখ পদ্মদলের মতো আয়ত ; যাঁহারা সঙ্কীর্তনের একমাত্র জন্মদাতা, বিশ্বসংসারের ভরণপোষণকর্তা, যুগধর্মের পালক, জগতের প্রিয়কারী, করুণার অবতার, সেই দ্বিজশ্রেষ্ঠ দুইজনকে (চৈতন্যদেব ও নিত্যানন্দ) বন্দনা করি।

*

দীপ্তিমান্ কৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্রের জয় হোক, তাঁহার শাশ্বত পবিত্র কীর্তি জয়যুক্ত হোক, জয়যুক্ত হোক , সেই বিশ্বেশ্বরমূর্তির অনুগামী জয়যুক্ত হোন, জয়যুক্ত হোন ; তাঁহার সকল প্রিয়জনের নৃত্য জয়যুক্ত হোক, জয়যুক্ত হোক।]

অবতরণিকা

বাঙ্গালীর চারিত্র্যে একটা বিবিক্ত, আত্মমুখী ভাব আছে। এই যে ঊনবিংশ শতাব্দী হইতে বাহিরের সঙ্গে এত সংশ্লেষ, সারা পৃথিবীর ভাবনাচিন্তা, জ্ঞান-বিজ্ঞান, কর্মকৌশলের সঙ্গে পরিচয়, নানা ভাবান্দোলন ও সমাজ-সংস্কার, রাজনীতিক তৎপরতা, এততেও কিন্তু বাঙ্গালী জাতিসত্তার ওই দুর্বলতা দূর হয় নাই। এমন অনেক কীর্তিমান বাঙ্গালী আছেন সৃজনশীল প্রতিভা ও কৃতিত্বের জন্য যাঁহারা চিরস্মরণীয়। কিন্তু বাঙ্গালীর কর্মকৃতি ব্যক্তিকে ছাড়াইয়া সামাজিক ব্যাপার হইয়া ওঠে না। ব্যক্তিবিশেষ বা একাধিক ব্যক্তির গুণে একটা প্রতিষ্ঠান একসময় খুব নাম করে. দশের মধ্যে তাহার প্রতিষ্ঠা হয়। কিন্তু সেই সব ব্যক্তির অভাব হইলে বা তাঁহাদের উত্তরাধিকার স্তিমিত হইয়া গেলে প্রতিষ্ঠানটি আর তেমন জোর পায় না, নিশ্চল নিরুদ্যম অবস্থায় দুর্বল ও জীর্ণ হইয়া পড়ে। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, বিশ্বভারতী ও বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ ইহার সর্বজনজ্ঞাত দৃষ্টান্ত। ভুরি দৃষ্টান্ত মিলিবে বাঙ্গালীর ব্যবসা ও উদ্যোগ শিল্পের ইতিহাসে। এক পুরুষে যে প্রতিষ্ঠান খুব ফুলিয়া ফাঁপিয়া ওঠে পরের পুরুষে তাহা হস্তান্তরিত হইয়া যায় অথবা ভাঙ্গাচোরা অবস্থায় কোনো রকমে টিকিয়া থাকে।

সকলে মিলিয়া মিশিয়া একটা কাজ সম্পন্ন করা বাঙ্গালীর পক্ষে বিশেষ হইয়া ওঠে না। ইহার প্রমাণও বাঙ্গালীর ব্যবসার ইতিহাসেই মিলিবে। সমষ্টিগত বোঝা-পড়ার অভাবে বাঙ্গালীরা বহিরাগতদের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় বরাবর পিছু হঠিয়াছে, আজও হঠিতেছে। স্বাধীনতা সংগ্রামের বড় বড় আন্দোলনের সময় সারা দেশ যখন বৃটিশের বিরুদ্ধে প্রতিরোধে উত্তাল তখন দেখা গিয়াছে বাঙ্গলার নামী নেতারা দলবাজি করিয়া পরস্পরকে হতমান করিতে ব্যস্ত। বাঙ্গলায় নিষ্ঠাবান কর্মী ও সুযোগ্য সংগঠকের অভাব ছিল না। তাঁহারা নিজের নিজের এলাকায় অনেকদিন ধরিয়া প্রবল জাতীয়তাবাদী আন্দোলন চালাইয়াছেন। মেদিনীপুর জেলার কাঁথি ও তমলুক মহকুমায়, হুগলী জেলার আরামবাগ মহকুমায়, উত্তর চব্বিশ পরগণা জেলার মহিষবাথান ও পশ্চিম দিনাজপুর জেলার বালুরঘাট এলাকায় এবং পুরুলিয়া ও বাঁকুড়া জেলায় দীর্ঘস্থায়ী ব্যাপক গণ আন্দোলনে ইহার প্রমাণ মিলিবে। কিন্তু এ সব আন্দোলন এক একটা জায়গার ব্যাপার, সারা বাঙ্গলার সামগ্রিক আন্দোলনের অংশ হিসাবে গণ্য নয়। সমন্বয় সাধন করিবার মতো নেতৃত্ব বাঙ্গলায় ছিল না। ফলে সর্বভারতীয় জাতীয়তাবাদী আন্দোলনে বাঙ্গালী প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে পারে নাই।

স্বাধীনতা লাভের পর জাতীয় রাজনীতিতে বাঙ্গালীর কোনো বিশেষ ভূমিকা দেখা যায় না। তাহার পরিচয় আসলে আঞ্চলিক। সমষ্টির জোরে বাঙ্গালী কখনও সর্বভারতীয় মর্যাদা লাভ করে নাই।

মহৎ ব্যক্তি একটা বড় ভাব আনিতে পারেন, কিন্তু সেই ভাব অনুসারে কাজ চালানর দায়িত্ব সমাজের। সমাজ সে ভাব আত্মস্থ করিতে না পারিলে তাহা কিছুদিনের মধ্যেই মিলাইয়া যায়। যে সময় বাঙ্গালীদের মধ্যে কৃতী ব্যক্তির আধিক্য ছিল, তখন সারা দেশে বাঙ্গালীর মর্যাদা উঁচু ছিল। আজ বাঙ্গালীর মধ্যে কৃতকর্মা ব্যক্তির অভাব ঘটিয়েছে, সর্বভারতীয় পর্যায়ে বাঙ্গালীর স্থানও সঙ্কুচিত। আসলে বাঙ্গালীর মধ্যে সংগঠন শক্তির বড় অভাব। অনেকে মিলিয়া একটা বড় ভাব বা বড় কাজ সামাজিক শক্তির জোরে টিকাইয়া রাখার দৃষ্টান্ত বাঙ্গালীদের মধ্যে বেশী নাই।

চৈতন্যদেব (১৪৮৬-১৫৩৩) বাঙ্গালী সমাজে একটা মস্ত বড় ভাব নিয়া আসিয়াছিলেন। তিনি প্রেমভক্তিতত্ত্বের প্রবক্তা। তদাত্মবুদ্ধিতে ঈশ্বরের প্রতি একাগ্র অনুরাগই প্রেমভক্তি। অতএব প্রেমভক্তির ভাব অতীন্দ্রিয়। কিন্তু ভক্তিবাদের দিক দিয়া ইহার দার্শনিক তাৎপর্য গভীর। প্রেমভক্তির সাধনা চিত্তবিকাশের পথে একান্ত আন্তরিক উপলব্ধির সাধনা। সাধকের চিত্তে প্রেমভক্তি জন্মিলে পরমার্থলাভ হয়। কোন আচার অনুষ্ঠানের দরকার নাই, শাস্ত্রার্থ জানাও নিষ্প্রয়োজন, তদ্গতভাবে ঈশ্বরের নামগুণযশোগান করিলেই হৃদয়ে প্রেমসঞ্চার হইবে। প্রেমভক্তি সাধনায় জাতিকুলমানের স্থান নাই। প্রেমভক্তি সর্বজনবোধ্য, সর্বজনসাধ্য। অতএব এই পথে মুক্তি সর্বজনের পক্ষেই লভ্য। সকলেই নিজের জোরে পরমার্থ লাভের অধিকারী। চৈতন্যধর্মের এই প্রত্যয় সাধারণ মানুষের মনে প্রবল আত্মবিশ্বাস ও গভীর আনন্দ জাগাইয়া তুলিয়াছিল।

প্রেমভক্তির এই তত্ত্বই ছিল বাঙ্গলার কবি, চারুশিল্পী, সুরসাধক ও তত্ত্বজিজ্ঞাসুদের মনে প্রগাঢ় প্রেরণার উৎস। চৈতন্য-প্রবর্তিত ভক্তিবাদের প্রণোদনে বাঙ্গলার ভাষা, সাহিত্য, দর্শনচিন্তা, স্থাপত্য, ভাস্কর্য, চিত্রকলা ও সঙ্গীতের অভিনব ও অভূতপূর্ব বিকাশ হইয়াছিল। এমন বিচিত্র ও বহুমুখী বিস্ফুরণ বাঙ্গালীর ইতিহাসে ইতিপূর্বে হয় নাই। ইহারই বেগে বাঙ্গালী সংস্কৃতি কৈশোর হইতে একেবারে যৌবনে উপনীত হয়, তাহার শক্তি ও সুষমা বিকশিত হইয়া ওঠে।

চৈতন্যধর্মের আর একটা বড় গুণ সামঞ্জস্যপরায়ণতা। চৈতন্যদেবের সময় বাঙ্গলায় বেদান্ত, ভক্তিবাদ এবং গুহ্য সাধনার অনেক রকম ধর্মমত প্রচলিত ছিল। ধর্মের দিক দিয়া সমাজ তখন বহু ভাগে বিভক্ত। অতীন্দ্রিয় ভাব হইতে দার্শনিক ভাবনায় প্রসারিত প্রেমভক্তির তত্ত্বে বিভিন্ন মতের মধ্যে সামঞ্জস্যের ইঙ্গিত আছে।

এই সামঞ্জস্যসূত্র অবলম্বন করিয়া বিভিন্ন ধর্মমতের উপাসকগণ, যথা—মায়াবাদী, তন্ত্রসাধক, বৌদ্ধ ও বৈষ্ণব সহজসাধক, নাথপন্থীরা—ভক্তিবাদী ধর্মের অনুগামী হইয়াছিল। বস্তুতপক্ষে চৈতন্য-প্রবর্তিত ভক্তিবাদ বিভিন্ন ধর্মমতের সমন্বয় ক্ষেত্র হইয়া ওঠে।

চৈতন্যদেব প্রেমভক্তি ধর্ম দ্বারা অর্থ বিদ্যাকুলমানের বাধা ও ধর্মমতের ভেদ অতিক্রম করিয়া বাঙ্গালী সমাজের সর্বসাধারণকে একত্র করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। পার্থক্যের বাধা কাটাইয়া নানা ধরণের মানুষকে একত্র করা চৈতন্যপন্থী ভক্তিবাদের অন্যতম লক্ষ্য। চৈতন্যপন্থার নীতিসমূহও এই লক্ষ্যের পরিপোষক। চৈতন্যদেব-রচিত শিক্ষাষ্টকের প্রথম শ্লোকে আছে—

তৃণাদপি সুনীচেন তরোরিব সহিষ্ণুণা।
অমানিনা মানদেন কীর্ত্তনীয়ঃ সদা হরিঃ॥

(রূপ গোস্বামীর পদ্যাবলীতে ধৃত)

[যে তৃণের চেয়েও সুনীচ (অর্থাৎ নম্র), তরুর মতো যে সহিষ্ণু, যে নিরভিমান (সম্মানের প্রত্যাশী নয়) এবং অপরকে সম্মান করে সে-ই হরিকীর্তনের অধিকারী]

এই গুণাবলীই চৈতন্যপন্থী বৈষ্ণবতার আদর্শ। ইহাতেই সাধকের চরিত্রগঠন হইবে। যে ধর্ম বিভিন্ন ধরনের মানুষ ও মতের মিলন ক্ষেত্র সেখানে সকলকে নম্র, সহিষ্ণু, নিরভিমান এবং অপরের প্রতি মানদ না হইলে চলে না। ইহার অভাব হইলে সমাবেশ ভাঙ্গিয়া যাইবে। এই কথা চিন্তা করিয়াই বোধ হয় চৈতন্যদেব শিক্ষাষ্টকে কীর্তনাধিকারীর গুণাবলী নির্দেশ করিয়াছিলেন।

চৈতন্যদেবধর্মের আদি ও মৌলিক সংগঠন সঙ্কীর্তন। সঙ্কীর্তন সম্মেলক গান, ঈশ্বরের নাম, গুণ, যশ, অনেকে মিলিয়া প্রকাশ্যে গাওয়া হয়। সঙ্কীর্তন প্রেমভক্তিসাধন। সঙ্কীর্তনের সাধনক্ষেত্রে ছোট বড়, গুণবান গুণহীনে ভেদ নাই। সকলেই স্বচ্ছন্দে সঙ্কীর্তনে যোগ দিয়া ভক্তিসাধনে নাচিতে ও গান করিতে পারে। চৈতন্যদেবের পরে বাঙ্গলার ভক্তিধর্মে অনেক পরিবর্তন হইয়াছে। কিন্তু মূল সংগঠন অর্থাৎ সম্মেলক কীর্তনের ঐতিহ্য ক্ষুন্ন হয় নাই।

চৈতন্যদেবের কর্মকাল ষোড়শ শতকের প্রথমার্ধ। চতুর্দশ হইতে ষোড়শ শতক বাঙ্গালী জাতিসত্তা ও সংস্কৃতির উন্মেষকাল। কিন্তু গোড়ার দিকে ব্যাপারটা ছিল সম্পূর্ণ অভ্যন্তরিক ও বিবিক্ত। ত্রয়োদশ শতক হইতেই বহির্জগতের সঙ্গে বাঙ্গালীর সংযোগ ক্ষীণ হইয়া গিয়াছিল। বিচ্ছিন্নতার একটা কারণ রাজনীতিক। ত্রয়োদশ

শতকের মাঝামাঝি দিল্লীর সুলতানী আধিপত্য অগ্রাহ্য করিয়া বাঙ্গলার স্বাধীন সুলতানী রাষ্ট্র স্থাপিত হইয়াছিল। তাহার পর বাঙ্গলার স্বাধীন সুলতানদের সঙ্গে প্রতিবেশী রাষ্ট্র ওড়িশা, জৌনপুর ও কামরূপের যুদ্ধবিগ্রহ প্রায়ই লাগিয়া থাকিত। যুদ্ধ বা প্রস্তুতি শুরু হইলে সীমান্ত পার হওয়া স্বভাবতই বিপজ্জনক হইয়া উঠিত। কবিকর্ণপুর-বিরচিত 'চৈতন্যচন্দ্রোদয়' নাটকে (৬/১৪-১৫) বাঙ্গলা-ওড়িশা সীমান্তে এইরূপ অবস্থার ইঙ্গিত আছে। সীমান্তের পরিস্থিতি অনিশ্চিত হইলে ভারতের অন্যান্য অংশের সঙ্গে স্থলপথে যাতায়াত রাখা কঠিন হইবে ইহাই স্বাভাবিক। উত্তর ভারতের সঙ্গে এবং উত্তর ভারত হইয়া দূরান্তের সঙ্গে বাঙ্গলার স্থলপথবাহী বাণিজ্য বন্ধ হইয়া গিয়াছিল। সমুদ্রপথের বাণিজ্য অবশ্য তখন বেশ সমৃদ্ধ। ইহা বহির্জগতের সঙ্গে সংযোগের একটা উপায়ও বটে। কিন্তু বাঙ্গালার সামুদ্রিক বাণিজ্য চালাইত প্রধানতঃ আরব, ইরাণী ও আবিসিনীয় বণিকরা, বাঙ্গালী বণিকদের বিশেষ স্থান ছিল না (তরফদার ১৯৬৫ঃ ১৪০-৪৬)। সাংস্কৃতিক কারণে বহির্জগতের সঙ্গে সংযোগের প্রমাণও খুব একটা নাই। দুইচার জন ব্রাহ্মণ পণ্ডিত কাশীতে গিয়া বাস করিতেন, কিছু লোক গয়া বা কাশীতে তীর্থযাত্রা করিত, এই পর্যন্ত।

সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে বহির্জগতের সঙ্গে বাঙ্গলার সংযোগ পুনঃপ্রতিষ্ঠার সূচনা হয় সম্ভবতঃ পঞ্চদশ শতকের প্রথমার্ধে। এই সময় হইতে বাঙ্গলায়, বিশেষতঃ নবদ্বীপে, নব্যন্যায়চর্চার গৌরব বহির্বঙ্গে স্বীকৃত হইতে থাকে। ক্রমে নব্যন্যায়চর্চায় বাঙ্গলা মিথিলার প্রতিদ্বন্দ্বী হইয়া ওঠে। বাঙ্গালী নৈয়ায়িকরা বাঙ্গলার বাহিরে প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে থাকেন। প্রগলভাচার্য (পঞ্চদশ শতকের মাঝামাঝি), রঘুনাথ শিরোমণি (পঞ্চদশ শতকের দ্বিতীয় ভাগ ও ষোড়শ শতকের প্রথম দিক) ও জানকীনাথ তর্কচূড়ামণি (পঞ্চদশ শতকের শেষ দিক ও ষোড়শ শতকের প্রথম দিক) কর্তৃক বিরচিত নব্যন্যায়ের মূল আকর গ্রন্থ 'তত্ত্বচিন্তামণির' মৌলিক ভাষ্য অবলম্বন করিয়া নবান্যায়ের তিনটি সম্প্রদায় গঠিত হয়। তিনটি সম্প্রদায়ই বাঙ্গলার বাহিরে বিশেষ খ্যাতি লাভ করে। কাশীতে 'তত্ত্বচিন্তামণির' অধ্যাপনা শুরু হয় প্রগলভাচার্য দ্বারা। জানকীনাথের ভাষ্য কাশীসহ নব্যন্যায়ের বিভিন্ন কেন্দ্রে পড়ান হইত। তিনজনের মধ্যে রঘুনাথ শিরোমণির খ্যাতিই সবচেয়ে বেশী। শিরোমণির সম্প্রদায় ঊনবিংশ শতকের শেষ পর্যন্ত বজায় ছিল। শিরোমণির প্রধান গ্রন্থ 'অনুমানদীধিতি' কাশ্মীর হইতে কেরল ও অসম হইতে গুজরাত সারা ভারতবর্ষে প্রায় চারশ বছর ধরিয়া ন্যায়দর্শনের সর্বোচ্চ পরীক্ষায় দুরূহতম আকরগ্রন্থ হিসাবে সম্মানিত হইয়াছে। মিথিলা নব্যন্যায়ের আদি পীঠস্থান।

এখানে নব্যন্যায়ের অনেক প্রথিতযশা পণ্ডিত ছিলেন। রঘুনাথ মিথিলায় গিয়া সেখানকার অগ্রগণ্য পণ্ডিত ধুরন্ধর নৈয়ায়িক পক্ষধর মিশ্রর প্রতিপক্ষে নিজের ভাষ্য প্রতিষ্ঠা করিয়া আসেন। প্রধানতঃ শিরোমণি সম্প্রদায়ের প্রভাবে নবদ্বীপ সারা ভারতে নব্যন্যায়চর্চার শ্রেষ্ঠ কেন্দ্র হইয়া ওঠে। ভারতবর্ষের বিভিন্ন অঞ্চল হইতে ছাত্ররা নব্যন্যায় পড়িবার জন্য নবদ্বীপে আসিত। (দীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য ১৩৫৮ঃ ৭৯-১৬১, ২৪৯-২৫৯)।

এইভাবে বহির্বঙ্গের সঙ্গে বাঙ্গলার সাংস্কৃতিক সংযোগের একটা পথ খুলিয়া গিয়াছিল। তবে এ পথ শুধু পণ্ডিতজনের, মহাজনের জন্য নয়। সাংস্কৃতিক আদান-প্রদানের এই পথটিকে প্রশস্ত ও সর্বজনীন করিয়া তুলিলেন চৈতন্যদেব। দক্ষিণ ভারত ও উত্তর ভারত ঘুরিয়া চৈতন্যদেব বিভিন্ন মতাবলম্বী পণ্ডিতদের সঙ্গে আলাপ আলোচনা ও বাদবিতণ্ডায় প্রেমভক্তির তত্ত্ব স্থাপন করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন (চৈতন্যচরিতামৃত, অতঃপর চৈ.চ., ২।৯) বাঙ্গালীর ইতিহাসে ইহা অভিনব ঘটনা। আদ্য শঙ্করাচার্য অষ্টম শতকে বেদান্তদর্শনের শারীরক ভাষ্য দিয়া অদ্বৈতবাদ স্থাপন করার পর হইতে তাঁহার উত্তরপক্ষে ভক্তিবাদী দর্শনের বিভিন্ন মত প্রচারিত হয়। ষোড়শ শতক পর্যন্ত আটশ বছর ধরিয়া উত্তরপক্ষে নূতন নূতন মতের উদ্ভব হইতেছিল। শুদ্ধাদ্বৈতবাদের প্রবর্তক বল্লভাচার্য চৈতন্যদেবের সমসাময়িক। এক একটা ভক্তিবাদী মতের মধ্যে আলাদা আলাদা পন্থের উদ্ভব হইয়াছিল। যেমন, শ্রীসম্প্রদায়ের মধ্যে রামানন্দী মত, রামানন্দী মত হইতে কবীরপন্থ।

চৈতন্যদেবের আগে বাঙ্গলায় কোন ভক্তিবাদী মত বা পন্থের উদ্ভব হয় নাই। সারা ভারতবর্ষে অদ্বৈতবাদ বনাম ভক্তিবাদের যে বিতর্ক চলিতেছিল তাহাতে বাঙ্গলার কোনও ভূমিকা ছিল না। বাঙ্গলায় দর্শনচর্চা ভালই হইত। দর্শনশাস্ত্রের নামজাদা পণ্ডিতও বাঙ্গলায় ছিলেন। ষড়দর্শনে কৃতবিদ্য বাসুদেব সার্বভৌম 'অদ্বৈতমকরন্দ' নামে বেদান্তের টীকা লিখিয়াছিলেন। কিন্তু সর্বভারতীয় দর্শন-বিচারে যোগ দিয়া নূতন মত প্রচারের চেষ্টা চৈতন্যদেবই প্রথম করিলেন। চৈতন্যদেব নিজে ভক্তিসিদ্ধান্ত কিছু লিখিয়া যান নাই। তাঁহার অনুগামী সনাতন গোস্বামী, রূপ গোস্বামী, গোপাল ভট্ট গোস্বামী ও জীব গোস্বামী বৃন্দাবনে বসিয়া চৈতন্যপন্থার ভক্তিশাস্ত্র রচনা করেন। জীব গোস্বামী দর্শনবিদ্। প্রেমভক্তির দার্শনিক মত অচিন্ত্যভেদাভেদবাদ স্থাপন তাঁহার কীর্তি।

সনাতন ও রূপ বৃন্দাবনে গিয়াছিলেন চৈতন্যদেবের নির্দেশে। চৈতন্যদেব তাঁহাদের বৃন্দাবনে থাকিয়া লুপ্ততীর্থ উদ্ধার, বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা ও ভক্তিশাস্ত্র প্রণয়নের

দায়িত্ব দিয়াছিলেন। চৈতন্যদেবের আরও কয়েকজন অনুগামীও তাঁহারই কারকতায় বৃন্দাবনে গিয়া বাস করেন। ক্রমে চৈতন্যভাবক ভক্ত, পণ্ডিত ও সাধক অনেকে বৃন্দাবনে জড়ো হইতে থাকেন। চৈতন্যদেবের জীবদ্দশাতেই বৃন্দাবনে চৈতন্যপন্থার ঘাঁটি জমিয়া উঠিতে থাকে। তাঁহার তিরোভাব হইবার পর বৃন্দাবন হইয়া ওঠে চৈতন্যপন্থার সবচেয়ে বড় ঘাঁটি। শাস্ত্রচর্চা, তীর্থযাত্রা ও সাধনার জন্য বাঙ্গলার বৈষ্ণবরা বৃন্দাবনে আসিয়া জুটিতে লাগিলেন।

সন্ন্যাস নিয়া চৈতন্যদেব পুরুষোত্তমক্ষেত্র পুরীতে চলিয়া আসেন। এইখানে তিনি চব্বিশ বছর, শেষ আঠার বছর একটানা, বাস করিয়াছিলেন। চৈতন্যদেবের আকর্ষণে হরিদাস ঠাকুর, গদাধর পণ্ডিত, স্বরূপ দামোদর প্রমুখ অনেক চৈতন্যভাবক পুরীতে আসিয়া বাস করেন। ইহা ছাড়া প্রত্যেক বছর রথের সময় বাঙ্গলা হইতে চৈতন্যদেবের সহযোগী ও ভক্তরা দল বাঁধিয়া পুরীতে আসিতেন এবং চারমাস থাকিয়া যাইতেন। চৈতন্যদেবের কারণে পুরী বাঙ্গলার ভক্তিবাদীদের একটা বড় ঘাঁটি হইয়া ওঠে। চৈতন্যদেবের দেহান্ত হইবার পরে পুরীতে বাঙ্গালী বৈষ্ণবদের বাস ও যাতায়াত বজায় ছিল।

নবদ্বীপ, বৃন্দাবন ও পুরী চৈতন্যপন্থী বৈষ্ণবের প্রধান তীর্থক্ষেত্র। এই তিন ধামে তীর্থযাত্রা না করিলে চৈতন্যপন্থী বৈষ্ণবের ধর্মাচরণ সম্পূর্ণ হয় না। পুরী বৃন্দাবন ঘুরিয়া আসিলে ভারতবর্ষের অনেকখানি দেখা হইত, ভারতীয় সংস্কৃতির বিভিন্ন বৈচিত্র্যের সঙ্গে সাক্ষাৎ পরিচয় ঘটিত। পুরী উত্তর ভারতের সঙ্গে দক্ষিণ ভারতের সাংস্কৃতিক আদান-প্রদানের অন্যতম দ্বারপথ। শাস্ত্রচর্চা ও বিদ্যাচর্চা এবং সঙ্গীত, নৃত্য ও চিত্রকলার জন্য পুরী খ্যাতি লাভ করিয়াছিল। বৃন্দাবনের অবস্থান উত্তর ভারতের হৃৎকেন্দ্রে। কাশী, প্রয়াগ ও মথুরার মতো প্রাচীন তীর্থক্ষেত্র, বিদ্যাস্থান ও শিল্পকলার কেন্দ্র পার হইয়া বৃন্দাবনে যাইতে হয়। মথুরা-বৃন্দাবন অঞ্চল হইতে একটু পশ্চিমে গেলেই রাজস্থান। রাজস্থানের সঙ্গে বৃন্দাবনের চৈতন্যপন্থী বৈষ্ণবদের ঘনিষ্ঠ সংযোগ ছিল। রাজস্থানে চারুশিল্পের, বিশেষতঃ চিত্রকলার ঐতিহ্য সুপ্রাচীন। এই ঐতিহ্য হইতেই মধ্যযুগীয় রাজপুত চিত্রকলার উদ্ভব।

নানা ধরণের লোক চৈতন্যপন্থার অনুগামী হইয়াছিলেন। প্রথম হইতেই চৈতন্যানুরাগীদের মধ্যে জ্ঞানীগুণী, কবি, গায়ক, বাদক, নৃত্যবিদ্, চারুশিল্পী, কারিগর ও ব্যবসায়ীদের পরিচয় পাওয়া যায়। ইঁহাদের কথা ভাবিলে মনে হয় চৈতন্যপন্থী ভক্তিবাদীদের পুরী ও বৃন্দাবনে তীর্থযাত্রা পুণ্যার্জনের উপায়মাত্র নয়। শাস্ত্রান্বেষী, তত্ত্বজিজ্ঞাসু ও শিল্পীদের কাছে এই যাত্রা জ্ঞানার্জন ও নূতন কৃৎকৌশল শিক্ষার সুযোগও বটে।

একটু বিশেষভাবে বলিতে হয় কারিগর ও ব্যবসায়ীদের কথা। নবদ্বীপে চৈতন্যদেবের প্রচার শুরু হওয়ার সময় হইতেই সেখানকার কারিগর ও ব্যবসায়ীদের অনেকে ভক্তিবাদী ধর্মের অনুগামী হইয়াছিল। পঞ্চদশ, ষোড়শ শতকে কারিগরী শিল্প ও বাণিজ্য নবদ্বীপের কিছু সমৃদ্ধি ছিল। বেশ কিছু কারিগর ও ব্যবসায়ী জাতি নবদ্বীপে বাস করিত। 'চৈতন্যভাগবত' কাব্যে বৃন্দাবনদাস এই সংবাদ দিতেছেন (চৈতন্যভাগবত, অতঃপর চৈ.ভা., ১৮, ২।২৩)। চূড়ামণিদাসের 'গৌরাঙ্গবিজয়' কাব্যেও নবদ্বীপে ব্যবসা-বাণিজ্যের একটু ইঙ্গিত আছে (গৌরাঙ্গ-বিজয়, অতঃপর গৌ.বি., পৃঃ ৬৮)। ভক্তি-ধর্ম প্রচারের আগেই নবদ্বীপের কারিগর ও ব্যবসায়ীদের সঙ্গে চৈতন্যদেব বেশ মেলামেশা করিতেন। চৈতন্যদেব ভক্তি প্রচার করিতে আরম্ভ করিলে ইহাদের অনেকেই তাঁহার অনুরাগী হইয়া ওঠে। সপ্তগ্রাম তখন দক্ষিণ-পশ্চিম বাংলার প্রধান বন্দর। এখানে বিত্তশালী বাঙ্গালী বণিকদের বড় ঘাঁটি গড়িয়া উঠিয়াছিল। চৈতন্যদেব পুরী চলিয়া যাইবার পর তাঁহার মুখ্য সহযোগী নিত্যানন্দ সপ্তগ্রামে প্রচার করিতে গিয়া সেখানকার অধিকাংশ বণিককে ভক্তিধর্মে দীক্ষিত করিয়াছিলেন। নিত্যানন্দর প্রভাবে সপ্তগ্রামের বণিকরা ভক্তি-ধর্মের পরম অনুরাগী ও উৎসাহী পোষক হইয়া ওঠে। বণিকদের মধ্যে ভক্তিপ্রচারে চৈতন্যদেবেরও যথেষ্ট আগ্রহ ছিল। সপ্তগ্রামে সাফল্যের জন্য তিনি নিত্যানন্দকে সমাদর করিয়াছিলেন (চৈ.ভা., ১৮, ২।২৩, ৩।৮)।

যে পথ দিয়া তীর্থযাত্রীরা বাঙ্গলা হইতে বৃন্দাবনে যাইতেন তাহা পূর্বভারত হইতে উত্তর ভারতগামী প্রধান বাণিজ্যপথ। পথটি খুব প্রাচীন। বারাণসী, এলাহাবাদ (প্রয়াগ), কোয়েল (আলিগড়), বায়ানা, আগ্রা, মথুরা প্রভৃতি শিল্পোৎপাদন ও বাণিজ্যকেন্দ্রের উপর দিয়া এই পথটি উত্তরপশ্চিমে দিল্লী হইয়া লাহোরের দিকে চলিয়া যাইত। মুঘল আমলে বাঙ্গলা ও উত্তর ভারতের মধ্যে নূতন করিয়া ব্যবসা-বাণিজ্য শুরু হইলে এই পথ ধরিয়াই পণ্য চলাচল শুরু হইয়াছিল। ব্যবসাবাণিজ্য যাহাদের পুরুষানুক্রমিক বৃত্তি তাহাদের পক্ষে এই সব জায়গার সঙ্গে পরিচিত হইতে পারা খুব কাজের কথা। তখনকার দিনের বাঙ্গালী বণিকদের সম্মুখে এই কথা বিশেষভাবে খাটে। সামুদ্রিক বহির্বাণিজ্যে তাহাদের ভূমিকা তো কিছুই ছিল না। বৃন্দাবনে যাওয়া-আসার পথে উত্তর ভারতের বাণিজ্য-কেন্দ্রে ও বণিকদের সঙ্গে সংযোগ হইলে বাঙ্গালী বণিকদের বাণিজ্য বিস্তারের একটা উপায় হয়ত পাওয়া যাইত।

চৈতন্যদেব এই সবটা ব্যাপার পুরাপুরি ভাবিয়া নিয়া কাজ শুরু করিয়াছিলেন একথা বলা চলে না, সাক্ষাৎ প্রমাণ কিছু নাই। তবে পুরী ও বৃন্দাবনে তীর্থযাত্রা

ভক্তিধর্মে অনুরাগীদের ব্যবহারিক জীবনে সার্থক হইয়া উঠিতে পারে বলিয়া চৈতন্যদেব অনুমান করিয়াছিলেন এ কথা মনে করিলে অযৌক্তিক হইবে না। বাঙ্গলা, পুরী ও বৃন্দাবন একসূত্রে বাঁধিয়া দিয়া চৈতন্যদেব এই সম্ভাবনা খুলিয়া দিয়াছিলেন, অন্ততঃ এ কথা বলায় কোন বাধা নাই। চৈতন্যপন্থার পরবর্তী ইতিহাসে, বিশেষতঃ বাঙ্গলার বৈষ্ণব সংস্কৃতির বিকাশে, ইহার যথার্থতা বোঝা যাইবে।

চৈতন্যপন্থীরা বৃন্দাবনে আসিয়াছিলেন সনক সম্প্রদায় ও বল্লভাচারী সম্প্রদায়ের পরে। মথুরা, বৃন্দাবন অঞ্চলে দুই সম্প্রদায়েরই ঘাঁটি ছিল। আত্মপ্রতিষ্ঠার জন্য চৈতন্যপন্থীদের এই দুই সম্প্রদায়ের সঙ্গে জোর প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিতে হইয়াছিল। নিম্বার্কাচার্য (দ্বাদশ শতক) প্রবর্তিত সনক সম্প্রদায়ের দ্বৈতাদ্বৈতবাদ ও বল্লভাচার্যের (১৪৬৮-১৫৩৪) শুদ্ধাদ্বৈতবাদের প্রতিপক্ষে চৈতন্যপন্থীরা অচিন্ত্যভেদাভেদবাদ স্থাপন করিবার চেষ্টা করিতেছিলেন। অপরদিকে বিগ্রহ সেবা ও ভেট প্রভৃতি নিয়া চৈতন্যপন্থীদের সঙ্গে বল্লভাচারীদের বিবাদ পাকাইয়া উঠিয়াছিল (বিমানবিহারী মজুমদার ১৯৫৯ ঃ পৃঃ ৩৭৬-৩৮১)। বল্লভাচারী তখন বেশ প্রভাবশালী সম্প্রদায়। মহারাষ্ট্র, গুজরাট ও রাজস্থান এই সম্প্রদায়ের প্রভাবক্ষেত্র। অনেক রাজন্য ও বিত্তশালী বণিক বল্লভাচারীদের পৃষ্ঠপোষক। প্রতিদ্বন্দ্বিতা সত্ত্বেও চৈতন্যপন্থীরা মন্দির ও কুঞ্জ স্থাপন করিয়া এবং অনেক জমিজমা কিনিয়া বৃন্দাবনে জাঁকাইয়া বসিয়াছিলেন। রাজস্থানের বিভিন্ন রাজপুত রাজবংশ, বিশেষতঃ অম্বরের কাছওয়াই রাজারা, পুরুষানুক্রমে চৈতন্যপন্থী বৈষ্ণবদের পোষকতা করিয়াছেন। মথুরা ও আগ্রা অঞ্চলের ধনী ব্যবসায়ীদের মধ্যেও চৈতন্যপন্থার ঢের অনুগামী ছিল। বৃন্দাবনের চৈতন্যপন্থীরা মুঘল রাষ্ট্রের সহায়তাও লাভ করিয়াছেন। সম্রাট আকবর চৈতন্যপন্থীদের প্রতি শ্রদ্ধা পোষণ করিতেন। তাঁহার আনুকূল্যের প্রমাণ আছে। বৃন্দাবনে চৈতন্যপন্থীদের বড় বড় মন্দির, যথা—মদনমোহন, গোবিন্দদেব, রাধাদামোদর, রাধারমণ, গোপীনাথ ও যুগলকিশোর মন্দির—তৈরীর খরচ দিয়াছিলেন রাজপুত রাজা, ভূস্বামী ও ক্ষত্রি বণিকরা। বিগ্রহসেবার জন্য তাঁহারা ভূসম্পত্তি ও টাকাপয়সাও দিয়াছিলেন (তারাপদ মুখোপাধ্যায় ১৩৮৯ঃ ৪৭-৬৮, হরিদাসদাস ৪৭১ চৈতন্যাব্দ ঃ ১৯৬০, গ্রাউজ ১৮৩৩ ঃ ২৪৩-৪৪, ২৫০, ২৫৩, ২৬৪)।

মথুরা-বৃন্দাবন অঞ্চলে জনসাধারণের মধ্যেও চৈতন্যপন্থার প্রভাব বেশ ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। এই অঞ্চলের ভাষা ব্রজভাষায় লেখা বিপুল সংখ্যক চৈতন্যপন্থী বৈষ্ণব পদ পাওয়া গিয়াছে। পদগুলির রচনাকাল ষোড়শ শতকের দ্বিতীয়ার্ধ

হইতে অষ্টাদশ শতকের মাঝামাঝি পর্যন্ত। অনেকগুলি পদ চৈতন্যদেবকে নিয়া রচিত (গুপ্ত ১৩৭৩ : ৯৫-১০১)। ব্রজভাষায় লেখা এই পদগুলি ভাব ও ভঙ্গীতে বাঙ্গলা গৌরাঙ্গবিষয়ক পদেরই মতো। বাঙ্গলা গৌরাঙ্গবিষয়ক পদে দুই-তিন রকমের ভাব ব্যক্ত হইয়াছে, যথা—চৈতন্যদেব স্বয়ং পরমেশ্বর (গৌরপারম্যবাদ), চৈতন্যদেব কৃষ্ণের অবতার, যুগলাবতারতত্ত্ব অর্থাৎ কৃষ্ণ ও রাধা যুগপৎ চৈতন্যরূপে অবতীর্ণ (চৈতন্যদেব অন্তরে কৃষ্ণ কিন্তু বহিরঙ্গের আচরণে তিনি রাধার অবতার)। চৈতন্যদেবের ঈশতৃত্ব ও অবতারত্ব বাঙ্গালী চৈতন্যভাবকদের মত। বৃন্দাবনের গোস্বামীরা গ্রন্থ লিখিয়াছেন অন্যমতে। গোস্বামী সিদ্ধান্তমতে শ্রীকৃষ্ণই পরমেশ্বর, তিনিই অনন্য উপাস্য। চৈতন্যদেব ও শ্রীকৃষ্ণ এক নন। গোস্বামীগ্রন্থে চৈতন্যদেবের অবতারত্বও স্বীকৃত হয় নাই। গোস্বামীগ্রন্থের বিচারে চৈতন্যদেব ভক্তশ্রেষ্ঠ, তিনি প্রেমভক্তি লাভের উপায়। ব্রজভাষার কবিরা বৃন্দাবনের সূত্রেই চৈতন্যদেবের কথা জানিয়াছিলেন, তাঁহাদের কেহই বাঙ্গলায় যান নাই। এই কবিদের অনেকেই সনাতন গোস্বামী, রূপ গোস্বামী ও গোপাল ভট্ট গোস্বামীর শিষ্য-পরম্পরায় অবস্থিত। বাঙ্গলার চৈতন্যভাবকরা বৃন্দাবনে গিয়া নিজেদের মত প্রচার না করিলে ব্রজভাষী অঞ্চলে চৈতন্যদেবের ঈশতৃত্ব বা অবতারত্বে বিশ্বাস প্রচলিত হইতে পারিত না। ব্রজভাষী অঞ্চলে বাঙ্গলার চৈতন্যভাবকদের মত ভালই প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল। শুধু কবিদের কথা নয়, ব্রজভাষী অঞ্চলে সাধারণ মানুষের মনেও চৈতন্যদেবের ঈশতৃত্ব ও অবতারত্বে বিশ্বাস জন্মিয়াছিল। ব্রজভাষায় বৈষ্ণব কবিতা রাজসভার জন্য লেখা হয় নাই। সাধারণ ভক্তজন ইহা উপভোগ করিত। প্রায় দুইশ বছর ধরিয়া যে ব্রজভাষায় চৈতন্যদেবের ঈশতৃত্ব ও অবতারত্বজ্ঞাপক পদ লেখা হইয়াছে ইহাতেই বোঝা যায় ব্রজভাষী সাধারণ মানুষের মনে বাঙ্গালী চৈতন্যভাবকদের তত্ত্ব কতটা গভীর প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল।

পুরী ও বৃন্দাবনে যাতায়াত উপলক্ষে বাঙ্গলার সঙ্গে দক্ষিণ ভারত, ওড়িশা ও উত্তরভারতের সাংস্কৃতিক সংযোগ ঘনিষ্ঠ হইয়াছে। তীর্থ করিতে গিয়া বাঙ্গলার শিল্পীরা দক্ষিণ ভারতীয়, ওড়িয়া ও রাজপুত চিত্রকলা ও ভাস্কর্যের পরিচয় পাইতেন। অন্যসূত্রেও দক্ষিণ ভারতীয়, ওড়িয়া ও রাজপুত শিল্পকলার প্রভাব বাঙ্গলায় আসিয়া থাকিতে পারে, তবে তীর্থযাত্রীদের সুবাদে আসার সম্ভাবনাই বেশী। তীর্থযাত্রা হইত প্রতিবৎসর। তীর্থে গেলে স্মৃতিচিহ্ন বলিয়া কিছু না কিছু কিনিয়া আনার প্রথা আছে। সহজে আনা যায় বলিয়া যাত্রীরা ছবি, ছোটখাট মূর্তি, দুই এক পদ সৌখীন জিনিষ কিনিয়া আনিতেন। তীর্থ হইতে আনা জিনিষপত্র সকলকে দেখাইতে হয়। গ্রামস্থ শিল্পীরাও তাহা

দেখিতেন। তাহা ছাড়া শিল্পীরা নিজেরাও তো তীর্থে যাইতেন। যে ভাবে বাঙ্গলার শিল্পীরা দক্ষিণ ভারতীয় এবং ওড়িয়া ভাস্কর্য ও চিত্রকলা এবং রাজপুত অনুচিত্রের রেখা. রূপ, বর্ণ ও সজ্জার বিভিন্ন উপাদান নিজের কলা-কৌশলে রপ্ত করিয়া নিয়াছিলেন মূল শিল্পকলার সঙ্গে প্রত্যক্ষ পরিচয় না থাকিলে তাহা সম্ভব হইত না। বাঙ্গলার মন্দির অলঙ্করণের মৃৎ ভাস্কর্য. দারু ভাস্কর্য. পুঁথির পাটায় আঁকা অনুচিত্র ও পটচিত্রের উৎকর্ষে দক্ষিণ ভারতীয়, ওড়িয়া ও রাজপুত শিল্পের উপাদান সহজেই ধরা পড়ে। বস্তুতঃ ষোড়শ-সপ্তদশ শতকে বাঙ্গলার চিত্র ও ভাস্কর্য শিল্পের পুনরুজ্জীবনে মার্গ শিল্পের বোধ আসিয়াছিল দক্ষিণ ভারতীয়, ওড়িয়া ও রাজপুত শিল্পের ঐতিহ্য হইতে (ঘোষ ১৯৮২ ঃ ২৯-৩৭, ৬৫-৮১ ; সান্যাল ১৯৮৪ ঃ ১২১-১৪৭)। বাঙ্গলার উচ্চাঙ্গ কীর্তন তৈরী হইয়াছিল উত্তর ভারতে জাত ধ্রুপদ গানের ঠাটে। নরোত্তমদাস বাঙ্গলায় প্রচলিত কাব্যে সঙ্গীতকে ধ্রুপদ গানের ঠাটে ফেলিয়া উচ্চাঙ্গ রসকীর্তন প্রবর্তন করিয়াছিলেন।

চৈতন্যদেব বাঙ্গালীর ইতিহাসে নূতন জীবনের আলোকবর্তিকাস্বরূপ। বাঙ্গালীর স্বতন্ত্র আঞ্চলিক চেতনা ও সত্তা যখন বিকচোম্মুখ সেই সময় চৈতন্যপন্থার ধর্মাদর্শ ও ধর্মাচরণ বৃহত্তর জীবনাদর্শের পথ দেখাইয়াছিল। চৈতন্যদেব বহুভাগে বিভক্ত বাঙ্গালীকে সহিষ্ণুতা ও সামঞ্জস্যের ভিত্তিতে একত্র ও সংগঠিত করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন এবং ভারতীয় সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্যের দিকে বাঙ্গালীর দৃষ্টি ফিরাইয়া দিয়াছিলেন। ষোড়শ, সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতকে বাঙ্গালী সংস্কৃতির ব্যাপক প্রসার ও তাহার বিচিত্র সমৃদ্ধিতে এই প্রচেষ্টার সার্থকতা প্রতীয়মান। এই সাংস্কৃতিক বিকাশেই বাঙ্গালীর জাতিসত্তার স্বতন্ত্র সংজ্ঞা গড়িয়া উঠিয়াছে। ইহার ভাব ও অভিব্যক্তি চৈতন্যপন্থী ভক্তিবাদের প্রেরণাসঞ্জাত। চৈতন্যপন্থী ভক্তি আন্দোলন নবদ্বীপের একটা ছোট গোষ্ঠী নিয়া শুরু হইয়াছিল বটে, কিন্তু ইহার আবেদন অচিরে সর্বজনীন হইয়া ওঠে। চৈতন্যদেবের জীবদ্দশাতেই চৈতন্যপন্থী ভক্তিবাদের দ্রুত বিস্তার হইতেছিল। ক্রমে বাঙ্গালী হিন্দুসমাজের গরিষ্ঠতম অংশ গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মের (চৈতন্যপন্থী ভক্তিবাদের আনুষ্ঠানিক রূপ) অনুগামী হইয়া ওঠে। তবে সংখ্যাটা বড় কথা নয়, সর্বব্যাপী প্রভাবটাই আসল। পঞ্চদশ-অষ্টাদশ শতকে ভক্তিবাদী বৈষ্ণব সংস্কৃতিই বাঙ্গালী সংস্কৃতির মূল প্রবাহ। গোষ্ঠীবিশেষ বা ব্যক্তিবিশেষ গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মের অনুগামী হক বা না হক বৈষ্ণব সংস্কৃতির উত্তরাধিকার বৈষ্ণব অবৈষ্ণব নির্বিশেষে বাঙ্গালী মাত্রেরই সমান।

বাঙ্গালী চারিত্রের যে সব দুর্বলতা ও বাধার কথা গোড়াতেই বলিয়াছি সেগুলি চৈতন্যদেবের চোখে কতখানি কিভাবে ধরা পড়িয়াছিল তাহা স্পষ্ট বুঝিবার উপায় নাই। তবে রঘুনাথদাসের প্রতি তাঁহার একটা উক্তিতে একটু আভাস ধরা পড়ে। রঘুনাথদাসকে চৈতন্যদেব বলিয়াছিলেন 'গ্রাম্য বার্তা না কহিবে গ্রাম্যবার্তা না শুনিবে' (চৈ.চ. ৩।৬)। চৈতন্যপন্থার ধর্মাদর্শ ও ধর্মাচরণে গ্রাম্যতা কাটাইয়া বিস্তৃততর সামাজিক সংগঠন তৈরী করিবার এবং ব্যাপকতর সাংস্কৃতিক আদান-প্রদানের পথনির্দেশ ছিল। এই পথ ধরিয়া বাঙ্গালী জাতিসত্তা কিছুদূর অগ্রসর হইয়াছিল। কিন্তু তাহার পরেই অগ্রগতি থামিয়া যায়। বাঙ্গালার ভক্তিধর্ম ও বৈষ্ণব সংস্কৃতির ইতিহাসে ইহার প্রমাণ মিলিবে। চিরাচরিত প্রথা অনুসারে বৈদিক ঐতিহ্যের মধ্যে নূতন ধর্মসম্প্রদায় প্রবর্তন করিতে হইলে সর্বভারতীয় সুধী সমাজের কাছে ব্রহ্মসূত্রের স্বতন্ত্র মৌলিক ভাষ্য স্থাপন করিতে হয়। চৈতন্যপন্থার ভক্তিসিদ্ধান্ত ব্যক্ত করিয়া বৃন্দাবনের গোস্বামীরা অধিবিদ্যা, দর্শন, রসশাস্ত্র এবং সদাচার বিষয়ে অনেক গ্রন্থ লিখিয়াছেন। জীব গোস্বামীর ষট্‌সন্দর্ভে স্থাপিত অচিন্ত্যভেদাভেদবাদ ব্রহ্মের সঙ্গে জীব ও জড় জগতের সম্পর্ক নির্ণয়ের দার্শনিক মত অর্থাৎ ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্য। কিন্তু সর্বভারতীয় পর্যায়ে অচিন্ত্যভেদাভেদবাদ ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্য বলিয়া স্বীকৃত হয় নাই। ফলে গৌড়ীয় বৈষ্ণবরা শ্রী, মধ্ব, সনক ও বল্লভাচারী সম্প্রদায়ের সমান হইয়া স্বতন্ত্র বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের মর্যাদা লাভ করিতে পারেন নাই। সম্ভবতঃ এই কারণে গৌড়ীয় বৈষ্ণবরাও সকলে অচিন্ত্যভেদাভেদবাদকে ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্য বলিয়া গ্রহণ করেন নাই। একবার সঙ্কটের মুখে চৈতন্যপন্থী বৈষ্ণবদের পক্ষে ব্রহ্মসূত্রের আর একটা ভাষ্য লেখা হইয়াছিল। রূপ গোস্বামী-প্রতিষ্ঠিত গোবিন্দ বিগ্রহের সেবাধিকার বরাবর বাঙ্গালী বৈষ্ণবদের হাতে ছিল। অষ্টাদশ শতকের গোড়ায় শ্রীসম্প্রদায়ের বৈষ্ণবরা বাঙ্গালী বৈষ্ণবদের অসম্প্রদায়ী বলিয়া সেবাধিকার হইতে সরাইয়া দেন। তখন বিরুদ্ধবাদীদের সঙ্গে বিচারের জন্য গৌড়ীয় বৈষ্ণবদের পক্ষে বলদেব বিদ্যাভূষণ গোবিন্দভাষ্য নামে ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্য প্রণয়ন করেন (ননীগোপাল গোস্বামী ১৩৭৯ ঃ ১১৭-১৮)। কিন্তু এই ভাষ্যও অভিনব বলিয়া স্বীকৃত হয় নাই।

চিত্রকলা ও ভাস্কর্যে বাঙ্গালী শিল্পীরা নূতন আঙ্গিক সৃষ্টি করিয়াছিলেন। শিল্প বিচারে চিত্রকলা ও ভাস্কর্য উভয় ক্ষেত্রেই নূতন আঙ্গিকের চর্চায় সৌকর্য বিকাশের সম্ভাবনা ছিল প্রচুর। কিন্তু শিল্পীরা এই সম্ভাবনা পুরাপুরি কাজে লাগাইতে পারেন নাই। মার্জিত উচ্চাঙ্গ শিল্পের যে আভাস চিত্রকলা ও ভাস্কর্যে আছে, তাহা অপরিস্ফুট। পুঁথির পাতায় আঁকা অনুচিত্রে উৎকর্ষ সবচেয়ে বেশী।

কিন্তু এই ছবিও শিল্পগুণে সমকালীন জয়পুর, মালওয়া, বাসলী বা পাহাড়ী চিত্রের সঙ্গে কোনও ক্রমেই তুলনীয় নয়।

বাঙ্গলার রসকীর্তন ধ্রুপদগানের ঠাটে তৈরী। রসকীর্তনের সাঙ্গীতিক চরিত্র মার্গ সঙ্গীতের লক্ষণাক্রান্ত। কিন্তু চিত্রকলা ও ভাস্কর্যের মতো কীর্তনগানও মার্গ কলাকৃতির পর্যায়ভুক্ত নয়। বিশেষজ্ঞরা কীর্তনকে বিশুদ্ধ মার্গসঙ্গীতের মধ্যে ধরেন না। বিখ্যাত গৌড়ীয় বৈষ্ণব পদকর্তা ও ঐতিহাসিক নিবন্ধকার নরহরি চক্রবর্তী (আনুমানিক ১৬৯৮-১৭৬০) সঙ্গীতশাস্ত্রে বিশারদ ছিলেন। নরহরি চক্রবর্তী-বিরচিত 'সঙ্গীতসারসংগ্রহে' এবং 'ভক্তিরত্নাকর' গ্রন্থের সঙ্গীত বিষয়ক অংশে (পঞ্চম তরঙ্গ) পদাবলী কীর্তন সম্পর্কে কোন আলোচনা নাই।

বাঙ্গলায় মুঘল শাসনের পত্তন হয় ষোড়শ শতকের শেষ দিকে। বাঙ্গলা মুঘল সাম্রাজ্যের অন্তর্গত হওয়ার ফলে উত্তর ভারতে যাতায়াতের বাধা দূর হইয়া যায়। প্রায় চারশ বছর পরে বাঙ্গলার সঙ্গে উত্তর ভারতের এবং সেখান হইতে পশ্চিম এশিয়া ও মধ্য এশিয়ার স্থলপথে ব্যবসা বাণিজ্য আবার শুরু হইল। মুঘল আমলে বাঙ্গলার সামুদ্রিক বাণিজ্যের পরিমাণও বাড়িতে থাকে। কিন্তু এই ব্যবসা বাণিজ্যে বাঙ্গালীর কোনও হাত ছিল না। পশ্চিম দিক হইতে স্থলপথে বাণিজ্যের সূত্র ধরিয়া মুঘল, ইরাণী, আর্মেনীয়, রাজস্থানী, ও গুজরাতী বণিকরা বাঙ্গলায় আসিয়া জাঁকিয়া বসে। সামুদ্রিক বাণিজ্যের সূত্রে আসিতে-থাকে ইওরোপীয় বণিকরা। পর্তুগীজরা সুলতানী আমলের শেষ দিকেই আসিয়া গিয়াছিল। এবার আসিয়া উপস্থিত হইল ওলন্দাজ, ইংরাজ, ফরাসী ও দিনেমার ব্যবসায়ীরা। বাঙ্গালী বণিকরা বহিরাগত ব্যবসায়ীদের জন্য পণ্য সংগ্রহ করিত, আবার দরকারমতো নগদ টাকাও ধার দিত। বাঙ্গলার পণ্য দূর দূরান্তে চালান দেওয়া এবং বাঙ্গলায় পণ্য আমদানী করা, দুই ছিল পুরাপুরি বহিরাগতদের নিয়ন্ত্রণাধীন। মুঘল শাসন শুরু হইবার আগেই বোধ হয় অবস্থাটা এই রকম দাঁড়াইয়া গিয়াছিল। ষোড়শ শতকের শেষ দিকে লেখা কবিকঙ্কন মুকুন্দরামের 'চণ্ডীমঙ্গল' কাব্যে (৭।৪১৭) সপ্তগ্রামবাসী বেনেদের যে বিবরণ আছে তাহাতেই ইহার ইঙ্গিত পাওয়া যাইবে। মুকুন্দরাম বলিতেছেন

সপ্তগ্রামের বণিক কোথাহ না জায়
ঘরে বস্যা সুখমোক্ষ নানা ধন পায়।

বাঙ্গালী বণিকরা কোথাও যাইত না। বাঙ্গলার সুবিস্তৃত ব্যবসা বাণিজ্যে তাহাদের ভূমিকা গৌণ। লাভের অংশ সবচেয়ে কম। বাণিজ্যপথ ধরিয়া বাঙ্গালী বণিকদের বৃন্দাবন যাওয়া আসা নিরর্থক হইয়া গিয়াছিল।

চৈতন্যদেবের নামে ও চৈতন্যপন্থার গুণে বাঙ্গালী সমাজের বিভিন্ন গোষ্ঠী ভক্তিবাদের আশ্রয় নিয়াছিল। চৈতন্যপন্থায় কীর্তন ভক্তিসাধন। বহুজনে মিলিয়া ঈশ্বরের নামগুণযশোগান করিয়া সঙ্কীর্তন করিত। সঙ্কীর্তন নানান মতাবলম্বী লোকের মিলনক্ষেত্র হইয়া উঠিয়াছিল। সঙ্কীর্তন এই মিলিত ধর্মসাধনার আদি সংগঠন। আজও গ্রামাঞ্চলে নানা ধরণের মানুষ অবস্থা ও মতভেদ সত্ত্বেও একসঙ্গে সঙ্কীর্তন করে এবং এক আসরে বসিয়া লীলাকীর্তন শোনে। কিন্তু এই মিলনে বৃহত্তর সংগঠনের সূচনা হয় নাই। চৈতন্যদেবের জীবদ্দশাতেই তাঁহার অনুগামীদের মধ্যে ভেদবুদ্ধির লক্ষণ দেখা দিয়াছিল। তাঁহার তিরোভাব হইবার পরে বাঙ্গলার চৈতন্যপন্থীরা নানা ভাগে ভাঙ্গিয়া পড়িলেন। বাঙ্গলার চৈতন্যভাবকরা গৌর-পারম্যবাদী। চৈতন্যপরিকররা সকলেই চৈতন্যদেবের নামে ভক্তিবাদ ও কীর্তন প্রচার করিতেন, কিন্তু তাঁহারা এক হইয়া চলিতে পারেন নাই! বড় বড় মহান্তরা নিজের নিজের ভাব নিয়া চৈতন্যপন্থী ভক্তিবাদের আলাদা আলাদা গোষ্ঠী পত্তন করিয়া ফেলিলেন। বাঙ্গলার বাহিরে বৃন্দাবনের ঘাঁটিতে বসিয়া গোস্বামীরা শ্রীকৃষ্ণকে অনন্য উপাস্য জ্ঞানে চৈতন্যপন্থার ভক্তিশাস্ত্র রচনা করিতেছিলেন। বাঙ্গলার বৈষ্ণবদের মধ্যে গোস্বামীসিদ্ধান্তের প্রভাব ছড়াইতেছিল। চৈতন্যদেবের দেহান্ত হইবার পঞ্চাশ বছর পরে নরোত্তমদাস বিভিন্ন গোষ্ঠীকে মিলাইবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। নরোত্তমদাসের চেষ্টায় গৌরপারম্যবাদ, গোস্বামীসিদ্ধান্ত এবং বাঙ্গলায় প্রচলিত গুহ্যসাধন পন্থার মধ্যে সামঞ্জস্য করিয়া যে ধর্মমত গঠিত হইল সব গোষ্ঠীই তাহা মানিয়া লইলেন। গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্ম বলিতে যাহা বোঝা যায় তাহা এই মতের উপর প্রতিষ্ঠিত। সামঞ্জস্যমূলক মতের সর্বশ্রেষ্ঠ তত্ত্বগ্রন্থ কৃষ্ণদাস কবিরাজের 'চৈতন্যচরিতামৃত'। সামঞ্জস্যমূলক মতের সবটাই হয়ত সকলে সমানভাবে মানে না, কিন্তু 'চৈতন্যচরিতামৃত' সকলেরই শিরোধার্য। গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মে নানা রকম বাহ্য আচার অনুষ্ঠান এবং মনস্তাত্ত্বিক সাধন ও গুহ্য আচার আছে কিন্তু কীর্তন সকলেরই অবলম্বন। গুহ্য সাধকদের কাছেও কীর্তন নীতিসম্মত। বৈষ্ণব তান্ত্রিক রসরাজ উপাসনা গোষ্ঠীর গ্রন্থ প্রেমদাস মিশ্র রচিত 'বংশীশিক্ষায়' আছে যে কৃষ্ণের কৃপা হইলে গৃহী ভক্তও

শ্রীনাম কীর্ত্তন রসরাজ উপাসন ॥

এই দুই কার্য অনায়াসেতে সাধয়। (বংশীশিক্ষা, ১ উল্লাস)

নরোত্তম দাসের আগ্রহে ও উদ্যমে ভাবের দিক দিয়া বিভিন্ন গোষ্ঠীর মধ্যে সামঞ্জস্য হইল বটে, কিন্তু তিনিও সকলকে একত্র করিয়া গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মের সংগঠন গড়িয়া তুলিতে পারিলেন না।

ভারতের অন্যান্য বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের প্রত্যেকটিই একটা সুস্পষ্ট দার্শনিক মতের উপর প্রতিষ্ঠিত। প্রত্যেকটি সম্প্রদায়েরই একটা প্রধান মঠ আছে। প্রধান মঠের মঠাধীশ আচার্যই সম্প্রদায়ের মুখ্য ও অবিসংবাদিত নায়ক। মঠের শাখাপ্রশাখা ভারতবর্ষের যে প্রান্তেই অবস্থিত হোক না কেন এবং সম্প্রদায়ীরা যত দূরেই থাকুক না কেন প্রধান মঠ ও মঠাধীশকে সকলেই মানিয়া চলে। গৌড়ীয় বৈষ্ণবদের প্রধান মঠ বলিয়া কিছু নাই। অচিন্ত্যভেদাভেদবাদ গোস্বামী সিদ্ধান্তে কথিত চৈতন্যপন্থী ভক্তিশাস্ত্রের দার্শনিক মত। কিন্তু গৌড়ীয় বৈষ্ণবদের সকলে এই মতের উপর ভরসা রাখিতে পারেন নাই। সংগঠন গড়ার ব্যাপারে ইহা অন্তরায় বলিতে হইবে। তবে সামঞ্জস্যমূলক মতের অনুগামীরা সাধারণভাবে গোস্বামীসিদ্ধান্তের প্রমাণিকতা স্বীকার করেন এবং ভক্তি সাধনায় গোস্বামীমতের সাধনপ্রণালীকে আদর্শ বলিয়া মানিয়াও চলেন। 'চৈতন্যচরিতামৃত' ও কীর্তন সর্বজনমান্য। কিন্তু এইগুলি প্রতীকমাত্র, সাংগঠনিক কৌশলের সূত্র হইয়া ওঠে নাই। গৌড়ীয় বৈষ্ণবদের মধ্যে গোষ্ঠী অনেক। প্রত্যেক গোষ্ঠী এবং গোষ্ঠী হইতে জাত উপগোষ্ঠী নিজের মতো চলিতে অভ্যস্ত। ইহারা আবার শ্রেষ্ঠতাভিমানী এবং পরস্পরের প্রতি বিদ্বিষ্টও বটে। অষ্টাদশ শতকে লেখা অকিঞ্চনদাসের 'বিবর্তবিলাস' কাব্যে এই অবস্থাটা স্পষ্ট ভাষায় বর্ণনা করা আছে।

চৈতন্যের মর্ম্ম যেই গোস্বামীর মর্ম্ম।
গোস্বামীর ধর্ম্ম যাহা সাধকের কর্ম্ম ॥
সাধুমুখে এই শুনি করিয়ে বিচার।
পৃথক্ পৃথক্ কেন দেখি যে আচার ॥
কেহ কার সঙ্গে নাহি করে আলাপন।
কেহ কার সঙ্গে নাহি করয়ে ভোজন ॥
তবে কৈছে ইহা সবার গোস্বামীর ধর্ম্ম হয়।
বুঝিতে না পারি মোর হইল সংশয় ॥

(বিবর্তবিলাস, অতঃপর বি.বি., ১ বিলাস)

সফলতা ও ব্যর্থতার কথা নিয়া চৈতন্যপন্থার ইতিহাস। চৈতন্যদেব বাঙ্গালীর মধ্যে উৎকর্ষের প্রেরণা সঞ্চার করিয়াছিলেন। বাঙ্গালী সমাজ সেই প্রেরণার জোরে আত্মপ্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিল বটে, কিন্তু উন্নতির পথে বেশী দূর অগ্রসর হইতে পারে নাই। উৎকর্ষের প্রেরণাও বাঙ্গালী সমাজ বেশী দিন ধরিয়া রাখিতে পারিল না। অষ্টাদশ শতকের প্রথমভাগেই সাংস্কৃতিক বিস্ফূরণের প্রক্রিয়া স্তব্ধ হইয়া গিয়াছে। তবে ইহার দরুণ চৈতন্যপন্থার সর্বজনীন আবেদন ক্ষুণ্ণ

হয় নাই। চৈতন্যপন্থার সর্বজনীন সংস্কৃতিও অব্যাহত ছিল। বাঙ্গালী হিন্দু সমাজে নবশাখ, অজলচল ও অন্ত্যজ জাতিভুক্ত লোক শতকরা পঁচাশী ভাগ কি আরও বেশী। ইহারা গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মের অনুগামী। ধর্মগ্রন্থ পাঠ গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মাচরণের অঙ্গ। ধর্মাচরণের জন্য অতি সাধারণ মানুষও 'চৈতন্যচরিতামৃত', 'চৈতন্যভাগবত' ও বিভিন্ন সাধন নিবন্ধ পড়িত বা পড়াইয়া নিত। এ পর্যন্ত যত বাংলা পুঁথি পাওয়া গিয়াছে তাহার বেশীর ভাগই বৈষ্ণব ধর্মগ্রন্থ। পাওয়া গিয়াছে প্রধানতঃ নিম্নতর জাতিভুক্ত লোকের বাড়ী হইতে (দীনেশচন্দ্র সেন ১৩২৯ঃ ১২৪)। এই ঘটনাতেই বৈষ্ণব সংস্কৃতির সর্বজনীনতা প্রতীয়মান। সর্বজনীনতা সবচেয়ে বেশী ধরা পড়ে কীর্তনে। সম্মেলক কীর্তনে সামাজিক ভেদ নির্বিশেষে সকলের সমান অধিকার। লীলাকীর্তনের আসরে প্রবেশাধিকার অবাধ। ধর্মতত্ত্ব, কাব্য, গীত, বাদ্য ও নৃত্য নিয়া লীলাকীর্তন। লীলাকীর্তনের আসরে বসিয়া অতি সাধারণ মানুষও উন্নত সাহিত্যিক ও সাঙ্গীতিক রস, শাস্ত্রার্থ এবং আধ্যাত্মিক ভাব আস্বাদন করিতে শিখিয়াছে। সাধকের বিবেচনায় কীর্তন ভক্তিসাধন ও মুক্তির উপায়, কিন্তু ইহা সামাজিক সম্মিলনের উপলক্ষ এবং লোকশিক্ষার বাহনও বটে। চৈতন্যদেবের পরে চৈতন্যপন্থায় অনেক পরিবর্তন হইয়াছে। অষ্টাদশ শতক হইতে বৈষ্ণব সংস্কৃতি ক্ষীয়মান। কিন্তু কীর্তনের বিশিষ্টতা ও উপযোগিতা কিছুতেই হ্রাস পায় নাই। চৈতন্যদেব যে ভাব আনিয়াছিলেন বিপ্রতীপ পরিবেশের বাধা অতিক্রম করিয়া এক কীর্তনের নিরবিচ্ছিন্ন প্রবাহেই তাহা প্রাণবন্ত থাকিয়া গিয়াছে। কীর্তন বাঙ্গালী সমাজের দীর্ঘস্থায়ী সংগঠন। বাঙ্গালীয়ানার ঐতিহ্যে এ একটা ব্যতিক্রম বটে।

প্রথম পরিচ্ছেদ

কীর্তনের অর্থ ও তাৎপর্য

কীর্তন শব্দের সাধারণ অর্থ সংশব্দন, কথন, বচন, বর্ণন, ঘোষণা। তবে কীর্তন শব্দটি একটা বিশেষ অর্থে ব্যবহার করা হয়। শ্রীমদ্ভাগবতে একটি শ্লোকে এই অর্থের ইঙ্গিত আছে।

বর্হাপীড়ং নটবরবপুঃ কর্ণয়োঃ কর্ণিকারং
বিভ্রদ্‌বাসঃ কনককপিশং বৈজয়ন্তীঞ্চ মালাম্‌।
রন্ধ্রান্‌ বেণোরধরসুধয়া পূরয়ন্‌ গোপবৃন্দৈঃ
বৃন্দারণ্যং স্বপদরমণং প্রাবিশদ্‌ গীতকীর্ত্তিঃ ॥

(শ্রীমদ্ভাগবতম্‌, ১০।২১।৫)

[সুন্দর দেহ, মাথায় ময়ূরপুচ্ছের ভূষণ, কানে কর্ণিকার ফুল, সোনার মতো উজ্জ্বল পীতবাস পরণে, গলায় বৈজয়ন্তীমালা (পরিয়া) অধরে ন্যস্ত বেণু বাজাইতে বাজাইতে (শ্রীকৃষ্ণ) নিজ লীলাভূমি বৃন্দাবনে প্রবেশ করিলেন। তখন গোপগণ চারিদিকে তাঁহার কীর্তি গান করিতেছিল।]

কৃৎ ধাতুর অর্থ প্রশংসা। কীর্তি ও কীর্তন এই দুইটি শব্দই কৃৎ ধাতু হইতে আসিয়াছে। রূপে শৌর্যে, জ্ঞানে ও কর্মে যিনি শ্রেষ্ঠ তাঁহার নাম স্মরণ, গুণ বর্ণন, যশোসূচক গানের নাম কীর্তন। ঈশ্বর সর্বশক্তিমান্‌, পরম গুণান্বিত। তিনি পরমানন্দস্বরূপ, সকলের আশ্রয়। তাঁহার মহিমা অনুত্তর। তাই ঈশ্বরের নাম, গুণ ও যশোকথা আবৃত্তি ও গান কীর্তনের বিশিষ্ট অর্থ। ভক্ত ও সাধকজন বরাবরই কীর্তন শব্দটি এই অর্থে ব্যবহার করেন। ইহাই এখন কীর্তন শব্দের প্রচলিত অর্থ।

'ভাগবতপুরাণে' (১০।৩০।৪) আছে কৃষ্ণবিরহে সন্তপ্তা গোপীগণ সকলে মিলিত হইয়া উচ্চৈঃস্বরে কৃষ্ণনাম গান করিয়াছিলেন ('গায়ন্ত্য উচ্চৈরমুমেব সংহতা')। 'ব্রহ্মাণ্ডপুরাণে' উচ্চৈঃস্বরে হরিনাম কীর্তনের নির্দেশ আছে (২।৬।৫৪-৬০)। শাস্ত্রপ্রমাণমূলে রূপ গোস্বামী 'ভক্তিরসামৃতসিন্ধু' (১'২।৬৩) গ্রন্থে কীর্তনের সংজ্ঞা দিয়া বলিয়াছেন 'নামলীলাগুণাদিনামুচ্চৈর্ভাষা তু কীর্তনম্' [নাম লীলা গুণাদি উচ্চৈস্বরে উচ্চারণ করাকে কীর্তন বলে] 'ভক্তিসন্দর্ভঃ' গ্রন্থে (পৃঃ ৪৫১) জীব গোস্বামী বলিতেছেন 'নামকীর্তনঞ্চেদমুচ্চৈরেব প্রশস্তম্' [এই নামকীর্তন উচ্চকণ্ঠে করাই সবচেয়ে ভাল]। কীর্তন একক সঙ্গীত হিসাবে করা যায়। অপরপক্ষে অনেকের সম্মিলিত প্রয়াসও হইতে পারে। ভাগবতের যে সব কথা উদ্ধার করিয়াছি তাহাতে সম্মেলক কীর্তনের ইঙ্গিত আছে। ভাগবতে (১১।৫।২৯) জনকের প্রতি 'যজ্ঞৈঃ সঙ্কীর্তন প্রায়ৈর্যজন্তি হি সুমেধসঃ' এই কবি-বাক্যের টীকায় জীব গোস্বামী বহুজনের সম্মিলিত কৃষ্ণবিষয়ক গানকে সঙ্কীর্তন আখ্যা দিয়া বলিয়াছেন 'সঙ্কীর্তন বহুভির্মিলিত্বা শ্রীকৃষ্ণগানসুখম্ (ক্রমসন্দর্ভঃ ১১।৫।৩২-৩৩)। জীব গোস্বামীর 'ভক্তিসন্দর্ভ' অনুসারে শুধু নামগানেই সঙ্কীর্তন হয়। নামসঙ্কীর্তনের মহিমাপ্রসঙ্গে জীব গোস্বামী বলিতেছেন 'অত্র চ বহুভির্মিলিত্বা কীর্তনং সঙ্কীর্তনমিত্যুচ্যতে' (পৃ. ৪৬৫)। ইহার অর্থ অনেকে একত্রে মিলিত হইয়া যে কীর্তন করে তাহাই সঙ্কীর্তন। ঠিক মতো গান করিলে একক কীর্তনকে সঙ্কীর্তন (বাচ্যার্থ, সম্যক্‌রূপে কীর্তন) বলায় বাধা নাই। কিন্তু ভক্তিধর্মের সর্বজনীন আবেদনের কথা ভাবিলে বলিতে হয় বহুজনের সম্মেলক প্রয়াসেই কীর্তনের সার্থকতা। বহুজনের সমবায়ে যে কীর্তন হয় তাহাই সম্যক্ কীর্তন, সঙ্কীর্তন। এই সংজ্ঞাই চালু আছে। অনেক লোকে মিলিয়া উচ্চকণ্ঠে হরে কৃষ্ণ হরে রাম প্রভৃতি নাম কীর্তন করিলে তাহাকে সঙ্কীর্তন বলা হয়।

ঈশ্বর বা দেবতার নাম গান বা স্তুতিগান করার প্রথা ভারতীয় সংস্কৃতিতে খুব প্রাচীন। তবে নির্দিষ্ট নিয়মিত সাধন পদ্ধতি হিসাবে কীর্তনের প্রতিষ্ঠা বোধ হয় ভক্তিধর্ম প্রসারের সঙ্গে হইয়াছিল। দাক্ষিণাত্যে ইহার সূচনা। তামিলনাড়ু ও কেরলের আড়্‌বার সন্তগণ (আবির্ভাবকাল আনুমানিক ষষ্ঠ হইতে নবম শতক) মন্দির ও অন্যান্য দেবস্থানে বিষ্ণু বা শ্রীকৃষ্ণের নামগুণলীলাদি বিষয়ক গান গাহিয়া উপাসনা করিতেন। ইহাই ছিল তাঁহাদের ভক্তিসাধনা। পরপর বারজন আড়্‌বার (ফলিত অর্থ ভগবৎপ্রেমে নিমগ্ন মহাপ্রেমী ভক্ত) আবির্ভূত হন। ইঁহারা 'দিব্যপ্রবন্ধম্' নামে তামিল ভাষায় চার হাজার অতি উৎকৃষ্ট এবং ভাবশুদ্ধিময়

ভজন সঙ্গীত রচনা করিয়াছিলেন। বিষ্ণু বা কৃষ্ণের প্রেয়সীর ভাবে ইষ্ট দেবতার সঙ্গে মিলনাকাঙ্ক্ষায় রচিত আড়্বার ভজন সঙ্গীতগুলি ভক্তিবাদী সাধকদের মনোহরণ করিয়াছিল। আড়্বারদের প্রভাবে দাক্ষিণাত্যে সাঙ্গীতিক ভজনের খুব প্রসার হয়।

চতুর্দশ শতক হইতে ষোড়শ শতক এই তিনশত বৎসর ভারতে ভক্তি ধর্মের জোয়ার আসিয়াছিল। ভক্তি ধর্মের প্রভাবে সাঙ্গীতিক ভজন তথা কীর্তনের খুব বিকাশ হয়। ভক্তিধর্ম জনমুখী। সাধারণ লোকের মনে ইহার প্রতি আকর্ষণ প্রবল। সাধারণ্যে ভক্তি প্রচার ও সর্বসাধারণের ভক্তি সাধনার পক্ষে ভজন কীর্তন খুবই উপযোগী। ভজন একক সঙ্গীত, কিন্তু বহুলোকে এক জায়গায় বসিয়া গান শোনে। সম্মেলক কীর্তনে উপস্থিত সকলেই যোগ দিতে পারে। ফলে ভজন কীর্তনে এককালে অনেক লোকের মধ্যে উদ্দীপনা সঞ্চার হয়। এই-জন্যই ভক্তিধর্মের প্রচারকগণ সকলেই সাঙ্গীতিক সাধনার পথ অবলম্বন করিয়াছিলেন। চতুর্দশ শতকে নামদেবের (দেহান্ত ১৩৫০) প্রভাবে মহারাষ্ট্রের দেশ অঞ্চলে কীর্তনের খুব সমৃদ্ধি হইয়াছিল। নামদেব ভক্তিবাদী ভাগবতধর্ম প্রচার করিতেন। ভাগবত ধর্মাবলম্বী বারকারী সম্প্রদায়ের পোষকতায় কীর্তনের বিকাশ সপ্তদশ শতক পর্যন্ত অব্যাহত ছিল। মহারাষ্ট্রের প্রখ্যাত ভক্তিবাদী সন্ত একনাথ (১৫২৮-১৬০৩), তুকারাম (আনুমানিক ১৬০৮-৪৯) এবং রামদাস (জন্ম ১৬০৮) বহু উৎকৃষ্ট আভঙ্গ অর্থাৎ গানের পদ রচনা করিয়াছেন। উত্তর ভারতের ভক্তিবাদী সন্তগণ, যথা—কবীর (আনু, ১৪৪০-১৫১৮), রবিদাস ও সদনা (১৫-১৬ শতক),—প্রধানতঃ গান গাহিয়া সাধনভজন ও ধর্ম-প্রচার করিতেন। ইঁহাদের, বিশেষতঃ কবীরের, লেখা দোহা অনবদ্য কাব্যগুণ ও আধ্যাত্মিকভাব সমন্বিত। সুরদাস (১৪৮৩-১৫৬৩) ও রবিদাসের শিষ্যা মীরাবাঈ রচিত ভজনের সৌন্দর্য ও ভাবগভীরতা বৈষ্ণব অবৈষ্ণব নির্বিশেষে সকলের মনোমুগ্ধকর। গুজরাত ও রাজস্থানে ভক্তিধর্মের প্রধান প্রচারক দাদূ (১৫৪৪-১৬০৩)। তিনি কীর্তন করিয়া সাধন-ভজন ও প্রচার করিতেন। দাদূ-রচিত বেশ কিছু সুন্দর ভজন সঙ্গীত আছে। নানকদেব (১৪৬৯-১৫৩৯) পঞ্জাবে ভক্তিধর্ম প্রচার করিয়াছিলেন। অসম ও তাহার লাগোয়া কোচবিহার অঞ্চলে (পশ্চিমবঙ্গ) ভক্তিধর্মের পুরোধা শঙ্করদেব (১৪৪৯-১৫৬৮)। ইঁহাদের ধর্মপ্রচারের ফলে সংশ্লিষ্ট অঞ্চলে কীর্তনের খুব চলন হয়। শঙ্করদেব-প্রবর্তিত ভাগবতী বা মহাপুরুষী ধর্মে কীর্তন সাধনার প্রধান অঙ্গ। শঙ্করদেব অনেকগুলি গান ও কয়েকটি নাটক লিখিয়াছিলেন। তাঁহার শিষ্য মাধবদাসও অনেকগুলি

পদ লিখিয়া গিয়াছেন। বাংলায় ভক্তিধর্মের ব্যাপক প্রসার হয় চৈতন্যদেবের (১৪৮৬-১৫৩৩) নায়কতায়। চৈতন্যদেবের প্রচার ও সাধনাও কীর্তননির্ভর। চৈতন্যদেবের অনুগামীদের মধ্যে বেশ কয়েকজন কবি ও গায়ক ছিলেন।

ভাগবতে (৭।৫।২৩-২৪) বিষ্ণুভক্তি লাভের নয়টি উপায় নির্দেশ করা আছেঃ শ্রবণ, কীর্তন, স্মরণ, পাদসেবন, অর্চন, বন্দন, দাস্যভাব, সখ্যভাব ও আত্মনিবেদন। কিন্তু ভক্তিবাদী সন্তগণের কাছে কীর্তনই প্রধান অবলম্বন। কীর্তন বলিতে ঈশ্বরের নামগুণলীলাযশোগান। ভক্তিবাদী সন্তদের গানে সব রকমই আছে, কিন্তু নামগানের উপরেই জোর পড়িয়াছে সবচেয়ে বেশী। ভক্তিশাস্ত্রমতে নাম ও নামী অভিন্ন, নামের মধ্যেই নামীর আবির্ভাব। এই শাস্ত্রবাক্য ধরিয়া তুকারাম বলিয়াছেন কীর্তন ভক্ত, ভগবান ও ভগবৎ নামের ত্রিবেণী সঙ্গম। তুকারামের রচনায় আরও একটা উঁচুদরের কথা আছে। কীর্তনকে তিনি গঙ্গার বিপরীত প্রবাহ বলিয়া আখ্যা দিয়াছেন। বিষ্ণুপাদসঞ্জাত সুরধনী স্বর্গ হইতে নামিয়া পতিতোদ্ধারিণীর রূপে মর্তে প্রবাহিত, আর ঐহিক জীবের হৃদয় হইতে উৎসারিত কীর্তনের প্রবাহ ঊর্ধ্ব মুখে চলিয়াছে শ্রীহরির পাদপদ্মের দিকে। তাই তুকারাম বলিতেছেন নামগান খুব বড় জিনিষ। নাম মানুষের মনে শক্তি জাগায়, সর্বভয় নিরসন করে, নামেই ঈশ্বরের প্রসাদ লাভ হয়, নামেই মুক্তি (খগেন্দ্রনাথ মিত্র ১৯৫৬ঃ ৫২১)। শঙ্করদেবের ধর্মে নামকীর্তনই মুখ্য ভজন। এই জন্য শঙ্করদেব-প্রবর্তিত ভাগবতী বা মহাপুরুষী ধর্ম নামধর্ম বলিয়াও পরিচিত। চৈতন্যদেবও বলিয়াছেন 'নাম-সঙ্কীর্ত্তন কলৌ পরম উপায়' (চৈ.চ., ৩।২০)। সব বৈষ্ণব সন্ত ও সাধকদেরই বিশ্বাস যে নামকীর্তনই কলিযুগের সর্বোত্তম সাধনা।

কীর্তন স্থান-কাল-পাত্র নির্বিশেষে সকলেই করিতে পারে। কোনো বাধা নাই। তুকারাম বলিতেছেন কীর্তন করিবে মনের আনন্দে, এমনভাবে গান করিবে যে শুনিলে শ্রোতার মন বিগলিত হয় (গজেন্দ্রগদকার ১৯৫৬ঃ ৩৭১)। ভক্তিধর্মের দিক দিয়া কথাটা খুব দরকারী। ভক্তির ভাব সংক্রামক, কীর্তন তাহার বাহন। অনেকে বলেন নামগানের সাঙ্গীতিক দিকটা গৌণ, ওদিকে নজর দেওয়ার তেমন প্রয়োজন নাই। মনে ঐকান্তিক ভক্তি থাকিলেই হইল। আন্তরিক যে গান, শ্রোতার চিত্ত তাহা স্পর্শ করিবেই। সকলে এই মত মানেন না। ভিন্নদর্শীরা বলেন ভক্তি তো ভক্তর মনে থাকিবেই, তাই সে প্রশ্ন ওঠে না। আসলে গানটা ভাল করিয়া করিতে হইবে। গান হইবে মৃদঙ্গ, করতাল সহযোগে বিভিন্ন রাগরাগিণী ও তাল অনুসারে। গানে ভগবানের উপাসনা হয়। অতএব তাহা যথারীতি হওয়াই সঙ্গত। 'হরিভক্তিবিলাস' গ্রন্থে (৮।২৭৪)

নির্দেশ দেওয়া আছে যে ভগবান বাসুদেবের উদ্দেশ্য নিবেদিত সঙ্গীত 'সম্যক্ তাল প্রয়োগেন সন্নিপাতেন বা পুনঃ' করিতে হইবে। 'হরিভক্তিবিলাসের' 'দিক্‌প্রদর্শিনী' টীকায় সনাতন গোস্বামী বলিতেছেন 'সন্নিপাতেন বিবিধরাসাদি-সমুচ্চয়েন' (হরিভক্তিবিলাস, ৮।২৭৪ শ্লোকের টীকা)। মূল ও টীকার অর্থ এই যে কীর্তন বিভিন্ন রাগরাগিণীতে সম্যক্ তাল প্রয়োগ করিয়া গাওয়া উচিত। 'ভক্তিরত্নাকর' গ্রন্থে নরহরি চক্রবর্তী গানে নৈর্মলতার দিকে লক্ষ্য রাখার কথা বিশেষভাবে বলিয়াছেন।

উচ্চারণে বাক্যের সকল বোধ হয়।
অদোষ রসযুক্তার্থ নৈর্মল্য কহয় ॥
গুণাদির অভাবে যে দোষ হয় গীতে।
তাহা কিছু জানো এ বিস্তারে গীতজ্ঞেতে ॥
তালহীনে রোগ ধাতুহীনে ধনক্ষয়।
ধাতু মাতু পদ বিনা গীতে রিপু হয় ॥
(ভক্তিরত্নাকর, অতঃপর ভ.র., ৫।৩০৭০-৩০৭৪)।

কীর্তন ভাবাবেগের গান। তাহা হইলেও কিন্তু কীর্তনের সাঙ্গীতিক দিকের প্রতি সাধারণ লোকেরও বেশ খেয়াল থাকে। নাম সঙ্কীর্তনে অনেক লোকে এক জায়গায় জড় হইয়া গান করে। কিছু লোক হয়ত একেবারেই পারে না, কিন্তু বেশীর ভাগ লোকেই যথাসাধ্য সুর তাল বজায় রাখার চেষ্টা করে। অবিচ্ছিন্ন নামযজ্ঞে অষ্টপ্রহর (একদিন), ষোল প্রহর, চব্বিশ প্রহর, আটচল্লিশ প্রহর টানা নামগান চলে। এই টানা গানের মধ্যে রাগরাগিণীভেদ আছে। সারাটা সময় সেই একই 'হরে কৃষ্ণ হরে রাম' বা 'রাধাগোবিন্দ' নামোচ্চারণ চলে, কিন্তু দিনের ভাগ অনুসারে গান হয় বিভিন্ন রাগে। সকালে ভৈরব-ভৈরবী, দুপুরে বাগেশ্রী, সন্ধ্যায় পূরবী, ইমন-কল্যাণ, আর রাতে গাওয়া হয় বেহাগে।

উচ্চকণ্ঠে সমস্বরে গান গাওয়া অতি প্রাচীন ও বহুল প্রচলিত সামাজিক প্রথা। নৈমিত্তিক অনুষ্ঠান উপলক্ষে এই রকম গান হয়। সারা ভারতবর্ষেই এই প্রথা প্রচলিত আছে। বাঙ্গালী সমাজেও দেখা যায়। দক্ষিণপশ্চিম বাঙ্গলার টুসু ও ভাদু এবং পূর্ববঙ্গে প্রচলিত বিবাহের গান সম্মেলক গানের পরিচিত দৃষ্টান্ত। বাঙ্গলা ও তাহার আশেপাশের অঞ্চলগুলিতে মহাযান বৌদ্ধ গুহ্য সাধক সম্প্রদায়-সমূহের মধ্যে চর্যাপদ গান গাওয়ার রেওয়াজ ছিল। দশম-একাদশ শতকে রচিত চর্যাগীতির কথা আজ সুপরিজ্ঞাত। চর্যাগীতি অধ্যাত্মগোচর। সম্প্রদায়ীরা বিষম

অর্থাৎ এককভাবে অথবা অনেকে মিলিয়া সমভাবে গান করিতেন। নাথযোগী প্রমুখ অন্যান্য সম্প্রদায়ের মধ্যেও চর্যার মত আধ্যাত্মিক গান গাওয়া হইত (প্রজ্ঞানানন্দ ১৯৭০ ঃ ১৬-৪৩)। এই সব সামাজিক ও আধ্যাত্মিক গানের ঐতিহ্য সঙ্কীর্তনের পূর্বসূরী।

চৈতন্যদেব বাঙ্গলায় ভক্তি আন্দোলনের প্রবর্তক। তবে বাঙ্গলায় বৈষ্ণবতার ইতিহাস বেশ পুরানো। বাঙ্গলায় ভক্তিবাদ প্রচারও চৈতন্যপূর্ব ঘটনা। অন্ততঃপক্ষে অষ্টম শতক হইতে কৃষ্ণ ও বৃন্দাবনলীলার কাহিনী যে বাঙ্গলায় জনপ্রিয় হইয়া উঠিতেছিল শিল্প ও কাব্যে তাহার প্রমাণ আছে। কৃষ্ণ ও গোপীর যুগলমূর্তি পাওয়া গিয়াছে অষ্টম শতকীয় পাহাড়পুর মন্দিরের (রাজসাহী জেলা, বাংলাদেশ) গাত্রালঙ্কারে। ডিহরের ষাঁড়েশ্বর মন্দিরের (১০-১১ শতক) দেওয়ালে বংশীবাদনরত কৃষ্ণের মূর্তি খোদাই করা আছে। দ্বাদশ শতকে রচিত হয় কৃষ্ণলীলার শৃঙ্গার বা মধুর রসের কাব্যরূপ 'গীতগোবিন্দ'। ইহার পর কৃষ্ণলীলা বিষয়ক কাব্য রচনার দৃষ্টান্ত বড়ু চণ্ডীদাসের 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' (১৪-১৫ শতক) ও মালাধর বসুর 'শ্রীকৃষ্ণবিজয়' (১৪৮০-৮১)। মালাধর বসুর কাব্য ভক্তিভাবাশ্রিত রচনা। পঞ্চদশ শতকের দ্বিতীয় ভাগে রচিত কৃত্তিবাস ওঝার রামায়ণেও ভক্তিভাব প্রকট। ভক্তিভাব নিয়া চতুর্ভুজ ভট্টাচার্য সংস্কৃত ভাষায় 'হরিচরিতকাব্যম্' (১৪৯৩) নামে একখানি কৃষ্ণলীলাকাব্য লিখিয়াছিলেন। ষোড়শ শতকের প্রথমার্ধে ভক্তিতত্ত্ব ব্যাখ্যা করিয়া 'ভাবচন্দ্রিকা' নামে একটি নিবন্ধ প্রণীত হইয়াছিল। প্রণেতার নাম চণ্ডীদাস (কবি চণ্ডীদাস হইতে স্বতন্ত্র)। পঞ্চদশ শতক হইতে ভক্তিমূলক কিছু চিত্রেরও সন্ধান পাওয়া যাইতেছে। এই প্রসঙ্গে দুইটি পাটাচিত্রের উল্লেখ করা যায়। একটি পাটায় কৃষ্ণের গোষ্ঠলীলার ছবি আঁকা আছে। অন্য পাটাখানির বিষয়বস্তু দশাবতার। বিষ্ণুপুরে (বাঁকুড়া) প্রাপ্ত এই ছবিটি আঁকা হইয়াছিল ১৪৯৯ সালে (ঘোষ ১৯৮২ ঃ ১৪৭-৪৮)।

চৈতন্যদেবের আগে বাঙ্গলায় ভক্তিধর্মের বেশ কয়েকটা ঘাঁটি তৈরী হইয়াছিল। ঐকান্তিক ভক্তিবাদী বৈষ্ণব মধ্ব সম্প্রদায়ভুক্ত সন্ন্যাসী মাধবেন্দ্র পুরী প্রেমভক্তি-সাধনা প্রচারের সূচনা করেন। বাঙ্গলায় মাধবেন্দ্র পুরীর বেশ কয়েকজন শিষ্য ছিলেন। অদ্বৈত আচার্য ও চৈতন্যদেবের দীক্ষাগুরু ঈশ্বর পুরী মাধবেন্দ্রের শিষ্য। সংসারাশ্রমে ঈশ্বর পুরীর নিবাস ছিল কুমারহট্টে (আধুনিক হালিসহর, উত্তর চব্বিশ পরগণা জেলা)। সন্ন্যাস নিয়া তিনি নানা জায়গায় ঘুরিয়া বেড়াইতেন। নবদ্বীপে তাঁহার যাতায়াত ছিল। অদ্বৈত আচার্যের বাড়ী ছিল শান্তিপুরে (নদীয়া)। তিনি নবদ্বীপে টোল বসাইয়া অধ্যাপনা করিতেন। এখানে তাঁহার একটা বাড়ী ছিল।

নবদ্বীপে একটা বৈষ্ণবগোষ্ঠী গড়িয়া উঠিয়াছিল। ইহার নায়ক ছিলেন অদ্বৈত আচার্য। এই গোষ্ঠীই নবদ্বীপে চৈতন্যদেবের আদি সংগঠন। শান্তিপুরের একটা বৈষ্ণব-গোষ্ঠী ছিল। সেখানেও অদ্বৈত আচার্যই ছিলেন প্রধান। 'শ্রীকৃষ্ণবিজয়'-রচয়িতা মালাধর বসু গুণরাজ খান কুলীনগ্রামের (বর্ধমান) অধিবাসী। কুলীনগ্রামের বসু বংশ পুরুষানুক্রমে বৈষ্ণব। মালাধর বসুর ছেলে লক্ষ্মীনাথ বসু সত্যরাজ খান ও নাতি রামানন্দ বসু চৈতন্যপরিকর। এখানকার মদনগোপাল মন্দির (পঞ্চদশ শতকের শেষ অথবা ষোড়শ শতকের প্রথম দিকে নির্মিত) বসুবংশের কীর্তি। বসুরা বাদে কুলীনগ্রামে আরও কিছু বৈষ্ণব ভক্তিবাদী ছিলেন। চৈতন্যদেবের সঙ্গে পরিচয় হওয়ার আগে হরিদাস ঠাকুর কুলীনগ্রামের নিষ্ঠাবান বৈষ্ণব জগদানন্দ পাঠকের বাড়ীতে থাকিয়া কিছুদিন সাধনভজন ও সঙ্কীর্তন প্রচার করিয়াছিলেন। ইহার আগে তিনি ছিলেন বেনাপোলে (যশোহর, বাংলাদেশ), পরে যান শান্তিপুরের কাছে ফুলিয়ায় (নদীয়া)। 'ভাবচন্দ্রিকা'-প্রণেতা চণ্ডীদাস কেতুগ্রামের (বর্ধমান) লোক বলিয়া পরিচিত। ইহার কাছে খণ্ড বা বৈদ্যখণ্ড (পরে নাম হয় শ্রীখণ্ড)। শ্রীখণ্ড-নিবাসী রাজবৈদ্য মুকুন্দ ও তাঁহার ভ্রাতা নরহরি চৈতন্যপরিকর। চৈতন্যদেবের সঙ্গে পরিচয় হইবার আগেই তাঁহারা ভক্তিধর্ম দ্বারা নিষিক্ত ছিলেন। এই সময় নরহরি ব্রজলীলা বিষয়ে কিছু পদও রচনা করিয়াছিলেন। শ্রীখণ্ডের অনতিদূরে কুলাই (বর্ধমান)। চৈতন্যদেবের ভাবপ্রকাশের খবর পাইয়া কুলাই নিবাসী তিন ভাই গোবিন্দ ঘোষ, মাধব ঘোষ ও বাসু ঘোষ নবদ্বীপে আসিয়া চৈতন্যমণ্ডলে যোগ দেন। তিনজনেই ভাল কীর্তনীয়া, বিশেষতঃ মাধব ঘোষ। বাসু ঘোষ পদ রচনার জন্য খ্যাতনামা। চৈতন্যদেবের সন্ন্যাসগুরু কেশব ভারতীর জন্মস্থান দেনুড় (বর্ধমান)। যে পরিবারে কেশব ভারতীর জন্ম সেই পরিবারে ভক্তিসাধনা চলিত। দেনুড়ে আরও কয়েকজন বৈষ্ণব ভক্ত ছিলেন। সন্ন্যাস নিয়া কেশব ভারতী কিছুদিন কাটোয়ার কাছে খাটন্দীতে (বর্ধমান) বাস করেন। এখানে তাঁহার কয়েকজন অনুগামী ছিলেন। খাটন্দী হইতে কেশব ভারতী কাটোয়াতে গিয়া আশ্রম স্থাপন করেন। দেনুড় ছাড়া অন্য সবগুলি জায়গাই কাটোয়ার কাছাকাছি। ফলতঃ কাটোয়া এলাকা প্রাক্‌চৈতন্য ভক্তিবাদী বৈষ্ণবধর্মের ঘাঁটি হইয়া উঠিয়াছিল। প্রাক্-চৈতন্য বৈষ্ণবধর্মের আর একটা ঘাঁটি শান্তিপুর এলাকা। শান্তিপুরে অদ্বৈত আচার্যর স্থায়ী নিবাস। এখানে তাঁহার বেশ কিছু অনুগত ভক্ত ছিল। শান্তিপুরের কাছেই ফুলিয়া। শেষদিকে হরিদাস ঠাকুর এখানে সাধনভজন করিতেন। ফুলিয়া তখন প্রসিদ্ধ বিদ্যাস্থান। এখানে অনেক ভক্তিবাদী বৈষ্ণবের বাস ছিল। ফুলিয়া কৃত্তিবাস ওঝার জন্মভূমি। কাটোয়ার ষোল মাইল দক্ষিণপূর্বে নবদ্বীপ।

শান্তিপুর ও ফুলিয়া নবদ্বীপের মাইল দশেক দক্ষিণে অবস্থিত। চৈতন্যদেবের আগে কাটোয়া-শান্তিপুর অঞ্চলে ভক্তিধর্মের প্রসার বেশ ভালই হইয়াছিল।

নবদ্বীপ চৈতন্যদেবের জন্মস্থান। নবদ্বীপের আশেপাশে গোটা কয়েক ঘাঁটির নাম করিলাম। ভক্তিধর্মের প্রভাব ইহার বাহিরেও বেশ ছিল। ভক্তিবাদের অনুগামীরা ছড়াইয়া ছিটাইয়া ছিলেন। চৈতন্যদেবের ভাবপ্রকাশ আরম্ভ হইতে ভক্তিবাদীরা নবদ্বীপে আসিয়া চৈতন্যদেবের সঙ্গে জুটিয়া গিয়াছিলেন। নবদ্বীপের চৈতন্যমণ্ডলীতে বাহিরের লোক ঢের ছিল। পরবর্তী পরিচ্ছদে ইঁহাদের নাম-ধামের বিবরণ আছে।

কাটোয়ার দিকে কীর্তনগানের ভাল রকম চর্চা ছিল। কুলাইয়ের সভ্রাত গোবিন্দ ঘোষ কীর্তনে পারঙ্গম ছিলেন বলিয়াছি। নবদ্বীপে গিয়া চৈতন্য-মণ্ডলীতে যোগ দিবার আগেই তাঁহারা ভালভাবে কীর্তন শিক্ষা করিয়াছিলেন। শ্রীখণ্ড গান-বাজনার জন্য বরাবরই প্রসিদ্ধ। অনুমান করি কুলীনগ্রাম ও শান্তিপুরেও কীর্তনগানের চর্চা হইত। চৈতন্যদেব নীলাচলে থাকাকালীন রথযাত্রার সময় সমবেত ভক্তদের নিয়া দল বাঁধিয়া কীর্তনের ব্যবস্থা করিতেন। দল হইত সাতটি। তাহার মধ্যে তিনটি দল শ্রীখণ্ড, শান্তিপুর ও কুলীনগ্রামের কীর্তনীয়াদের নিয়া গড়া হইত। কীর্তনচর্চার ঐতিহ্য না থাকিলেও শ্রীখণ্ড, কুলীনগ্রাম ও শান্তিপুরের নামে দল গড়া সম্ভব হইত না।

নবদ্বীপের প্রাক্‌চৈতন্য বৈষ্ণবগোষ্ঠীতে ছিলেন শ্রীবাস পণ্ডিত, তাঁহার তিন ভাই শ্রীরাম, শ্রীপতি ও শ্রীনিধি, মুকুন্দ দত্ত, গোপীনাথ আচার্য, গদাধর পণ্ডিত, শ্রীমান পণ্ডিত, সদাশিব পণ্ডিত, শুক্লাম্বর ব্রহ্মচারী ও মুরারি গুপ্ত প্রভৃতি ভক্তবৃন্দ। ইঁহারা বোধহয় নিত্য নিয়মিত সম্মেলক কীর্তন গান করিতেন। বৃন্দাবনদাস-বিরচিত 'চৈতন্যভাগবত' কাব্যে আছে যে এই বৈষ্ণবগোষ্ঠীর গান ও নাচ দেখিয়া লোকে বলিত

…উদ্ধতের প্রায় নৃত্য এ কোন ব্যাভার।

… … …

শ্রীবাস পণ্ডিত চারি ভাইর লাগিয়া।
নিদ্রা নাহি যাই ভাই ভোজন করিয়া॥
ধীরে ধীরে কৃষ্ণ বলিলে কি পুণ্য নহে।
নাচিলে কাঁদিলে ডাক ছাড়িলে কি হয়ে॥

(চৈ.ভা. ১।৭)

দেখা যাইতেছে নবদ্বীপের চৈতন্যপূর্ব বৈষ্ণবগোষ্ঠী উচ্চকণ্ঠে কৃষ্ণনাম করিয়া উদ্দণ্ড নৃত্যসহযোগে কীর্তন করিত। কীর্তনের সময় ভক্তদের ভাববিকারের কথাও আছে, যথা—ক্রন্দন। নিন্দুকদেয় অভিযোগে কিছুটা বাড়াবাড়ি থাকা সম্ভব। তবে বাঙ্গলায় ভক্তিবাদী বৈষ্ণবধর্মের এবং উপাসনা পদ্ধতি হিসাবে সম্মেলক গানের দীর্ঘ ঐতিহ্যের কথা মনে রাখিলে এইরূপ কীর্তনের প্রচলন থাকা অসম্ভব বলিয়া মনে হয় না। চৈতন্যদেব সর্বসাধারণের জন্য যে কীর্তন প্রবর্তন করেন তাহার মধ্যে পূর্বসূরীদের বৈশিষ্ট্যগুলি দেখিতে পাওয়া যায়।

সাধারণ লোকের মধ্যেও কীর্তন করিবার রেওয়াজ ছিল। চৈতন্যদেবের জন্ম হয় ফাল্গুনী পূর্ণিমার দিনে। তাঁহার জন্মদিনে চন্দ্রগ্রহণ লাগিয়াছিল। চৈতন্য-দেবের প্রথম জীবনীকার মুরারি গুপ্ত 'শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচরিতামৃতম্' কাব্যে (সাধারণতঃ মুরারি গুপ্তর কড়চা নামে পরিচিত) লিখিয়াছেন গ্রহণ উপলক্ষ্যে নবদ্বীপের লোকে কৃষ্ণকীর্তন করিয়াছিলেন (কড়চা, ১৫।২১)।

'লঘুভাগবতামৃত' গ্রন্থের মঙ্গলাচরণে চৈতন্যদেবের মহিমা ব্যক্ত করিয়া রূপ গোস্বামী লিখিয়াছেন শ্রীচৈতন্য-মুখনিসৃত হরিনামে জগৎ নির্মজ্জিত হইয়াছিল ঃ

শ্রীচৈতন্যমুখোদগীর্ণা হরে-কৃষ্ণেতি-বর্ণকাঃ।
মজ্জয়ন্তো জগৎ প্রেম্ণি বিজয়ন্তাং তদাহ্বয়াঃ।

এইরূপ বলিবার সঙ্গত কারণ আছে। চৈতন্যদেব নিজে খুব নাম কীর্তন করিতেন এবং তাঁহার প্রভাবে বাঙ্গলায় কীর্তনগানের ব্যাপক প্রসার হয়। চৈতন্যদেবের চরিতকারদের মতে অবশ্য কীর্তনে তাঁহার অবদান অনেক বেশী। চৈতন্যদেবের প্রথম বাঙ্গলা চরিতকার বৃন্দাবনদাস 'চৈতন্যভাগবত' গ্রন্থের মঙ্গলাচরণে চৈতন্যদেব ও নিত্যানন্দকে 'সঙ্কীর্তন পিতরৌ' বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। এই কথারই প্রতিধ্বনি করিয়া কৃষ্ণদাস কবিরাজ 'চৈতন্যচরিতামৃত' গ্রন্থে লিখিয়াছেন 'সঙ্কীর্তন প্রবর্তক শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য' (১৩।১৪)। 'চৈতন্যমঙ্গল' গ্রন্থে লোচনদাস চৈতন্যদেবকে বলিয়াছেন 'সংকীর্তনদাতা গোরহরি' (চৈতন্যমঙ্গল, অতঃপর চৈ. ম. ২।১।১১)। ভক্তি আন্দোলন শুরু হইবার আগে বাংলায় ভক্তিবাদী বৈষ্ণবধর্মের বিস্তার হইতেছিল। সমবেতভাবে আধ্যাত্মিক গান গাহিবার রীতি বেশ পুরণো। চৈতন্যদেবের আগে ভক্তজন কীর্তনও করিত। নবদ্বীপের প্রাক্‌চৈতন্য বৈষ্ণবগোষ্ঠীর কীর্তনে যে সব বৈশিষ্ট্য ছিল সেগুলি চৈতন্যদেবের কীর্তনেও দেখা যায়। তবুও চৈতন্যদেবের চরিতকারগণ বলিতেছেন চৈতন্যদেবই সংকীর্তনের স্রষ্টা ও প্রবর্তক। ইহার কারণ এই যে বাঙ্গলায় উপাসনা পদ্ধতি হিসাবে কীর্তন ও সঙ্কীর্তনের বিশিষ্ট রূপ ও তাৎপর্য চৈতন্যদেবের প্রভাবেই পরিণতি লাভ করিয়াছিল।

রূপের কথা আগেই বলিয়াছি। এখন তাৎপর্যের কথা বলি। রূপ গোস্বামীর 'পদ্যাবলী' নামক সঙ্কলনে চৈতন্যদেবের রচনা বলিয়া আটটি সংস্কৃত শ্লোক উদ্ধৃত আছে। ইহাই শিক্ষাষ্টক নামে খ্যাত। শিক্ষাষ্টকের প্রথম শ্লোকটি নামসঙ্কীর্তনের মহিমা বিষয়ক। শ্লোকটি উদ্ধার করিতেছি।

চেতোদর্পণমার্জ্জনং ভবমহাদাবাগ্নিনির্বাপণং
শ্রেয়ঃকৈরবচন্দ্রিকাবিতরং বিদ্যাবধূজীবনম্।
আনন্দাম্বুধিবর্দ্ধনং প্রতিপদং পূর্ণামৃতাস্বাদনং
সর্বাত্মস্নপনং পরং বিজয়তে শ্রীকৃষ্ণসঙ্কীর্তনম্॥

[যাহা চিত্ত দর্পণের মালিন্য দূর করিয়া উজ্জ্বল করে, যাহা সংসাররূপ দাবানল নির্বাপণ করে, পরম মঙ্গল পথরূপ শ্বেতপদ্ম ফোটানোর জন্য যাহা চন্দ্রকিরণ বিতরণ করে, যাহা বিদ্যরূপ বধূর প্রাণস্বরূপ, যাহাতে আনন্দের সমুদ্র উদ্বেল হয়, যাহা প্রতিপদে পূর্ণ অমৃতের আস্বাদ দেয়, যাহা আত্মাকে অবগাহন স্নান করাইয়া দেয়, সেই শ্রীকৃষ্ণসঙ্কীর্তন জয়যুক্ত হয়।]

শিক্ষাষ্টকের এই শ্লোকধৃত ভাবটি চৈতন্যদেবের জীবনীকারগণ নানাভাবে ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ করিয়াছেন। বৃন্দাবনদাস 'চৈতন্যভাগবত' গ্রন্থে বলিতেছেন

কলিযুগে ধর্ম হয় হরি সঙ্কীর্তন।
এতদর্থে অবতীর্ণ শ্রীশচীনন্দন॥
এই কহে ভাগবত সর্বতত্ত্ব সার।
কীর্তন নিমিত্ত গৌরচন্দ্র অবতার॥ (চৈ. ভা. ১।২)

লোচনদাস-বিরচিত 'চৈতন্যমঙ্গল' গ্রন্থে ভক্তদের উদ্দেশ্যে চৈতন্যদেবের উক্তি বলিয়া এই কথা লেখা আছে

সর্বধর্ম্মসার এই সঙ্কীর্ত্তন ধর্ম্ম।
বিশেষ জানিবে কলিযুগে এই কর্ম্ম॥
পঞ্চম সে বেদ হইতে প্রকাশ ইহার।
শিব তেঁই পঞ্চমুখে গায় অনিবার॥
... ...
সর্ব পাপ মুক্ত হৈয়া সব জন নাচে।
সালোক্যাদি মুক্তি তার ফিরে পাছে পাছে॥
... ...
যে যজ্ঞ বেড়িয়া রহে বৈষ্ণব আচার্য্য।
জানিবে কীর্ত্তন যজ্ঞ সর্বযজ্ঞ আর্য্য॥
(লোচন, চৈ.ম. ২।৮।৪৩৪-৩৮)

জয়ানন্দ-বিরচিত 'চৈতন্যমঙ্গলে'ও চৈতন্যদেব বলিতেছেন

কীর্ত্তন সকল কর্ম্ম কীর্ত্তন সকল ধর্ম্ম
কীর্ত্তন সকল ব্রহ্মজ্ঞান।
কীর্ত্তন আগম বেদ রাজসূয় অশ্বমেধ
কীর্ত্তন শ্রবণ গঙ্গাস্নান ॥

... ...

কীর্ত্তন অবলম্ব মাত্রে অধর্ম্ম না রহে গাত্রে
কীর্ত্তন দর্শনে পাপক্ষয়।

... ...

কীর্ত্তন ভারত পুরাণ জপতপ দান ধ্যান
কেহো নহে কীর্ত্তন সমান ॥

(জয়ানন্দ, চৈতন্যমঙ্গল, অতঃপর চৈ. ম. ৩।২২।৩-৬)

কৃষ্ণদাস কবিরাজের 'চৈতন্যচরিতামৃত' গ্রন্থে চৈতন্য জীবনের তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা আছে। কৃষ্ণদাস কবিরাজ বলিয়াছেন 'নাম সঙ্কীর্ত্তন সব আনন্দস্বরূপ' (চৈ. চ. ১।১।১০৮) ইহাই 'পরম উপায়' (চৈ. চ. ৩।২০।১২)।

নাম কীর্তনের মহিমা ভাগবতসহ বিভিন্ন শাস্ত্রগ্রন্থে নানাভাবে বলা হইয়াছে। কিন্তু শাস্ত্রবাক্য এক কথা আর চৈতন্যদেব নিজে ভক্তজনের আছে কীর্তনের মহিমা ব্যক্ত করিতেছেন, সকলকে নিয়া কীর্তনে নাচিতেছেন সে সম্পূর্ণ অন্য ব্যাপার। ভক্তদের কাছে শাস্ত্রবাক্য অপেক্ষাও তাহার মাহাত্ম্য বোধ হয় বেশী। ইহার কারণ এই যে ভক্তদের দৃষ্টিতে চৈতন্যদেব স্বয়ং ভগবান। চরিতগ্রন্থসমূহে চৈতন্যদেবকে স্বয়ং ঈশ্বর ও অবতার দুইই বলা হইয়াছে (দৃষ্টান্তস্বরূপ কড়চা, ১।১।১৪, ২।১।৫, ২।২।১১ শ্লোকে স্বয়ং ভগবান এবং ১।৪।২৬-২৭ ও ১।৫।৪ শ্লোকে যুগবতার ও অংশাবতার)। শাস্ত্রমতে অবতার ঈশ্বরের আবির্ভাব, স্বয়ং ঈশ্বর নন। চৈতন্যদেবের স্বরূপ বিচারে বাঙ্গলার চরিতকারগণ ঈশ্বর ও অবতারে তফাৎ করিয়াছেন বলিয়া মনে হয় না। অবতার বলিতে তাঁহারা চৈতন্যদেবের ঈশত্বই জ্ঞাপন করিয়াছেন। চৈতন্যদেবের সমসাময়িক পদকর্তারাও, যথা—নরহরি সরকার, শিবানন্দ সেন, বাসুদেব ঘোষ, গোবিন্দ ঘোষ ও প্রেমদাস—অবতার বলিতে ঈশ্বর বুঝিয়াছেন। বস্তুত চৈতন্যভাবকদের কাছে চৈতন্যদেব পরমেশ্বর, পরমতত্ত্ব, অনন্য, অতএব তিনিই উপেয় এবং উপাস্য। এই মতের নাম গৌরপারম্যবাদ। নবদ্বীপে চৈতন্যপরিকর ও সাধারণ ভক্ত সকলেই ছিলেন গৌরপারম্যবাদী।

চৈতন্যদেব সন্ন্যাস নিয়া পুরী চলিয়া যাইবার পর তাঁহার পরিকর ও অনুগামীরা ভক্তিধর্ম প্রচার করিয়াছিলেন গৌরপারম্যবাদের কথা বলিয়া।

শ্রীচৈতন্যরূপী স্বয়ং ভগবান সর্বসাধারণকে নামসংকীর্তনে আহ্বান করিতেছেন। চৈতন্যদেবের সান্নিধ্য স্বয়ং পরমেশ্বরের সান্নিধ্য, তাঁহার কথা মানিয়া চলিলে স্বয়ং ঈশ্বরের আজ্ঞা পালন করা হয় এই বিশ্বাস চৈতন্যভাবকদের মনে গভীর প্রেরণা ও উদ্দীপনা সঞ্চার করিয়াছিল। কীর্তন যে 'সর্বধর্মসার' এবং প্রেমলাভের 'পরম উপায়' সে বিষয়ে চৈতন্যভাবকগণ নিসংশয়। চৈতন্য-প্রচারিত ধর্মমতে প্রেমভক্তিই পরমার্থ। কীর্তনেই প্রেমভক্তি অর্জন করা যায়। সাধনপদ্ধতি হিসাবে ইহা সহজ সরল এবং অনাড়ম্বর। কোন প্রকার আচার অনুষ্ঠান, মন্ত্রোচ্চারণ, কৃচ্ছ্রসাধন এমন কি গুরুও নিষ্প্রয়োজন। কীর্তনগানে স্থান-কাল-পাত্রভেদ নাই। যে কেহ যখন ইচ্ছা কীর্তনগান করিতে পারে। মনপ্রাণ দিয়া কীর্তন করিলে প্রেমভক্তি লাভ অবশ্যম্ভাবী। খুব বড় কথা। বহুজনহিতায় এমন সহজলভ্য অথচ নিশ্চিত উপায় আর কি হইতে পারে। স্বয়ং ভগবান এই কথা বলিয়াছেন। সুতরাং ইহার যৌক্তিকতা ও প্রামাণিকতা ভক্তজনের কাছে সন্দেহাতীত।

সর্বসাধারণের মধ্যে কীর্তন দ্বারা ভক্তি প্রচার করাই ছিল চৈতন্যদেবের লক্ষ্য। চৈতন্যদেব অদ্বৈত আচার্যের কাছে এই অঙ্গীকার করিয়াছিলেন। বৃন্দবনদাসের 'চৈতন্যভাগবত' কাব্যে এই ঘটনার বিবরণ আছে। একদিন অদ্বৈত আচার্যর সঙ্গে কথাবার্তার সময় চৈতন্যদেব বলিলেন

ঘরে ঘরে করিমু কীর্ত্তন পরচার।
মোর যশে নাচে যেন সকল সংসার ॥
ব্রহ্মাভবনারদাদি যার তপ করে।
হেন ভক্তি বিলাইমু বলিলুঁ তোমারে ॥
অদ্বৈত বোলেন যদি ভক্তি বিলাইবা।
স্ত্রী শূদ্র আদি যত মুর্খেরে সে দিবা ॥
বিদ্যাধনকুল আদি তপস্যার বাদে।
তোর ভক্ত তোর ভক্তি যে যে জন বাধে।
সে পাপিষ্ঠ সব দেখি মরুক পুড়িয়া।
চণ্ডাল নাচুক তোর নাম গুণ গায়্যা ॥
অদ্বৈত বাক্য শুনি করিলা হুঙ্কার।
প্রভু বোলে সত্য যে তোমার অঙ্গীকার ॥

(চৈ.ভা. ২।৬)

সত্যরক্ষা করিয়া চৈতন্যদেব সর্বসাধারণের জন্য কীর্তন দ্বারা প্রেমভক্তি বিতরণ করিয়াছিলেন। জয়ানন্দ লিখিয়াছেন

আচণ্ডাল আদি সভারে দিল কোল।
আব্রহ্ম ভরিয়া শুনি হরি হরি বোল॥

(চৈ ম. ৪।১০।৫)

যে কীর্তন 'সর্বধর্মসার', যাহা হইতে সর্বসাধ্য প্রেম লাভ হয় দেখা যাইতেছে তাহাকেই চৈতন্যদেব আপামর সকলের অধিগত করিয়া দিলেন। অতএব সাধারণ ভক্তজনের মনে কীর্তনের আকর্ষণ যে বিপুল হইবে তাহাতে বিস্ময়ের কিছু নাই। আচণ্ডাল সর্বসাধারণ চৈতন্যদেবের নামে সংকীর্তন যজ্ঞে যোগ দিয়াছিল। চৈতন্য-দেবের পরিকরগণ, বিশেষতঃ নিত্যানন্দ, কীর্তন গাহিয়া নাচিয়া বাঙ্গালীর হৃদয় জয় করিয়া নিয়াছিলেন। পরবর্তীকালে চৈতন্যসম্প্রদায় শাস্ত্রশাসনে আবদ্ধ হইলেও সঙ্কীর্তনের আকর্ষণ ক্ষুণ্ণ হয় নাই। আজও বাঙ্গলার বৈষ্ণব সমাজে সঙ্কীর্তনের প্রভাব অব্যাহত। অনেক মন্দিরে, আখড়ায় নিয়মিত বা নৈমিত্তিক নামকীর্তন হয়। গ্রামে গ্রামে হরিমেলা বা বারয়ারীতলায় অষ্টপ্রহর, ষোলপ্রহর, চব্বিশপ্রহর, আটচল্লিশপ্রহর বা নবরাত্রিব্যাপী নামকীর্তনের ব্যবস্থা আছে। বিভিন্ন জাতির লোক সমবেত হইয়া একত্রে সঙ্কীর্তন করিয়া থাকে।

চৈতন্যদেবের আবির্ভাবের পূর্বে গুহ্য সম্প্রদায়সমূহের মধ্যে সমবেতকণ্ঠে আধ্যাত্মিক গান করিবার রীতি প্রচলিত ছিল। ইহাদের সাম্প্রদায়িক ধর্মাচরণে জাতিবিচার ছিল না, অস্পৃশ্যরাও যোগ দিতে পারিত। কিন্তু গুহ্য সম্প্রদায় সমূহের ধর্মাচরণ হইত গোপনে, সমাজদৃষ্টির আড়ালে। চৈতন্যদেব যে সঙ্কীর্তন প্রচার করিলেন তাহার অনুষ্ঠান হইত সর্বজনসমক্ষে প্রকাশ্যে, আচণ্ডাল সর্বজাতি কীর্তনে মিলিত হইয়া গান করিত, নাচিত। নাচগানে মাতিয়া সকলে ভাবোন্মত্ত হইয়া উঠিত। ভক্তির আবেগে ও প্রেমানুসন্ধানে কীর্তন হইয়া উঠিয়াছিল আচণ্ডাল সকলের মিলনক্ষেত্র। সকলে মিলিয়া এমনভাবে প্রকাশ্যে উচ্চকণ্ঠে ভগবানের নামে বাজনা বাজাইয়া সুর তাল বজায় রাখিয়া গান গাওয়া এবং গানের সঙ্গে ভাবাবেশে নাচ বোধহয় আগে ছিল না। তাই চৈতন্য-প্রবর্তিত কীর্তন লোকচক্ষে অভিনব ঠেকিয়াছিল। কবিকর্ণপুর বিরচিত 'চৈতন্যচন্দ্রোদয়ম্' নাটকে (৮।৪২) আছে যে ওড়িশার রাজা প্রতাপরুদ্র চৈতন্যদেব-পরিচালিত সংকীর্তন শুনিয়া বাসুদেব সার্বভৌমকে বলিতেছেন, "ঈদৃশং কীর্তনকৌশলং ক্বাপি ন দৃষ্টম" (এইরূপ কীর্তন কৌশল কখনও দেখি নাই)। সার্বভৌম উত্তর দিলেন, "ইয়মিয়ং ভগবচ্চৈতন্য সৃষ্টি" (ইহা ভগবান চৈতন্যেরই সৃষ্টি)।

চৈতন্যদেবের সঙ্গীসাথী হিসাবে যে সব বিশিষ্ট ভক্তদের নাম ও পরিচয় জীবনী গ্রন্থসমূহে পাওয়া যায় তাঁহাদের অধিকাংশই সমাজের উচ্চতর পর্যায়ের লোক (বিমানবিহারী মজুমদার ১৯৫৯ ঃ ৫৬৭)। তবে সাধারণ লোক যাহারা ভক্তিধর্মের অনুগামী হইয়াছিল তাহাদের বেশীরভাগই সমাজের নিম্নতর পর্যায়ভুক্ত। চৈতন্য-জীবনীসমূহেই ইহার ইঙ্গিত আছে। সমাজের উঁচু নীচু, ছোট বড় বিভিন্ন পর্যায়ের লোক ভক্তি ধর্মের আশ্রয়ে সমবেত হইয়াছিল। গুহ্যসাধন সম্প্রদায়সমূহও ছোটবড় নানা ধরণের লোকের মিলনক্ষেত্র। গুহ্যসাধনা মুখ্যতঃ যৌনযৌগিক তান্ত্রিকসাধনা। শিষ্টসমাজের চোখে ইহা দোষের। তবে গুহ্যসাধনা অপ্রকাশ্য। লোকগোচরের বাহিরে বিভিন্ন জাতির মানুষ মিলিয়া সাধনভজন করিলে সাধারণভাবে তাহাতে সামাজিক রীতিনীতি সরাসরি লঙ্ঘিত হইবার সম্ভাবনা কম। এইজন্যই বোধ হয় শিষ্ট সমাজের কাছে গুহ্য সাধনা নিন্দনীয় হইলেও সব সময় বিপজ্জনক বলিয়া ঠেকে নাই। কিন্তু প্রকাশ্য সর্বজনীন কীর্তনে নিম্নজাতিভুক্ত লোকের সমাবেশ দেখিয়া গোঁড়া শাস্ত্রবিশ্বাসীদের মনে আতঙ্ক জন্মিয়াছিল। ভয়ের বশেই তাহারা বলিয়াছিল

কৃষ্ণের কীর্ত্তন করে চণ্ডাল বার বার।
এই পাপে গ্রাম সব হইব উজাড়॥

(চৈ. চ. ১।১৭)

শাস্ত্রে যে সম্মেলক কীর্তনের কথা নাই তাহা নয়। কিন্তু আচণ্ডাল সকলকে নিয়া প্রকাশ্যে বাদ্যভাণ্ড ও নৃত্য সহযোগে উচ্চকণ্ঠে সঙ্কীর্তন গান বাঙ্গলায় চৈতন্যদেব কর্তৃক প্রবর্তিত অভিনব ঘটনা। চৈতন্যদেবের আগে ইহার নজির নাই। শাস্ত্রেও ইহার সমর্থন মিলিবে না। তাই রক্ষণশীল লোকে সঙ্কীর্তনের বিরুদ্ধতা করিয়া বলিয়াছিল

কেহো বোলে হরিনাম লৈব মনে মনে।
হুড়াহুড়ি বলিয়াছে কেমন পুরাণে॥

(চৈ. ভা. ২।২৩)

(কেহো বোলে) ও কীর্ত্তন না দেখিলে কি হইব মন্দ।
জনশত বেঢ়ি যেন করে মহাদ্বন্দ্ব॥
কোন জপ কোন তপ কোন তত্ত্বজ্ঞান।
যাহা না দেখিলে করি নিজকর্ম্মধ্যান॥

(চৈ. ভা. ২।৮)

প্রকাশ্য সম্মেলক সঙ্কীর্তন এবং সঙ্কীর্তনে নিম্নতর জাতিভুক্ত লোকের মুখে ঈশ্বরের নামগুণযশোগান গোঁড়া শাস্ত্রবিশ্বাসীদের কাছে পাপজনক ও অমঙ্গলসূচক বলিয়া বোধ হইয়াছিল। ইহাদের নিন্দা ও আশঙ্কায় সমাজের একাংশের মনোভাব প্রকাশ পাইতেছে সন্দেহ নাই। কিন্তু সম্মেলক কীর্তনে জপতপ-বিরহিত বহুলোকের 'হুড়াহুড়ি' এবং চণ্ডালের মুখে বারংবার কৃষ্ণের কীর্তনই ভক্তিধর্মের সামাজিক সার্থকতা। শাস্ত্র ও সামাজিক রীতিনীতির কথা চিন্তা না করিয়া আচণ্ডাল বিভিন্ন পর্যায়ের লোকে যে সমবেত হইয়া সম্মেলক কীর্তন করিতেছে ইহাতেই বোঝা যায় যে চৈতন্যদেব মানুষের মনে গভীর আগ্রহ ও আত্মবিশ্বাস সঞ্চার করিয়াছিলেন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

চৈতন্যদেব ও নবদ্বীপে কীর্তনের প্রসার

বাঙ্গলা কীর্তনের প্রাণপুরুষ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য। তাঁহার জন্ম হয় ১৪৮৬ খ্রীষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারী মাসে, ফাল্গুনী পূর্ণিমার তিথিতে। জন্মস্থান নবদ্বীপ। পিতার নাম জগন্নাথ মিশ্র, মাতা শচী দেবী। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য তাঁহার সন্ন্যাস আশ্রমের নাম। সংসারাশ্রমে তাঁহার নাম ছিল বিশ্বম্ভর মিশ্র, ডাক নাম নিমাঞি (আধুনিক উচ্চারণে নিমাই)। নিমাঞির গায়ের রং ছিল তপ্তকাঞ্চনের মত। তাই তিনি গৌরাঙ্গ বা গৌর (গোরা) নামেও পরিচিত ছিলেন। বিশ্বম্ভর বিষ্ণু পণ্ডিত, সুদর্শন ওঝা ও গঙ্গাদাস পণ্ডিতের টোলে লেখাপড়া করেন। বৃন্দাবনদাস ও কৃষ্ণদাস কবিরাজের চরিতকাব্যে লেখা আছে যে বিশ্বম্ভর ব্যাকরণ পাঠ করিয়াছিলেন (চৈ.ভা. ১৬, ৭; চৈ.চ. ১।১৫)। কিন্তু 'চৈতন্যমঙ্গল' কাব্যে জয়ানন্দ বলিতেছেন যে বিশ্বম্ভর কাব্য, নাটক, স্মৃতি ও ন্যায় পড়িয়াছিলেন (চৈ.ম. ২।১৬।৫)। আঠার কি উনিশ বছর বয়সে বিশ্বম্ভর নিজেই টোল খুলিয়া ছাত্র পড়াইতে শুরু করেন। মুরারি গুপ্তর সাক্ষ্য অনুসারে বিশ্বম্ভর লৌকিক সৎক্রিয়াবিধি অর্থাৎ স্মৃতিশাস্ত্র পড়াইতেন (কড়চা ১।১৫।১)। বৃন্দাবনদাস ও কৃষ্ণদাস কবিরাজ বলিতেছেন যে বিশ্বম্ভর ছিলেন বৈয়াকরণ, ছাত্রদের তিনি ব্যাকরণ পড়াইতেন (চৈ.চ. ১।১৬)। মাতা, পত্নী ও ভৃত্য নিয়া ছিল বিশ্বম্ভরের সংসার। তিনিই ছিলেন গৃহকর্তা। বাল্যকালে এগার বার বছর বয়সে তাঁহার পিতৃবিয়োগ হয়। লেখাপড়া শেষ করিবার আগেই বিশ্বম্ভর বিবাহ করিয়াছিলেন।

জগন্নাথ মিশ্রর বাড়ীতে সাধুসন্ন্যাসীদের আনাগোনা ছিল। বিশ্বম্ভরের বড় ভাই—সাত আট বছরের বড়—বিশ্বরূপ সন্ন্যাসী হইয়া গিয়াছিলেন। কিন্তু ছাত্রাবস্থায় বা অধ্যাপনা করিবার সময় বিশ্বম্ভরের মনে আধ্যাত্মিক ভাবনা বিশেষ কিছু ছিল

বলিয়া মনে হয় না। তিনি নিজে পছন্দ করিয়া বল্লভ আচার্যর মেয়ে লক্ষ্মীকে বিবাহ করিয়াছিলেন। বিবাহ হইয়াছিল পনেরো কি ষোল বছর বয়সে। টোল খুলিবার পর আয় উপার্জনের চেষ্টায় বিশ্বম্ভর একবার পূর্ববঙ্গে গিয়াছিলেন। পূর্ববঙ্গে ভ্রমণের সময় অপঘাতে লক্ষ্মীর মৃত্যু হয়। লক্ষ্মীর সঙ্গে বিশ্বম্ভরের বিবাহিত জীবন চার বা পাঁচ বছরের। লক্ষ্মী মারা যাওয়ার কিছুদিন পর মায়ের আগ্রহাতিশয্যে সনাতন মিশ্রর কন্যা বিষ্ণুপ্রিয়ার সঙ্গে বিশ্বম্ভরের বিবাহ হয়। এ বিবাহে বিশ্বম্ভরের রুচি ছিল না। বিষ্ণুপ্রিয়াকে তিনি কখনই সমাদর করেন নাই।

বাল্যে বিশ্বরূপের গৃহত্যাগ ও প্রথম যৌবনে লক্ষ্মীর মৃত্যু বিশ্বম্ভরের মনে গভীর দাগ কাটিয়াছিল। এই দুইজনকেই তিনি অতিশয় ভালবাসিতেন। বাইশ বছর বয়সে, ১৫০৮ সালে, বিশ্বম্ভর পিতৃকার্য উপলক্ষে গয়াতীর্থে যান। এখানে তাঁহার ভাবান্তর ঘটিল। প্রেমধর্মের প্রবর্তক মাধবেন্দ্র পুরীর শিষ্য কৃষ্ণপ্রেমাবিষ্ট সন্ন্যাসী ঈশ্বর পুরী তখন গয়াতে ছিলেন। ঈশ্বর পুরীর নবদ্বীপে যাতায়াত ছিল। বিশ্বম্ভর মিশ্রকে তিনি চিনিতেন। কিন্তু সে পরিচয়ে আধ্যাত্মিক সংশ্রব ছিল না। আধ্যাত্মিক যোগ ঘটিল গয়াতে। বিশ্বম্ভর ঈশ্বর পুরীর কাছে মন্ত্রদীক্ষা গ্রহণ করিলেন। দীক্ষার পরেই তাঁহার মনে কৃষ্ণাবেশের সঞ্চার হইল। বাড়ী ফিরিবার পথে কানাঞির (কানাই) নাটশালা গ্রামে (সাঁওতাল পরগণা, বিহার) তিনি শ্যামতনু বংশীধারী বালক কৃষ্ণকে দেখিতে পাইলেন। কিন্তু সে একবার মাত্র তাঁহার কাছে আসিয়াই অদৃশ্য হইয়া গেল। গয়া হইতে বিশ্বম্ভর নবদ্বীপে ফিরিয়া আসিলেন কৃষ্ণপ্রেমে বিভোর হইয়া। সময়টা ১৫০৮ সালের ডিসেম্বর মাসের শেষ দিক। চৈতন্যদেবের শৈশব ও প্রথম যৌবনে গৃহস্থ জীবনের কাহিনী বিস্তারিতভাবে বলা আছে বৃন্দাবনদাস-রচিত 'চৈতন্যভাগবতের' আদিখণ্ডে। (উপরন্তু মুরারি গুপ্তর কড়চা, ১ প্রক্রম, সর্গ ৬-১৬, কবিকর্ণপূর-বিরচিত 'চৈতন্যচরিতামৃত' ২-৪ সর্গ এবং জয়ানন্দ-বিরচিত 'চৈতন্যমঙ্গল' নদীয়াখণ্ড ১৫-৬৬ উল্লেখযোগ্য)।

কবিকর্ণপূরের 'চৈতন্যচরিতামৃতম্' অনুসারে গয়া হইতে প্রত্যাবর্তনের এক মাসের মধ্যেই বিশ্বম্ভরের ভাবপ্রকাশ অর্থাৎ ঈশ্বরাবেশের অভিব্যক্তি শুরু হয় (চৈতন্যচরিতামৃতম্, ৪।৭৬)। ভাবপ্রকাশের অবস্থায় বিশ্বম্ভরের মনে সাংসারিক জীবনের আকর্ষণ শিথিল হইয়া গেল। (এখানে অবশ্য বিশ্বম্ভর মিশ্রকে নিমাই পণ্ডিত বলাই ভাল কেননা অধ্যাপক জীবনে লোকে তাঁহাকে এই নামেই জানিত)। নবদ্বীপে ফিরিবার পর নিমাই পণ্ডিত কিছুদিন টোল চালাইয়াছিলেন, কবিকর্ণপূরের মতে মাত্র চারমাস (উপর্যুক্ত, ৫।২৪)। বৃন্দাবনদাসের ইঙ্গিত অনুসারে

আরও কম সময় (চৈ.ভা. ২।১)। তবে অধ্যাপনা বোধহয় যথারীতি হইত না। বৃন্দাবনদাসের কাব্যে আছে গয়া হইতে ফিরিবার পর বিশ্বম্ভর ব্যাকরণের সূত্র, টীকা, ব্যাখ্যা ছাড়িয়া সব কিছুতেই কৃষ্ণভক্তির ব্যাখ্যান শুরু করিলেন। বিপন্ন ছাত্ররা চৈতন্যদেবের শিক্ষাগুরু গঙ্গাদাস পণ্ডিতের শরণাপন্ন হইল। তাঁহার কাছে গিয়া তাহারা বলিল নিমাই পণ্ডিত

গয়া হৈতে যাবত আসিয়াছেন ঘরে।
তদবধি কৃষ্ণ বই ব্যাখ্যা নাই স্ফুরে॥
সর্ব্বদা বোলেন কৃষ্ণ পুলকিত অঙ্গ।
ক্ষণে হাসে হুঙ্কার করয়ে বহু রঙ্গ॥

ফলে পড়াশুনা কিছুই হয় না। ছাত্ররা হাসাহাসি করিতে লাগিল। কয়েকজন পড়ুয়া তো বলিয়াই ফেলিল যে পণ্ডিতের বোধ হয় বায়ুর প্রকোপ হইয়াছে তাই এইসব কথা বলিতেছেন। অবশেষে পড়ুয়াদের ডাকিয়া নিমাই পণ্ডিত একদিন বলিলেন

তোমা সব স্থানে মোর এই পরিহার।
আজি হইতে আর পাঠ নাহিক আমার॥
... ...
কৃষ্ণের কীর্ত্তন কর পরিপূর্ণ করি॥
শিষ্যগণ বোলেন কেমন সঙ্কীর্ত্তন।
আপনে শিখায় প্রভু শ্রীশচীনন্দন॥

পড়ুয়াদের "দিশা দেখাইয়া প্রভু হাতে তালি দিয়া" কীর্তন শিখাইলেন। তাহার পর শিষ্যগণ সমভিব্যহারে তিনি গাহিলেন

হরয়ে নমঃ কৃষ্ণ যাদবায় নমঃ।
গোপাল গোবিন্দ নাম শ্রীমধুসূদন॥

(চৈ.ভা. ২।১)

এই শ্লোকটি চৈতন্য-প্রবর্তিত কীর্তনগানের আদি বাণী। বৃন্দাবনদাস বলিতেছেন এইভাবে "সঙ্কীর্তন আরম্ভের হইল প্রকাশ" (তদেব)। পোড়োদের নিয়া চৈতন্যদেব ঈশ্বরের বিভিন্ন নাম বলিয়া স্তবগান করিয়াছিলেন অর্থাৎ তাঁহার এই কীর্তন ছিল নামকীর্তন। অনেকে মিলিয়া গাওয়া হইয়াছিল বলিয়া ইহাকে সঙ্কীর্তন বলা হইয়াছে। পোড়োরা চৈতন্যদেবকে বেড়িয়া গান করিয়াছিল বলিয়া এই কীর্তনকে বেড়া কীর্তন বলা যাইতে পারে।

নিমাই পণ্ডিতের মনে ভক্তিভাবের সঞ্চার নবদ্বীপবাসীদের কাছে বিস্ময়জনক বোধ হইয়াছিল। ছেলেবেলা হইতেই নিমাই ছিলেন চপলমতি ও একরোখা। বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে লেখাপড়া শিখিয়া তিনি হইয়া উঠিলেন উদ্ধত, তার্কিক, আত্মশ্লাঘী, পরিহাসপ্রবন আর তাহার উপর আবার কিছুটা কলহপরায়ণ। লোকে তাঁহাকে ভাবিত 'উদ্ধতের চূড়ামণি'। বৃন্দাবনদাস বলিতেছেন 'তেমন উদ্ধত আর নাহি নবদ্বীপে'। (চৈ.ভা. ১।৮)। মুরারি গুপ্তর মত নির্বিরোধ লোককে নিয়া নিমাই পণ্ডিত বিদ্রূপ করিতেন (চৈ.ভা. ১।৭)। শ্রীবাস পণ্ডিত বা মুকুন্দ দত্তর মত নিরীহ বৈষ্ণব দেখিলে ফাঁকি বা কূট প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়া তাহাদের অপদস্থ করিতে চাহিতেন। ফলে বৈষ্ণবরা বুঝিয়াছিলেন নিমাই পণ্ডিতকে এড়াইয়া চলাই ভাল।

সভেই বোলেন ভাই উহান দেখিয়া।
ফাঁকি জিজ্ঞাসার ভয়ে যাই পলাইয়া॥ (চৈ.ভা. ১।৮)

গায়ে পড়িয়া তর্ক বাধান, হয়কে নয়, নয়কে হয় করা, কথাবার্তায় অহঙ্কার প্রকাশ করা ছিল নিমাই পণ্ডিতের স্বভাবসিদ্ধ ব্যাপার। একটা দৃষ্টান্ত দিলেই তাঁহার স্বভাবটা বোঝা যাইবে।

অধ্যাপক প্রতি সব কটাক্ষ করিয়া।
ব্যাখ্যা করে প্রভু গঙ্গাসমীপে বসিয়া॥
হয় ব্যাখ্যা নয় করে নয় করে হয়।
সকল খণ্ডিয়া শেষে সকল স্থাপয়।
প্রভু বোলে তারে আমি বলিয়ে পণ্ডিত।
একবার ব্যাখ্যা করে আমার সহিত।
সেই বাক্য যদি বাখানিয়ে আরবার।
আমা প্রবোধিব হেন দেখি শক্তি কার॥
এইমত ঈশ্বর ব্যঞ্জেন অহঙ্কার।··· (তদেব)

কাহারো সঙ্গে আবার খানিক তর্ক করিয়া বলিতেন, আজ বাড়ী গিয়া ভালভাবে পুঁথিপত্র দেখিয়া রাখ, কাল তোমার বিদ্যা বোঝা যাইবে। এইসব কারণেই বোধ করি লোকের সঙ্গে তাঁহার প্রায়ই ঝগড়াঝাঁটি হইত। নিমাই কাহার সঙ্গে কি ঝগড়া করিয়া আসে ভাবিয়া মায়ের মনে উদ্বেগ ছিল। তাই ছেলে টোল হইতে বাড়ী ফিরিলে

মায়ে বলে বাপ আজ কি পুথি পড়িলা।
কাহার সহিত কিবা কোন্দল করিলা॥ (চৈ.ভা. ২।১)

এইরূপ আচরণ সত্ত্বেও নিমাই পণ্ডিতের চারিত্র্যের প্রবলতা ও তেজস্বিতা এবং তাঁহার বিদ্যা বুদ্ধির উৎকর্ষ দেখিয়া লোকে তাঁহার প্রতি আকৃষ্ট না হইয়া পারিত না। সমবয়সী ও পড়ুয়াদের কাছে নিমাই পণ্ডিত প্রিয় ছিলেন। নিমাই পণ্ডিতের ব্যবহারে উত্যক্ত হইলেও তাহারা তাঁহার সঙ্গ কামনা করিত। ইহাদের সঙ্গে নিয়া দলবলসহ নিমাই পণ্ডিত সারা নবদ্বীপ ঘুরিয়া রঙ্গ তামাসা ও হৈ চৈ করিয়া বেড়াইতেন। নিমাই পণ্ডিতের মধ্যে প্রাধান্য বিস্তার ও নেতৃত্ব করিবার সহজাত প্রতিভা ছিল। যাহারা নিমাই পণ্ডিতের প্রভাব মানিত না বা তাঁহার উপর বিরক্ত ছিল তাহারাও তাঁহার বিশিষ্টতা স্বীকার করিত।

কেহো বোলে ব্রাহ্মণের শক্তি অমানুষি।
কোন মহাপুরুষ বা হয় হেন বাসি॥
... ...
কেহ বোলে এত তেজ মনুষ্যের নহে।
কেহো বোলে এ ব্রাহ্মণ বিষ্ণু অংশ হয়ে॥ (চৈ.ভা. ১৮)

লোকে দুঃখ করিয়া বলিত এমন বুদ্ধিমান যুবক ন্যায়শাস্ত্র পড়িল না, পড়িলে নিশ্চয়ই বড় অধ্যাপক হইতে পারিত। বৈষ্ণবদের মনে খুব খেদ ছিল যে এমন মানুষের কৃষ্ণভক্তি হইল না।

মনুষ্যের এমন পাণ্ডিত্য দেখি নাঞি।
কৃষ্ণে না ভজেন সবে এই দুঃখ পাই॥ (তদেব)

বৈষ্ণবরা তাই নিমাই পণ্ডিতের মতিবুদ্ধি শুধরাইবার চেষ্টায় তাঁহাকে বলিত, দেখ, কৃষ্ণভক্তিই বিদ্যাচর্চার একমাত্র উদ্দেশ্য, তাহাই যদি না হইল তবে লেখাপড়া করিয়া তোমার কি লাভ হইয়াছে। বৈষ্ণব ভক্তদের কথা শুনিয়া নিমাই পণ্ডিত ঠাট্টা করিয়া বলিতেন, তোমরা যে আমার শুভানুধ্যায়ী সে আমার বড় ভাগ্য, তোমরাই আমাকে কৃষ্ণভজনা শিখাও।

কথোদিন পঢ়াইয়া মোর চিত্তে আছে।
চলিব বুঝিয়া ভাল বৈষ্ণবের কাছে॥ (তদেব)

এই লোক একেবারে বদলাইয়া গেলেন। দীক্ষার পর হইয়া উঠিলেন পরম বৈষ্ণব। গয়া হইতে ফিরিয়া আসিবার পরে নিমাই পণ্ডিত স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া বৈষ্ণব ভক্তদের কাছে নিজের আর্তি জ্ঞাপন করিলেন। শ্রীমান পণ্ডিতকে বলিয়া একদিন সকাল বেলা শুক্লাম্বর ব্রহ্মচারীর বাড়ীতে বৈষ্ণব ভক্তদের কাছে নিজের ক্লেশ নিবেদন করিলেন। শুক্লাম্বর ব্রহ্মচারী ও শ্রীমান পণ্ডিত ছাড়া সেখানে উপস্থিত ছিলেন সদাশিব পণ্ডিত, মুরারি গুপ্ত ও গদাধর পণ্ডিত। শুক্লাম্বর ব্রহ্মচারী ও শ্রীমান্

পণ্ডিতের মুখে শ্রীবাস পণ্ডিত, তাঁহার ভাই শ্রীরাম পণ্ডিত এবং গোপীনাথ আচার্য নিমাই পণ্ডিতের নূতন অবস্থার কথা শুনিয়াছিলেন। নিমাই পণ্ডিতের ভাবান্তর দেখিয়া বৈষ্ণবগণ একভাবে বিস্মিত হইয়া গেলেন, অন্যভাবে হইলেন আনন্দিত। নিমাই পণ্ডিতকে সঙ্গে পাইয়া তাঁহাদের মনের বল বাড়িয়া গেল।

শুনিঞা অপূর্ব প্রেম সভেই বিস্মিত।
কেহো বোলে ঈশ্বর বা হইল বিদিত ॥
কেহো বোলে নিমাঞি পণ্ডিত ভাল হৈলে।
পাষণ্ডীর মুণ্ড ছিণ্ডিবারে পারি হেলে ॥ (চৈ.ভা. ২।১)

নবদ্বীপে বৈষ্ণব গোষ্ঠীর নেতা ছিলেন অদ্বৈত আচার্য। তিনি বহুদিন যাবৎ ভক্তিধর্ম প্রচারের জন্য কৃষ্ণের আবির্ভাব কামনায় সংকল্প করিয়া সাধনা করিতেছিলেন। নিমাই পণ্ডিতের কথা বলিবার জন্য বৈষ্ণবরা অদ্বৈত আচার্যর বাড়ীতে আসিলেন। অদ্বৈত আচার্য যেন এই সংবাদের জন্য তৈরী হইয়াই ছিলেন। আগের দিন রাত্রে একটা ঘটনা ঘটিয়া গেছে। স্বপ্নে ঈশ্বর তাঁহাকে প্রত্যাদেশ দিতে আসিয়াছিলেন। স্বপ্ন ভাঙ্গিতেই চোখ খুলিয়া দেখিলেন সম্মুখে বিশ্বম্ভর। অতএব নিমাই পণ্ডিত যে ঈশ্বর এ বিষয়ে তাঁহার সন্দেহ ছিল না। নিমাই পণ্ডিতের ভাবান্তর শুনিয়া অদ্বৈত আনন্দে অধীর হইয়া উঠিলেন। নিমাই পণ্ডিত তাঁহার বাড়ীতে আসিলে অদ্বৈত আচার্য সাশ্রুনয়নে চরণ বন্দনা করিয়া তাঁহাকে ঐশী পুরুষরূপে বরণ করিয়া নিলেন। বৈষ্ণব ভক্তদের মনেও সেই বিশ্বাস জন্মিল।

কেহো বোলে এ পুরুষ অংশ অবতার।
কেহো বোলে এ শরীরে কৃষ্ণের বিহার ॥
... ...
যত সব ভাগবতগণের গৃহিণী।
তাঁহারা বোলয়ে কৃষ্ণ জন্মিল আপনি ॥
কেহো বোলে এই বুঝি প্রভুর অবতার।
এইমত মনে সভে করেন বিচার ॥ (চৈ.ভা. ২।২)।

ভাবাবেশ শুরু হইবার পর হইতে নিমাই পণ্ডিত বৈষ্ণব গোষ্ঠীর সঙ্গে কীর্তন করিতেছিলেন। নবদ্বীপে কীর্তনের উদ্যোক্তা শ্রীবাস পণ্ডিত ভাবাবিষ্ট নিমাই পণ্ডিতকে দেখিতে আসিয়া তাঁহাকে বলিলেন

সভে মিলি এক ঠাঞি করিব কীর্ত্তন।
যে তে কেনে না বোলে পাষণ্ডী পাপিগণ ॥
(চৈ.ভা. ২।২)

নিমাই পণ্ডিতের ঐশী শক্তিতে বিশ্বাস জন্মিতে বৈষ্ণবরা আসিয়া তাঁহাকে আশ্রয় করিলেন।

…শুনিয়া প্রভুর ভক্তিকথার প্রচার ॥
সভে বলে আমরা সভার বড় পুণ্য।
তুমি হেন সঙ্গে সভে হইলাঙ ধন্য ॥
তুমি সঙ্গে যার তার বৈকুণ্ঠে কি করে।
তিলেক তোমার সঙ্গে ভক্তিফল ধরে ॥
অনুপাল্য তোমার আমরা সবজন।
সভার নায়ক হই করহ কীর্ত্তন ॥ (চৈ.ভা. ২।২)

সন্ধ্যার সময় হইলে ভক্তরা একে একে নিমাই পণ্ডিতের বাড়ীতে আসিয়া জড় হইতেন। সুকণ্ঠ গায়ক মুকুন্দ দত্ত ভক্তিশ্লোক পাঠ করিতেন। তাহার পর কীর্তন শুরু হইত। কীর্তন চলিত সারা রাত।

এই মত নিজগৃহে শ্রীশচীনন্দন।
নিরবধি নিশিদিশি করেন কীর্ত্তন ॥
আরম্ভিলা মহাপ্রভু কীর্ত্তন প্রকাশ।
সকল ভক্তের দুঃখ হয় দেখ নাশ ॥ (চৈ.ভা. ২।২)

এতদিন নবদ্বীপের বৈষ্ণবগোষ্ঠীটি ছিল ছোট। বৈষ্ণব ভক্তগণ গোষ্ঠীর বাহিরে গিয়া ভক্তিপ্রচারের উপায় খুঁজিতেছিলেন। অদ্বৈত আচার্য যে কৃষ্ণের অবতার করাইবার জন্য সাধনা করিতেছিলেন সেও এই উপায়ের সন্ধান। নিমাই পণ্ডিতের মধ্যে নবদ্বীপের বৈষ্ণবভক্তবৃন্দ নায়কের দর্শন পাইলেন। নিমাই পণ্ডিতের প্রবল ব্যক্তিত্ব হইল তাঁহাদের পরম আশ্বাসস্থল। নিমাই পণ্ডিতও এবার প্রকাশ্যে ঘোষণা করিলেন, আমিই ঈশ্বর 'মুঞি সেই মুঞি সেই বোলে বার বার' (তদেব)। ভক্তদের সমক্ষে তিনি বলিলেন

…আমি সে করিলুঁ পূর্বে পৃথিবী উদ্ধার ॥
সঙ্কীর্ত্তন আরম্ভ মোহর অবতার।
ভক্তজন রাখি দুষ্ট করিমু সংহার ॥ (চৈ.ভা. ২।৩)

এতদিন কীর্তন হইত শ্রীবাসের বাড়ীতে। উচ্চৈস্বরে করিলেও ভক্তরা প্রকাশ্যে কীর্তন করিতে ভরসা করেন নাই। নিমাই পণ্ডিতের জোরে তাঁদের সাহস খুব বাড়িয়া গেল।

পাষণ্ডীরে আর কেহ ভয় নাহি করে।
হাটে ঘাটে সভে কৃষ্ণ গায় উচ্চৈস্বরে ॥ (তদেব)

নবদ্বীপের যে বৈষ্ণব ভক্তগণ চৈতন্যদেবের ভগবত্তায় বিশ্বাস করিয়া তাঁহাকে নেতৃপদে বরণ করিয়া নিলেন তাঁহারাই আদি চৈতন্যপরিকর অর্থাৎ তাঁহার সঙ্গী-সাথী। ইঁহাদের নিয়াই নবদ্বীপের চৈতন্যমণ্ডলী অর্থাৎ চৈতন্য-প্রবর্তিত ভক্তি আন্দোলনের আদি সংগঠনের সূত্রপাত। নবগঠিত চৈতন্যমণ্ডলীতে কতজন ছিলেন জানা নাই, তবে এই কয়জনের নাম পাওয়া যাইতেছে: শ্রীমান পণ্ডিত, শুক্লাম্বর ব্রহ্মচারী, গদাধর পণ্ডিত, অদ্বৈত আচার্য, শ্রীবাস পণ্ডিত, রামাই পণ্ডিত, সদাশিব বিদ্যানিধি, মুরারি গুপ্ত ও মুকুন্দ দত্ত। নিমাই পণ্ডিতের নেতৃত্বে কীর্তন শুরু হইতে নবদ্বীপের আরও অনেক ভক্ত আসিয়া চৈতন্যমণ্ডলীতে যোগ দিলেন। ইঁহাদের মধ্যে কয়েকজনের নাম উল্লেখযোগ্য, যথা—চন্দ্রশেখর আচার্য (চৈতন্যদেবের মেসো), গোবিন্দ দত্ত ও বাসুদেব দত্ত (মুকুন্দ দত্ত ইঁহাদের ভাই), শ্রীগর্ভ পণ্ডিত, বুদ্ধিমন্ত খান (মিশ্র পরিবারের ইনি হিতাকাঙ্ক্ষী), পুরুষোত্তম আচার্য, গোপীনাথ আচার্য, মুকুন্দ সঞ্জয় (ইঁহার চণ্ডীমণ্ডপে নিমাই পণ্ডিত টোল বসাইয়াছিলেন), পুরুষোত্তম সঞ্জয় (মুকুন্দ সঞ্জয়ের ছেলে, নিমাই পণ্ডিতের ছাত্র), বিজয় আখরিয়া (ইনি নিমাই পণ্ডিতকে অনেক পুঁথি নকল করিয়া দিয়াছিলেন), ব্রহ্মানন্দ পুরী (বা ভারতী), খোলবেচা শ্রীধর, বনমালী পণ্ডিত, নন্দন আচার্য, গঙ্গাদাস (নন্দন আচার্যর ভাই), বংশীবদন চট্ট (নবদ্বীপের কাছে কুলিয়া গ্রামে বাড়ী), গোবিন্দানন্দ ও কৃষ্ণানন্দ।

নবদ্বীপে নিমাই পণ্ডিতের কীর্তন শুরু হইবার পর অচিরে চারিদিকে রটিয়া গেল যে স্বয়ং ঈশ্বর নবদ্বীপে অবতীর্ণ হইয়া ভক্তি বিতরণ করিতেছেন। এই সংবাদ শুনিয়া বিভিন্ন স্থান হইতে ভক্তিবাদের অনুগামীরা নবদ্বীপে আসিয়া চৈতন্যমণ্ডলীতে যোগ দিতে লাগিলেন। বহিরাগত ভক্তিবাদীদের মধ্যে প্রথমেই নাম করিতে হয় হরিদাস ঠাকুর (যবন হরিদাস নামেও পরিচিত) ও অবধূত সন্ন্যাসী নিত্যানন্দ স্বরূপের। হরিদাস ঠাকুরের জন্ম বুড়ন গ্রামে (যশোহর জেলা, বাংলাদেশ)। তিনি বেনাপোল (যশোহর) ও কুলীনগ্রামের (বর্ধমান) পর শান্তিপুরের কাছে ফুলিয়াতে (নদীয়া) একান্তে ভজন করিতেছিলেন। চৈতন্যদেবের ভাবপ্রকাশের আগে হরিদাস বৈষ্ণবসঙ্গ করিবার জন্য একবার নবদ্বীপে আসিয়াছিলেন। চৈতন্যদেবের ভক্তিপ্রচার শুরু হইলে হরিদাস নবদ্বীপে আসিয়া ভক্তমণ্ডলীতে যোগ দিলেন। নিত্যানন্দর জন্ম হইয়াছিল একচক্রা গ্রামে (বীরভূম)। অল্পবয়সে তিনি গৃহত্যাগ করেন। পরিব্রাজক সন্ন্যাসী নিত্যানন্দ তীর্থ হইতে তীর্থান্তরে ঘুরিয়া বেড়াইতেছিলেন। চৈতন্যদেবের ভাবপ্রকাশ শুরু হইবার কিছু দিন পরে তিনি নবদ্বীপে আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

আর যে সব ভক্তরা নানা জায়গা হইতে আসিলেন তাঁহারাও চৈতন্যদেবের বিশিষ্ট পরিকর। কয়েকজনের নাম করিতেছি ঃ কাঁচরাপাড়ার (নদীয়া) জগদানন্দ পণ্ডিত, আকনার (হুগলী) বক্রেশ্বর পণ্ডিত ও গরুড় পণ্ডিত, চাতরার (হুগলী) কাশীশ্বর পণ্ডিত, কুলীনগ্রামের সত্যরাজ খান ও তাঁহার পুত্র রামানন্দ বসু, জুলকুলের (বর্ধমান) ভগবান আচার্য, শ্রীখণ্ডের (বর্ধমান) নরহরি সরকার ও তাঁহার বড় ভাই মুকুন্দ, কুলাই (বর্ধমান) হইতে তিন ভাই গোবিন্দ ঘোষ, মাধবানন্দ ঘোষ ও বাসুদেব ঘোষ, যশড়ার (নদীয়া) জগদীশ পণ্ডিত, তালখেঁরা (যশোহর, বাংলাদেশ) হইতে লোকনাথ পণ্ডিত। আর ছিলেন চট্টগ্রামের পুণ্ডরীক বিদ্যানিধি। কর্মসূত্রে ইঁহার নবদ্বীপে যাতায়াত ছিল। বৃন্দাবনদাস বলিতেছেন

যত যত স্থানে সব পার্ষদ জন্মিলা।
অল্পে অল্পে সভে নবদ্বীপেরে আইলা ॥ (চৈ.ভা. ২।৮)

নবদ্বীপের প্রসার্যমান চৈতন্যমণ্ডলীতে নিত্য নিয়মিত কীর্তন হইতে লাগিল। কীর্তন হইত প্রধানতঃ তিন জায়গায়, নিমাই পণ্ডিতের বাড়ীতে, তাঁহার মেসো চন্দ্রশেখর আচার্যর বাড়ীতে ও শ্রীবাস অঙ্গনে অর্থাৎ শ্রীবাস পণ্ডিতের বাড়ীতে। অদ্বৈত আচার্যর নবদ্বীপ ও শান্তিপুরের বাড়ীতেও কীর্তন হইত। বাড়ীর মধ্যে যে কীর্তন হইত তাহা অন্তরঙ্গ ভক্তদের সঙ্গে একান্তে ভক্তিসাধনা। প্রকাশ্যে নবদ্বীপের পথে পথে ঘুরিয়া নগরকীর্তনের কথাও জানা যায়। মৃদঙ্গ (খোল), করতাল, মন্দিরা, শঙ্খ বাজাইয়া উচ্চকণ্ঠে গান গাহিয়া নৃত্যসহযোগে সপরিকর নিমাই পণ্ডিত কীর্ত্তন করিতেন। নামগুণযশোগান হইত। লোচনের 'চৈতন্যমঙ্গলে' আছে (২।১।৭৩) 'নামগুণ সঙ্কীর্ত্তন করে উচ্চৈস্বরে'। লোচনের সাক্ষ্য অনুসারে নিমাই পণ্ডিত ভক্তদের বলিতেন 'গুণ সঙ্কীর্ত্তন কর কৃষ্ণে অনুরাগ' (চৈ.ম. ১।২।১০৫)।

গানের সঙ্গে নাচ হইত। জীবনী গ্রন্থসমূহে নাচের কথা খুব আছে। চৈতন্যদেব এবং তাঁদের পরিকরবৃন্দ নাচিতেন, কীর্তনের সময় অন্য ভক্তরা থাকিলে তাঁহারাও নাচিতেন।

আপনে ঠাকুর নাচে ভক্তগণ সনে।
সবারে নাচায় প্রেমে শচীর নন্দনে ॥

(লোচন, চৈ. ম. ২।১।৭৫)

জয়ানন্দ বলিতেছেন 'ভালি নাচত গোর কীর্ত্তনসুখে' (জয়ানন্দ, চৈ. ম. ৪।১০।৩)। চৈতন্যদেব কখনো করিতেন উদ্দণ্ড নৃত্য, কখনো বা মধুর নৃত্য। নাচিতে নাচিতে বিহ্বল হইয়া যাইতেন।

…বিহ্বল করিয়া নৃত্য করে।
অতি অপরূপ নাচে প্রেমানন্দ ভরে ॥
(লোচন, চৈ.ম. ২।১৪।৬৬৩)

নৃত্যগীতে চৈতন্যদেবের ভাবাবেশ হইত। ভাবাবেশে কাহারো পায়ে ধরিতেন, কাহারো কাঁধে চড়িতেন, আবার হয়ত কাহারো গলা ধরিয়া কাঁদিতেন (চৈ. ভা. ২।৭)। কৃষ্ণদাস কবিরাজ বলিতেছেন নাচিবার সময় চৈতন্যদেবের অষ্টসাত্ত্বিক ভাবের উদয় হইত (চৈ. চ. ২।১৩)। জয়ানন্দর কাব্যেও অনুরূপ কথা লেখা আছে।

সঙ্কীর্ত্তনে নাচে প্রভু নিত্যানন্দ সঙ্গে।
কত সুরধনী বহে নর্ত্তন তরঙ্গে ॥
শ্বাস হাস স্বেদ কম্প হুঙ্কার গর্জ্জন।
অবনী হরিল হেম মেঘ বরিষণ ॥
(জয়ানন্দ, চৈ. ম. ৪।৮।২-৩)।

কোন দিন চৈতন্যদেব নৃত্য করিতেন আর পরিকরগণ গান করিতেন। শ্রীবাসের বাড়ীতে এইরূপ কীর্তনের একটি বর্ণনা বৃন্দাবনদাসের গ্রন্থে পাওয়া যায়। চৈতন্যদেব বোধ হয় অনেকক্ষণ ধরিয়া নাচিতেন: 'প্রভুর আনন্দ নৃত্যে নাহি অবসর' (চৈ. ভা. ২।৮)। কীর্তনসুখমগ্ন চৈতন্যদেবের রূপ বর্ণনা করিয়া চৈতন্য-পরিকর পদকর্তা বাসু ঘোষ লিখিয়াছেন

কীর্ত্তনে ঢর ঢর অঙ্গ ধূলি ধূসর
হালত ভাব-তরঙ্গে।
(বাসু ঘোষের পদাবলী, পদসংখ্যা ৪৭)

চৈতন্যদেবের ভাবপ্রকাশ শুরু হয় ১৫০৯ সালে জানুয়ারী মাসের গোড়ায়। তিনি সন্ন্যাস গ্রহণ করেন পরের বছর (১৫১০) জানুয়ারী মাসের শেষ দিকে। মাঝের এই সময়টাতে নবদ্বীপের চৈতন্যমণ্ডলীতে নিত্য নিয়মিত কীর্তন হইত। দিনের বেলা তো হইতই, রাত্রেও হইত (চৈ. ভা. ২।২৩)। ভক্তগণ সারা দিনরাত চৈতন্যদেবের সঙ্গে থাকিতেন, 'রাত্রিদিন বেঢ়ি সব গায় অনুচর' (চৈ. ভা. ২।৭)। মাঝে মাঝে গায়কদের গোটাকয়েক দলে ভাগ করিয়া কীর্তন হইত। চৈতন্যজীবনী গ্রন্থে এই দল সম্প্রদায় নামে অভিহিত হইয়াছে। সম্প্রদায় করিয়া কীর্তনের একটি বর্ণনা বৃন্দাবনদাসের কাব্যে আছে। শ্রীবাস, মুকুন্দ দত্ত ও গোবিন্দ ঘোষকে প্রধান করিয়া তিনটি সম্প্রদায় তৈরী করা হয়। প্রত্যেকটি সম্প্রদায় কয়েকজন

গায়ক নিয়া গঠিত। চৈতন্যদেবের নাচের সঙ্গে তিন সম্প্রদায় গান করিত (চৈ. ভা. ২।৮)। চৈতন্যমণ্ডলীতে সংগঠিত কীর্তনের দৃষ্টান্ত এই প্রথম। পরে নবদ্বীপ ও পুরীতে চৈতন্যদেব অনেক গায়ক, বাদক ও নর্তক একত্র করিয়া সংগঠিত কীর্তন করিয়াছিলেন।

বৃন্দাবনদাসের লেখা পড়িয়া মনে হয় অন্তরঙ্গজনসহ কীর্তন চৈতন্যদেব আড়ালেই করিতেন।

গূঢ়রূপে সঙ্কীর্ত্তন করে নিরন্তর।

(চৈ. ভা. ২।১৭)

প্রভু সে দুয়ার দিয়া করয়ে কীর্ত্তন।
প্রবেশিতে নারে ভক্ত বিনে অন্যজন ॥

(চৈ. ভা. ২।২৩)

ভক্তসঙ্গে দুয়ার দিয়া কীর্তন। ভিতরে কি হইতেছে দেখিতে না পাইয়া নিন্দুকরা অনেক অকথা কুকথা বলিয়াছিল।

কেহো বোলে এগুলা সকল মাগি খায়।
চিনিলে পাইবে লাজ দ্বার না ঘুচায় ॥
কেহো বোলে সত্য সত্য এই সে উত্তর।
নহিলে কেমত ডাকে এ অষ্টপ্রহর ॥
কেহো বোলে অরে ভাই মদিরা আনিয়া।
সভে রাত্রি করি খায় লোক লুকাইয়া ॥
কেহো বোলে ভাল ছিল নিমাঞি পণ্ডিত।
তোর কেনে নারায়ণ কৈল হেন চিত ॥
কেহো বোলে হেন বুঝি পূর্ব্বের সংস্কার।
কেহো বোলে সঙ্গদোষ হইল তাহার ॥
নিয়ামক বাপ নাহি তাতে আছে বাই।
এতদিনে সঙ্গদোষে ঠেকিল নিমাই ॥

... ...

কেহো বোলে অরে ভাই সব হেতু পাইলা।
দ্বার দিয়া কীর্ত্তনের সন্দর্ভ জানিলা ॥
রাত্রি করি মন্ত্র পঢ়ি পঞ্চকন্যা আনে।
নানাবিধ দ্রব্য আইসে তা সভার সনে ॥

ভক্ষ্য ভোজ্য গন্ধ মাল্য বিবিধ বসন।
খাইয়া তা সভা সঙ্গে বিবিধ রমণ ॥
ভিন্ন লোক দেখিলে না হয় তার সঙ্গ।
এতেক দুয়ার দিয়া করে নানারঙ্গ ॥

(চৈ. ভা. ২।৮)

উপরের উদ্ধৃতিটি পড়িলে বোঝা যায় চৈতন্যমণ্ডলী সম্পর্কে নিন্দাবাদ কতদূর গড়াইয়াছিল। পূর্বজন্মের সংস্কার, অভিভাবকহীন নবযুবকের সঙ্গদোষ বা বাই অর্থাৎ পাগলামো বলিয়া ছাড়িয়া দিলে এক রকম হইত। কিন্তু তাহা হয় নাই। বিরুদ্ধবাদীদের মন্তব্যে সামাজিক ধিক্কারের ইঙ্গিত আছে। গুহ্যসাধন সম্প্রদায়-গুলিতে তন্ত্রমতে মদ, মাংস প্রভৃতি উপাচার সহযোগে যৌন-যৌগিক সাধন চলিত। এইসব সাধনায় শুধু সম্প্রদায়ীদেরই অধিকার, বাহিরের লোক দেখিতে পাইত না। লোকচক্ষুর আড়ালে গোপন তন্ত্রাচারের জন্য শিষ্ট সমাজে গুহ্য সম্প্রদায়সমূহের মর্যাদা ছিল না, তাহারা নিন্দিত ও ধিকৃত হইত। চৈতন্যপ্রপত্তি সম্পূর্ণরূপে গুহ্যাচার বিরহিত, কিন্তু গুহ্য সম্প্রদায়সমূহের সঙ্গে তাহার ভাবাদর্শগত মিল আছে। গুহ্য সম্প্রদায়সমূহের মতো চৈতন্যপ্রপত্তি সামাজিক পরিচয় নির্বিশেষে সকলের প্রতি সমদর্শী। চৈতন্যদেবের ধর্মে সাধনভজনের ব্যাপারে ব্রাহ্মণ চণ্ডালে কোন ভেদ নাই, মুক্তিলাভেও আচণ্ডাল সকলের সমান অধিকার স্বীকৃত। নবদ্বীপে চৈতন্যদেবের কীর্তন অনুষ্ঠানে বোধ হয় জাতিভেদ মানা হইত না। বিরুদ্ধবাদীরা তাই চৈতন্য-মণ্ডলীর নিন্দা করিয়া বলিয়াছিল কীর্তনে সমবেত বৈষ্ণবরা

চালু কলা মুদ্গ দধি একত্র করিয়া।
জাতিনাশ করি খায় একত্র হইয়া ॥ (চৈ. ভা. ২।৮)

উপরন্তু চৈতন্যমণ্ডলীতে গুহ্য সম্প্রদায়ের লোকেরা আসিয়া যোগ দিয়াছিল এবং নিত্যানন্দ, বংশীবদন চট্ট এবং নরহরি সরকারের মত তান্ত্রিক ও সহজপন্থীরা চৈতন্যমণ্ডলীতে বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়াছিলেন। এই অবস্থায় দিনের পর দিন সারা রাত দরজা দিয়া আড়ালে কীর্তন করাতে চৈতন্যমণ্ডলী সম্পর্কে লোকের মনে হয়ত এই সন্দেহ জন্মিয়াছিল যে ইহারাও আসলে এক ধরনের গুহ্য সম্প্রদায়।

নবদ্বীপে চৈতন্যবিদ্বেষের অন্য কারণও ছিল। নবদ্বীপ তখন বাঙ্গলার সবচেয়ে বড় বিদ্যাস্থান। এখানে নব্য ন্যায়, বেদান্ত, স্মৃতি, ব্যাকরণ ও কাব্যের বহুল চর্চা হইত। নবদ্বীপের বিদ্যাচর্চার খ্যাতি তখন বহুব্যাপ্ত। দূরদূরান্ত হইতে বিদ্যার্থীরা নবদ্বীপে বিদ্যালাভ করিতে আসিত (চৈ. ভা. ১।৬, ৭, ৯)। চৈতন্যদেবের কিছু আগে ও সমকালে নরহরি বিশারদ, বাসুদেব সার্বভৌম, কাশীনাথ বিদ্যানিবাস,

পুণ্ডরীকাক্ষ বিদ্যাসাগর, শূলপাণি মহামহোপাধ্যায়, কণাদ তর্কবাগীশ, রঘুনাথ শিরোমণি, রঘুনন্দন ভট্টাচার্যর মতো ধুরন্ধর নৈয়ায়িক, বৈদান্তিক ও স্মার্ত পণ্ডিত নবদ্বীপে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। ইঁহাদের রচিত টীকা, ভাষ্য, নিবন্ধাদি বাঙ্গালী মনীষার গৌরব (ভট্টাচার্য ১৩৫৮ ঃ ৩৮-১০৮)। সেই নবদ্বীপে চৈতন্যদেবের নেতৃত্বে অনুভব-নির্ভর ভক্তিবাদ সূক্ষ্মবিচারপরায়ণ ন্যায়শাস্ত্র এবং বৈদান্তিক মায়াবাদের সমস্ত উপপত্তি ও যুক্তি উপেক্ষা করিয়া সর্বজনীন ধর্মরূপে আত্মপ্রকাশ করিতেছিল। ন্যায়শাস্ত্রে ঈশ্বর ও আত্মার অস্তিত্ব তর্কের বিষয়। অদ্বৈত বেদান্তবাদ মোক্ষধর্মের দর্শন। এই মত অনুসারে ব্রহ্মই একমাত্র সত্য, কিন্তু তিনি নির্গুণ নির্বিকার। জগৎপ্রপঞ্চ মায়ামাত্র। মোক্ষলাভ অর্থাৎ মায়ার বন্ধন অতিক্রম করিয়া ব্রহ্মে লয় হইয়া যাওয়াই জীবের পরমার্থ। ভক্তিবাদ ন্যায়শাস্ত্রের পরিপন্থী এবং অদ্বৈতবাদ ও মোক্ষবিরোধী। ভক্তিবাদী দর্শনে বলে ব্রহ্ম সগুণ, তিনি লীলাময় এবং জগৎ সত্য। পরমেশ্বর জীবের একমাত্র আশ্রয়। অতএব একান্তচিত্তে পরমেশ্বরের উদ্দেশ্যে আত্মসমর্পণ করিয়া তাঁহার ভজনা করাই জীবের কর্তব্য। ইহাই ভক্তি। প্রেমতত্ত্ব ভক্তিবাদের পূর্ণ পরিণত রূপ। পরমেশ্বর নয়, পরমেশ্বরের স্বভাব যে প্রেম বিশ্বসংসারে প্রকাশ পাইতেছে প্রেমভক্তি সাধনে তাহাই সাধ্য। সুতরাং প্রেমভক্তিবাদ সর্বাংশে অদ্বৈত বেদান্তবাদের বিপরীত তত্ত্ব। ঐশ্বরিক ভাবপ্রকাশ করিয়া সংগঠিত উপায়ে সাধারণ্যে প্রেমভক্তির তত্ত্ব প্রচার শুরু করাতে চৈতন্যদেব যে নবদ্বীপের বিদ্যাসমাজে বিরাগভাজন হইবেন ইহাতে বিস্ময়ের কিছু নাই। অপর-দিকে উচ্চনীচ শুচি-অশুচির ধারণা ও আচারবিশিষ্ট স্মৃতিশাসিত সমাজে জাতি ও স্ত্রী পুরুষ নির্বিশেষে প্রকাশ্য সম্মেলক কীর্তন এবং আচণ্ডাল সকলের মুক্তিলাভে সমান অধিকার এই কথা অশাস্ত্রীয় ও নীতিবিগর্হিত বলিয়া গণ্য। এইদিক দিয়া চৈতন্যদেব প্রচলিত সামাজিক মর্যাদা লঙ্ঘন করিয়াছিলেন। অতএব চৈতন্যপ্রপত্তি তৎকালীন পাণ্ডিত্যবুদ্ধি ও সমাজনীতির পরিপন্থী ছিল। বৃন্দাবনদাসের কাব্যে ও চূড়ামণিদাসের লেখা 'গৌরাঙ্গবিজয়' কাব্যে চৈতন্যপ্রপত্তি ও কীর্তনের বিরুদ্ধে পণ্ডিতজনের বক্তব্য যেটুকু লেখা আছে তাহাতে শাস্ত্র ও নীতির দিক দিয়া তাঁহাদের আপত্তি স্পষ্টভাবে ধরা পড়ে। বৃন্দাবনদাসের কাব্যে আছে

কেহো বোলে জ্ঞানযোগ করিয়া বিচার।
পরম উদ্ধত হেন সভার ব্যাভার ॥
... ...
হরি বোলে ডাক ছাড়ে যেন মহা বাই ॥
মনে মনে বলিলে কি পূণ্য নাহি হয়।
রাত্রি করি ডাকিলে কি পূণ্য জনময় ॥ (চৈ. ভা. ২।২)

কেহো বোলে ব্রাহ্মণের নহে নৃত্যধর্ম্ম।
পঢ়িয়াও এগুলো করয়ে হেন কর্ম্ম ॥
... ...
কেহো বোলে আত্মা বিনা সাক্ষাৎ করিয়া।
ডাকিলে কি কার্য্য হয় না জানিল ইহা ॥
আপন শরীর মাঝে আছে নিরঞ্জন।
ঘরে হারাইয়া ধন চরে গিয়া বন ॥
... ...
চালু কলা মুদ্‌গ দধি একত্র করিয়া।
জাতিনাশ করি খায় একত্র হইয়া ॥
... ...
(কীর্তনের ধ্বনিতে) হই হই হায় হায় এইমাত্র শুনি।
ইহা সভা হৈতে হৈল অপযশ বাণী ॥
মহা মহা ভট্টাচার্য্য সহস্র যথায়।
হেন ঢাঙ্গাইতগুলা বৈসে নদীয়ায় ॥ (চৈ. ভা. ২।৮)

চূড়ামণিদাসের 'গৌরাঙ্গবিজয়' কাব্যে আছে যে নবদ্বীপ ভক্তিধর্ম ও কীর্তনের প্রসার হওয়াতে

অদ্বৈতের নাটে নাচে নদীয়া নগর।
মহাবন্যা হইল ভক্তিরসের সাগর ॥
উত্তম মধ্যম নাচে অধম যে বসে।
এ মূর্খ পণ্ডিত নাচে এ নারী পুরুষে ॥
বৌদ্ধ তার্কিক মৈমাংসিক বৈদান্তিক।
সভাকার নাটে কহে ইবে দেখি ধিক ॥
সবলোক নাচে কান্দে করে কি বা কাজ।
ভাল লোক নাচে কান্দে না বাসএ লাজ ॥
হের দেখ অধ্যাপক অদ্বৈত আচার্য্য।
নাচিয়া কাঁদিয়া ওবা সাধে কোন কার্য্য ॥
তর্কবাদীন্দ্র সিদ্ধানন্দ ভট্টাচার্য্য।
এ দিগ্‌বিজয়ী কবি পূজে সর্ব্বরাজ্য ॥
ইহার নাটের কিছু টের নাঞি পাই।
দিগম্বর হইয়া নাচে কি বা কামবাই ॥

এতদিন নদীয়ার হই গেল খাঁখার।
ভাল ভাল মানুষের এত দুরাচার॥
কেহ কেহ বলে কিছু না বোলিবে ভাই।
না বুঝি না বুঝি করি চল ঘর জাই॥
রৌরবে গৌরব জাএ করি সারধারে।
নীচ বহু লোক ঘাঁটাইলে অবশ্য মারে॥

(গৌ. বি., পৃষ্ঠা ১৪-১৫)।

ঈশ্বরাবেশ হইবার আগে নিমাই পণ্ডিত ছিলেন অতিশয় তর্কপ্রিয়। কিন্তু ভাবপ্রকাশের সময় তিনি তর্ক বা বিতণ্ডা দ্বারা নিজের মতবাদ কাহাকেও বুঝাইবার চেষ্টা করেন নাই। নবদ্বীপের পণ্ডিতমণ্ডলীর সংস্রব হইতে দূরে থাকিয়া তিনি শাস্ত্র ও জ্ঞানের উপর অনুভবলভ্য প্রেমভক্তির উৎকর্ষ এবং মুক্তির উপায়স্বরূপ আবেগ ও উচ্ছ্বাসময় কীর্তনের মহিমা প্রচার করিয়াছেন। পরোক্ষভাবে হইলেও ইহাতে বিদ্যাচর্চা সম্পর্কে উপেক্ষার ভাব আছে। চৈতন্যপরিকরদের মধ্যে বেশ কয়েকজন শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত ছিলেন। কিন্তু চৈতন্যদেব কখনও তাঁহাদের সঙ্গে শাস্ত্রালোচনা বা বিচারে প্রবৃত্ত হন নাই। লোচনের সাক্ষ্য অনুসারে চৈতন্যদেব শাস্ত্রচর্চাকে ভক্তি-সাধনার পরিপন্থী বলিয়া মনে করিতেন। লোচনের কাব্যে চৈতন্যদেব মুরারি গুপ্তকে বলিতেছেন

শুন শুন ওহে বৈদ্য আমার বচন।
এড় গীতা অধ্যাত্ম চরচা তোর মন॥
জীবারে বাসনা যদি থাকয়ে তোমার।
কৃষ্ণ প্রেমানন্দে যদি সাধ থাকে আর॥
অধ্যাত্মচরচা তবে কর পরিত্যাগ।
গুণসঙ্কীর্ত্তন কর কৃষ্ণে অনুরাগ॥

(লোচন, চৈ. ম. ২।২।১০৪-৫)।

চৈতন্যদেবের অত্যুৎসাহী অনুগামীদের কথাবার্তায় বিদ্যাচর্চা ও পাণ্ডিত্যবুদ্ধির প্রতি অবজ্ঞা হয়ত স্পষ্টতর হইয়া উঠিত। বৃন্দাবনদাস ও চূড়ামণিদাসের কাব্যে তাহার ইঙ্গিত পাওয়া যায়।

ধনে কুলে পাণ্ডিত্যে চৈতন্য নাহি পাই।
কেবল ভক্তির বশ চৈতন্য গোসাঞি॥
বড় কীর্তি হইলে চৈতন্য নাহি পাই।
ভক্তিবশ সভে প্রভু চারি বেদে গাই॥ (চৈ. ভা. ২।১০)।

পণ্ডিতদের প্রতি কটাক্ষ করিয়া চূড়ামণিদাস বলিয়াছেন

বেদান্তিক মৈমাংসিক কুতার্কিক জত।
বুঝিতে না পারে কেহ গৌরঅভিমত॥

(গৌ. বি., পৃষ্ঠা ১০০)।

এই ধরণের কথা বোধ হয় আরও একটু তীব্রভাবে এবং শ্লেষ সহকারেও বলা হইত, যথা—

গ্রন্থ পঢ়ি মুণ্ড মুড়ি কারো বুদ্ধিনাশ।

(চৈ. ভা. ২।৬)।

তত্ত্বগত এবং ব্যবহারিক লৌকিক কারণে নবদ্বীপের প্রভাবশালী পণ্ডিতমণ্ডলীর মধ্যে চৈতন্যপ্রপত্তি সম্বন্ধে গভীর বিরূপতা সৃষ্টি হইয়াছিল। বৃন্দাবনদাস বলিয়াছেন 'ভট্ট মিশ্র চক্রবর্ত্তী সভে নিন্দা জানে' (চৈ. ভা. ২।৬), 'সূক্ষ্মতর্কবাদী পাপী কিছুই না মানে' (চৈ. ভা. ২।২৩)। মনে হয় বৃন্দাবনদাসের কথায় অতিশয়োক্তির সম্ভাবনা কম।

সর্বসাধারণের সম্মেলক সংকীর্তন অশাস্ত্রীয় ব্যাপার। চৈতন্যমণ্ডলী এইরূপ সংকীর্ত্তন করার ফলে দেশের অমঙ্গল হইতেছে নবদ্বীপে অন্ততঃ কিছু লোকের মনে এই ধারণা জন্মিয়াছিল। তাহারা বলিয়াছিল

যে না ছিল রাজ্যদেশে আনিঞা কীর্ত্তন।
দুর্ভিক্ষ হইল সব গেল চিরন্তন॥
দৈবে হরিলেক বৃষ্টি জানিল নিশ্চয়।
ধান্য মরি গেল কড়ি উৎপন্ন না হয়॥

(চৈ. ভা. ২।৮)।

শ্রীবাস পণ্ডিত এই অনর্থপাতের মূল কেননা তাঁহার বাড়ীতেই কীর্তন শুরু হইয়াছিল। তাই শ্রীবাসের উপর কীর্তন-বিরোধীদের খুব রাগ ছিল। তাহারা বলাবলি করিত

শ্রীবাস বামনা এই নদীয়ায় হইতে।
ঘর ভাঙ্গি কালি লৈয়া ফেলাইব সোঁতে॥
ও বামন ঘুচাইতে গ্রামের কুশল।
অন্যথা যবনে গ্রাম করিবে কবল॥

(চৈ. ভা. ২।৮)।

অন্তরঙ্গ গোষ্ঠীর সঙ্গে কিছুদিন কীর্তন চালাইবার পর চৈতন্যদেব সর্বসাধারণের জন্য প্রকাশ্যে ভক্তি প্রচার করিতে উদ্যোগী হইলেন। নবদ্বীপের পথে পথে ঘুরিয়া কৃষ্ণভক্তি প্রচারের জন্য নির্দেশ দিলেন নিত্যানন্দ ও হরিদাস ঠাকুরকে।

একদিন আচম্বিতে হৈল হেন মতি।
আজ্ঞা কৈল নিত্যানন্দ হরিদাস প্রতি ॥
শুন শুন নিত্যানন্দ শুন হরিদাস।
সর্বত্র আমার আজ্ঞা করহ প্রকাশ ॥
... ...
প্রতি ঘরে ঘরে গিয়া কর এই ভিক্ষা।
কৃষ্ণ ভজ কৃষ্ণ বোল কর কৃষ্ণ শিক্ষা ॥
ইহা বই আর না বলিবা বোলাইবা।
দিন অবসানে আসি আমারে কহিবা ॥
... ...
আজ্ঞা পাই দুই জনে বুলে ঘরে ঘরে।
বোল কৃষ্ণ গাও কৃষ্ণ ভজহ কৃষ্ণেরে ॥
কৃষ্ণ প্রাণ কৃষ্ণ ধন কৃষ্ণ সে জীবন।
হেন কৃষ্ণ বোল ভাই হই এক মন ॥
এই মত নদীয়ার প্রতি ঘরে ঘরে।
বলিয়া বেড়ান দুই জগত ঈশ্বরে ॥
... ...
এই মত ঘরে ঘরে বলিয়া বুলিয়া।
প্রতিদিন বিশ্বম্ভর স্থানে কহে গিয়া ॥ (চৈ. ভা. ২।১৩)

পথে পথে ঘুরিয়া বাড়ী বাড়ী প্রচারের সুফল কিছু হইয়াছিল। তবে বিরূপ প্রতিক্রিয়াও কম হয় নাই। নিত্যানন্দ ও হরিদাসের প্রভাবে কেহ কৃষ্ণনাম করিতে চাহিলে বিরুদ্ধবাদীরা বলিত, এই দুইজন মন্ত্রদোষে ক্ষেপিয়া গিয়াছে, তোমরাও মন্ত্রদোষে পাগল হইয়া এখন আমাদের পাগল করিতে আসিয়াছ। নিত্যানন্দ ও হরিদাস বাড়ীর দরজায় আসিলে তাহারা মার মার বলিয়া তাড়িয়া আসিত। রাগ করিয়া তাহারা বলিত

ভব্য ভব্য লোক সব হইল পাগল।
নিমাঞি পণ্ডিত নষ্ট করিল সকল ॥
কেহো বোলে দুইজন কিবা চোর চর।
ছল করি চর্চ্চিয়া বুলয়ে ঘর ঘর ॥
এমত প্রকট কেনে করিব সুজনে।
আর বার আইলে ধরি লইব দেয়ানে ॥ (চৈ. ভা. ১।১৩)

ভাবপ্রকাশের আগে নিমাই পণ্ডিত নবদ্বীপ বিদ্যাসমাজে উদ্ধত তার্কিক ও চপলবুদ্ধি ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত ছিলেন। এই কারণে সংশ্লিষ্ট লোকেরা তাঁহার উপর কিছুটা বিরক্ত ছিল। কিন্তু নিমাই পণ্ডিতের সামাজিক ব্যবহারে আর একটা দিক আছে। ইহা সম্পূর্ণ অন্যরকম। বৃন্দাবনদাসের কাব্যে (২।৮) ইহার বিশদ বিবরণ পাওয়া যায়। নবদ্বীপের তাঁতী, গন্ধবণিক, তাম্বুলী, শঙ্খবণিক, মালাকার এবং খোলবেচা শ্রীধরের মতো সামান্য পসারীর সঙ্গে নিমাই পণ্ডিতের স্নেহসম্বন্ধ ছিল। ইহাদের বাড়ী বাড়ী তিনি ঘুরিয়া বেড়াইতেন, বিভিন্ন উপলক্ষে হাসি-তামাশাও বেশ চলিত। নিমাই পণ্ডিতের ভাবপ্রকাশ এবং নিত্যানন্দ ও হরিদাসের গণপ্রচার বোধ হয় নবদ্বীপের এই নগরিয়াদের উপর খুব প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল। সাধ্যমত কিছু উপহার সামগ্রী হাতে নিয়া ইহারা নিমাই পণ্ডিতের কাছে আসিত। তাহারা আসিলে

প্রভু বোলে কৃষ্ণভক্তি হউক সভার।
কৃষ্ণগুণনাম বই না বলিহ আর ॥
হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।
হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে ॥
প্রভু বোলে কহিলাঙ এই মহামন্ত্র।
ইহা গিয়া জপ সভে করিয়া নির্ব্বন্ধ ॥
ইহা হইতে সর্ব্বসিদ্ধি হইব সভার।
সর্ব্বক্ষণ বোল ইথে বিধি নাহি আর ॥
দশ পাঁচ মিলি নিজ দুয়ারে বসিয়া।
কীর্ত্তন করহ সভে হাতে তালি দিয়া ॥
হরয়ে নমঃ কৃষ্ণ যাদবায় নমঃ।
গোপাল গোবিন্দ রাম শ্রীমধুসূদন ॥
কীর্ত্তন কহিল এই তোমা সভাকারে।
স্ত্রীয়ে পুত্রে বাপে মিলি কর গিয়া ঘরে ॥

(চৈ. ভা. ২।২৩)।

নিমাইয়ের উপদেশমতো লোকে সন্ধ্যাবেলা দুয়ারে বসিয়া করতালি সহযোগে কীর্তন করিতে লাগিল। নিমাই নিজে নগরিয়া ভক্তজনকে আলিঙ্গন করিয়া আর্তি প্রকাশ করিতেন।

প্রভুর দেখিয়া আর্ত্তি কান্দে সর্ব্বজন।
কায়মনোবাক্যে লইলেন সঙ্কীর্ত্তন ॥

পরম আনন্দে সব নগরিয়াগণ।
হাথে তালি দিয়া বোলে রামনারায়ণ॥
মৃদঙ্গ মন্দিরা শঙ্খ আছে সর্ব্বঘরে।
দুর্গোৎসবকালে বাদ্য বাজাবার তরে॥
সেই সব বাদ্য এবে কীর্ত্তন সময়ে।
গায়েন বায়েন সভে আনন্দ হৃদয়ে॥
হরি ও রাম রাম হরি ও রাম রাম।
এইমত নগরে উঠিল ব্রহ্মনাম॥

(চৈ. ভা. ২।২৩)

কিছু কিছু ভক্ত বোধ হয় নিমাই পণ্ডিতের কাছে যায় নাই। তাহারা নগর-কীর্তনের আশায় ছিল।

কোন কোন নাগরিয়া বোলে বসি থাক ভাই।
নয়ন ভরিয়া দেখিবাঙ এই ঠাঞি॥
সংসার উদ্ধার লাগি নিমাঞি পণ্ডিত।
নদীয়ার মাঝে আসি হইলা বিদিত॥
ঘরে ঘরে নগরে নগরে প্রতি দ্বারে।
করিবেন সঙ্কীর্ত্তন বলিল সভারে॥

(চৈ. ভা. ২।২৩)

লোচনদাসের কাব্যে এইরূপ নগর সংকীর্তনের কথা আছে। নিমাই পণ্ডিত পরিকরদের নগর সংকীর্তনের আয়োজন করিতে নির্দেশ দিয়া বলিতেছেন

আনহ যেখানে যেবা আছে ভক্তগণ।
মিলিয়া করিব আজি নাম সঙ্কীর্ত্তন॥
গায়ন বায়ন লই মৃদঙ্গ করতাল।
উচ্চস্বরে হবে নাম কীর্ত্তন রসাল॥
নগরে বেড়াব আজ কীর্ত্তন করিয়া।...

(লোচন, চৈ. ম. ২।৬।২৮০-৮১)

যেখানে যে ভক্ত আছে তাহাদের সকলকে একত্র করিয়া নগরকীর্তন করিতে হইবে। নিমাই পণ্ডিতের অন্তরঙ্গ পার্ষদদের বেশীর ভাগই ছিলেন ব্রাহ্মণ, বৈদ্য ও কায়স্থ জাতির লোক। ইহাদের অনেকেই উচ্চশিক্ষিত ও গুণবান। পুণ্ডরীক বিদ্যানিধি, ভগবান ন্যায়াচার্য, মুরারি গুপ্ত, গোপীনাথ আচার্য ও গদাধর পণ্ডিত

ছিলেন শাস্ত্রজ্ঞ ব্যক্তি। বেশ কয়েকজন ছিলেন উঁচুদরের কবি, যথা—নরহরি সরকার, বাসু ঘোষ, বংশীবদন চট্ট, মুরারি গুপ্ত, রামানন্দ বসু ও গোবিন্দ ঘোষ। গান বাজনায় পারদর্শিতার জন্য যশ ছিল মুকুন্দ দত্ত, গোবিন্দ দত্ত, মাধবানন্দ ঘোষ ও নরহরি সরকারের। নরহরির বড় ভাই মুকুন্দ ছিলেন রাজবৈদ্য। সরকার উপাধি দেখিয়া মনে হয় নরহরি নিজেও উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারী ছিলেন। সত্যরাজ খান 'শ্রীকৃষ্ণবিজয়' রচয়িতা মালাধর বসু যশোরাজ খানের পুত্র। পিতার মত তিনিও বোধ হয় রাজসরকারের উচ্চপদে অধিষ্ঠিত ছিলেন এবং সেই কারণে খান উপাধি পাইয়াছিলেন। বুদ্ধিমন্ত খানেরও অনুরূপ পরিচয় থাকা সম্ভব। এইসব জ্ঞানীগুণী প্রভাবশালী লোকের সঙ্গে মিলিয়া সাধারণ নগরিয়াগণ—তাঁতী, গন্ধবণিক, তাম্বুলী, শঙ্খবণিক, মালাকার—সম্মেলক কীর্তনে নামিয়াছে। অভিনব ঘটনা বটে।

ষোড়শ শতকে বিদ্যাস্থান হিসাবে নবদ্বীপের যে গৌরব তাহার কথা আগেই বলিয়াছি। ব্যবসা-বাণিজ্যের জন্যও নবদ্বীপ তখন বিখ্যাত ছিল। বিদ্যাচর্চার কারণে যেমন, বাণিজ্যসূত্রেও তেমনই, অনেক লোক নবদ্বীপে বাস করিত। বৃন্দাবনদাসের কাব্যে দেখা যায় নবদ্বীপে বিভিন্ন কারিগর ও ব্যবসায়ী জাতির অনেক লোক বাস করিত (চৈ. ভা. ১।৮)। চূড়ামণিদাসের 'গৌরাঙ্গবিজয়' কাব্যেও নবদ্বীপের বেশ কয়েকটি কারিগর ও ব্যবসায়ী জাতির উল্লেখ আছে (গৌ. বি., পৃ. ৩১)। বাণিজ্য সমৃদ্ধি না থাকিলে ইহা হইত না। নবদ্বীপের বাসিন্দাদের মধ্যে অনেক সম্পন্ন লোক ছিলেন। বৃন্দাবনদাস বলিতেছেন নবদ্বীপে 'রমা দৃষ্টিপাতে সর্বলোক সুখে বসে' (চৈ. ভা. ১।২)। চূড়ামণিদাসের কাব্যেও নবদ্বীপবাসীদের সমৃদ্ধির ইঙ্গিত আছে (গৌ. বি., পৃ. ৩১)। এই সব সম্পন্ন প্রভাবশালী লোকের মনে বিদ্যাভিমান ও বিত্তের অভিমান প্রবল ছিল। তাহারা বিদ্যা ও বিত্তের অভিমান আড়ম্বর করিয়া প্রকাশ করিত। এইরকম একটা জায়গায় ব্রাহ্মণ পণ্ডিত, বিত্তশালী উচ্চপদস্থ ব্যক্তি, সন্ন্যাসী আর তাঁতী, গন্ধবণিক, তাম্বুলীবণিক, শঙ্খবণিক, মালাকার ও গোয়ালদের মত সাধারণ নগরিয়া একসঙ্গে মিলিয়া কীর্তনে গানবাজনা করিয়া নাচিতেছেন। ইহার সামাজিক ইঙ্গিত গভীর অর্থবহ। ব্যবহারিক সামাজিক জীবনে যাহার ছোটবড়, শুচি অশুচির কারণে নানা পর্যায়ে বিভক্ত, প্রকাশ্য সাধনপথে প্রেমভক্তির টানে নিমাই পণ্ডিত তাহাদের একত্র করিবার ব্যবস্থা করিলেন। চৈতন্যদেব জাতি ব্যবস্থা সরাসরি অমান্য করিবার উপদেশ দেন নাই। কিন্তু তিনি ছোটবড় সকলের জন্য মিলনক্ষেত্র প্রস্তুত করিয়া দিয়াছিলেন। নীচ জাতিতে জন্মের দৈন্য ও গ্লানি সামাজিক জীবনে পরিহার করা

সম্ভব ছিল না। কিন্তু চৈতন্যদেব সর্বসমক্ষে ঘোষণা করিলেন নীচজাতি-জন্মের জন্য কেহ পড়িয়া থাকিবে না।

চণ্ডালেহো মোহোর শরণ যদি লয়।
সেহো মোর মুঞি তার জানিহ নিশ্চয়॥

(চৈ. ভা. ২।২৩)

শুধু তাই নয়

কিবা বিপ্র কিবা ন্যাসী শূদ্র কেনে নয়।
যেই কৃষ্ণতত্ত্ববেত্তা সেই গুরু হয়॥

(চৈ. চ. ২।৮)'

ভক্তি বিতরণে, মুক্তিলাভে জাতি-কুল-বিদ্যা-বিত্ত নির্বিশেষে পুরুষ এবং স্ত্রীলোক সকলেরই সমান অধিকার। সাধারণ মানুষের কাছে ইহা আত্মবিশ্বাস ও আত্ম-প্রতিষ্ঠার মন্ত্র। উচ্চজাতির বিদ্বান পদস্থ লোকের সঙ্গে নিম্নতর জাতির সাধারণ মানুষ সম্মেলক কীর্তনে একত্র হইবে এই মন্ত্রশক্তি অবলম্বন করিয়া।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

নবদ্বীপে নগরকীর্তন

নবদ্বীপে চৈতন্যপ্রপত্তি ও কীর্তনের প্রতি বিরূপতার কিছু কারণ আগের পরিচ্ছেদে আলোচনা করিয়াছি। বিরূপতার আরও একটি কারণ আছে। এই কারণটি রাজনিগ্রহের আশঙ্কাজনিত। নবদ্বীপের হিন্দুসমাজে বিদ্যা ও বিত্তের প্রভাব একত্র হইয়াছিল। শাসকদের কাছে ইহা অস্বস্তিকর ঠেকিয়া থাকিতে পারে। হয়ত এই কারণেই নবদ্বীপের হিন্দুদের উপরে মাঝে মাঝে রাজশক্তির উৎপীড়ন চলিত। চৈতন্যদেবের অন্যতম জীবনীকার জয়ানন্দ ইহার বিবরণ লিখিয়া গিয়াছেন (চৈ. ম. ২।৪।১৭-৫০)। জয়ানন্দর কাব্য অনুসারে সেই ঘটনার বিবরণ দিতেছি।

নবদ্বীপের কাছে পিরল্যা গ্রাম। এখানকার লোকে গৌড়ের সুলতানকে জানাইল যে নবদ্বীপের ব্রাহ্মণ হইতে গৌড়েশ্বরের বিপদ অবশ্যম্ভাবী। 'গন্ধর্ব লিখনে' একথা বলা আছে যে 'নবদ্বীপের ব্রাহ্মণ অবশ্য হব রাজা' এবং প্রজারা অস্ত্র ধারণ করিবে। শুনিয়া 'নদীয়া উচ্ছন্ন কর রাজা আজ্ঞা দিল।' তখন

আচম্বিতে নবদ্বীপে হৈল রাজভয়।
ব্রাহ্মণ ধরিয়া রাজা জাতি প্রাণ লয় ॥
নবদ্বীপে শঙ্খধ্বনি শুনে যার ঘরে।
ধন প্রাণ লএ তার জাতি নাশ করে ॥
কপালে তিলক দেখে যজ্ঞসূত্র কান্ধে।
ঘর দ্বার লুটে তার লৌহপাশে বান্ধে ॥
দেউল দেহারা ভাঙ্গে উপাড়ে তুলসী।
জীবনভএ স্থির নহে নবদ্বীপবাসী ॥

গঙ্গাস্নান বিরোধিল হাট ঘাট যত।
অশ্বত্থ পনস বৃক্ষ কাটে শত শত ॥
পিরল্যা গ্রামেতে বস্যে যতেক যবনে
উচ্ছন্ন করিল নবদ্বীপের ব্রাহ্মণে ॥

এই অত্যাচারের ফলে বাসুদেব সার্বভৌমর মত মহাধুরন্ধর পণ্ডিত আত্মীয়স্বজনের সঙ্গে দেশত্যাগ করিয়া ওড়িশা চলিয়া যান। সার্বভৌম পিতা বিশারদ বারাণসী চলিয়া গেলেন। আরও অনেক বিশিষ্ট ব্যক্তি সে বার নবদ্বীপ পরিত্যাগ করেন। নবদ্বীপে রাজপীড়ার কথা 'চৈতন্যভাগবতে'ও আছে। একবার গঙ্গাদাস পণ্ডিত (চৈতন্যদেবের শিক্ষাগুরু নন, বনমালী আচার্যর ভাই) রাজভয়ে পরিবারসহ রাত্রিকালে গঙ্গা পার হইয়া পলাইয়া গিয়াছিলেন (চৈ. ভা. ২।৯)।

নিমাই পণ্ডিতের নায়কত্বায় নবদ্বীপে কীর্তনের ঘটা শাসকবর্গ ভাল চোখে দেখে নাই। নিমাই পণ্ডিতের অন্তরঙ্গ গোষ্ঠী প্রসার্যমান, নানা জায়গা হইতে ভক্তরা আসিয়া জুটিতেছে। নিমাই পণ্ডিতের প্রভাবে নবদ্বীপের নগরিয়াগণ কীর্তনমত্ত। কীর্তন উপলক্ষ্যে নিমাই পণ্ডিতের নেতৃত্বে জোরদার একটা দল গড়িয়া উঠিতেছে, শাসকবর্গের মনে এইরকম আশঙ্কা হওয়া বিচিত্র নয়। তাহার উপর নবদ্বীপে ব্রাহ্মণ রাজা হইবে এই কথাটা নিয়া একটু সোরগোলও বাধিয়াছিল। বৈষ্ণবরা তো বলাবলি করিতেছিল যে নিমাই পণ্ডিতের দেহেই রাজচক্রবর্তীর লক্ষণ দেখা যাইতেছে (চৈ. ভা. ১।৮)।

এই সময় বাংলার সুলতান ছিলেন সৈয়দ আলাউদ্দীন হুসেন শাহ (১৪৯৩-১৫১৯)। তিনি বোধ হয় চৈতন্যদেব সম্বন্ধে একটু সন্দিহান ছিলেন। পরবর্তী সময়ের একটা ঘটনা হইতে এই আন্দাজ হয়। পুরী হইতে প্রথমবার বৃন্দাবনের উদ্দেশ্যে যাত্রা করিয়া চৈতন্যদেব গৌড় নগরের উপান্তে রামকেলিতে উপস্থিত হইলে বহুলোক তাঁহার কাছে আসিতে লাগিল। সুলতান বিস্মিত হইয়া ভাবিলেন 'বিনি দানে এত লোক' ইহার সঙ্গে আসে কেন। সুলতান তাঁহার দুইজন উচ্চপদস্থ কর্মচারী কেশব ছত্রি ও দবিরখাসের (রূপ গোস্বামী) কাছে চৈতন্যদেব সম্বন্ধে খোঁজখবর করিতে লাগিলেন। সুলতানের অনুসন্ধিৎসায় উৎকণ্ঠিত কেশব ছত্রি লোক মারফৎ চৈতন্যদেবকে বলিয়া পাঠাইলেন যে রামকেলি হইতে তাঁহার চলিয়া যাওয়াই শ্রেয়, 'রাজার নিকট গ্রামে কি কার্য্য রহিয়া'। রূপের দাদা সনাতনও সুলতানের উচ্চপদস্থ কর্মচারী ছিলেন। সনাতন ও রূপ চৈতন্যদেবের সঙ্গে দেখা করিয়া বলিলেন 'ইহাঁ হৈতে চল প্রভু ইহাঁ নাহি কাজ'। কেশব ছত্রি, সনাতন ও

রূপ বোধহয় সুলতানের দিক হইতে বিপদের আশঙ্কা করিতেছিলেন। (উপর্যুক্ত বিবরণের জন্য দ্রষ্টব্য চৈ. ভা. ৩।৪. চৈ. চ. ২।১)।

নিমাই পণ্ডিত ও তাঁহার কীর্তনের দরুণ সকলকে বিপদে পড়িতে হইবে নবদ্বীপে কিছু লোকের মনে এই ভয় হইয়াছিল। নবদ্বীপে রটিয়া গিয়াছিল যে কীর্তনীয়াদের ধরিয়া নিবার জন্য রাজার নৌকা আসিতেছে। খবরটা শুনিয়া লোকে বেশ ত্রস্ত হইয়া উঠিয়াছিল। উৎপীড়ন শুরু হইলে কি ভাবে গা বাঁচান যাইতে পারে তাহার জল্পনা-কল্পনা চলিতে লাগিল।

কেহো বোলে আরে ভাই পড়িল প্রমাদ।
শ্রীবাসের বাদে হৈল দেশের উৎসাদ॥
আজি মুঞি দেয়ানে শুনিলুঁ সব কথা।
রাজ আজ্ঞায় দুই নাও আইসে এথা॥
শুনিলে নদীয়ার কীর্ত্তন বিশেষ।
ধরিয়া নিবার হৈল রাজার আদেশ॥
যে তে দিগে পলাইব শ্রীবাস পণ্ডিত।
আমা সভা লৈয়া সর্ব্বনাশ উপস্থিত॥
তখনি বলিলুঁ মুঞি হইয়া মুখর।
শ্রীবাসের ঘর ফেলি গঙ্গার ভিতর॥
তখন না হৈল ইহা পরিহাসজ্ঞানে।
সর্ব্বনাশ হয় এবে দেখ বিদ্যমানে॥
কেহো বোলে আমরা সভের কোন দায়।
শ্রীবাসের বান্ধিয়া দিব যে বা আসি চায়॥

(চৈ. ভা. ২।২)

শুধু জল্পনা-কল্পনা নয়, বিরোধীপক্ষের দুই একজন স্থির করিয়াছিল স্থানীয় কর্তৃপক্ষের কাছে নালিশ করিয়া কীর্তনকারীদের ধরাইয়া দিবার ব্যবস্থা করিবে (চৈ. ভা. ২।৮)। নিমাই পণ্ডিতকেও তাহারা ভয় দেখাইয়া কীর্তন হইতে নিবৃত্ত করিবার জন্য বলিয়াছিল 'তোমারে রাজার আজ্ঞা আইসে ত্বরিত'। (চৈ. ভা. ২।১৭)

রাজনিগ্রহের আশঙ্কা একেবারে অমূলক ছিল না। নবদ্বীপের কাজী একদিন সন্ধ্যাবেলা কীর্তনের কোলাহল শুনিতে পাইয়া সঙ্কীর্তনরত নগরিয়াদের উপর অত্যাচার করিল। যাহাকে পারিল ধরিয়া মারিল, মৃদঙ্গ ভাঙ্গিয়া দিয়া কীর্তন-

কারীদের বাড়ীতে অনাচার করিল। জবরদস্তি করিয়া বলিল 'আজি বা কি করে তোর নিমাঞি আচার্য্য'। যাইবার সময়

কাজী বোলে হিন্দুয়ানী হইল নদীয়া।
করিমু ইহার শাস্তি নাগালি পাইয়া॥
ক্ষমা করি যাও আজ দৈব হৈল রাতি।
আর দিন লাগি পাইলেই লৈব জাতি॥

তাহার পর কাজী লোকজন নিয়া প্রতিদিন কীর্তনের সন্ধানে ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল।

নগরিয়াগণ নিমাই পণ্ডিতের কাছে গিয়া বলিল, কাজীর ভয়ে আর কীর্তন করা যাইতেছে না, আমরা নবদ্বীপ ছাড়িয়া অন্য জায়গায় চলিয়া যাইব। এই কথা শুনিয়া নিমাই পণ্ডিত ভীষণ ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিলেন। নিত্যানন্দকে বলিলেন, এখনই যাও, সব বৈষ্ণবকে ডাকিয়া আন। কাজীর অত্যাচারের কথা যাহারা বলিতে আসিয়াছিল নিমাই পণ্ডিত তাহাদের বলিলেন

সর্ব্ব নবদ্বীপে আজি করিমু কীর্ত্তন।
দেখোঁ মোরে কোন্ কর্ম্ম করে কোন্‌জন॥
... ...
ভাঙ্গিয়া কাজীর ঘর কাজীর দুয়ারে।
কীর্ত্তন করিমু দেখোঁ কোন কর্ম্ম করে॥
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড মোর সেবকের দাস।
মুঞি বিদ্যমানেও কি ভয়ের প্রকাশ॥
তিলার্দ্ধেকো ভয় কেহো না করিও মনে।

নিমাই পণ্ডিতের আহ্বানে নগরিয়াদের মনে বিপুল উন্মাদনা সঞ্চার হইল। নিমাই পণ্ডিত তাহাদের বলিয়াছিলেন প্রদীপ হাতে করিয়া সকলকে বিকালবেলা একত্র হইতে হইবে।

ঈষৎ আজ্ঞায় মাত্র সর্ব্ব নবদ্বীপ।
চলিলা দেউটি লই প্রভুর সমীপ॥

কীর্তনে যোগ দিবার জন্য বহু লোক জড় হইল। নিমাই বিশাল কীর্তন শোভাযাত্রা—বৃন্দাবনদাস বলিতেছেন নগরকীর্তন—বাহির করিবার আয়োজন করিলেন। তাঁহার প্রধান পরিকরগণ সকলেই উপস্থিত। নিমাই পণ্ডিত শোভাযাত্রা গুছাইয়া নিবার ব্যবস্থা করিলেন। প্রথমে নাচিবেন অদ্বৈত আচার্য, তাঁহার সঙ্গে থাকিবেন একদল গায়ক। অনুরূপভাবে গায়কদের নিয়া শোভাযাত্রার

মাঝখানে নৃত্য করিবেন হরিদাস, আর তাঁহার পিছনে শ্রীবাস। ইহার পরে নিমাই ও নিত্যানন্দ একত্রে নৃত্য করিবেন।

বিকাল বেলা সপরিকর নিমাই পণ্ডিত বহু লোক সঙ্গে নিয়া নগর কীর্তন বাহির করিলেন। স্ত্রীলোকেরাও কীর্তনে যোগ দিয়াছিল।

হরি বলি ডাকিলেন গৌরাঙ্গসুন্দর।
সকল বৈষ্ণবগণ হইলা সত্বর॥
করিতে লাগিল প্রভু বেড়িয়া কীর্ত্তন।...

মুরারি গুপ্ত, গোবিন্দ দত্ত, মুকুন্দ দত্ত, রামাই পণ্ডিত, বক্রেশ্বর পণ্ডিত ও বাসুদেব প্রমুখ পরিকরগণ নিমাই পণ্ডিতকে বেড়িয়া নৃত্যগীত করিতেছিলেন। নিমাই পণ্ডিতের দুই পাশে চলিতেছিলেন নিত্যানন্দ ও গদাধর পণ্ডিত। বৈষ্ণবগণ মৃদঙ্গ, শঙ্খ, মন্দিরা, করতাল বাজাইয়া ছোট ছোট দলে বিভক্ত হইয়া উচ্চরবে হরিধ্বনি করিতেছিল এবং নামকীর্তন ও নামগুণ কীর্তন করিয়া গাহিতেছিল

হরয়ে নমঃ কৃষ্ণ যাদবায় নমঃ।
গোপাল গোবিন্দ রাম শ্রীমধুসূদন॥

এবং

হরিবোল মুগধা বোলরে।
যাহে নাহি হয় শমন ভয় রে॥

কেহ গাহিতেছিল 'হরি ও রাম রাম হরি ও রাম রাম'। ইহাও নামকীর্তন। নিমাই স্বয়ং গুণকীর্তন করিয়া গাহিতেছিলেন

তুয়া চরণে মন লাগহুঁ রে।
শারঙ্গধর তুয়া চরণে মন লাগহুঁ রে॥

কলিটি সম্ভবতঃ পদগানের ধুয়া। পদটির পরিচয় জানা নাই। বৃন্দাবনদাস বলিতেছেন 'চৈতন্যচন্দ্রের এই আদি সঙ্কীর্ত্তন'। সম্ভবতঃ পদটি বা ধুয়াটি চৈতন্যদেবের রচনা বলিয়া বৃন্দাবনদাস এই কথা বলিয়াছেন।

নিমাই পণ্ডিত নগর কীর্তন নিয়া গঙ্গার তীরে তীরে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। বাড়ীর কাছে গঙ্গার ঘাটে অনেকক্ষণ কীর্তন করিয়া মাধাইয়ের ঘাট, বারকোনা ঘাট ও নগরিয়া ঘাট হইয়া নগর কীর্তন চলিতে লাগিল। পথের ধারে ধারে বাড়ীঘর লোকে মাঙ্গলিক দ্রব্য দিয়া সাজাইয়া রাখিয়াছিল। বাড়ীতে বাড়ীতে ঘৃত প্রদীপ, দুয়ারে দুয়ারে কলাগাছ এবং আম্রসার ও নারিকেল সজ্জিত পূর্ণ কলস। কীর্তনের যাত্রাপথে লোকে খই, কড়ি ও পয়সা ছড়াইতে লাগিল। লোকের মনে বিপুল উদ্দীপনা সঞ্চার হইয়াছিল।

গানের সঙ্গে চলিতেছিল নাচ। নিজ নিজ সম্প্রদায়সহ অদ্বৈত, হরিদাস ও শ্রীবাসের নাচের কথা আগেই বলিয়াছি। অন্যেরাও বাজনা বাজাইয়া খুব নাচগান করিয়াছিল।

ঠাঞি ঠাঞি এই মত মিলি দশ পাঁচে।
কেহ গায় কেহ বায় কেহ মাঝে নাচে॥
লক্ষ লক্ষ কোটী কোটী হৈল সম্প্রদায়।
আনন্দে নাচিয়া সর্ব্ব নবদ্বীপে যায়॥
... ...
কেহো কেহো নাচয়ে হইয়া এক মেলি।
দশ পাঁচে নাচে কেহ দিয়া করতালি॥
... ...
নাচিয়া যায়েন প্রভু গৌরাঙ্গসুন্দর।
বেঢ়িয়া গায়েন চতুর্দ্দিগে অনুচর॥

নাচিয়া নাচিয়া কীর্তন গাহিতে গাহিতে নগরিয়াদের মধ্যে বেশ উন্মাদনা আসিয়া গিয়াছিল। বৃন্দাবনদাস ইহার বিস্তারিত বর্ণনা দিয়াছেন।

কেহো নাচে কেহো গায় কেহো বোলে হরি হরি।
কেহো গড়াগড়ি যায় আপনা পাসরি॥
কেহো কেহো নানামত বাদ্য বায় মুখে।
কেহো কারো কান্ধে উঠে পরানন্দ সুখে॥
কেহো কারো চরণ ধরিয়া পড়ি কান্দে।
কেহো কারো চরণ আপন কেশে বান্ধে॥
কেহো দণ্ডবৎ হয় কাহারো চরণে।
কেহো কোলাকোলি বা করয়ে কারো সনে॥
... ...
বৃক্ষের উপরে গিয়া কেহো কেহো চঢ়ে।
যুগে যুগে কেহো কেহো লাফ দিয়া পড়ে॥
পাষণ্ডীরে ক্রোধ করি কেহ ভাঙ্গে ডাল।
কেহো বোলে এই মুঞি পাষণ্ডীর কাল॥
... ...
মাটিতে কিলায় কেহো পাষণ্ডী বলিয়া।
হরি বলি বুলে পুন হুঙ্কার করিয়া॥

এই মত কৃষ্ণের উন্মাদে সর্ব্বক্ষণ।
কিবা বোলে কিবা করে নাহিক স্মরণ॥

বৃন্দাবনদাসের বর্ণনা বেশ স্পষ্ট ও জীবন্ত। কীর্তনকালে ভক্তদের মধ্যে ভাবোন্মত্ততা আজও যথেষ্ট দেখা যায়। উন্মাদনার যেসব দৃষ্টান্ত বৃন্দাবনদাস দিয়াছেন তাহার অনেকগুলি এখনও সম্মেলক কীর্তনে দেখা যায়। কীর্তন শুনিতে শুনিতে উন্মাদনাগ্রস্থ হওয়া ভক্তের পক্ষে বিশেষ সৌভাগ্যের কথা।

নগরিয়াগণের কীর্তন শোভাযাত্রা নিয়া চৈতন্যদেব নবদ্বীপের একান্তে নগর সিমুলিয়ায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। এইখানেই কাজী সাহেবের বাড়ী। গান বাজনার শব্দ শুনিয়া কাজী প্রথমে ভাবিয়াছিলেন বিবাহযাত্রার আওয়াজ। তাঁহার আদেশ অমান্য করিয়া কেহ কীর্তন করিতে পারে ইহা তিনি ভাবিতেই পারেন নাই, 'মোর বোল লঙ্ঘিয়া কে করে হিন্দুয়ানী'। পরে যখন খবর নিয়া জানিতে পারিলেন যে নিমাই পণ্ডিত বহুলোক নিয়া কীর্তন করিতে করিতে আসিতেছে তখন

কাজী বোলে হেন বুঝি নিমাঞি পণ্ডিত।
বিহা করিবারে বা চলিলা কোন ভিত॥
এবা নহে মোরে লঙ্ঘি হিন্দুয়ানী করে।
তবে জাতি নিমু আজি সভার নগরে॥

কিন্তু কীর্তনের শোভাযাত্রা যখন বাড়ীর কাছে আসিয়া পড়িয়াছে তখন এত লোক, বিশেষতঃ নিমাই ও কীর্তনীয়াদের মারমুখী ভাব দেখিয়া, কাজী লোকজনসহ পলাইয়া গেলেন। ক্রোধবশে নিমাই পণ্ডিত সকলকে ডাকিয়া বলিলেন কাজীর বাড়িতে চারিদিক বেড়িয়া আগুন লাগাইয়া দাও। ভক্তরা বুঝাইয়া বলিতে তিনি নিরস্ত হইলেন। তবে উত্তেজিত নগরিয়ারা কাজীর ঘর দুয়ার বাগান ভাঙ্গিয়া চুরিয়া তছনছ করিয়া দিল। তাহার পর নিমাই পণ্ডিত নগরকীর্তন সঙ্গে নিয়া শঙ্খবণিক ও তাঁতীদের পাড়া খানিকটা ঘুরিয়া অবশেষে ফিরিয়া গেলেন। বৃন্দাবনদাস এখানেই নিমাই পণ্ডিত ও কাজী সংবাদ শেষ করিয়াছেন (উপর্যুক্ত বিবরণের জন্য দ্রষ্টব্য চৈ. ভা. ২।২৩)।

কৃষ্ণদাস কবিরাজ-কৃত 'চৈতন্যচরিতামৃতে' নগরকীর্তন প্রসঙ্গে একটু নূতন খবর আছে। কৃষ্ণদাসের বর্ণনা অনুসারে নগরকীর্তন বাড়ীর কাছে আসিতে কাজী ভয়ে লুকাইয়া পড়িয়াছিল। কীর্তনিয়াদের মধ্যে 'ঔদ্ধত্য লোক' কাজীর ঘরবাড়ী ও বাগান ভাঙ্গিয়া দিল। কিন্তু নিমাই পণ্ডিত 'ভব্যলোক' পাঠাইয়া তাহাকে ডাকাইয়া আনিলেন। কাজী আসিলে নিমাই পণ্ডিত তাঁহার সঙ্গে

শিষ্টালাপ করিয়া বিচারে প্রবৃত্ত হইলেন। বিচারের শেষে নিমাইয়ের অনুরোধে কাজী কীর্তনের উপর ঢালাও নিষেধাজ্ঞা তুলিয়া তো নিলেনই উপরন্তু ভবিষ্যতে কীর্তন অবাধ করিবার জন্য বংশধরদের উপর হুকুম জারী করিয়া দিলেন (চৈ. চ. ১।১৭)। কৃষ্ণদাস বলিতেছেন বটে, কিন্তু নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহৃত হইয়াছিল কিনা সন্দেহ। হইলে বৃন্দাবনদাসের মতো পরম উৎসাহী সম্প্রদায়প্রেমী গ্রন্থকার সে কথা না লিখিয়া থাকিতে পারিতেন না। আর একটা কথা আছে। বৃন্দাবনদাস 'চৈতন্যভাগবত' লিখিয়াছিলেন চৈতন্যদেবের তিরোভাব হইবার (১৫৩৩) অল্প কয়েক বছর পরে। নগরকীর্তনে যোগদানকারী বৈষ্ণবদের অনেকেই তখন জীবিত। বৃন্দাবনদাস ইঁহাদের মধ্যে বেশ কয়েকজনকে চিনিতেন। বিশেষভাবে বলিতে হয় নিত্যানন্দর কথা। বৃন্দাবনদাস নিত্যানন্দর অতি ঘনিষ্ঠজন। চৈতন্যচরিতের তথ্য অনেকটাই তিনি পাইয়াছিলেন নিত্যানন্দর কাছে। নিত্যানন্দ নগরকীর্তনে চৈতন্যদেবের সঙ্গে সঙ্গেই ছিলেন। কাজী আদেশ প্রত্যাহার করিলে নিত্যানন্দর সম্মুখেই তাহা ঘটিত। এতবড় একটা ঘটনা নিত্যানন্দ বৃন্দাবনদাসের কাছে গোপন করিবেন ইহা ভাবিবার যুক্তি নাই। কৃষ্ণদাস কবিরাজ 'চৈতন্যচরিতামৃত' (সমাপ্তি ১৬১২) লিখিয়াছিলেন নগরকীর্তনের অন্ততঃ একশ বছর পরে। দীর্ঘদিনের ব্যবধানে ওই ঘটনার উপর অনেক রং চড়িয়াছে ইহাই সম্ভব। কৃষ্ণদাস কবিরাজ নিজেও বেশ অতিশয়োক্তিপরায়ণ। তাই নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহারের কথা বিশ্বাস করা কঠিন।

কাজীর আদেশ প্রত্যাহৃত হয় নাই এইরূপ ভাবাই যুক্তিসঙ্গত। কিন্তু তাহাতে নগরকীর্তনের প্রত্যক্ষ সামাজিক তাৎপর্য কিছুমাত্র ক্ষুণ্ণ হয় না। বিষয়টি প্রণিধানযোগ্য। এই নগরকীর্তনে বহু লোক একত্রিত হইয়া নিমাই পণ্ডিতের পরিচালনায় কাজীর অন্যায় আদেশ অমান্য করিয়াছিল। শাসকের দম্ভ ও আস্ফালনের বিরুদ্ধে ইহা নিরস্ত্র লোকের সক্রিয় প্রতিরোধ। কাজীর অত্যাচারে নগরিয়াগণ ভয় পাইয়াছিল। নিমাই তাহাদের ভয় ভাঙ্গিয়া দিলেন এবং তাহাদের সঙ্গে নিয়া আদেশ অমান্য করিলেন। তাহার পর নগরিয়াদের কীর্তনসংঘট্ট নিয়া একেবারে কাজীর বাড়ীতে উপস্থিত হইলেন। কম কথা নয়। মানুষের মনে বিপুল সাহস ও ভরসা সঞ্চার করিতে না পারিলে এত বড় একটা কাণ্ড সম্ভব হইত না। নিমাই পণ্ডিত নবদ্বীপবাসীর মনে খুব একটা জোর আনিয়া দিয়াছিলেন। কাজীর অত্যাচারের ভয়ে যাহারা নবদ্বীপ ছাড়িয়া যাইবে ভাবিতেছিল তাহারাই কাজীর বিরুদ্ধে নির্ভয়ে সোজা হইয়া দাঁড়াইল। ইহার একটা কারণ বোধ হয় এই যে চৈতন্যপ্রপত্তিতে সাধারণ মানুষ আত্মপ্রতিষ্ঠা অর্জনের সম্ভাবনা

দেখিয়াছিল। নিমাই পণ্ডিতের ঈশত্বে বিশ্বাস ইহার পরিপূরক। নিমাই পণ্ডিতের মুখে নগরকীর্তনে যাইবার আহ্বান ঈশ্বরের আজ্ঞাস্বরূপ। বরাভয়দাতা ঈশ্বর স্বয়ং কীর্তন করিয়া সঙ্গে যাইবেন, তখন ভয় পাইবার কি আছে। নিমাই পণ্ডিত নগরিয়াদের বলিয়াছিলেন, আমি স্বয়ং ঈশ্বর, তোমাদের সঙ্গে আছি, মুহূর্তের জন্যও তোমরা ভয় পাইও না। নিমাই পণ্ডিতের এই কথায় সন্ত্রস্ত মানুষের মেরুদণ্ড ঋজু হইয়া উঠিয়াছিল। নগরকীর্তনের উন্মাদনার মধ্যে নগরিয়াগণ বলিয়াছিল

বৈকুণ্ঠ নায়ক অবতরি শচীঘরে।
আপনি কীর্ত্তন করে নগরে নগরে ॥
... ...
সর্ব্বন্দ্য মহেশ্বর যে নাম প্রভাবে।
হেন নাম সর্ব্বলোকে শুনে বোলে এবে ॥
হেন নাম লও ছাড় পর অপকার।
ভজ বিশ্বম্ভর নহে করিমু সংহার ॥ (চৈ. ভা. ২।২৩)

শেষ কথাটায় উন্মাদনার লক্ষণ আছে। নগরকীর্তনের সময়ে নগরিয়াদের মনে যে প্রবল উন্মাদনা আসিয়াছিল বৃন্দাবনদাসের বিবরণে তাহা স্পষ্ট। সেদিন এই উন্মাদনার প্রয়োজন ছিল। কীর্তন দেখিলে কাজী অত্যাচার করিতে পারে। এই আশঙ্কার মুখে বহু লোককে একত্রে সংহত রাখায় উন্মাদনা খুব কাজে লাগিয়াছিল। শুধু এই একবার নয়, পরে বহু ক্ষেত্রে প্রবল প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে মুখোমুখি দাঁড়াইবার সময় সাধারণ মানুষকে সম্মেলক কীর্তনে মত্ত হইতে দেখা গিয়াছে।

নগরকীর্তনে আত্মশক্তির যে অভিব্যক্তি দেখা গিয়াছিল একদিনের উন্মাদনাতেই তাহা শেষ হয় নাই। নগরকীর্তনের পর নিমাই পণ্ডিত ভক্তসঙ্গে একান্তে যেমন কীর্তন করিয়াছেন তেমনি প্রকাশ্যে কীর্তন করিয়াছেন নবদ্বীপের পথে এবং গঙ্গার ঘাটে। নিত্যানন্দও আগের মতো নবদ্বীপের পথে পথে ঘুরিয়া নগরিয়াদের কাছে প্রচার করিয়াছেন। নগরকীর্তনের আগে নিমাই পণ্ডিত নগরিয়াদের ঘরে ঘরে ঘুরিয়া কীর্তন করেন নাই। এইবার নিজেই সে কাজে নামিয়া পড়িলেন। নিমাই পণ্ডিত

এই মত প্রতি বৈষ্ণবের ঘরে ঘরে।
প্রতিদিন নিত্যানন্দ সংহতি বিহরে ॥ (চৈ. ভা. ২।২৫)।

এই সময় নিমাই পণ্ডিতের ভাবাবেশ বাড়িয়া যাইতেছিল। অনেক সময় বাহ্যজ্ঞান থাকিত না। পথের মধ্যেই ভাবের ঘোরে অজ্ঞান হইয়া পড়িতেন। এই অবস্থাতেও নবদ্বীপের পথে পথে ঘুরিয়া কীর্তন করিয়াছেন (চৈ. ভা. ২।২৪, ২৫)। নবদ্বীপে

কীর্তনের যে জনসমর্থন তৈরী হইয়াছিল এবং মানুষের মনে যে আত্মবিশ্বাস জাগিয়াছিল তাহা সংহত করিয়া তুলিবার জন্য ইহার প্রয়োজন ছিল।

চৈতন্যদেব সন্ন্যাস নিয়া পুরীতে চলিয়া যাইবার পর নিমাই পণ্ডিতের অন্তরঙ্গ-গোষ্ঠী ভাঙ্গিয়া যায়। কিন্তু কীর্তন বাদ পড়ে নাই। নিত্যানন্দ নবদ্বীপে আসিলেই সেখানে খুব কীর্তন হইত। ভক্তিপ্রচারের জন্য গঙ্গাতীরে পর্যটন করিবার সময় নিত্যানন্দ নবদ্বীপে আসিয়াছিলেন।

নবদ্বীপে আসি মহাপ্রভু নিত্যানন্দ।
হইলেন কীর্ত্তনের আনন্দ মূর্ত্তিমন্ত ॥
প্রতি ঘরে ঘরে সব পারিষদ সঙ্গে।
নিরবধি বিহরেন সঙ্কীর্ত্তন রঙ্গে ॥ (চৈ. ভা. ৩১৫)

শুধু নবদ্বীপে নয়, অন্যত্রও চৈতন্যভক্তদের মনে রাজনিগ্রহের ভয় যে কাটিয়া গিয়াছিল বৈষ্ণব সাহিত্যে তাহার ইঙ্গিত আছে। চৈতন্যদেব ও নিত্যানন্দর প্রিয়পাত্র গদাধরদাসের বাড়ী ছিল দক্ষিণেশ্বরের কাছে এঁড়েদহ গ্রামে (উত্তর চব্বিশ পরগণা)। প্রচার ভ্রমণকালে নিত্যানন্দ এঁড়েদহ আসিলে গদাধরদাসের বাড়ীতে কীর্তনের সমারোহ হয়। সেখানকার কাজী 'কীর্ত্তনের প্রতি দ্বেষ করয়ে অপার'। নিত্যানন্দ এঁড়েদহ আসিলে কাজী বোধহয় কিছু অনিষ্ট করিয়াছিল। রাত্রিবেলা গদাধর সোজা কাজীর বাড়ীতে গিয়া তর্জন গর্জন করিয়া আসিলেন।

যদ্যপি কাজী মহা হিংসক চরিত।
তথাপিহ না বোলে কিছু হইল স্তম্ভিত ॥ (তদেব)

কাজীর সঙ্গে গদাধরদাসের বিবাদের কথা জয়ানন্দর কাব্যেও আছে (চৈ. ম. ৯।১৭১)। কালনার গৌরীদাস পণ্ডিত 'প্রেম উন্মাদে' কাজীর সঙ্গে বিবাদ করিয়াছিলেন। বিবাদের ফলে বোধহয় গৌরীদাসকে কিছুদিন সরিয়া থাকিতে হইয়াছিল (চৈ. ম. ৯।১৬৯)। বলরামদাস এক যবনকে নিগ্রহ করিয়াছিলেন বলিয়া জয়ানন্দর কাব্যে (৯।১৭৬) উল্লেখ আছে।

ষোড়শ শতকের দ্বিতীয়ভাগে ভক্তিধর্মের অন্যতম বড় প্রচারক শ্যামানন্দ। 'প্রেমবিলাস' গ্রন্থে তাঁহার সঙ্গে রাজপ্রতিনিধির বিবাদ হইবার কাহিনী আছে। ঘটনাটি সংক্ষেপে বলিতেছি। শ্যামানন্দ শিষ্য সেবক সঙ্গে নিয়া কীর্তন করিতে করিতে প্রচার করিতেন। একদিন শের খাঁ পাঠান নামে এক রাজপ্রতিনিধি শ্যামানন্দকে কীর্তন করিতে দেখিয়া থামিতে বলিল। শ্যামানন্দ তাহার আদেশ শুনিলেন না। তখন শের খাঁ জোর করিয়া খোল করতাল ভাঙ্গিয়া দিল। ক্রুদ্ধ শ্যামানন্দ হুঙ্কার করিয়া উঠিতে পাঠানের দাড়ি গোঁপ পুড়িয়া গেল আর তাহার

মুখ দিয়া রক্ত উঠিতে লাগিল। রাত্রে চৈতন্যদেব স্বপ্নে পাঠানের কাছে আসিয়া এক চড় মারিয়া কথা শুরু করিলেন এবং তাহাকে ভয় দেখাইয়া শ্যামানন্দর শরণ লইতে আদেশ দিলেন। অনন্যোপায় পাঠান তাহাই করিল (প্র. বি. ১৯ বিলাস)। গালগল্পের মত শোনায় বটে। তবে বাড়াবাড়ি বাদ দিলে রাজশক্তির কীর্তন বিরোধিতা এবং বৈষ্ণবদের প্রতিরোধের অন্য কাহিনীর সঙ্গে শ্যামানন্দ-শের খাঁ সংবাদের মিল আছে।

রাজধানী গৌড় ও তাণ্ডা (গৌড়ের দক্ষিণে, ১৫৬৫ হইতে কিছুদিনের জন্য বাঙ্গলার রাজধানী) হইতে শুরু করিয়া সপ্তগ্রাম পর্যন্ত গঙ্গার দুই তীরের সুলতানী শাসনের অনেকগুলি বড় বড় কেন্দ্র ছিল। ভক্তি আন্দোলনের সূচনা ও প্রসারও গঙ্গার দুই তীরভূমি ধরিয়া। নবদ্বীপ ও শান্তিপুর হইতে শুরু। তাহার পর চৈতন্যদেব এবং তাঁহার নিত্যানন্দ প্রমুখ পরিকরগণের চেষ্টায় গঙ্গাতীরবর্তী অঞ্চলে ভক্তিধর্ম প্রচারের ঘাঁটি পরপর গড়িয়া উঠিল। যে অঞ্চলে এই ঘাঁটিগুলির অবস্থান তাহার বিস্তার অনেকখানি, উত্তরে মুর্শিদাবাদ জেলায় কাঁদীর কাছে চৌয়ারিগাছা হইতে দক্ষিণে আদিগঙ্গার মোহনা অঞ্চলে ছত্রভোগ ও হাতিয়াগড় (সুন্দরবন, দক্ষিণ চব্বিশ পরগণা) পর্যন্ত। এই অঞ্চলের মধ্যে অম্বুয়া (বর্তমান কালনা শহর) বর্ধমান, সালিমাবাদ (উলা-বীরনগর), সপ্তগ্রাম, হাতিয়াগড় প্রভৃতি শাসনকেন্দ্র। এই সব জায়গায় বা ধারে কাছে ছিল ভক্তিধর্মের বড় বড় ঘাঁটি যথা, অম্বুয়া, বর্ধমানের কাছে কুলীনগ্রাম, সালিমাবাদের কাছে শান্তিপুর ও ফুলিয়া হাতিয়াগড় এবং তাহার কাছে ছত্রভোগ। সপ্তগ্রামে একটা বড় ভক্তিধর্মের ঘাঁটি তৈরী হইয়াছিল। ইহার কাছে ছিল কুমারহট্ট (হালিসহর) ও কাঁচরাপাড়া। শাসন-কেন্দ্র হইতে একটু দূরের জায়গা ধরিলে তো বহু বৈষ্ণব ঘাঁটি পর পর সাজান। গঙ্গাতীর বা গঙ্গা সমীপবর্তী এই সব জায়গায় বড় বড় মহান্তরা নিয়ত কীর্তন করিয়া ভক্তিধর্ম প্রচার করিতেন। কীর্তন উপলক্ষে লোক সংঘট্ট শাসকদের কাছাকাছিই হইত। বৃন্দাবনদাস, জয়ানন্দ ও কৃষ্ণদাস কবিরাজের সাক্ষ্যে দেখা যাইতেছে শাসকবর্গ কীর্তনের সমারোহে বেশ নারাজ ছিল। কীর্তন যাহারা করিত তাহাদের বেশীর ভাগই তো সাধারণ লোক। রাজশক্তির অসন্তোষ দেখিয়া তাহারা ভয় পায় নাই। তাহাদের মনে খুব একটা জোর আসিয়া গিয়াছিল।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

চৈতন্যদেবের দেশভ্রমণ, প্রচার ও সংগঠন

নবদ্বীপে বৎসরাধিককাল ভাবাদর্শ ও কীর্তন প্রচার করিবার পর নিমাই পণ্ডিত সন্ন্যাসী হইয়া গেলেন। কাটোয়াতে গিয়া কেশব ভারতীর কাছে সন্ন্যাস গ্রহণ করিলেন ১৫১০ সালের ২৬শে জানুয়ারী তারিখে। সন্ন্যাস আশ্রমে তাঁহার নাম হইল শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য। সংক্ষেপ করিয়া বলা হয় শ্রীচৈতন্য বা চৈতন্যদেব। সন্ন্যাস জীবনে তাঁহার প্রিয় সহচর স্বরূপ দামোদর চৈতন্যদেব ও তাঁহার চারজন ঘনিষ্ঠ পরিকর নিত্যানন্দ, অদ্বৈত আচার্য, শ্রীবাস ও গদাধর পণ্ডিতকে শ্রীকৃষ্ণের পাঁচটি তত্ত্ব বলিয়া নিরূপণ করিয়াছিলেন। স্বরূপ দামোদরের বিচারে পঞ্চতত্ত্বাত্মক কৃষ্ণের ভক্তরূপ চৈতন্যদেব স্বয়ং, অদ্বৈত আচার্য ভক্তাবতার, নিত্যানন্দ ভক্তস্বরূপ, শ্রীবাস ভক্তাখ্য এবং গদাধর পণ্ডিত ভক্তশক্তি। পরমেশ্বরের সর্বপ্রধান তত্ত্ব ভক্তরূপ হিসাবে স্বরূপ দামোদর চৈতন্যদেবকে মহাপ্রভু বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন (গৌরগণোদ্দেশদীপিকা, শ্লোক ৮-১৩)। মহাপ্রভু অভিধাটি ভক্তসমাজে খুব প্রিয়। অনেকেই চৈতন্যদেবকে শুধু মহাপ্রভু বলিয়া উল্লেখ করেন।

সন্ন্যাস নিবার পরদিন কাটোয়া হইতে বাহির হইয়া চৈতন্যদেব সাত আট দিন রাঢ় অঞ্চলে ঘুরিয়া বেড়াইয়াছিলেন। মুরারি গুপ্তর কাব্যে আছে যে চৈতন্যদেবের গন্তব্যস্থল ছিল ব্রজ অর্থাৎ মথুরা-বৃন্দাবন (কড়চা, ৩৷৩৷১)। এই কথার সমর্থন পাওয়া যায় কৃষ্ণদাস কবিরাজের রচনায় (চৈ চ. ২৷৩)। বৃন্দাবনদাস অবশ্য বলিতেছেন চৈতন্যদেবের উদ্দেশ্য ছিল বক্রেশ্বর যাওয়া (চৈ. ভা. ৩৷১)। রাঢ় হইতে ফিরিয়া চৈতন্যদেব শান্তিপুরে আসিলেন। এখানে তিনদিন থাকিয়া নীলাচলের পথে রওনা হইয়া গেলেন (চৈতন্যচন্দ্রোদয়ম্, ৬৷৫)। নীলাচল (বর্তমান নাম পুরী) জগন্নাথদেবের অধিষ্ঠানক্ষেত্র, পুরুষোত্তমধাম। চৈতন্যদেব এখানে সন্ন্যাস জীবন যাপন করেন।

চৈতন্যদেব নীলাচলে পৌঁছান মার্চ মাসের প্রথম দিকে (১৫১০)। কিছুদিন—কবিকর্ণপুর বলিতেছেন আঠারো দিন—নীলাচলে থাকিবার পর মার্চ মাসের শেষাশেষি (বা তাহার কিছু পরে) চৈতন্যদেব নীলাচল হইতে চলিলেন দক্ষিণ ভারত। দক্ষিণে তিনি গিয়াছিলেন সেতুবন্ধ রামেশ্বরম পর্যন্ত। দুই বছর আটমাস ধরিয়া দুই দফায় দক্ষিণ ভারত ভ্রমণ শেষে চৈতন্যদেব নীলাচলে ফিরিয়া আসিলেন ১৫১২ সালের শেষ দিকে।

পরের বছর অর্থাৎ ১৫১৩ সালের সেপ্টেম্বর মাসের শেষদিকে চৈতন্যদেব বাঙ্গলা হইয়া ব্রজের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন। কিন্তু সেবার তাঁহার বৃন্দাবন যাওয়া হইল না। বাঙ্গলার রাজধানী গৌড়ের উপান্তে অবস্থিত রামকেলি হইয়া সাঁওতাল পরগণার (বিহার) অন্তর্গত কানাঞি (কানাই) নাটশালা পর্যন্ত গিয়া আর অগ্রসর হইলেন না। বাঙ্গলার বিভিন্ন স্থান ঘুরিয়া ১৫১৪ সালের জুন মাসে নীলাচলে ফিরিয়া আসিলেন। ওই বছরেই শরৎকালে (সম্ভবতঃ অক্টোবর মাসে) তাঁহার বৃন্দাবনযাত্রা। এবার গেলেন ঝাড়খণ্ডের পথে। বৃন্দাবন হইতে প্রয়াগ ও বারাণসী হইয়া ১৫১৫ সালের মার্চ মাসে নবদ্বীপের পরপারে কুলিয়ায় উপস্থিত হইলেন। তাহার পর শান্তিপুর হইয়া নীলাচলে ফিরিয়া আসিলেন সেই বছর মে মাসে (চৈতন্যচরিতামৃতম্, ১৯।৫, ২০।৯-৩৫ ; চৈ. চ. ২।১৬, ১৭, ২৫) ইহাই চৈতন্যদেবের শেষ তীর্থযাত্রা। নীলাচল ছাড়িয়া তিনি আর বাহির হন নাই। টানা আঠারো বছর নীলাচলে বাস করিয়াছেন। এখানে ১৪৫৫ শকে (১৫৩৩ খ্রীষ্টাব্দ) বৈশাখ মাসে অক্ষয় তৃতীয়ার দিন (২৭।২৮ এপ্রিল) অথবা রথযাত্রার কয়েকদিন পর ২৯শে জুন চৈতন্যদেবের দেহাবসান হয় (প্রভাত মুখোপাধ্যায় ১৯৮০ ঃ ৪৫-৪৬)।

সন্ন্যাস গ্রহণের পর শান্তিপুর হইতে নীলাচল যাত্রায় চৈতন্যদেবের সঙ্গী ছিলেন নিত্যানন্দ, মুকুন্দ দত্ত, গদাধর পণ্ডিত, জগদানন্দ পণ্ডিত, ব্রহ্মানন্দ (ভারতী বা পুরী) এবং গোবিন্দ। শান্তিপুর হইতে দক্ষিণ দিকে চলিয়া চৈতন্যদেব সদলে আটিসারা (বর্তমানে বারুইপুর সহরের অংশ, দক্ষিণ চব্বিশ পরগণা) হইয়া ছত্রভোগে (বারুইপুর হইতে দক্ষিণে মথুরাপুর রেল স্টেশনের মাইল চারেক পূর্ব-দক্ষিণে) উপনীত হইলেন। ছত্রভোগ তখন প্রসিদ্ধ স্থান। ইহার কাছেই শতমুখী গঙ্গা। ছত্রভোগের অম্বুলিঙ্গ ঘাট (এখন বরাশী গ্রামে) হইতে চৈতন্যদেব নৌকা করিয়া উৎকল দেশের প্রয়াগঘাটে গিয়াছিলেন। নৌকার বন্দোবস্ত করিয়া দিয়াছিলেন ছত্রভোগের ভূস্বামী রামচন্দ্র খান (চৈ. ভা. ৩।২)।

আটিসারা ও ছত্রভোগ দুই জায়গাই তখন গঙ্গাতীরবর্তী। সেই সময় গঙ্গার গতিপথ ছিল অন্যরকম। এখন যেখানে কলিকাতার ময়দান তাহার দক্ষিণ-পশ্চিমে আসিয়া গঙ্গা দুইভাগে বিভক্ত হইয়া যাইত। একটি স্রোতধারা ছিল দক্ষিণ-পূর্ব বাহিনী, বর্তমান আদিগঙ্গার খাত তাহার প্রবাহপথ। এই প্রবাহ এখন লুপ্তপ্রায়। উৎসমুখ হইতে কালীঘাট হইয়া গড়িয়া পর্যন্ত আদিগঙ্গা এখন অতিশয় ক্ষীণতোয়া। তাহার পর হইতে আদি গঙ্গার খাত একেবারে মজিয়া গিয়াছে। তবে বারুইপুর, শাসন, জয়নগর-মজিলপুর, ছত্রভোগ, বরাশী, নিজ খাড়ি প্রভৃতি স্থানে বিলীয়মান খাতের চিহ্ন এখনও দেখা যায়। চৈতন্যদেবের সমসাময়িক কবি বিপ্রদাস পিপলাই-রচিত 'মনসাবিজয়' কাব্যে (১৪৯৫) এই প্রবাহপথের বর্ণনা আছে (মনসাবিজয়, ৯।৪, ৬)। সমকালীন মানচিত্রকর জাও দ্য বারোস (১৪৯৬-১৫৭০) কৃত বাঙ্গলার মানচিত্রে গঙ্গার দুইটি প্রবাহ পথই দেখান আছে (গোল ১৯৮৩ ঃ ১১৭)। ইহার শতাধিক বৎসর পরে পিটার ফন ডেন ব্রুকে বাঙ্গলার যে মানচিত্র (১৬৬০) প্রস্তুত করিয়াছিলেন তাহাতেও গঙ্গার দক্ষিণ-পূর্ব বাহিনী এবং দক্ষিণ-পশ্চিম বাহিনী প্রবাহ স্পষ্টভাবে দেখা যাইতেছে (নীহাররঞ্জন রায় ১৯৪৯ ঃ ৩ নং মানচিত্র)। দক্ষিণ-পূর্ব বাহিনী আদিগঙ্গা শতমুখী হইতে বিভিন্ন মুখে ভাগ হইয়া বঙ্গোপসাগরে বহিয়া যাইত। সপ্তদশ শতকের মাঝামাঝি কি তাহার আগে হইতে দক্ষিণ-পূর্ব বাহিনী আদি-গঙ্গা মজিয়া যাইতে থাকে। অবশেষে দক্ষিণ-পশ্চিম বাহিনী খাতটিই হইয়া ওঠে গঙ্গার একক প্রবাহ পথ। সাগরসঙ্গমগামী এই খাতটাই এখন আমাদের পরিচিত। আদিগঙ্গার জীবৎকালেই দেখা যাইতেছে গঙ্গার দক্ষিণ-পশ্চিম খাতটি প্রবলতর। ত্রিবেণী হইতে উৎপন্ন গঙ্গার শাখা সরস্বতী সপ্তদশ শতক পর্যন্ত বেশ বড় নদী ছিল। কলিকাতার হেস্টিংস এলাকার বিপরীত পারে অবস্থিত বেতড়ে (হাওড়া সহরের অংশ) সরস্বতী গঙ্গার দক্ষিণ-পশ্চিম ধারার সঙ্গে মিলিত হইত। আরও দক্ষিণে মেদিনীপুর জেলার গেঁওখালিতে গঙ্গার দক্ষিণ-পশ্চিম প্রবাহের সঙ্গে মিলিত হইত রূপনারায়ণ (তখন নাম ছিল মন্ত্রেশ্বর) নদ। তাহার পর গঙ্গা-রূপনারায়ণের মিলিত জলরাশি দক্ষিণ-পূর্ব দিকে একটু বাঁকিয়া সাগর সঙ্গমের দিকে বহমান। সাগরের পথে পশ্চিম দিক হইতে হলদী ও রসুলপুর নদী এই প্রবাহে আসিয়া পড়িত। বারোস ও ব্রুকে উভয়ের মানচিত্রেই দেখা যাইতেছে যে আদি গঙ্গার দুইটি প্রশস্ত ধারাও পূর্ব দিক হইতে আসিয়া সাগরমুখী গঙ্গা-রূপনারায়ণ প্রবাহে পড়িতেছে। সাগর সন্নিধানে এই নদী হইয়া উঠিত বিস্তীর্ণ ও প্রবল। বারোস এবং ব্রুকের মানচিত্রে ইহা স্পষ্ট।

বৃন্দাবনদাসের কাব্য অনুসারে চৈতন্যদেব ছত্রভোগ হইতে নৌকায় চড়িয়া ওড্র (ওড়িশা) দেশের অন্তর্গত প্রয়াগ ঘাটে উপনীত হন। তাহার পর দাঁতনে সুবর্ণরেখা নদী পার হইয়া জলেশ্বর দিয়া নীলাচলের পথে চলিয়া যান (চৈ.ভা. ৩।২)। এখনকার মেদিনীপুর জেলা তখন ওড়িশার মধ্যে। মেদিনীপুরের উত্তর-পূর্ব প্রান্তে রূপনারায়ণ এবং পূর্বপ্রান্তে গঙ্গা-রূপনারায়ণ প্রবাহ ছিল বাঙলা ও ওড়িশার সীমানা। আদিগঙ্গার যে দুইটি ধারা গঙ্গা-রূপনারায়ণে পড়িত তাহার একটি পশ্চিমমুখী, আন্দাজ হয় কুলপীর খানিকটা দক্ষিণে ইহার সঙ্গমস্থল। অন্য ধারাটি দক্ষিণ-পশ্চিমমুখী। ব্লকের মানচিত্রে ইহার নাম সাগর নদী। এই দুইটি ধারার একটি, সম্ভবতঃ পশ্চিমবাহিনী ধারাটি, বাহিয়া চৈতন্যদেব ছত্রভোগ হইতে গঙ্গা-রূপনারায়ণ প্রবাহে পৌঁছিয়া পশ্চিম পারে ওড়িশায় উপস্থিত হইয়াছিলেন। প্রয়াগ ঘাটের অবস্থান অনিশ্চিত, এ বিষয়ে বৃন্দাবনদাসও কোন ইঙ্গিত দেন নাই। তবে তিনি প্রয়াগঘাটের অন্য পরিচয় একটু দিয়াছেনঃ প্রয়াগ ঘাটের কাছেই ছিল গঙ্গাঘাট ও যুধিষ্ঠির কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত শিব মন্দির। মেদিনীপুর জেলায় পটাশপুর থানার মধ্যে কেলেঘাই নদীর ধারে পাথরঘাটা নামে একটা জায়গা আছে। এখানে একটা বেশ উঁচু ঢিবির উপর কঙ্কেশ্বর মহাদেবের মন্দির। বর্তমান মন্দিরটি অর্বাচীন, তবে ঢিবিটি যে প্রাচীন মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ তাহাতে সন্দেহ নাই। ঢিবির উপর একটা দীর্ঘ (১০? ফিট) ইটের প্রাচীর দেখা যায়। ইহার আশেপাশে ইতস্ততঃ ছড়াইয়া আছে পাঁচটি কষ্ঠি পাথরের অলঙ্কৃত স্তম্ভ। ঢিবিটির পূর্বদিকে প্রাচীনকালের প্রশস্ত বাঁধান ঘাট, ভাঙ্গাচোরা অবস্থায় পড়িয়া আছে। মন্দির ও ঘাটের ভগ্নাবশেষ দেখিয়া মনে হয় দেবস্থান হিসাবে পাথরঘাটা এক সময় বেশ জমকালো জায়গা ছিল। প্রায় তিরিশ বছর আগে লেখা একটা বিবরণে (বসু ভক্তিসাগর ১৩৬৬ঃ ৩-৪) আছে যে এই পাথরঘাটা তখনও প্রয়াগঘাটা নামে পরিচিত ছিল এবং কঙ্কেশ্বর শিবকে লোকে যুধিষ্ঠির কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত মহেশ বলিয়া জানিত (বিরাট রাজার সভায় অজ্ঞাতবাসকালে যুধিষ্ঠিরের নাম ছিল কঙ্ক)। প্রকৃষ্ট যাগ যেখানে হয় সেই জায়গা প্রয়াগ। এই অর্থে প্রসিদ্ধ দেবস্থান হিসাবে পাথরঘাটার প্রয়াগ পরিচয় সম্ভব।

পাথরঘাটাকে যদি বৃন্দাবনদাস-কথিত প্রয়াগঘাটা বলিয়া ধরা হয় তাহা হইলে চৈতন্যদেব ওড়িশায় ঢুকিয়াছিলেন হলদী নদীর মোহনা দিয়া। ভগবানপুরের উত্তরে মিলিত হইবার পর কংসাবতী ও কেলেঘাই নদীর যুক্তপ্রবাহ হলদী নামে পরিচিত। পাথরঘাটার কয়েক মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে সাউরি। এখানকার দাস মহাপাত্ররা প্রাচীন ভূস্বামী বংশ। ছত্রভোগের রামচন্দ্র খান না কি ইঁহাদের

জ্ঞাতি ছিলেন। দাস মহাপাত্র বংশে প্রবাদ আছে যে চৈতন্যদেব প্রয়াগঘাটার পরে নন্দ কাপাসিয়া বাঁধ ধরিয়া সাউরি হইয়া দাঁতন গিয়াছিলেন (তদেব)। নন্দ কাপাসিয়ার বাঁধ পুরানো ও প্রসিদ্ধ জাঙ্গাল। এই সড়কটি মন্দারণ (হুগলী জেলা) হইতে মেদিনীপুরে জেলার রামজীবনপুরে আসিবার পর খড়ার, বরদা, পান্না, ঝুমঝুমি, গোলগ্রাম ও ডেবরা পর্যন্ত প্রথমে উত্তর-পূর্ব দিকে তাহার পর দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে খানিকটা ঘুরিয়া আবার সোজা দক্ষিণমুখী গতিতে পিঙ্গলা, সবং ও পটাশপুর থানার এলাকা অতিক্রম করিয়া অবশেষে দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে ঘুরিয়া দাঁতনে পৌঁছিত। বিহার হইতে আসা যে সড়কটি বাঁকুড়া ও মেদিনীপুর জেলা ভেদ করিয়া পুরী যাইতেছে তাহা প্রাচীন তীর্থপথ। এখন ইহার নাম পিলগ্রিম রোড। নন্দ কাপাসিয়ার বাঁধের সঙ্গে পিলগ্রিম রোডের সংযোগস্থল দাঁতন (সাঁতরা ১৯৮৭ ঃ ৩৪-৩৬)। হলদী ও কেলেঘাই দিয়া পাথরঘাটায় আসিয়া থাকিলে চৈতন্যদেব নন্দ কাপাসিয়ার বাঁধ ও পিলগ্রিম রোড ধরিয়া নীলাচল গিয়াছিলেন বলিয়া মনে হয়, কেননা এইটাই সোজা পথ। একটু গোল বাধে মুরারি গুপ্তর কথায়। মুরারির কড়চায় আছে যে চৈতন্যদেব তমলুক হইয়া নীলাচলে গিয়াছিলেন (৩।৬।২)। মুরারি গুপ্ত শান্তিপুরের পর একেবারে তমলুকের নাম করিতেছেন, ছত্রভোগের উল্লেখ তিনি করেন নাই। ছত্রভোগের কথা অবশ্য অবিশ্বাস করা কঠিন, কারণ কৃষ্ণদাস কবিরাজও ছত্রভোগের কথা বলিয়াছেন (চৈ. চ. ২।৩)। ছত্রভোগ হইতে নীলাচলে যাইতে হইলে হলদী নদী দিয়া মেদিনীপুরে ঢোকাই যুক্তিযুক্ত কেননা এইভাবে গেলে চালু পথ দিয়া পিলগ্রিম রোডে ওঠা সহজ হয়। তাহা ছাড়া ছত্রভোগে চৈতন্যদেবের সহায়ক রামচন্দ্র খান যদি সাউরির দাস মহাপাত্রদের জ্ঞাতি হইয়া থাকেন তবে সে দিক দিয়াও নন্দ কাপাসিয়ার বাঁধ ধরিয়া সাউরি হইয়া যাওয়াই সুবিধাজনক ছিল। সাউরির দাস মহাপাত্ররা বোধ হয় চৈতন্যদেবের অনুরাগী হইয়াছিলেন। আজও এই পরিবারের চৈতন্যপন্থী বৈষ্ণবতা প্রসিদ্ধ।

ছত্রভোগ হইতে তমলুক হইয়া নীলাচল যাওয়া ঘুরপথ। ছত্রভোগ হইতে গঙ্গা-রূপনারায়ণে পড়িয়া তমলুক যাইতে হইলে পঁয়ত্রিশ মাইলের মতো উজানে যাইতে হয়। তবে তমলুকে যাওয়ার কথা একেবারে উড়াইয়া দেওয়া যায় না। তমলুক তখন বেশ বড় জায়গা। এখানে ভক্তিপ্রচারের একটা ঘাঁটি করিবার কথা চৈতন্যদেব ভাবিয়া থাকিতে পারেন। তমলুক হইতে নন্দ কাপাসিয়ার বাঁধ ধরিবার রাস্তা ছিল দুইটি। একটি পথ পিঙ্গলা এলাকার মধ্য দিয়া, আর একটি নরঘাটে হলদী নদী পার হইয়া ভগবানপুর ও পটাশপুরের ভিতর দিয়া। তমলুক

হইয়া গেলে চৈতন্যদেব ওড়িশায় প্রবেশ করিয়াছিলেন গেঁওখালিতে বা তাহার কাছাকাছি কোথাও। এক অর্থে প্রয়াগ বলিতে তিন নদীর সঙ্গমস্থল বোঝায়। জাও দ্য বারোসের মানচিত্রে দেখা যাইতেছে গঙ্গার সহিত মিলনের মুখে রূপনারায়ণের প্রবাহ দুই ধারায় বিভক্ত। এখনকার গেঁওখালির কাছে রূপনারায়ণের এই দুইটি ধারা গঙ্গার সহিত মিলিত হইত। এই কারণে গঙ্গা-রূপনারায়ণের সঙ্গমস্থল প্রয়াগঘাট নামে পরিচিত হইয়া থাকিতে পারে। প্রাচীন লোকেরা এখনও গেঁওখালিকে প্রয়াগ বলিয়া অভিহিত করেন।

বৃন্দাবনদাস ও মুরারি গুপ্তর সাক্ষ্যে অমিল থাকায় চৈতন্যদেব মেদিনীপুর জেলার ভিতর দিয়া ঠিক কোন পথে নীলাচলে গিয়াছিলেন তাহা ধরা গেল না। তবে পাথরঘাটা বা তমলুক যেখান হইতেই তাঁহার যাত্রা শুরু হোক না কেন এটা বলা যায় যে চৈতন্যদেব নন্দ কাপাসিয়ার বাঁধ ধরিয়া সাউরি হইয়া দাঁতনে (মেদিনীপুর) পিলগ্রিম রোড ধরিয়াছিলেন। দাঁতনে সুবর্ণরেখা পার হইয়া তিনি আসিলেন জলেশ্বরে (বালেশ্বর জেলা, ওড়িশা)। সেখান হইতে গেলেন রেমুনা (বালেশ্বর), তাহার পর যাজপুর (কটক জেলা)। যাজপুরে অনেক মন্দির ও বহু ব্রাহ্মণের বাস ছিল। চৈতন্যদেবের পূর্বপুরুষরা নাকি যাজপুরের বাসিন্দা ছিলেন। চৈতন্য-দেবের পিতামহ উপেন্দ্র মিশ্র যাজপুর হইতে শ্রীহট্ট জেলার (বর্তমান বাংলাদেশে) ঢাকা দক্ষিণে উঠিয়া যান। যাজপুর ছাড়িয়া চৈতন্যদেব কটক. ভুবনেশ্বর ও সাক্ষীগোপাল অতিক্রম করিলেন। তাহার পর কমলপুরে পৌঁছিয়া দেখিতে পাইলেন জগন্নাথ মন্দিরের ধ্বজা (কড়চা, ৩।৫-১০ ; চৈ.ভা. ৩।২)।

শান্তিপুর হইতে নীলাচল পর্যন্ত জলেস্থলে দীর্ঘপথ চৈতন্যদেব ও তাঁহার সঙ্গীরা কীর্তন করিতে করিতে চলিয়াছিলেন। আটিসারা গ্রামে তাঁহারা অনন্ত পণ্ডিতের আশ্রয়ে 'সর্ব্বরাত্রি কৃষ্ণকথা কীর্তন প্রসঙ্গে' (চৈ.ভা. ৩।২) যাপন করিয়া ছত্রভোগে উপনীত হন। এখানে মুকুন্দ দত্তর গানে চৈতন্যদেব নৃত্য করিয়াছিলেন। ছত্রভোগের লোকেও তাঁহাদের আগমনে উৎসাহিত ও আনন্দিত হইয়াছিল। সেই সময় বাঙ্গলার সুলতানের সঙ্গে ওড়িশার রাজার যুদ্ধ চলিতেছিল। সীমান্ত পার হওয়া দুষ্কর (চৈতন্যচন্দ্রোদয়ম্, ৬।১৪-১৫)। ছত্রভোগের ভূস্বামী রামচন্দ্র খান চৈতন্যদেবের অনুরাগী হইয়াছিলেন। তিনি নৌকা করিয়া সীমান্ত পার হইবার ব্যবস্থা করিয়া দেন। ছত্রভোগে নৌকায় উঠিয়া সপরিকর চৈতন্যদেব কীর্তন শুরু করিলে মাঝি কীর্তন থামাইতে বলিল কারণ নদীতে ডাকাতের ভয় আছে, পারের জঙ্গলে আছে বাঘের উপদ্রব। মাঝির কথায় চৈতন্যদেবের সঙ্গীরা কীর্তন বন্ধ করিলে তিনি বলিলেন ভয় নাই, আমি তোমাদের রক্ষা

করিব। আবার কীর্তন শুধু হইল। গঙ্গাঘাটে চৈতন্যদেব সদলবলে সারা রাত কীর্তন করিয়াছিলেন। সুবর্ণরেখার তীরে করিয়াছিলেন নৃত্য। ভুবনেশ্বরে আসিয়া কৃত্তিবাস (লিঙ্গরাজ) মন্দিরে শিবের সম্মুখে নৃত্যগীত করিয়াছিলেন। মুরারি গুপ্ত বলিতেছেন পথে চৈতন্যদেব কৃষ্ণনামগুণগান এবং এই শ্লোকটি পাঠ ও গান করিয়াছিলেন।

রাম রাঘব রাম রাঘব রাম রাঘব পাহি মাম।
কৃষ্ণ কেশব কৃষ্ণ কেশব কৃষ্ণ কেশব ত্রাহি মাম্ ॥

(কড়চা ৩।৫।৪-৬)

কমলপুরে জগন্নাথ মন্দিরের ধ্বজা দেখিয়া চৈতন্যদেব শ্লোক পাঠ করিতে লাগিলেন। শ্লোকগুলি সম্ভবতঃ চৈতন্যদেবের নিজের রচনা। বৃন্দাবনদাসের কাব্যে একটি শ্লোক উদ্ধৃত আছে। শ্লোকটি এখানে তুলিয়া দিতেছি।

প্রাসাদাগ্রে নিবসতি পুরঃ স্মেরবক্ত্রারবিন্দো।
মামালোক্য স্মিতসুবদনো বালগোপালমূর্ত্তিঃ ॥

(চৈ.ভা. ৩।২)

[যাঁহার মুখপদ্ম বিকশিত সেই বালগোপালমূর্তি শ্রীকৃষ্ণ আমাকে দেখিয়া সুমধুর হাস্যে শ্রীবদনের সমধিক শোভা বিস্তার করিতে করিতে প্রাসাদের উপর আমার সামনে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন।]

চৈতন্যদেব দাক্ষিণাত্যে যাত্রা শুরু করিয়াছিলেন নীলাচলের দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে অবস্থিত আলালনাথ হইতে। সঙ্গে ছিলেন কৃষ্ণদাস নামে একজন সেবক। দক্ষিণদেশ ভ্রমণের সময় চৈতন্যদেব কীর্তন ও নৃত্য করিয়া পথ চলিয়াছেন। কীর্তন বলিতে কৃষ্ণনামগান।

কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হে।
কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হে ॥
কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ রক্ষ মাং।
কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ পাহি মাং ॥

(কড়চা, ৩।১৪।৯)

এই শ্লোকটি একটু বিস্তারিত ও পরিবর্তিত আকারে কৃষ্ণদাস কবিরাজের কাব্যে চৈতন্যদেবের দাক্ষিণাত্য ভ্রমণ প্রসঙ্গে উদ্ধৃত আছে। কৃষ্ণদাসের সাক্ষ্য অনুসারে শ্লোকটি চৈতন্যদেবের রচনা (চৈ.চ. ২।৭)।

আলালনাথ হইতে চৈতন্যদেব আসিলেন কূর্মক্ষেত্রে। ওড়িশার গঞ্জাম জেলায় চিকাকোল স্টেশন হইতে আট মাইল পূর্বে অবস্থিত কূর্মক্ষেত্রে কূর্মাবতারের মন্দির

আছে। মন্দিরটি তখন মধ্ব সম্প্রদায়ের পরিচালনাধীন ছিল। কূর্মক্ষেত্র হইতে চৈতন্যদেব গেলেন জিয়ড়ে। জিয়ড়ে বিশাখাপত্তনম (আন্ধ্র প্রদেশ) হইতে আন্দাজ পাঁচ মাইল উত্তরে। এখানে নৃসিংহ অবতারের মন্দির আছে। মন্দির পরিচালনা করিতেন শ্রী সম্প্রদায়ের বড়গলই শাখাভুক্ত বৈষ্ণবগণ। জিয়ড়ের পরে চৈতন্যদেবের গন্তব্যস্থল শ্রীরঙ্গম। তামিলনাড়ুর কুম্ভকোণম হইতে চার পাঁচ মাইল পশ্চিমে অবস্থিত শ্রীরঙ্গম বিশিষ্টাদ্বৈতবাদের প্রবর্তক ও শ্রী সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা রামানুজাচার্যের সাধনপীঠ ও প্রধান কর্মক্ষেত্র। রামানুজের পর মতপার্থক্যের ফলে শ্রী সম্প্রদায় বড়গলই ও তেঙ্গলই নামে দুই শাখায় ভাগ হইয়া যায়। দুই শাখার মধ্যে তেঙ্গলই একটু বেশী ভক্তিবাদী। তেঙ্গলই শাখার প্রধান কেন্দ্র শ্রীরঙ্গম। ইহা দক্ষিণ ভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ তীর্থস্থান।

শ্রীরঙ্গক্ষেত্রে চৈতন্যদেব ত্রিমল্ল ভট্ট (মতান্তরে বেঙ্কট ভট্ট) নামে এক ব্রাহ্মণের বাড়িতে চাতুর্মাস্য যাপন করেন। ত্রিমল্লের বালক পুত্র গোপাল তাঁহার দেখাশোনা করিত। গোপালের চারিত্র্যগুণে চৈতন্যদেব আকৃষ্ট হন। (কড়চা, ৩।১৫।১৫-১৬)। গোপালকে তিনি বৃন্দাবনে যাইবার নির্দেশ দিলেন। পিতামাতা উভয়েই গত হইলে গোপাল ভট্ট সংসার ত্যাগ করিয়া বৃন্দাবনে চলিয়া যান (ভ.র. ১।১।২১, ১৬৩-৬৫)।

শ্রীরঙ্গম হইতে সেতুবন্ধ রামেশ্বরমে গিয়া চৈতন্যদেবের দক্ষিণ ভ্রমণ শেষ হইল। ফেরার পথে তিনি গোদাবরী নদীর তীরে বিদ্যানগরে (আধুনিক রাজমহেন্দ্রী, আন্ধ্র প্রদেশ) রায় রামানন্দর সঙ্গে দেখা করিতে গেলেন। গোদাবরী নদীর মোহনা সন্নিহিত আন্ধ্র প্রদেশের উত্তর-পূর্ব অংশ তখন ওড়িশা রাষ্ট্রের অন্তর্গত। রসজ্ঞ বৈষ্ণব রায় রামানন্দ ছিলেন ওড়িশা রাজার অধীনে গোদাবরী মণ্ডলের মহামাণ্ডিত অর্থাৎ শাসনকর্তা। চৈতন্যদেব দাক্ষিণাত্যে যাইতেছেন শুনিয়া ওড়িশার রাজা প্রতাপরুদ্রের সভাপণ্ডিত বাসুদেব সার্বভৌম তাঁহাকে রায় রামানন্দর সঙ্গে দেখা করিতে বলিয়া দিয়াছিলেন। চৈতন্যদেব বিদ্যানগর হইতে নীলাচলে ফিরিয়া আসিলেন ১৫১২ সালের মে মাসে। কয়েকটা দিন নীলাচলে থাকিয়াই তিনি আবার চলিয়া গেলেন বিদ্যানগরে। দুই বারে সাধ্য ও সাধন সম্পর্কে রামানন্দর সঙ্গে চৈতন্যদেবের দীর্ঘ ও অন্তরঙ্গ আলোচনা হয়। রামানন্দর সঙ্গে কয়েকমাস কাটাইবার পরে চৈতন্যদেব তাঁহাকে সঙ্গে নিয়া নীলাচলে ফিরিয়া আসিলেন নভেম্বর মাসে (চৈতন্যচরিতামৃতম্, ১২।৯৪-১৩৪ ও ১৩।১-৬১ ; সুখময় মুখোপাধ্যায় ১৯৮৪ ঃ ৯, ১৫-১৬)।

চৈতন্যদেব প্রথমবার বৃন্দাবনযাত্রা করিয়াছিলেন বাঙ্গলা হইয়া। বাঙ্গলায় ঘুরিবার সময় তাঁহার সঙ্গী ছিলেন নিত্যানন্দ। প্রধানতঃ মুরারি গুপ্তর কড়চা

(৩।১৭।৫-২০, ৩।১৮।১-২১), বৃন্দাবনদাসের 'চৈতন্যভাগবত' (৩।৪) এবং জয়ানন্দ-বিরচিত 'চৈতন্যমঙ্গলে'র (৮।৩, ৪, ৫, ৬) সাক্ষ্য মিলাইয়া চৈতন্যদেবের বাঙ্গলায় ভ্রমণের (১৫১৩-১৪) বিবরণ দিতেছি।

চৈতন্যদেব নীলাচল হইতে জলেশ্বর ও দাঁতনের পথে মন্দারণে (হুগলী জেলায় আরামবাগ মহকুমার দক্ষিণ-পশ্চিম প্রান্তে) উপনীত হইলেন। দাঁতন হইতে মন্দারণে যাইবার দুইটি পথ ছিল। একটি নন্দ কাপাসিয়ার বাঁধ। আর একটি পথ নারায়ণগড়, মেদিনীপুর, কেশপুর ও ক্ষীরপাই হইয়া সোজা উত্তর মুখে মন্দারণ যাইত। কোন পথে চৈতন্যদেব গিয়াছিলেন তাহা স্পষ্ট নয়। মন্দারণ তখন বাঙ্গলা ও ওড়িশার সীমান্তে বাঙ্গলার সুলতানী রাষ্ট্রের সীমান্ত ঘাঁটি। মন্দারণে বাঙ্গলায় প্রবেশ করিবার পর চৈতন্যদেব উত্তর-পূর্বমুখে চলিয়া বর্ধমান সহরের কাছে মাঞিপুরা (বা আমাইপুর) গ্রামে জয়ানন্দর পিতা সুবুদ্ধি মিশ্রের বাড়ীতে আগমন করিলেন। তাহার পর আবার উত্তর-পূর্বমুখী পথে গঙ্গা পার হইয়া বায়ড়া গ্রামে বাসুদেব সার্বভৌমের ভ্রাতা যশস্বী পণ্ডিত বিদ্যাবাচস্পতির বাড়ীতে আসিলেন। বায়ড়া শান্তিপুরের কাছে। [চৈতন্যচন্দ্রোদয়ম্ (৯।২৫-৩৩) এবং 'চৈতন্য-চরিতমৃত' (২।১৬) অনুসারে চৈতন্যদেব বাঙ্গলায় আসিয়াছিলেন ভিন্ন পথে। চৈতন্যদেব মন্ত্রেশ্বর (রূপনারায়ণ) পার হইয়া পিছলদা গ্রামে বাঙ্গলা রাষ্ট্রে প্রবেশ করেন। পিছলদা হাওড়া জেলায় শ্যামপুর থানার মধ্যে। তমলুক হইতে রূপনারায়ণ পার হইয়া সাত আট মাইল দক্ষিণ-পূর্বে ইহার অবস্থান। পিছলদা হইতে চৈতন্যদেব নৌকাযোগে পানিহাটি আসেন। তাহার পর কুমারহট্ট ও কাঁচরাপাড়া হইয়া গেলেন শান্তিপুরে।]

চৈতনাদেবের যাত্রাপথের সব জায়গাতেই লোকজনের ভীড় হইতেছিল। বায়ড়াতে ভীড় খুব বাড়িয়া গেলে চৈতনাদেব নবদ্বীপেব পরপারে গঙ্গার পশ্চিম তীরে (তখন নবদ্বীপ ছিল গঙ্গার পূর্ব তীরে, নদীর গতি পরিবর্তন হওয়াতে এখন পশ্চিমতীরবর্তী, ব্লুকের মানচিত্র দ্রষ্টব্য) কুলিয়া গ্রামে মাধবদাসের বাড়ীতে চলিয়া আসিলেন। এখানে তিনি সাতদিন ছিলেন। চৈতন্যদেব আসিয়াছেন শুনিয়া

কিম্বা মুকঃ কিন্নু পঙ্গুঃ কিমন্ধঃ কিম্বা বৃদ্ধঃ কিং শিশুঃ কিং স্ত্রিয়ো বা।
যে যে সর্বে শ্রীনবদ্বীপভূস্থাঃ প্রীত্যুদ্রেকাত্তে তত্র বাথ জগ্মুঃ॥

... ...

মধ্যে মধ্যে তত্র লোকপ্রচায়ৈরত্যুদ্বিগ্নো ভূয়সোহন্তর্দধাতি।
কিন্তুৎকণ্ঠা বর্দ্ধতে গাঢ়গাঢ়ং তেষাং তেষাং ক্রন্দতাং মুক্তকণ্ঠম্॥

(চৈতন্যচরিতামৃতম্, ২০।২৭, ২৯)।

[নবদ্বীপভূমির কি মূক, কি পঙ্গু, কি অন্ধ, কি বৃদ্ধ, কি শিশু, কি স্ত্রী (সকল লোক) প্রীতির উদ্রেক হওয়াতে সেই স্থানে গমন করিল। …মধ্যে মধ্যে (চৈতন্যদেব) জনসমাগমের (আধিক্য) হেতু উদ্বিগ্ন হইয়া বারবার অন্তর্ধান করিতে লাগিলেন। কিন্তু (লোকে) মুক্তকণ্ঠে ক্রন্দন করায় তাহাদের উৎকণ্ঠা বাড়িতে লাগিল।]

কুলিয়া হইতে চৈতন্যদেব গঙ্গাপথে আসিলেন বাঙ্গলার রাজধানী গৌড় নগরের প্রান্তবর্তী রামকেলি গ্রামে। এখানে দেখা হইল সনাতন ও রূপের সঙ্গে। সনাতন ও রূপ সহোদর ভাই। দুইজনেই সুলতান হুসেন শাহের অতি উচ্চপদস্থ কর্মচারী ছিলেন। সনাতন ছিলেন সকর অর্থাৎ মুখ্যমন্ত্রী, তাঁহার খেতাব ছিল মল্লিক। রূপ ছিলেন দবির খাস অর্থাৎ সুলতানের একান্ত সচিব। কর্ণাট ব্রাহ্মণবংশজাত সনাতন ও রূপ ছিলেন শাস্ত্রজ্ঞ, বিদগ্ধ পণ্ডিত ও নিষ্ঠাবান বৈষ্ণব। সুলতানের চাকরী করিয়া দুই ভাইয়ের মনে গ্লানি জন্মিয়াছিল। চৈতন্যদেবের সঙ্গে দেখা হইলে সনাতন তাঁহাকে বলিলেন, আমার মত পাপাশয় ও অপরাধী আর কেহ নাই, আমাকে ক্ষমা করুন (কড়চা, ৩।১৮।৩)। কৃষ্ণদাস কবিরাজের কাব্য অনুসারে সনাতন আর একটু খুলিয়া বলিতেছেন

ম্লেচ্ছ জাতি ম্লেচ্ছ সেবা করি ম্লেচ্ছ কর্ম্ম।
গোব্রাহ্মণদ্রোহী সঙ্গে আমার সঙ্গম॥ (চৈ.চ. ২।১)

কৃষ্ণদাসের লেখায় আছে যে ইতিপূর্বে সনাতন ও রূপ বারবার পত্র লিখিয়া চৈতন্যদেবের কাছে দৈন্যজ্ঞাপন করিতেছিলেন। ইঁহাদের সঙ্গে দেখা করিবার জন্যই চৈতন্যদেবের রামকেলি আগমন (তদেব)। সম্ভবপর বটে। সনাতন ও রূপের রাজকার্যে মন ছিল না। রাজপদের বন্ধন হইতে মুক্তির উপায় জানিতে চাহিয়া তাঁহারা চৈতন্যদেবকে চিঠি লিখিয়াছিলেন। উত্তরে চৈতন্যদেব সনাতন ও রূপকে আপাতকর্তব্যের ইঙ্গিত দিয়া এই শ্লোকটি লিখিয়া পাঠান।

পরব্যসনিনী নারীব্যগ্রাপি গৃহকর্ম্মসু।
তদেবাস্বাদয়ত্যন্তর্নবসঙ্গরসায়নং॥ (তদেব)

[পুরুষান্তরে আসক্ত কুলবধূ প্রকাশ্যে গৃহকর্মে রত থাকিয়াও মনে মনে সেই প্রেমাস্পদের সঙ্গে নবসঙ্গমের রসই আস্বাদন করে।]

তাহার পর চৈতন্যদেব সনাতন ও রূপকে আশ্বস্ত করিয়া বলিলেন

ঘর যাহ ভয় কিছু না করিহ মনে।
… … …
অচিরাতে কৃষ্ণ তোমায় করিবে উদ্ধার॥ (তদেব)

চৈতন্যদেবের সঙ্গে খুব লোকের ভীড় ফিরিতেছিল। রামকেলিতেও খুব ভীড় হইয়াছিল। চৈতন্যদেবের সঙ্গে এত লোক সংঘট্ট সনাতন ও রূপের ভাল লাগে নাই। তাঁহারা চৈতন্যদেবকে বলিলেন, এত লোক সঙ্গে সঙ্গে ফিরিতেছে, এ ভাবে বৃন্দাবনে যাওয়া ঠিক নয়। রাজদরবারে থাকিয়া তাঁহারা বোধ হয় বুঝিতে পারিয়াছিলেন ইহাতে বিপদ হইতে পারে। কেশব ছত্রির মতো তাঁহাদের মনেও হয়ত সুলতানের দিক হইতে বিপদের আশঙ্কা ছিল। সনাতন ও রূপের পরামর্শ মানিয়া চৈতন্যদেব কানাই নাটশাল (সাঁওতাল পরগণা, বিহার) হইতে নীলাচলের দিকে ফিরিয়া চলিলেন (চৈ.চ. ২।১, ১৭)।

ফিরিবার পথে প্রথমে নামিলেন শান্তিপুরে। এখানে অদ্বৈত আচার্যর বাড়ীতে কয়েকদিন থাকিয়া গেলেন। নবদ্বীপ হইতে গঙ্গাদাস পণ্ডিত, মুরারি গুপ্ত প্রমুখ ভক্তদের খবর দিয়া আনান হইল। ইঁহাদের সঙ্গে আসিলেন চৈতন্যদেবের মাতা শচীদেবী। শ্রীগর্ভ পণ্ডিত, জগদীশ পণ্ডিত, গোপীনাথ আচার্য প্রভৃতি ভক্তরাও আসিয়া উপস্থিত হইলেন। নিরন্তর কৃষ্ণকথা ও কীর্তন চলিতে লাগিল। এই সময় অদ্বৈত আচার্যর গুরু ও চৈতন্যদেবের পরমগুরু মাধবেন্দ্রপুরীর আরাধনা তিথি উপলক্ষে অদ্বৈত আচার্য উৎসবের আয়োজন করিলেন। এই উৎসবে কীর্তনের খুব ঘটা হইয়াছিল।

শংখ ঘণ্টা মৃদঙ্গ মন্দিরা করতাল।
সঙ্কীর্ত্তন সঙ্গে ধ্বনি বাজয়ে বিশাল॥
... ...
মণ্ডলী করিয়া নাচে সর্ব্ব ভক্তগণ।
মধ্যে নাচে মহাপ্রভু শ্রীশচীনন্দন॥ (চৈ.ভা ৩।৪)

গোবর্ধন মজুমদার সপ্তগ্রামের বিশিষ্ট রাজপদোপজীবি। তাঁহার ছেলে রঘুনাথ অল্প বয়স হইতেই চৈতন্যগতপ্রাণ হইয়া উঠিয়াছিলেন। রঘুনাথ নীলাচলে চৈতন্যদেবের কাছে চলিয়া যাইবার চেষ্টা করিলে গোবর্ধন ছেলেকে ঘরে আটকাইয়া পাহারা বসাইয়া দিলেন। এবার চৈতন্যদেব শান্তিপুরে আসিয়াছেন শুনিয়া রঘুনাথ পিতার অনুমতি নিয়া সেখানে উপস্থিত হইলেন। রঘুনাথ নীলাচলে যাইতে চাহিলে চৈতন্যদেব তাঁহাকে বলিলেন

স্থির হঞা ঘরে যাহ না হও বাতুল।
ক্রমে ক্রমে পায় লোকে ভবসিন্ধুকুল॥
মর্কটবৈরাগ্য না কর লোক দেখাইঞা।
যথাযোগ্য বিষয় ভুঞ্জ অনাসক্ত হঞা॥

অন্তরনিষ্ঠা কর বাহ্যে লোক ব্যবহার।
অচিরাতে কৃষ্ণ তোমায় করিবেন উদ্ধার ॥

এই উপদেশ দিয়া চৈতন্যদেব রঘুনাথকে বলিলেন আমি বৃন্দাবন হইতে ফিরিলে তুমি নীলাচলে চলিয়া আসিও (চৈ.চা. ২।১৬)।

শান্তিপুর হইতে চৈতন্যদেব আসিলেন কুমারহট্টে। শ্রীবাস নবদ্বীপ হইতে এখানে উঠিয়া আসিয়াছিলেন। কি কারণে জানি না। তবে তাঁহার বোধহয় বিশেষ কিছু অসুবিধা হইয়া থাকিবে। কাজকর্ম একেবারে ছাড়িয়া দিয়া শ্রীবাস বিমর্ষ চিত্তে সব সময় বাড়ীতে বসিয়া থাকিতেন। তাঁহার দিন চলাই ভার হইয়া উঠিয়াছিল। চৈতন্যদেব শ্রীবাসের ভাই শ্রীরাম পণ্ডিতকে ডাকিয়া শ্রীবাসের ভরণপোষণের একটা ব্যবস্থা করিয়া দিলেন।

শ্রীবাসের বাড়ীতে ভক্তরা আসিয়া জড় হইয়াছিল। তাহাদের সঙ্গে কয়েকদিন কাটাইয়া চৈতন্যদেব পানিহাটিতে রাঘব পণ্ডিতের বাড়ীতে আসিলেন। তাঁহার আগমন সংবাদ শুনিয়া কাছাকাছি জায়গা হইতে ভক্তগণ রাঘব পণ্ডিতের বাড়ীতে আসিয়া উপস্থিত হইল। সমবেত ভক্তদের সঙ্গে চৈতন্যদেব কীর্তনাদি 'পরম আনন্দ' করিয়া কয়েকদিন যাপন করিলেন। পানিহাটি হইতে চৈতন্যদেব গেলেন বরাহনগর। এখানে ভাগবতবিশারদ ব্রাহ্মণ রঘুনাথের ভাগবতপাঠে খুশি হইয়া চৈতন্যদেব তাঁহাকে ভাগবতাচার্য উপাধি দিলেন।

এই মত প্রতি গ্রামে গঙ্গাতীরে।
রহিয়া রহিয়া প্রভু ভক্তের মন্দিরে ॥
সবার করিয়া পূর্ণ মনোরথ কাম।
পুনঃ আইলেন নীলাচল ধাম ॥ (তদেব)

চৈতন্যদেব দ্বিতীয়বার বৃন্দাবনের উদ্দেশ্যে রওনা দিলেন (১৫১৪) বনপথে, ঝাড়খণ্ডের ভিতর দিয়া (চৈতন্যচন্দ্রোদয়ম্, ৯।৩৪-৩৫, চৈ.ভা. ১।১)। ঝাড়খণ্ড বলিতে ছোটনাগপুর মালভূমির পাহাড়ী বনময় ভূখণ্ড। সঙ্গে চলিলেন মাত্র দুই জন, বলভদ্র ভট্টাচার্য ও তাঁহার ব্রাহ্মণ ভৃত্য। ঝাড়খণ্ডের মধ্য দিয়া যাওয়ার বর্ণনা দিয়াছেন কৃষ্ণদাস কবিরাজ।

প্রসিদ্ধ পথ ছাড়ি প্রভু উপপথে চলিলা।
কটক ডাহিনে করি বনে প্রবেশিলা ॥
....
পথে যাইতে করে প্রভু উচ্চ সঙ্কীর্তন ॥
... ...

ঝাড়িখণ্ডে স্থাবর জঙ্গম হয় যত।
কৃষ্ণনাম দিঞা কৈল প্রেমে উনমত॥
যেই গ্রাম দিয়া যান যাঁহা করেন স্থিতি।
সে সব গ্রামের লোকের হয় প্রেমভক্তি॥
কেহ যদি তার মুখে শুনে কৃষ্ণনাম।
তার মুখে আন শুনে তার মুখে আন॥
সভে কৃষ্ণ হরি বলি নাচে কান্দে হাসে।
পরম্পরা সম্বন্ধে বৈষ্ণব হৈল সর্ব দেশে॥ (চৈ.চ. ২।১৭)

ঝাড়খণ্ডের মধ্য দিয়া যাইবার সময় ভক্তিপ্রচার করার কথা মুরারি গুপ্তর কড়চা (৪।১।১২-১৩), বৃন্দাবনদাসের 'চৈতন্যভাগবত' (১।১) ও লোচনদাসের 'চৈতন্য-মঙ্গলে'ও (৪।২।৭৭-৭৯) আছে।

রামকেলিতে চৈতন্যদেবের সঙ্গে দেখা হইবার পর সনাতন ও রূপের আর সংসারে মন টিঁকিল না। প্রথমে রূপ তাহার পর সনাতন রাজকার্য ও বিষয়-আশয় ছাড়িয়া বৈরাগ্যবশে বাহির হইয়া পড়িলেন। চৈতন্যদেব বৃন্দাবনে যাইবেন ইহা তাঁহারা জানিতেন। তাঁহারা বৃন্দাবনের দিকে রওনা দিলেন। ওদিকে চৈতন্যদেব বৃন্দাবন হইতে ফিরিতেছিলেন। পথে রূপের তাঁহার দেখা হইল প্রয়াগে। রূপের সঙ্গে ছিলেন তাঁহার ছোট ভাই বল্লভ। বড় দুই ভাইয়ের মতো বল্লভও সুলতানের অধীনে উচ্চপদাধিকারী ছিলেন। তাঁহার খেতাব ছিল অনুপম মল্লিক (চৈ.চ. ২।১৯)। ইনি জীব গোস্বামীর পিতা। পরম বৈষ্ণব বল্লভও বোধ হয় সংসার ছাড়িয়া বড় ভাইয়ের সঙ্গে বাহির হইয়া পড়িয়াছিলেন। প্রয়াগে চৈতন্যদেব রূপকে রসশাস্ত্র বিষয়ে উপদেশ দিলেন। তাহার পর রূপকে বলিলেন বৃন্দাবন ঘুরিয়া নীলাচলে আসিও (চৈ.চ. ২।১৯)।

সনাতনের সঙ্গে চৈতন্যদেবের দেখা হইল কাশীতে। সনাতন চৈতন্যদেবের সঙ্গে প্রায় দুইমাস কাশীতে বাস করেন। এই সময় চৈতন্যদেব তাঁহাকে ভক্তি-সিদ্ধান্ত শিক্ষা দেন। 'চৈতন্যচরিতামৃতে' (২।২০-২৪) ইহার বিবরণ আছে। কাশীতেই চৈতন্যদেব সনাতনকে বৃন্দাবনে গিয়া থাকিতে বলিলেন। ইতিপূর্বে রূপকে তিনি বৃন্দাবনে থাকিয়া শাস্ত্রপ্রচার করিতে বলিয়াছিলেন। সনাতনকেও তিনি বলিলেন

তুমিহ করিও ভক্তিশাস্ত্রের প্রচার।
মথুরার লুপ্ত তীর্থের করিহ উদ্ধার॥

বৃন্দাবনে কৃষ্ণসেবা বৈষ্ণব আচার।
ভক্তিস্মৃতিশাস্ত্র করি করিহ প্রচার ॥ (চৈ.চ. ২।২৩)।

কাঁথা করঙ্গিয়া মোর কাঙ্গাল ভক্তগণ।
বৃন্দাবনে আইসে তার করিহ পালন ॥ (চৈ.চ. ২।২৫)।

চৈতন্যদেব নীলাচলে ফিরিবার পর রূপ ও বল্লভ বাঙ্গলা হইয়া পুরী যাত্রা করিলেন। পথে গঙ্গাতীরে বল্লভের মৃত্যু হয়। রূপ একা পুরীতে আসিলেন। এখানে চৈতন্যদেব তাঁহাকে আবার রসশাস্ত্র বিষয়ে উপদেশ দিলেন। এবার রূপকে তিনি বলিলেন বৃন্দাবনে স্থায়ীভাবে বসবাস করিতে।

…বৃন্দাবনে যাহ তুমি রহিয় বৃন্দাবনে।
… … …
রসশাস্ত্র তুমি করিহ নিরূপণ।
তীর্থ সব লুপ্ত তার করিহ প্রচারণ ॥
কৃষ্ণসেবা ভক্তিরস করিও প্রচার।
আমিহ দেখিতে তাঁহা যাব একবার ॥ (চৈ.চ. ৩।১)।

সনাতন ও রূপকে বৃন্দাবনে পাঠাইবার আগে চৈতন্যদেব সুবুদ্ধি রায়কে বৃন্দাবনে বাস করিতে বলিয়াছিলেন। সুবুদ্ধি রায় বাঙ্গলায় উচ্চপদস্থ রাজপুরুষ বা বিশিষ্ট ভূম্যাধিকারী ছিলেন। কোন কারণে -সুলতান হুসেন শাহ তাঁহার জাতিনাশ করেন। মনের গ্লানিতে সুবুদ্ধি রায় কাশীতে গিয়া পণ্ডিতদের কাছে প্রায়শ্চিত্তের বিধান চাহিলে তাঁহারা গরম ঘি খাইয়া আত্মহত্যা করিবার বিধান দেন। এই সময় বৃন্দাবনের পথে চৈতন্যদেব কাশীতে উপস্থিত হইয়াছিলেন। সুবুদ্ধি রায় তাঁহার সঙ্গে দেখা করিয়া সব কথা বলিলে

প্রভু কহে ইঁহা হৈতে যাহ বৃন্দাবন।
নিরন্তর কর কৃষ্ণনাম সঙ্কীর্ত্তন ॥
এক নামাভাসে তোমার পাপ দোষ যাবে।
আর নাম হইতে কৃষ্ণচরণ পাইবে ॥
আর কৃষ্ণনাম লৈতে কৃষ্ণস্থানে স্থিতি।
মহাপাতকের হয় এই প্রায়শ্চিত্ত ॥ (চৈ.চ. ২।২৫)।

চৈতন্যদেবের কথায় সুবুদ্ধি রায় বৃন্দাবনে বাস করিতে গেলেন। পরবর্তী কালে বৃন্দাবনে চৈতন্য-অনুগামীদের যে সংগঠন গড়িয়া উঠিয়াছিল তাহার প্রথম খুঁটি সুবুদ্ধি রায়। বৃন্দাবনে তাঁহার নিজের জীবনযাত্রা ছিল খুবই সাধাসিধা, কিন্তু বাঙ্গলা হইতে কেহ আসিলে খুব যত্ন করিয়া তাহার দেখাশোনা করিতেন। রূপ

প্রথমবার বৃন্দাবনে আসিলে সুবুদ্ধি রায় তাঁহাকে আশ্রয় দিয়া বৃন্দাবন ঘুরাইয়া দেখাইয়াছিলেন। সনাতন আসিলে তাহাকেও তিনি খুব সমাদর করিয়াছিলেন (তদেব)।

বৃন্দাবন হইতে ফিরিবার পথে কাশীতে থাকাকালীন চৈতন্যদেব ভিক্ষা করিতেন তপন মিশ্র নামে এক ব্রাহ্মণের বাড়ীতে। তপন মিশ্রর ছেলে রঘুনাথ তাঁহার পরিচর্যা করিত। রঘুনাথ তখন তের চৌদ্দ বছরের বালক। সে চৈতন্যদেবের অনুরাগী হইয়া ওঠে। চৈতন্যদেব রঘুনাথকে বলিলেন, তুমি ভাগবতচর্চা কর। পিতামাতার মৃত্যুর পর রঘুনাথ নীলাচলে আসিলে চৈতন্যদেব তাঁহাকে বৃন্দাবন চলিয়া যাইতে বলিলেন। রঘুনাথ বৃন্দাবনে গিয়া উঠিলেন সনাতন ও রূপের আশ্রয়ে (কড়চা, ৪।১।১৪-১৭, চৈ.চ. ৩।১৩)।

কাশী হইতে চৈতন্যদেব নীলাচলে প্রত্যাবর্তন করেন বাঙ্গলা ঘুরিয়া (১৫১৫)। বাঙ্গলায় আসিয়া প্রথমে উপস্থিত হইলেন নবদ্বীপের পরপারে কুলিয়া গ্রামে। তাহার পর মায়ের কথায় তাঁহার নবদ্বীপে আগমন। নবদ্বীপ হইতে অম্বিকা কালনা ও শান্তিপুর। অম্বিকা কালনায় গৌরীদাস পণ্ডিতের কাছে দুই এক দিন থাকিয়া আসিলেন শান্তিপুরে। এখানে অদ্বৈত আচার্যর বাড়ীতে ভক্তদের সমাগম হইলে তাহাদের সঙ্গে কীর্তনাদি করিলেন। কয়েকদিন পরে তমলুক হইয়া নীলাচলযাত্রা (কড়চা, ৪।১৪।১-১৭ ও ৪।১৫।১-১৩, লোচন, চৈ.ম. ৪।৩।২৩৩-২৪৮)। চৈতন্যদেব বলিয়াছিলেন

গৌড়দেশে হয় আমার দুই সমাশ্রয়।
জননী জাহ্নবী হয় দুই দয়াময় ।। (চৈ.চ. ২।১৬)

জননী, জাহ্নবী ও জন্মভূমি দর্শন তাঁহার এই শেষ বার। বাঙ্গলায় তিনি আর আসেন নাই।

চৈতন্যদেবের সন্ন্যাস একটু আকস্মিক ব্যাপার বলিয়া মনে হয়। চৈতন্যদেব হয়ত মনে মনে সন্ন্যাসের জন্য উৎসুক ছিলেন। কিন্তু যখন নবদ্বীপে ভক্তিপ্রচার এবং অনুগামীদের সংগঠিত করিয়া তুলিবার কাজ সবেমাত্র জমিয়া উঠিতেছে সেই সময় সন্ন্যাস নিবার কথা চৈতন্যদেব নিজেও বোধ হয় ভাবেন নাই। একটা ঘটনার দরুন সন্ন্যাসগ্রহণ ত্বরান্বিত হয়। ঘটনাটি বৃন্দাবনদাস সবিস্তারে বলিয়াছেন। একদিন নিমাই পণ্ডিতের সঙ্গে এক পড়ুয়ার আধ্যাত্মিক বিষয়ে তর্ক বাধে। নিমাই পণ্ডিত তখন ভাবাবস্থায় ছিলেন। তিনি পড়ুয়াটিকে ঠেঙ্গা হাতে তাড়া করেন। পড়ুয়াটি পলাইয়া বাঁচে। সতীর্থর এই নিগ্রহ শুনিয়া নবদ্বীপের পড়ুয়ারা খুব উত্তেজিত হইয়া ওঠে। তাহারা ঠিক করে আর কখনও এই রকম হইলে সকলে

মিলিয়া নিমাই পণ্ডিতকে মারিবে। পড়ুয়াদের সঙ্কল্প জানিতে পারিয়া নিমাই পণ্ডিত হেঁয়ালি করিয়া বলিলেন

করিল পিপ্পলিখণ্ড কফ নিবারিতে।
উলটিয়া আরও কফ বাড়িল দেহেতে॥

ইহার অর্থ এই যে মানুষের পরিত্রাণের জন্য আমি যে চেষ্টা করিতেছি লোকে তাহা বুঝিল না, বরং প্রতিপক্ষের বিদ্বেষ বাড়িয়াই চলিয়াছে। বিরোধ করার ইচ্ছা তাঁহার একেবারেই ছিল না। নিমাই পণ্ডিত তখনই স্থির করিলেন যে তিনি গৃহত্যাগ করিয়া সন্ন্যাসী হইয়া যাইবেন। তাহা হইলে হয়ত প্রতিপক্ষ বিরোধ বাধাইবার সুযোগ পাইবে না। অন্তরঙ্গদের তিনি বলিলেন সন্ন্যাসী হইয়া

যে যে জন চাহিয়াছে মোরে মারিবারে।
ভিক্ষুক হইমু কালি তাহার দুয়ারে॥
... ...
সন্ন্যাসীরে সর্বলোক করে নমস্কার।
সন্ন্যাসীরে কেহো আর না করে প্রহার॥ (চৈ.ভা. ১।১৫)

ইহার অল্প কয়েকদিন পরে নিমাই পণ্ডিত কাটোয়ায় গিয়া সন্ন্যাস নিলেন। কবে তিনি সন্ন্যাস নিবেন সে কথা মাত্র অল্প কয়েকজনই জানিতেন। এক নিত্যানন্দকেই নিমাই পণ্ডিত নিজে জানাইয়াছিলেন আর তাঁহাকেই নির্দেশ দিয়াছিলেন গদাধর পণ্ডিত, মুকুন্দ দত্ত, ব্রহ্মানন্দ, চন্দ্রশেখর আচার্য ও মাতা শচীদেবী এই পাঁচজনকে জানাইয়া দিতে। সম্ভবতঃ হরিদাস ঠাকুরও জানিতে পারিয়াছিলেন। কিন্তু আর কেহই নয়। অদ্বৈত আচার্য ও শ্রীবাস পণ্ডিতের মতো অন্তরঙ্গজনও সন্ন্যাস হইয়া যাইবার পর খবর পাইয়াছিলেন।

সন্ন্যাসী হইয়া চৈতন্যদেব কোথায় যাইবেন, কি করিবেন গৃহত্যাগের আগে তাহার কিছুই বোধ হয় ঠিক করা ছিল না। চরিতগ্রন্থসমূহে এ বিষয়ে যাহা বলা আছে তাহাতে ইহাই মনে হয়। যে রকম হঠাৎ করিয়া চৈতন্যদেব সন্ন্যাস নিয়াছিলেন তাহাতে এই সব কথা ভাবিয়া রাখার অবকাশও বিশেষ ছিল না। সন্ন্যাস নিবার পর চৈতন্যদেব চলিয়া গেলেন নীলাচলে। নীলাচল জগন্নাথক্ষেত্র বলিয়া তাঁহার মন টানিয়া থাকিতে পারে। তবে নীলাচলে স্থায়ীভাবে থাকার জন্য মনস্থির চৈতন্যদেব তখন হয়ত করেন নাই। নীলাচল হইতে বাঙ্গলায় ফিরিয়া আসিবার ইচ্ছা তাঁহার ছিল। মুরারি গুপ্ত ও বৃন্দাবনদাসের কাব্যে নীলাচল যাইবার আগে শান্তিপুরে ভক্তদের উদ্দেশ্যে চৈতন্যদেবের উক্তি দেখিলে তাহাই মনে হয়। মুরারির কাব্যে চৈতন্যদেব বলিতেছেন, আমি পুরুষোত্তম দর্শনে যাইব,

তোমরা সর্বদা কীর্তন করিবে এবং হরিবাসরে জাগরণ করিবে (৩।৪।২৫, ২৬)। নীলাচলের নিত্যানন্দকে তিনি বলিয়াছিলেন জগন্নাথে গিয়া কয়েকমাস থাকিব (৩।৫।১৯-২০)। বৃন্দাবনদাসের কাব্যে আছে

প্রভু বোলে আমি চলিলাঙ নীলাচলে।
কিছু দুঃখ না ভাবিহ তোমরা সকলে ॥
নীলাচলচন্দ্র দেখি আমি পুনর্বার।
আসিয়া হইব সঙ্গ তোমা সভাকার ॥
সভে গিয়া সুখে গৃহে করহ কীর্ত্তন।··· (চৈ.ভা. ৩।২)।

কৃষ্ণদাসের কাব্যে ফিরিয়া আসিবার ইঙ্গিত নাই বটে, তবে বাঙ্গলার ভক্তদের সঙ্গে অবিচ্ছিন্ন সংযোগ রাখিবার সঙ্কল্প চৈতন্যদের সুস্পষ্টভাবে ব্যক্ত করিয়াছেন। 'চৈতন্যচরিতামৃত' হইতে শান্তিপুরে সমবেত ভক্তদের কাছে চৈতন্যদেবের উক্তি উদ্ধার করিতেছি।

যদ্যপি সহসা আমি করিয়াছি সন্ন্যাস।
তথাপি তোমা সভা হৈতে নাহিব উদাস ॥
তোমা সভা না ছাড়িব যাবৎ আমি জীব।
মাতারে তাবৎ আমি ছাড়িতে নারিব ॥ (চৈ.চ. ২।২)।

নবদ্বীপে ভক্তিধর্ম ও কীর্তন প্রচারের কাজ অনেকখানি আগাইয়া গিয়াছিল। সব কিছুর প্রাণকেন্দ্র ছিলেন চৈতন্যদেব স্বয়ং। তিনি হঠাৎ চলিয়া গেলে কাজের খুব ক্ষতি হইবে এ কথা বোঝা কঠিন নয়। তাই চৈতন্যদেব বাঙ্গলায় ফিরিয়া আসিবার কথা বলিয়াছিলেন।

চৈতন্যদেব নবদ্বীপ ছাড়িয়া যাইবার পরেই নবদ্বীপের প্রসর্যমান বৈষ্ণবগোষ্ঠী ভাঙ্গিয়া যায়। নিত্যানন্দ, মুকুন্দ দত্ত, গদাধর পণ্ডিত ও জগদানন্দ পণ্ডিত চৈতন্যদেবের সঙ্গে নীলাচল গিয়াছিলেন। গদাধর পণ্ডিত নীলাচলে থাকিয়া যান। বাকি তিনজন নীলাচল হইতে আর নবদ্বীপে ফেরেন নাই। নিত্যানন্দ তাঁহার অনুগামীদের নিয়া বিভিন্ন জায়গায় ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। মুকুন্দ দত্ত নবদ্বীপের পাট তুলিয়া দিয়া চলিয়া আসিলেন কাঁচরাপাড়ায় (নদীয়া)। জগদানন্দ কাঁচরাপাড়া নিবাসী। তিনি বাড়ীতে ফিরিয়া গেলেন। অদ্বৈত আচার্য নবদ্বীপ যাওয়া ছাড়িয়া দিলেন। শান্তিপুর হইল তাঁহার কর্মকেন্দ্র। হরিদাস ঠাকুর চলিয়া গেলেন তাঁহার ভজনস্থান ফুলিয়ায়। নবদ্বীপ-ভক্তমণ্ডলীতে আর যাঁহারা বাহিরের লোক ছিলেন তাঁহারাও নবদ্বীপ হইতে চলিয়া গেলেন। নরহরি সরকারের বাড়ী শ্রীখণ্ডে (বর্ধমান)। তিনি সেখানে ফিরিয়া গেলেন। কুলাইয়ের

গোবিন্দ ঘোষ ও তাঁহার দুই ভাই মাধব ও বাসুদেব নবদ্বীপ পরিত্যাগ করিলেন। নবদ্বীপে চৈতন্যদেব অন্তরঙ্গ ভক্তদের নিয়া কীর্তন শ্রীবাসের বাড়ীতেই বেশী করিতেন। সেই শ্রীবাস কিছুদিন পর উঠিয়া গেলেন কুমারহট্টে (উত্তর চব্বিশ পরগণা)। মুকুন্দর ভাই বাসুদেব কাঁচরাপাড়ায় উঠিয়া আসিলেন। ইঁহাদের বড় ভাই গোবিন্দ চলিয়া গেলেন সুখচরে (কলিকাতার উত্তরে, উত্তর চব্বিশ পরগণা)।

নবদ্বীপের চৈতন্যমণ্ডলী বাঙ্গলায় ভক্তিধর্মের আদি সংগঠন। নানা জায়গায় ছড়ান ভক্তদের একত্র করিয়া ভক্তিপ্রচার করিতে হইলে এই সংগঠনকে ধরিয়াই করিতে হইত। চৈতন্যদেব সন্ন্যাস নিয়া নবদ্বীপ পরিত্যাগ করাতে সেই সংগঠনই আর রহিল না। ভক্তিধর্ম প্রচারের জন্য নূতন করিয়া সংগঠন তৈরী করার প্রয়োজন হইয়া পড়িল। সন্ন্যাস নিয়া নীলাচল যাইবার পথে এবং পরে দুইবার বাঙ্গলায় আসিয়া চৈতন্যদেব সেই চেষ্টাই করিয়াছিলেন। তাঁহার উদ্যোগে বাঙ্গলায় ভক্তি-ধর্মের বেশ কয়েকটা ঘাঁটি গড়িয়া ওঠে। শান্তিপুরের (নদীয়া) উপর তাঁহার খুব ঝোঁক ছিল। শান্তিপুরে অদ্বৈত আচার্যর স্থায়ী নিবাস। চৈতন্যমণ্ডলীতে অদ্বৈত আচার্য খুব শ্রদ্ধেয় ব্যক্তি ছিলেন। বয়সে ও জ্ঞানেগুণে তিনি ছিলেন সকলের বড়। চৈতন্যদেবের ভাবপ্রকাশ হইবার আগে অদ্বৈত আচার্য ছিলেন নবদ্বীপের বৈষ্ণবগোষ্ঠীর নেতা। ভক্তরা বিশ্বাস করিতেন যে তাঁহার সাধনার জোরেই কৃষ্ণ চৈতন্যরূপে নবদ্বীপে অবতীর্ণ হইয়াছেন। চৈতন্যদেব নীলাচলে চলিয়া গেলে অদ্বৈত আচার্য চৈতন্যভাবকদের অভিভাবকস্থানীয় হইয়া উঠিলেন। অদ্বৈত আচার্যর নিজস্ব অনুরাগীমণ্ডলীও ছিল। নানান জায়গা হইতে বৈষ্ণবরা শান্তিপুরে অদ্বৈত আচার্যর কাছে আসিতেন। কাছেই ফুলিয়া হরিদাস ঠাকুরের ভজনস্থান। হরিদাস ঠাকুর ছিলেন অদ্বৈত আচার্যর পরম সুহৃদ। তিনি মাঝে মাঝে শান্তিপুরে আসিতেন। এই সব কারণেই বোধ করি চৈতন্যদেব শান্তিপুরের উপর জোর দিয়াছিলেন। সন্ন্যাসের পর তিনি তিনবার শান্তিপুর আসিয়াছিলেন। চৈতন্যদেব শান্তিপুরে আসিলে বহু ভক্তের সমাবেশ হইত। নবদ্বীপের অনেকেই এখানে আসিয়া তাঁহার সঙ্গে দেখা করিতেন। চৈতন্যদেব তিনবার আসার ফলে শান্তিপুরে ভক্তিধর্মের ঘাঁটি বেশ জমিয়া ওঠে। ভক্তি আন্দোলনের প্রথম দিকে নবদ্বীপের পরেই শান্তিপুরের স্থান। চৈতন্যদেব নীলাচলে চলিয়া গেলে শান্তিপুর বাঙ্গলায় চৈতন্যভাবকদের সবচেয়ে বড় কেন্দ্র হইয়া উঠিল। চৈতন্যদেবের দেহাবসান হইবার (১৫৩৩) পর ভক্তিধর্মের কেন্দ্র হিসাবে খড়দহ ও শ্রীখণ্ডের প্রভাব বাড়িতে থাকে। এই পর্যন্ত শান্তিপুর ছিল মুখ্য।

গুরুত্বের কথা ভাবিয়া শান্তিপুরের কথা প্রথমে বলিয়া নিলাম। এইবার অন্য ঘাঁটিগুলির কথা। যেসব জায়গায় চৈতন্যদেব গিয়াছিলেন বলিয়া চরিতগ্রন্থসমূহে লেখা আছে সেইগুলির বিষয় আগে আলোচনা করিব। উত্তর দিক হইতে শুরু করি। প্রথমে গঙ্গা ও অজয় নদের সঙ্গমস্থলে কাটোয়া। এখানে চৈতন্যদেব সন্ন্যাস নিয়াছিলেন। তাঁহার সন্ন্যাস গুরু কেশব ভারতী কাটোয়াতে বাস করিতেন। এখানে একটা চৈতন্যভক্তমণ্ডলী গড়িয়া উঠিয়াছিল। চৈতন্যদেবের তিরোভাব হইবার কয়েক বছর পরে চৈতন্যপরিকর গদাধরদাস এঁড়েদহ (উত্তর চব্বিশ পরগণা) ছাড়িয়া কাটোয়াতে চলিয়া আসেন। গদাধরদাস কাটোয়ায় গৌরাঙ্গমন্দির প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। তাঁহার সুবাদে কাটোয়া ভক্তিধর্মের একটা বড় ঘাঁটি হইয়া ওঠে। কাটোয়া বৈষ্ণবদের অন্যতম প্রধান তীর্থস্থান। কাটোয়া ছাড়িয়া পঁচিশ মাইল দক্ষিণ-পূর্বে গেলে নবদ্বীপের পরপারে কুলিয়া। এখানে মাধবদাস ছাড়া আরও কয়েকজন বিশিষ্ট চৈতন্যানুরাগী বাস করিতেন। রসরাজ উপাসনার প্রবর্তক ছকড়ি চাটুয্যের নিবাস ছিল কুলিয়ায়। ছকড়ির ছেলে বংশীবদন চৈতন্যদেবের অন্যতম ঘনিষ্ঠ পরিকর এবং গৌরাঙ্গবিষয়ক পদ রচনায় অন্যতম আদি কবি। বংশীবদনের খ্যাতি প্রতিপত্তি ছিল। আর একজন চৈতন্যপরিকর ও গৌরাঙ্গবিষয়ক আদি পদ রচয়িতা প্রেমদাসও কুলিয়ার অধিবাসী। এই সব চৈতন্য পরিকরদের চেষ্টায় কুলিয়া ভক্তিধর্মের খুব বড় ঘাঁটি হইয়া উঠিয়াছিল।

নবদ্বীপের ষোল মাইল দক্ষিণে শান্তিপুরের অপর পারে অম্বুয়া বা অম্বিকা কালনা (বর্ধমান)। কালনা গৌরীদাস পণ্ডিতের সাধন ও কর্মক্ষেত্র। চৈতন্যদেব একবার নিত্যানন্দকে সঙ্গে নিয়া গৌরীদাসের কাছে কয়েকদিন যাপন করিয়াছিলেন। গৌরীদাস চৈতন্যদেব ও নিত্যানন্দকে অম্বিকায় থাকিয়া যাইবার জন্য অনুরোধ করিলে চৈতন্যদেব নিমকাঠে নিজের ও নিত্যানন্দর প্রতিমূর্তি গড়াইয়া গৌরীদাসকে দিয়া যান। এই বিগ্রহের কথা মুরারি গুপ্তর কড়চায় (৪।১৪।১৩) আছে। কড়চার সাক্ষ্য অনুসারে সর্বপ্রথম চৈতন্যবিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করেন চৈতন্যদেবের পত্নী বিষ্ণুপ্রিয়া দেবী (৪।১৪।৮)। তাহার পরেই অম্বিকায় গৌরীদাসের গৌর-নিতাই বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা। চৈতন্যদেব ও নিত্যানন্দ হরিনদী গ্রাম হইতে নিজেরাই নৌকা বাহিয়া অম্বিকায় আসিয়াছিলেন। যে বৈঠা দিয়া তাঁহারা নৌকা বাহিয়াছিলেন সেই বৈঠা এবং গীতার একখানি পুঁথিও চৈতন্যদেব গৌরীদাসকে দিয়া গিয়াছিলেন (ভ.র. ৭।৩৩৬-৩৪১)। বিষ্ণুপ্রিয়া দেবীর প্রতিষ্ঠিত বিগ্রহ সম্পর্কে আর কিছু জানা যায় না। সম্ভবতঃ এই বিগ্রহ তিনি গৃহদেবতারূপে

সেবা করিতেন। তাহা হইলে প্রকাশ্যে চৈতন্যদেবের বিগ্রহপূজার উদ্যোক্তা গৌরীদাস পণ্ডিত। গৌর-নিতাই বিগ্রহ সেবা এবং চৈতন্যদেবের স্মৃতিচিহ্ন-বৈঠা ও গীতার পুঁথি থাকিবার ফলে অম্বিকার মাহাত্ম্য খুব বাড়িয়া যায়। অম্বিকার কাছে প্যারীগঞ্জে থাকিতেন চৈতন্যনুরাগী নকুল ব্রহ্মচারী। ইনি গোপাল বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন।

অম্বিকা কালনা হইতে কুড়ি মাইল উত্তর-পশ্চিমে গেলে বর্ধমান সহর। ইহার কাছে মাঞ্জিপুরা গ্রাম। এই গ্রামের সুবুদ্ধি মিশ্র বোধ হয় নবদ্বীপে চৈতন্যদেবের টোলে পড়িয়াছিলেন। মাঞ্জিপুরার মিশ্ররা বেশ প্রভাবশালী ছিলেন। পাণ্ডিত্য ও ধর্মনিষ্ঠার জন্য ইঁহাদের অনেকেরই যশ ছিল। মিশ্ররা ছিলেন রামোপাসক এবং চৈতন্যবিদ্বেষী। শুধু সুবুদ্ধি ও তাঁহার স্ত্রী ইহার ব্যতিক্রম। সুবুদ্ধির স্ত্রী রোদনী আবার নিত্যানন্দভক্তও ছিলেন। চৈতন্যদেবের অন্যতম জীবনীকার জয়ানন্দ এই চৈতন্যানুরাগী দম্পতির সন্তান (জয়ানন্দ, চৈ.ম. ৩।২৫।৫০-৫৯)।

বর্ধমান সহর হইতে মাইল পনেরো দক্ষিণ-পূর্বে ও কালনা হইতে প্রায় আঠার মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে কুলীনগ্রাম। এখানকার বসুবংশ পুরুষানুক্রমে প্রভাবশালী ও সংস্কৃতিবান। সাহিত্য ও সঙ্গীতচর্চা এবং বৈষ্ণবতার জন্য বসুবংশ বিখ্যাত ছিল। চৈতন্যদেবের জন্ম হইবার কয়েক বছর আগে মালাধর বসু গুণরাজ খান 'শ্রীমদ্ভাগবত' অবলম্বনে 'শ্রীকৃষ্ণবিজয়' কাব্য রচনা করিয়াছিলেন। মালাধর বসুর পুত্র সত্যরাজ খান ও তাঁহার পুত্র রামানন্দ বসু দুইজনেই চৈতন্যপরিকর। দুইজনেরই কীর্তনীয়া হিসাবে নাম ছিল। কুলীনগ্রামে আরও কয়েকজন কীর্তনীয়া ছিলেন। রামানন্দ বসু গৌরাঙ্গলীলার অন্যতম। আদি পদকর্তা চৈতন্যদেব নীলাচলে থাকার সময় রামানন্দ বসু প্রতিবৎসর অন্যান্য ভক্তদের সঙ্গে রথযাত্রা উপলক্ষে নীলাচলে যাইতেন। স্নানযাত্রা ও রথযাত্রার সময় জগন্নাথ, বলরাম ও সুভদ্রা বিগ্রহ রত্নবেদী হইতে নামান ও ওঠানর জন্য খুব শক্ত রেশমী দড়ি প্রয়োজন হয়। ইহাকে বলে পট্টডোরী। চৈতন্যদেবের নির্দেশে রামানন্দ প্রতি-বৎসর পট্টডোরী যোগান দিতেন (চৈ.চ. ২।১৪)। কুলীনগ্রামে আরও কয়েক-জন চৈতন্যপরিকরের বাস ছিল। ইঁহাদের নাম বাণীনাথ বসু, যদুনাথ, পুরুষোত্তম, শঙ্কর বিদ্যানন্দ (অথবা শঙ্কর ও বিদ্যানন্দ)। হরিদাস ঠাকুর কিছুদিন কুলীন-গ্রামে থাকিয়া সাধনভজন করিয়াছিলেন। এখানে তিনি থাকিতেন জগদানন্দ পাঠকের আশ্রয়ে। জগদানন্দ প্রতিদিন লক্ষনাম জপ করিতেন বলিয়া প্রসিদ্ধি আছে। রামানন্দ বসু হরিদাস ঠাকুরের মূর্তি গড়াইয়া তাঁহার ভজনস্থানে প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন।

শান্তিপুরের মাইল তিনেক দক্ষিণ-পূর্বে গঙ্গাতীরবর্তী বায়ড়া (নদীয়া)। বাসুদেব সার্বভৌমর ভাই বিদ্যাবাচস্পতি এখানে থাকিতেন। রামকেলি যাইবার পথে চৈতন্যদেব বিদ্যাবাচস্পতির বাড়ীতে আসিয়াছিলেন। বায়ড়ার গায়েই ফুলিয়া। সে আমলে ফুলিয়া বেশ বড় বিদ্যাস্থান ছিল। সুষেণ পণ্ডিত, শান্তাচার্য প্রভৃতি পণ্ডিতরা ছিলেন ভক্ত বৈষ্ণব। হরিদাস ঠাকুর ফুলিয়াতে থাকার সময় এখানকার অনেক লোক তাঁহার অনুরাগী হইয়াছিলেন। সুষেণ পণ্ডিত ইঁহাদের অগ্রগণ্য। হরিদাস ঠাকুর নীলাচলে চলিয়া গেলে ফুলিয়ার লোক খুব কষ্ট পাইয়াছিল। জয়ানন্দ বলিতেছেন যাত্রার সময় 'ফুল্যার স্ত্রীপুরুষ কান্দে হয়্যা চঞ্চল' (জয়ানন্দ, চৈ.ম. ৮।২।১৭)।

ফুলিয়া হইতে গঙ্গা বাহিয়া মাইল পনেরো দক্ষিণে কুমারহট্ট (উত্তর চব্বিশ-পরগনা), ইহার গায়েই কাঁচরাপাড়া (নদীয়া)। কুমারহট্ট চৈতন্যদেবের দীক্ষাগুরু ঈশ্বরপুরীর জন্মস্থান। এখানে ও ইহার কাছেপিঠে ভক্তিধর্মের অনেক অনুরাগী বাস করিতেন। কুমারহট্টে শ্রীবাসের বাড়ীতে থাকিবার সময় অনেক ভক্ত বৈষ্ণব চৈতন্যদেবের কাছে আসিয়াছিলেন। শ্রীবাস এই ভক্তদের জোটাইয়া একটা বড় গোষ্ঠী চালাইতে পারিবেন বোধ করি এই কথা ভাবিয়া চৈতন্যদেব তাঁহাকে সাংসারিক ব্যাপারে নিশ্চিন্ত করিবার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। কাঁচরাপাড়ায় ছিলেন দুইজন বিশিষ্ট চৈতন্যপরিকর জগদানন্দ পণ্ডিত ও শিবানন্দ সেন। জগদানন্দ নবদ্বীপ-মণ্ডলীর পরিকর ও চৈতন্যদেবের অতি ঘনিষ্ঠজন। শিবানন্দর সঙ্গে চৈতন্যদেবের পরিচয় সন্ন্যাসের পরে, নীলাচলে। শিবানন্দ কবি ও পণ্ডিত ব্যক্তি। গৌরাঙ্গ-বিষয়ক আদি পদকর্তাদের ইনি অন্যতম। শিবানন্দর অবস্থা বেশ ভাল ছিল। প্রতি বৎসর বাঙ্গলা হইতে নীলাচলে যে ভক্তরা যাইতেন চৈতন্যদেবের নির্দেশে শিবানন্দ তাঁহাদের যাওয়া আসার ব্যয় নির্বাহ ও তত্ত্বাবধান করিতেন (চৈ.চ. ২।১৫, ৩।১২)। শিবানন্দর কনিষ্ঠ পুত্র পরমানন্দ সেন কবিকর্ণপূর ছিলেন চৈতন্যদেবের পরম অনুরাগী। কবিকর্ণপূর শুধু কবি নন, নাট্যকার এবং শাস্ত্রবেত্তাও বটেন। ইনি চৈতন্যজীবনী অবলম্বন করিয়া 'চৈতন্যচরিতামৃতম্' নামে মহাকাব্য ও 'চৈতন্যচন্দ্রোদয়ম্' নামে নাটক প্রণয়ন করিয়াছিলেন আর চৈতন্যাবতারের তাৎপর্য নিরূপণ করিয়া লিখিয়াছিলেন 'গৌরগণোদ্দেশদীপিকা'। রসশাস্ত্র ও অলঙ্কারশাস্ত্রে সুপণ্ডিত কবিকর্ণপূর এইসব বিষয়েও গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। শিবানন্দ সেনের স্ত্রী, বড় দুই ছেলে এবং দুই ভাগিনাও চৈতন্যভক্ত। ভাগিনাদের নাম বল্লভ সেন ও শ্রীকান্ত সেন। কাঁচরাপাড়ার কিছুটা দক্ষিণে গঙ্গাতীরবর্তী গরিফা গ্রামে ইঁহাদের বাড়ী। ইঁহারা প্রায়ই কাঁচরাপাড়ায় যাতায়াত করিতেন। শ্রীকান্ত চৈতন্য

দেবের বিশেষ প্রীতিভাজন ভক্ত। কবিকর্ণপূরের দীক্ষাগুরু কাঁচরাপাড়ার শ্রীনাথ পণ্ডিতও চৈতন্যদেবের অন্যতম প্রিয় পরিকর। ইনি 'শ্রীচৈতন্যমতমঞ্জুষা' নামে ভগবতের টীকা লিখিয়াছিলেন। কাঁচরাপাড়ার কৃষ্ণরায় বিগ্রহ এবং তাঁহার আদি মন্দির শ্রীনাথ পণ্ডিতের প্রতিষ্ঠিত বলিয়া জনশ্রুতি আছে। চৈতন্যদেব সন্ন্যাস নিয়া চলিয়া যাইবার পর নবদ্বীপমণ্ডলীর মুকুন্দ দত্ত ও বাসুদেব দত্ত কাঁচরাপাড়ায় আসিয়া বাস করেন। এই সব বিশিষ্ট ভক্তদের প্রভাবে কাঁচরাপাড়া ভক্তিধর্মের বড় ঘাঁটি হইয়া ওঠে।

কুমারহট্ট হইতে দক্ষিণ দিকে আঠার মাইল গেলে গঙ্গার তীরে খড়দহ এবং তাহার পর ক্রমান্বয়ে পানিহাটি, এঁড়েদহ ও বরাহনগর (উত্তর চব্বিশ পরগনা)। খড়দহে ছিলেন পুরন্দর পণ্ডিত, গঙ্গাদাস ও পরমেশ্বরদাস। পুরন্দর পণ্ডিতের দেবালয় ছিল। এঁড়েদহের গদাধরদাস বালগোপাল বিগ্রহ সেবা করিতেন। তাঁহারও মন্দির ছিল। বরাহনগর ভাগবতবিশারদ রঘুনাথের বাসস্থান। পানিহাটিতে রাঘব পণ্ডিতের বাস। তখনকার দিনে পানিহাটি খুব বর্ধিষ্ণু জায়গা। এখানে বৈষ্ণবদের একটা গোষ্ঠী ছিল। রাঘব পণ্ডিত ছিলেন তাহার নেতা। পানিহাটি প্রসঙ্গে জয়ানন্দ বলিতেছেন

পানিহাটি সমগোষ্ঠী নাঞি গঙ্গাতীরে।
বড় বড় পতাকা সমাজ মন্দিরে ॥
ইষ্টকা রচিত হাট বাট রম্যস্থান।
দেউল দেহারা মঠ প্রাসাদ পুষ্পোদ্যান।
মহাপণ্ডিত মহাকবি মহাগুণী।
রাজবিশ্বাস সব মহা মহা গণি ॥
মহান্ত বৈষ্ণব তাতে রাঘব পণ্ডিত।...

(জয়ানন্দ, চৈ.ম. ৮।৬।১-৪)

রাঘব পণ্ডিত বোধ হয় পানিহাটি এলাকায় প্রভাবশালী লোক ছিলেন। তাঁহার বাড়ীতে মন্দিরাদি ছিল। রাঘব পণ্ডিত ছাড়া পানিহাটিতে মকরধ্বজ কর প্রমুখ আরও বৈষ্ণবের বাস ছিল। কাছাকাছি জায়গার কয়েকজন, যথা—খড়দহের পুরন্দর পণ্ডিত, গঙ্গাদাস ও পরমেশ্বরদাস এবং এঁড়েদহের গদাধরদাস চৈতন্যদেবের আগমন উপলক্ষে রাঘব পণ্ডিতের বাড়িতে উপস্থিত হইয়াছিলেন। পানিহাটি হইতে বেশ খানিকটা দূরে অবস্থিত মাহিনগর (সোনারপুরের কাছে, দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা) হইতে আসিয়াছিলেন রঘুনাথ বৈদ্য বা বেজ ওঝা। ইঁহারা সকলেই

খ্যাতিমান ভক্ত বৈষ্ণব। পানিহাটিতে থাকিবার সময় চৈতন্যদেব রাঘব পণ্ডিতকে একান্তে ডাকিয়া বলিয়াছিলেন

আমার সকল কর্ম্ম নিত্যনন্দ দ্বারে।
এই আমি অকপটে কহিল তোমারে ॥
যেই আমি সেই নিত্যানন্দ ভেদ নাই।
তোমার ঘরেই সব জানিবা এথাই ॥
মহাযোগেন্দ্রেরো যাহা পাইতে দুর্লভ।
নিত্যানন্দ হৈতে তাহা হইব সুলভ ॥
এতেক হইয়া তুমি মহা সাবধান।
নিত্যানন্দ সেবিহ যেহেন ভগবান ॥ (চৈ.ভা. ৩।৫)

ইহার পর চৈতন্যদেব মকরধ্বজ করকে রাঘব পণ্ডিতের সেবা করিতে নির্দেশ দিয়া বলিলেন ইহাতে তাঁহারই সেবা করা হইবে (তদেব)। রাঘব পণ্ডিত, মকরধ্বজ কর ও নিত্যানন্দকে একত্র করিয়া চৈতন্যদেব পানিহাটিতে একটা বড় ঘাঁটি গড়িবার আয়োজন করিয়া দিলেন।

পানিহাটি হইতে গঙ্গা বাহিয়া নামিলে আদিগঙ্গার উপর আটিসারা ও ছত্রভোগ (দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা)। আটিসারায় ভক্তিধর্মের ঘাঁটি তৈরী করিয়াছিলেন অনন্ত পণ্ডিত। তিনি এখানে নিতাই-গৌর বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করিয়া পূজার্চনা ও উৎসবাদির ব্যবস্থা করেন। জনশ্রুতি আছে যে চৈতন্যদেব অনন্ত পণ্ডিতের কাছে একটি শালগ্রাম শিলা ও নিজের একজোড়া খড়ম রাখিয়া আসিয়াছিলেন। ছত্রভোগে ভক্তিধর্মের পোষ্টা ছিলেন রামচন্দ্র খান।

ভাগীরথী ও রূপনারায়ণের সঙ্গমস্থল হইতে সাত আট মাইল উত্তর-পশ্চিমে তমলুক (মেদিনীপুর)। মেদিনীপুর জেলার দক্ষিণপ্রান্তে নীলাচলগামী রাস্তার ধারে দাঁতন। দুই জায়গাতেই চৈতন্যদেবের যাওয়া আসার সূত্রে ভক্তিধর্মের ঘাঁটি গড়িয়া ওঠে। চৈতন্যদেবের সন্ন্যাস হইবার পর নবদ্বীপ পর্যায়ের পরিকর পদকর্তা বাসুদেব ঘোষ তমলুকে গিয়া বাস করেন। এখানে তাঁহার প্রধান অনুগামী ছিলেন মাধবদাস। স্থানীয় চৈতন্যভক্তদের সাহায্যে বাসু ঘোষ তমলুকে গৌরাঙ্গ মন্দির স্থাপন করেন। দাঁতন নামটি উদ্ভবের কারণ না কি এই যে চৈতন্যদেবের দাঁতনকাঠি হইতে এখানে একটি নিমগাছ জন্মিয়াছিল। এই নিমগাছটি এখানকার আদি চৈতন্যস্মারক বলিয়া পরিচিত। দাঁতনে পুরানো নিতাই-গৌর বিগ্রহের পূজা হয়।

'চৈতন্যচরিতামৃত' কাব্যে কৃষ্ণদাস কবিরাজ পিছলদা গ্রামের উল্লেখ করিয়াছেন (চৈ.চ. ২।১৬)। কৃষ্ণদাসের সাক্ষ্য অনুসারে চৈতন্যদেব ওড়িশা হইতে বাঙ্গলায় আসার সময় মন্ত্রেশ্বর নদ (রূপনারায়ণ) পার হইয়া পিছলদাতে বাঙ্গলার সীমায় প্রবেশ করিয়াছিলেন। তমলুক হইতে রূপনারায়ণ পার হইয়া কিছুটা দক্ষিণ-পূর্বে গেলে পিছলদায় (হাওড়া) পৌছান যায়। চৈতন্যদেবের সময় রূপনারায়ণ ছিল ওড়িশা ও বাঙ্গলা রাষ্ট্রের সীমানা। কৃষ্ণদাস এই গ্রামটির কথাই বলিয়াছেন মনে হয়। বারোসের মানচিত্রেও রূপনারায়ণের উত্তর তীরে পিছলদা দেখান আছে। পিছলদা তখন বেশ বড় জায়গা ছিল। পিছলদা নামে আর একটা গ্রামে আছে মেদিনীপুর জেলায়। তমলুক হইতে চৌদ্দ মাইল দূরে নরঘাটে হলদী নদী পার হইবার পর দুই মাইল দক্ষিণে দ্বিতীয় পিছলদার অবস্থান। এখানে পুরাণো গৌরাঙ্গ বিগ্রহ ছিল। বিগ্রহটি এখন কাছেই কাসিমপুর গ্রামে নিয়া যাওয়া হইয়াছে। তমলুক হইতে নীলাচলে যাওয়া আসার পথে চৈতন্যদেবের পক্ষে এই গ্রামে আসা সম্ভব।

প্রসঙ্গক্রমে মন্দার পর্বতের কথা বলা দরকার। ভাগলপুর জেলায় (বিহার) গঙ্গার ধারে মন্দার পর্বত। নবদ্বীপ হইতে গয়া যাওয়ার পথে চৈতন্যদেব মন্দার পর্বতের উপর মধুসূদন বিগ্রহ দর্শন করিয়াছিলেন। পাহাড়ের উপরে একটি মন্দিরে চৈতন্যদেবের যুগল চরণচিহ্ন আছে। মন্দার পর্বতে ভক্তিবাদীদের আনাগোনা ছিল বলিয়া মনে হয়।

১৫১৩-১৫১৪ সালে চৈতন্যদেবের বাঙ্গলা পরিভ্রমণ প্রসঙ্গে মুরারি গুপ্ত লিখিয়াছেন

এবং ভক্তবর্গাণাং গ্রামে গ্রামে গৃহে গৃহে।
ভুক্ত্বা পীত্বা সুখং কৃত্বা যযৌ শ্রীপুরুষোত্তম্ ॥

(কড়চা, ৩।১৮।২১)

[এইভাবে ভক্তদের গ্রামে গ্রামে ও গৃহে গৃহে ভোজন ও পানাদি করিয়া এবং আনন্দ করিয়া (চৈতন্যদেব) শ্রীপুরুষোত্তমে (নীলাচলে) গমন করিলেন।]

প্রথমবার নীলাচল যাওয়ার (১৫১০) পথে এবং ১৫১৫ সালে বৃন্দাবন হইতে বাঙ্গলা হইয়া নীলাচলে ফিরিবার সময়ও চৈতন্যদেব নিশ্চয়ই অনেক জায়গায় গিয়াছিলেন। হাঁটাপথে বা নৌকায় গেলে খাওয়াদাওয়া বা রাত্রিবাসের জন্য মাঝেমাঝে বিরতি দিতেই হয়। সবশুদ্ধ কতগুলি জায়গা চৈতন্যস্মৃতিবিজড়িত তাহার সম্পূর্ণ তালিকা পাওয়া অসম্ভব। চরিতগ্রন্থসমূহে বেশ কতকগুলি জায়গার উল্লেখ পাওয়া যায়। এই জায়গাগুলির কথা এতক্ষণ আলোচনা করিয়াছি। ইহা

ছাড়া আরও বেশ কয়েকটি জায়গায় চৈতন্যদেব গিয়াছিলেন বলিয়া জনশ্রুতি আছে। জায়গাগুলির অবস্থান দেখিয়া মনে হয় জনশ্রুতি হয়ত অমূলক নয়। কয়েকটি গ্রাম তো চৈতন্যদেবের ভ্রমণপথে বা তাহার আশেপাশে পড়ে। পাণ্ডুরি বিশ্রামতলা (বীরভূম), বিশ্রামতলা, ধোয়াঘাট (মুর্শিদাবাদ), কুলাই, বিশ্রামতলী (বর্ধমান) চৈতন্যদেবের রাঢ় ভ্রমণের স্মৃতিবিজড়িত। আটিশেওড়া, শেওড়াফুলী, বৈদ্যবাটীর নিমাইতীর্থঘাট, শ্রীরামপুর-চাতরা, কোন্নগর (হুগলী) ও বালি (হাওড়া) গঙ্গাতীরবর্তী। গঙ্গার তীর ধরিয়া পরিভ্রমণের সময় চৈতন্যদেব এই সব জায়গায় আসিয়া থাকিতে পারেন। পাণ্ডুরি বিশ্রামতলা গ্রামটি সিউরি সহরের দুই মাইল দক্ষিণে অবস্থিত। সন্ন্যাসের পর চৈতন্যদেব নাকি বক্রেশ্বরের পথে পাণ্ডুরি বিশ্রামতলা পর্যন্ত আসিয়াছিলেন। এখানে বিশ্রাম করিবার পর (বিশ্রামতলা নাম এই কারণে) তিনি নিত্যানন্দর চালনায় অন্য পথে শান্তিপুরের দিকে চলিয়া যান। ভরতপুরের দুই মাইল উত্তরে বিশ্রামতলা এবং দেড় মাইল উত্তরপূর্বে ধোয়াঘাট। দুইটি জায়গাই কুয়ে নদীর তীরে অবস্থিত। বিশ্রামতলায় চৈতন্যদেব বিশ্রাম করিয়াছিলেন বলিয়া কথিত আছে। কাটোয়ার কাছে কুলাই বাসু ঘোষের পৈতৃক নিবাস। এখানে বাসু ঘোষের বৈমাত্র ভাইরা ভক্তিধর্ম প্রচার করিতেন। কুলাইয়ের কাছে বিশ্রামতলী। শোনা যায় চৈতন্যদেব এখানেও বিশ্রাম করিয়াছিলেন। চৈতন্যদেবের বিশ্রাম করার জায়গায় একটা বেদী আছে। কাটোয়া হইতে গঙ্গা বাহিয়া নামিলে পঁয়তাল্লিশ মাইল দক্ষিণে আটিশেওড়া। এখন ইহার নাম শ্রীপুর। এখানে চৈতন্যদেব একটা কুচিল গাছের তলায় বিশ্রাম করিয়াছিলেন বলিয়া গ্রামটি বৈষ্ণবদের তীর্থবিশেষ। শ্রীপুরের প্রায় ছাব্বিশ মাইল দক্ষিণে গঙ্গাতীরবর্তী বৈদ্যবাটী। চৈতন্যদেব বৈদ্যবাটীতে একদিন থাকিয়া এখানকার গঙ্গার ঘাটে স্নান করিয়াছিলেন। এখানকার চৈতন্যস্মারক নিমাইতীর্থ ঘাট। এই ঘাটে স্নান করিয়া এখানকার গঙ্গাজল নিয়া তারকেশ্বরে তারকনাথ শিবের মাথায় ঢালিলে খুব পুণ্য হয় বলিয়া লোকের বিশ্বাস। বৈদ্যবাটীর আট মাইল দক্ষিণে বালি। এখানকার একটি পল্লীর নাম চৈতন্যপাড়া। এই নামটি বোধ হয় চৈতন্যদেবের বালিতে আসার স্মৃতিচিহ্ন। বর্ধমান হইতে প্রায় দশ মাইল দক্ষিণ-পূর্বে দামোদর নদের উত্তর তীরে নতু নামে একটি গ্রাম আছে। চৈতন্যদেব এই গ্রামের মিত্র বাড়ীতে ভিক্ষা করিয়াছিলেন বলিয়া স্থানীয় লোকের বিশ্বাস। নতুর মিত্র বাড়ীতে চৈতন্যদেবের স্মৃতিচিহ্ন খড়ম ও চাঁদেয়া আছে। নতু হইতে মাইল পনেরো দক্ষিণে দামোদরের দক্ষিণতীরে ছোট বৈনান। চৈতন্যদেব না কি এই গ্রামে এক দিন বিশ্রাম করিয়াছিলেন। ছোট বৈনান হইতে বাহির হইয়া চলিলেন মন্দারণের

পথে দশ-বার মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে অবস্থিত বাতানলে (হুগলী)। পথে চৈতন্যদেবের সঙ্গীসাথীরা খোল করতাল বাজাইয়া 'চলল গৌর বাতানল' বলিয়া গান করিতে করিতে গিয়াছিলেন। দক্ষিণ দামোদর অঞ্চলের লোকে এই ঘটনা এখনও মনে রাখিয়াছে। সভাস্থল বা আড্ডা ছাড়িয়া যাইতে হইলে লোকে উঠিবার সময় বলে 'চলল গৌর বাতানল'। বাতানল বর্ধমান হইতে মন্দারণগামী পথের ধারে পড়ে।

মেদিনীপুর জেলার নারায়ণগড় ও ময়নাপাড়া (বেলদার কাছে) ও পাঁশকুড়ায় চৈতন্যদেব গিয়াছিলেন বলিয়া শোনা যায়। মন্দারণ বা তমলুক হইয়া বাঙ্গলা-নীলাচল যাতায়াতের পথে পিলগ্রিম রোডের ধারে নারায়ণগড় ও বেলদা পড়ে। নারায়ণগড়ের ভূস্বামী কেশব সামন্ত চৈতন্যদেবের অনুরাগী হইয়াছিলেন। ময়না-পাড়ায় নিতাই-গৌর বিগ্রহ আছে। সেবায়েত শাক্ত ব্রাহ্মণ। ইঁহারা নাকি চৈতন্যদেবের সময় হইতে পুরুষানুক্রমে এই বিগ্রহের সেবা করিয়া আসিতেছেন। তমলুকের মাইল দশেক উত্তর-পশ্চিমে পাঁশকুড়া। তমলুক হইতে উত্তর-পশ্চিম মুখে মন্দারণ গেলে পাঁশকুড়া হইয়া যাওয়া সম্ভব। কেলেঘাই নদীর তীরবর্তী প্রয়াগঘাটার কথা একটু আগেই বলিয়া আসিয়াছি। এখানে মহেশ মন্দিরের কাছে নিতাই-গৌর বিগ্রহের পূজা হয়। বিগ্রহ প্রাচীন বলিয়া খ্যাত।

বর্তমান ওড়িশার মধ্যে জলেশ্বর হইতে নীলাচল পর্যন্ত যে পথে চৈতন্যদেব অন্ততঃ পাঁচবার যাতায়াত করিয়াছেন তাহা প্রাচীন রাজপথ। এই পথের ধারে চৈতন্যপন্থী ভক্তিধর্মের বেশ কয়েকটি ঘাঁটি গড়িয়া উঠিয়াছিল। চৈতন্যদেবের অনুগামীরা কুআঁশা, রামেশ্বরপুর, গৌরাঙ্গপুর ও কানপুরে গৌরাঙ্গমন্দির প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। মন্দির ছাড়া কয়েকটি জায়গায় চৈতন্যদেবের স্মৃতিচিহ্ন দেখা যায়। অমরদা গ্রামে চৈতন্যঘাট নামে একটি পুকুরঘাট আছে। কথিত আছে চৈতন্যদেব এই ঘাটে স্নান করিয়াছিলেন। চৌদ্বাব গ্রামের একটা বড় পাথর চৈতন্যদেবের স্মৃতিবিজড়িত। ভক্তরা পাথরটিকে সযত্নে রক্ষা করেন। ভদ্রকের উপকণ্ঠে সইয়া গ্রামের মদনমোহন মন্দিরে একটি কাঁথা আছে। ইহা চৈতন্যদেবের কাঁথা বলিয়া লোকের বিশ্বাস। চৈতন্যদেব এখানে গঙ্গানারায়ণ বিদ্যাবাচস্পতির বাড়ীতে পাঁচদিন ছিলেন বলিয়া শোনা যায়। কটকের অপর পারে মহানদীর ধারে গড়গড়িয়া ঘাট। এখানে একটা পাথরের উপর কয়েকটা দাগ আছে। ভক্তদের বিশ্বাস ইহা চৈতন্যদেবের পদচিহ্ন। নীলাচল হইতে বাঙ্গলায় যাইবার পথে আশ্বিন পূর্ণিমার রাত্রে চৈতন্যদেব এখানে কীর্তন করিয়াছিলেন এইরূপ জনশ্রুতি। চৈতন্যদেবের আগমন স্মরণ করিয়া প্রতি বৎসর আশ্বিন পূর্ণিমার দিন গড়গড়িয়ার

উৎসব ও মেলা হয়। ইহার নাম বালিযাত্রা। (উপর্যুক্ত তথ্যের সূত্র প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, ১৯৮০ঃ ৩২-৩৫)।

চৈতন্যদেবের পরিকররা বাঙ্গলায় ভক্তিধর্মের বেশ কয়েকটা ঘাঁটি গড়িয়া তুলিয়াছিলেন। চৈতন্যদেব এই সব জাগয়ায় আসিয়াছিলেন বলিয়া শোনা যায় না। তবে ভক্তিধর্ম প্রচারে এই সব জায়গার গুরুত্ব কম নয়। গদাধর পণ্ডিত মুর্শিদাবাদ জেলার ভরতপুরে সুররাজ নামে একজন সম্পন্ন ব্যক্তির পোষকতায় গোপীনাথ বিগ্রহের মন্দির প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। গদাধর পণ্ডিতের ভাইপো নয়নানন্দ এখানে থাকিয়া বিগ্রহসেবা ও ভক্তিধর্ম প্রচার করিতেন। ভরতপুরের দুইমাইল পূর্বে কাঞ্চনগড়িয়া (মুর্শিদাবাদ) চৈতন্যদেবের পরিকর কীর্তনীয়া হরিদাস আচার্যর বাড়ী। ইনি ভক্তিপ্রচারক। হরিদাসের দুই ছেলে শ্রীদাস ও গোকুলদাস এখানে থাকিয়া ভক্তিপ্রচার করিতেন। কাঞ্চনগড়িয়া হইতে মাইল কুড়ি দক্ষিণে কাটোয়া (বর্ধমান)। কাটোয়ার পাঁচ মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে শ্রীখণ্ড। এখানকার মুকুন্দ ও নরহরি সরকার দুই ভাই। ইঁহারা নবদ্বীপ পর্যায়ের চৈতন্য-পরিকর। মুকুন্দর ছেলে রঘুনন্দনও চৈতন্যদেবের ঘনিষ্ঠ ছিলেন। ইঁহাদের সঙ্গে যোগ দিয়াছিলেন চিরঞ্জীব ও সুলোচন। শ্রীখণ্ড গৌরনাগরবাদের সবচেয়ে বড় ঘাঁটি হইয়া ওঠে। নরহরি সরকার ঠাকুরের প্রভাব ইহার কারণ। নরহরি সরকার ঠাকুরের পরে রঘুনন্দন ও তাঁহার বংশধররা এই খ্যাতি বজায় রাখিয়াছিলেন। নরহরি শ্রীখণ্ডে গৌরাঙ্গ বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করেন। শ্রীখণ্ডে সাহিত্য ও গান বাজনার চর্চা খুব ছিল। নরহরি নিজে উৎকৃষ্ট পদকর্তা। তাঁহার ও রঘুনন্দনের কীর্তন-গানে পারদর্শিতা ছিল। শ্রীখণ্ডের গৌরনাগরবাদী গুরুবংশের প্রতিষ্ঠাতাও নরহরি ঠাকুর। এই গুরুবংশের শিষ্যদের মধ্যে অনেক কবি, পণ্ডিত, গায়ক ও বাদক ছিলেন (কবিরাজ ১৯৭৭ঃ খ-এঃ)। নরহরির প্রধান শিষ্য লোচনদাস। ইনি 'চৈতন্যমঙ্গল' নামে চরিতকাব্যের রচয়িতা।

কাটোয়া হইতে গঙ্গা বাহিয়া চার মাইল দক্ষিণে গেলে দাঁইহাট (বর্ধমান)। বাসু ঘোষের এক বৈমাত্র ভাই মুকুন্দ এবং কুমুদানন্দ পণ্ডিত এখানে থাকিয়া ভক্তি-প্রচার করিতেন। কুমুদানন্দর রসিকরাজ বিগ্রহ সেবা ছিল। আর কিছুটা দক্ষিণে গঙ্গাতীরবর্তী চাকুন্দী (নদীয়া) ও অগ্রদ্বীপ (বর্ধমান)। চাকুন্দীতে চৈতন্যপরায়ণ গঙ্গাধর ভট্টাচার্যের বাড়ী। ইঁহার পুত্র শ্রীনিবাস আচার্য গৌড়ীয় বৈষ্ণবদের অন্যতম প্রধান মহান্ত। অগ্রদ্বীপে ভক্তিপ্রচারক গোবিন্দ ঘোষ। যশস্বী কীর্তনীয়া মাধব ঘোষ বড় ভাইয়ের সঙ্গে এখানে থাকিতেন। গোবিন্দ ঘোষ অগ্রদ্বীপের বিখ্যাত গোপীনাথ মন্দিরের প্রতিষ্ঠাতা। অগ্রদ্বীপ ও চাকুন্দী আগে গঙ্গার পশ্চিম পাড়ে

ছিল। নদী সরিয়া যাওয়ার ফলে এখন পূর্বতীরে পড়িয়া গিয়াছে। আরও দক্ষিণে গেলে শান্তিপুর হইতে মাইল দশ দক্ষিণ-পূর্বে চাকদহের (নদীয়া) কাছে যশড়া ও পালপাড়া। চৈতন্যপরিকর দুই ভাই জগদীশ পণ্ডিত ও মহেশ পণ্ডিত এই দুই জায়গায় থাকিতেন। জগদীশ যশড়াতে গৌরাঙ্গ ও জগন্নাথ মন্দির প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। নর্তক হিসাবে জগদীশ পণ্ডিতের নাম ছিল। মহেশ পণ্ডিতও ভাল নাচিতে পারিতেন। চাকদহের কাছে সুখসাগর ছিল পুরুষোত্তম-দাসের নিবাস ও কর্মক্ষেত্র। ইহার পর গরিফা (উত্তর চব্বিশ পরগনা)। গঙ্গাতীরে অবস্থিত এই গ্রামে অনেক ভক্তর বাস ছিল। গরিফা হইতে পনেরো মাইল মতো দক্ষিণে গেলে গঙ্গার পশ্চিম তীরে শ্রীরামপুরের লাগোয়া চাতরা চৈতন্যপরিকর কাশীশ্বর পণ্ডিতের বাসস্থান। তিনি এখানে গৌরাঙ্গ মন্দির স্থাপন করিয়াছিলেন। কাশীশ্বরের ভাগিনা রুদ্র পণ্ডিত নামকরা মহান্ত। রুদ্র পণ্ডিত শ্রীরামপুরের বল্লভপুরে রাধাবল্লভ মন্দির প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। শ্রীরামপুরের দক্ষিণে আকনা (হুগলী)। এখানে গরুড় পণ্ডিত বাস করিতেন। আকনা ও তাহার কছে মাহেশ ভক্তিধর্মের ঘাঁটি। মাহেশের পাঁচ-ছয় মাইল দক্ষিণে গঙ্গার পূর্ব পারে সুখচর (উত্তর চব্বিশ পরগনা)। নবদ্বীপমণ্ডলীর কীর্তনীয়া গোবিন্দ দত্ত এই গ্রামে আসিয়া গৌরাঙ্গ মন্দির স্থাপন করেন।

গঙ্গাতীর ছাড়াইয়া ভিতরের দিকেও চৈতন্যভক্তদের কয়েকটা ঘাঁটি ছিল। নবদ্বীপের কিছুটা উত্তর-পশ্চিমে পুটশুড়ি গ্রামে (বর্ধমান) থাকিতেন নর্তক গোপাল। পুটশুড়ির গায়ে দেনুড়। এই গ্রাম চৈতন্যদেবের দীক্ষাগুরু কেশব ভারতীর জন্মস্থান। এখানে অনেক বৈষ্ণব ভক্তর বাস ছিল। গোপীনাথ ও তাঁহার পুত্র রামদাস ইঁহাদের মধ্যে অগ্রগণ্য। নবদ্বীপ হইতে আঠারো মাইল উত্তর-পূর্বে শালিগ্রাম (নদীয়া)। শালিগ্রামের সরখেল পরিবারের গৌরীদাস প্রমুখ ছয় ভাই চৈতন্যদেব ও নিত্যানন্দর পরম অনুরাগী ছিলেন। গৌরীদাস অম্বিকায় চলিয়া আসিয়াছিলেন। শালিগ্রামের গায়ে দোগাছিয়া, তাহার একটু উত্তরে বড়গাছি। এই দুইটি গ্রামেও চৈতন্যদেব ও নিত্যানন্দর বেশ কয়েকজন অনুগামী বাস করিতেন। শ্রীরামপুর হইতে কুড়ি মাইল উত্তর-পশ্চিমে গোস্বামী মালিপাড়া (হুগলী)। ভগবান আচার্য কুলীনগ্রামের কাছে জুলকুল হইতে উঠিয়া আসিয়া এখানে বাস করেন। শ্রীরামপুর হইতে প্রায় পঁয়তাল্লিশ মাইল পশ্চিমে অবস্থিত খানাকুল (হুগলী) ছিল রামদাস বা অভিরাম গোস্বামীর কর্মক্ষেত্র।

চৈতন্যপ্রপত্তি প্রচারের সূচনা নবদ্বীপে। চৈতন্যদেব সন্ন্যাস নিবার আগে ভক্তিধর্মপ্রচার ছিল নবদ্বীপ-কেন্দ্রীক। সন্ন্যাসী হইবার পর চৈতন্যদেব বাঙ্গলা

ছাড়িয়া চলিয়া গেলেন বটে, কিন্তু কিছুদিনের মধ্যেই চৈতন্যপ্রবর্তিত বাঙ্গলার বিভিন্ন স্থানে, বিশেষতঃ ভাগীরথী তীরবর্তী অঞ্চলে, দ্রুত ছড়াইয়া পড়িল। উত্তরে ভরতপুর হইতে দক্ষিণে ছত্রভোগ ও দক্ষিণ-পশ্চিমে দাঁতন পর্যন্ত বিস্তৃত অঞ্চলে মুর্শিদাবাদ, বর্ধমান, হুগলী, নদীয়া, উত্তর চব্বিশ পরগনা, দক্ষিণ চব্বিশ পরগণা, হাওড়া ও মেদিনীপুর জেলায় পর পর ভক্তিধর্ম প্রচারের অনেকগুলি ঘাঁটি গড়িয়া উঠিল। উদ্যোক্তা চৈতন্যদেব স্বয়ং অথবা তাঁহার পরিকরগণ। সবগুলি ঘাঁটিতে চৈতন্যদেব নিজে যান নাই, একথা ঠিক, কিন্তু ভাগীরথীর তীর ধরিয়া এবং মেদিনীপুরের ভিতর দিয়া যাওয়া আসা করিবার সময় ভক্তিধর্ম প্রচারের অনেকগুলি ঘাঁটি তিনি তৈরী করিয়া দিয়াছিলেন বা গুছাইয়া দিয়াছিলেন। বিভিন্ন ঘাঁটিতে বসিয়া যাঁহারা ভক্তিধর্ম প্রচার শুরু করিলেন তাঁহাদের কয়েকজন চৈতন্যদেবের পূর্বপরিচিত, নবদ্বীপ পর্যায়ের সহচর, যথা—অদ্বৈত আচার্য, গোবিন্দ ঘোষ, নরহরি সরকার, শ্রীবাস পণ্ডিত, মুকুন্দ দত্ত, বাসুদেব ঘোষ ও জগদীশ পণ্ডিত। নতুন লোকও কম ছিল না। শিবানন্দ সেন, শ্রীনাথ পণ্ডিত, রাঘব পণ্ডিত, পুরন্দর পণ্ডিত, গদাধরদাস, রঘুনাথ বৈদ্য, পরমেশ্বরদাস, রঘুনাথ ভাগবতাচার্য, অনন্ত পণ্ডিত ও অভিরাম গোস্বামীর সঙ্গে চৈতন্যদেবের জানাশোনা হয় সন্ন্যাসের পর বাঙ্গলায় পরিভ্রমণ কালে অথবা বৃন্দাবনে বা নীলাচলে। বিভিন্ন জায়গায় ছড়ান ভক্তিধর্মপ্রচারক মহান্তদের মধ্যে সংযোগের সূত্র চৈতন্যদেব স্বয়ং। চৈতন্যদেবের আগমন উপলক্ষে পানিহাটি, কুমারহট্ট ও শান্তিপুরে অনেক পরিকর ও ভক্তর সমাবেশ হইত। ভক্তদের তিনি প্রতি বৎসর রথের সময় নীলাচল যাইতে বলিয়াছিলেন। প্রতি বৎসর বাঙ্গলার ভক্তরা রথের সময় নীলাচলে গিয়া চাতুর্মাস্য যাপন করিতেন অর্থাৎ আষাঢ় হইতে আশ্বিন বর্ষার চারমাস কাটাইয়া আসিতেন। বাঙ্গলার ভক্তরা নীলাচলে প্রথম যান ১৫১৩ সালের রথযাত্রায়। ইহার পর ১৫৩৩ সালে চৈতন্যদেবের তিরোধান পর্যন্ত মাঝে দুইবার বাদে প্রতি বৎসর তাঁহারা গিয়াছেন। শিবানন্দ সেনের পরিচালনায় তাঁহারা দল বাঁধিয়া নীলাচল যাওয়া আসা করিতেন। নীলাচলে চৈতন্যদেবের সান্নিধ্যে চাতুর্মাস্য যাপন বাঙ্গলার ভক্তিপ্রচারকদের মধ্যে পারস্পরিক সংযোগের নিয়মিত উপায় হইয়া উঠিয়াছিল।

চৈতন্য পরিকরদের মধ্যে নিত্যানন্দ ভক্তিধর্মের সবচেয়ে বড় প্রচারক। নিত্যানন্দর কর্মকৃতির বিবরণ পরে দেওয়া আছে। চৈতন্যদেব বৃন্দাবন হইতে নীলাচলে ফিরিবার পরে তাঁহার নির্দেশে নিত্যানন্দ প্রচার শুরু করেন। চৈতন্যদেব সন্ন্যাস নিবার পর ভক্তিধর্ম প্রচারের যে সব ঘাঁটি গড়িয়া উঠিয়াছিল নিত্যানন্দ সেইগুলিকে ধরিয়া প্রচার শুরু করেন। তাঁহার প্রচার-পরিভ্রমণ আরম্ভ হইয়াছিল

পানিহাটি হইতে, রাঘব পণ্ডিতের সহায়তায়। তাহার পর নিত্যানন্দের পরিক্রমা চলে দক্ষিণে ছত্রভোগ (দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা) হইতে উত্তরে চৌয়ারিগাছা (মুর্শিদাবাদ) পর্যন্ত। প্রচার-পরিভ্রমণে নিত্যানন্দের সঙ্গী ছিলেন রামদাস (অভিরাম), গঙ্গাধরদাস, পরমেশ্বরদাস, কৃষ্ণদাস পণ্ডিত, রঘুনাথ বৈদ্য, গোবিন্দ ঘোষ, মাধব ঘোষ ও বাসু ঘোষ। ইঁহারা সকলেই চৈতন্যপরিকর।

চৈতন্যদেব মথুরা-বৃন্দাবনে গিয়াছিলেন ঝাড়খণ্ডের পথে। অধিকাংশ চরিতগ্রন্থেই এই সংবাদ পাওয়া যায়। তবে এক কৃষ্ণদাস কবিরাজই মথুরাযাত্রার বিবরণ দিয়াছেন। তিনি বলিতেছেন চৈতন্যদেব ঝাড়খণ্ডের বনপথ দিয়া গিয়াছিলেন। ঝাড়খণ্ড শব্দের অর্থ অরণ্যভূমি। তবে সাধারণতঃ ছোটনাগপুর মালভূমিকে ঝাড়খণ্ড বলা হয়। পাহাড়ে ঘেরা অরণ্যময় এই অঞ্চল উত্তরে বিহারের সাঁওতাল পরগণা ও হাজারিবাগ জেলা হইতে দক্ষিণে ওড়িশার গড়জাত পাহাড়শ্রেণীর (ময়ূরভঞ্জ, কেন্দুঝড়, সুন্দরগড় জেলায়) উত্তর প্রান্ত পর্যন্ত বিস্তৃত। বিহারের সাঁওতাল পরগণা, গিরিডি হাজারিবাগ, ধানবাদ, রাঁচি, সিংভূম ও চাইবাসা জেলা এবং পশ্চিমবঙ্গের পুরুলিয়া জেলা ও মেদিনীপুর, বাঁকুড়া, বর্ধমান ও বীরভূম জেলার পশ্চিম অংশ ছোটনাগপুর মালভূমির অন্তর্গত। কোন পথে চৈতন্যদেব মথুরায় গিয়াছিলেন কৃষ্ণদাস কবিরাজের লেখায় তাহা পরিষ্কার নয়। কৃষ্ণদাস শুধু বলিতেছেন চৈতন্যদেব কটক ডান দিকে রাখিয়া বনে প্রবেশ করিলেন এবং উপপথ ধরিয়া অগ্রসর হইলেন। ঝাড়খণ্ডের বনপথ অতিক্রম করিয়া চৈতন্যদেব পৌঁছিলেন কাশীতে। কটক ডানদিকে রাখিয়া বনপথে কাশীর দিকে যাইতে হইলে ওড়িশার ঢেঙ্কানাল, সুন্দরগড় এবং মধ্যপ্রদেশের রায়গড় ও সুরগুজা জেলা পার হইয়া যাওয়াই সোজা (বসু ১৯৪৯ : ৫)। কিন্তু এই দিক দিয়া গেলে ছোটনাগপুর মালভূমি অর্থাৎ ঝাড়খণ্ড পড়ে না। কটক ডান দিকে রাখিয়া কেন্দুঝড়, রাঁচি, হাজারিবাগের বনভূমি হইয়া কাশীর দিকে এখন যাওয়া চলে। কিন্তু তখনকার দিনে এই পথে চলাচল করা খুব কঠিন ছিল। সেই সময় এদিককার জঙ্গল খুব ঘন ছিল। পাহাড়ও বেশ উঁচু। ঘন জঙ্গল ও উঁচু পাহাড়ের মধ্যে কিছু কিছু অরণ্যচারী জনগোষ্ঠী ইতস্ততঃ ঘুরিয়া বেড়াইত, স্থায়ী বসতি বিশেষ ছিল না। স্থায়ী বসতির কথাটা এখানে বিশেষভাবে খেয়াল রাখা প্রয়োজন কেননা কৃষ্ণদাস কবিরাজ চৈতন্যদেবের যাত্রাপথে ব্রাহ্মণদের বসতি ও শূদ্র মহাজনদের উল্লেখ করিয়াছেন। কৃষ্ণদাস কবিরাজের মতো জয়ানন্দও কটক ডানদিকে রাখিয়া অগ্রসর হওয়ার কথা বলিতেছেন। তবে জয়ানন্দের বিবরণে যাত্রাপথ সম্বন্ধে

ইঙ্গিত একটু স্পষ্ট। জয়ানন্দ বলিতেছেন চৈতন্যদেব ওড়িশা হইতে বক্রেশ্বরে (বীরভূম) আসেন, তাহার পর ডানদিকে মগধ ও বামদিকে ঝারি পাহাড় রাখিয়া বারাণসীর দিকে চলিয়া যান (চৈ.ম. ৭।১৭-৯)। কৃষ্ণদাস কবিরাজ ও জয়ানন্দর সাক্ষ্য মিলাইয়া দেখিলে ঝাড়খণ্ডের মধ্য দিয়া চৈতন্যদেবের যাত্রাপথ সম্পর্কে মোটামুটি ধারণা করা সম্ভব। চৈতন্যদেব কটক ডানদিকে রাখিয়া মহানদীর উত্তরে গড়জাত জঙ্গলে প্রবেশ করেন। তাহার পর উত্তর-পূর্ব মুখে চলিয়া ব্রাহ্মণী ও সুবর্ণরেখা পার হন। সুবর্ণরেখা পার হইলেই চাইবাসা, সিংভূম (বিহার) ও মেদিনীপুরের ঝাড়গ্রাম হইতে ছোটনাগপুরের মালভূমি শুরু। সুবর্ণরেখা ছাড়াইবার পর চৈতন্যদেবের যাত্রাপথ উত্তরমুখী। এই পথে চৈতন্যদেব উত্তরে বীরভূম পর্যন্ত বিস্তৃত সুবর্ণরেখা-কাঁসাই-শিলাই-দ্বারকেশ্বর-দামোদর-অজয় অববাহিকার বনভূমি পার হইয়া বক্রেশ্বরে (বীরভূম) উপনীত হইলেন। বক্রেশ্বর হইতে তিনি উত্তর-পশ্চিমমুখে সাঁওতাল পরগণা ও হাজারিবাগ জেলার ভিতর দিয়া বারাণসীর দিকে গিয়াছিলেন। সাঁওতাল পরগণা ও হাজারিবাগে জঙ্গলের প্রান্ত ধরিয়া চলিলে ডান দিকে গয়া ও পাটনা জেলা অর্থাৎ মগধ এবং বামদিকে পাহাড়ী গহন জঙ্গল পড়ে। জয়ানন্দর কথায় মনে হয় চৈতন্যচরিত কাব্যগুলিতে ঝাড়খণ্ড বলিতে যে ভূখণ্ডের দিকে ইঙ্গিত করা হইয়াছে তাহা চাইবাসা-সিংভূম-মেদিনীপুর-বাঁকুড়া-পুরুলিয়া-বর্ধমান-বীরভূম-সাঁওতাল পরগনা-হাজারিবাগ জেলার অন্তঃপাতী ছোটনাগপুর মালভূমির দক্ষিণ-পূর্ব, পূর্ব ও উত্তর প্রান্তভূমি। এই দিকটা ঠিক পাহাড়ী নয়। এখানকার মাটি কাঁকুরে, ভূ-পৃষ্ঠ ঢেউ খেলান, মালভূমির মাঝখানের তুলনায় জঙ্গলও এখানে হালকা। এখানে প্রাচীনকাল হইতে স্থায়ী বসতি, চলাচলের পথ এবং ব্যবসা-বাণিজ্য ছিল। এই রকম এলাকার মধ্যে বনপথে চলিতে চলিতে পর পর ব্রাহ্মণবসতি ও শূদ্র মহাজনের সাক্ষাৎ পাওয়া সম্ভব।

যে অঞ্চলের কথা বলিলাম তাহা কন্ধ, জুয়াঙ্গ, শবর, কোল, হো, মুণ্ডা, উরাঁও, পাহাড়িয়া প্রভৃতি আদিবাসী জন এবং বাউড়ি, বাগদি, মেট্যা প্রভৃতি অন্ত্যজ জাতির বাসভূমি। সমতলভূমির সংগঠিত সমাজের চোখে ইহারা অসংস্কৃত রাঢ় চুয়াড়। ইহাদের প্রতি লক্ষ্য করিয়াই কৃষ্ণদাস কবিরাজ ঝাড়খণ্ড প্রসঙ্গে বলিয়াছেন 'ভিল্লপ্রায় লোক তাঁহা পরম পাষণ্ড' (চৈ.চ. ২।১৭) তবে প্রাচীনকাল হইতেই রাজনৈতিক ও বাণিজ্যিক সূত্রে ছোটনাগপুর মালভূমির বিভিন্ন অংশের সঙ্গে বহির্জগতের ঘনিষ্ঠ সংযোগ স্থাপিত হইয়াছিল। প্রাচীনকালের অনেক প্রত্নানিদর্শন এই অঞ্চলে দেখিতে পাওয়া যায়। নদীপ্রবাহ ও সাবেক পথের আশেপাশে প্রাচীন জৈন ও ব্রাহ্মণ্য মন্দির ও মূর্তির ধ্বংসাবশেষ ছড়াইয়া আছে। স্থানীয়

রাজন্যবর্গ ও বণিকগণ এই সব কীর্তির প্রতিষ্ঠাতা। ত্রয়োদশ-চতুর্দশ শতকের রাজনৈতিক আবর্তনে বহির্জগতের সঙ্গে ছোটনাগপুর মালভূমির সংযোগ অনেকটাই নষ্ট হইয়া গিয়াছিল। প্রাচীন পথগুলি দিয়া যাওয়া আসাও অনেক কমিয়া আসিয়াছিল। এই জন্যই বোধ হয় কৃষ্ণদাস কবিরাজ ঝাড়খণ্ডের ভিতর দিয়া যাওয়ার প্রসঙ্গে বলিয়াছেন চৈতন্যদেব প্রসিদ্ধ পথ ছাড়িয়া উপপথ দিয়া চলিলেন। তবে এদিকে ব্রাহ্মণদের বসতি ছিল। কৃষ্ণদাস কবিরাজ বলিতেছেন স্থানীয় ব্রাহ্মণদের সঙ্গে চৈতন্যদেবের দেখা হইয়াছিল। তাঁহাদের কাছে তিনি ভিক্ষা নিয়াছিলেন। কৃষ্ণদাস শূদ্র মহাজনদের কথাও বলিয়াছেন। সম্ভবতঃ ইঁহারা স্থানীয় ভূম্যাধিকারী। ভঞ্জভূম, বরাহভূম, তুঙ্গভূম, মল্লভূম, শূরভূম শিখরভূমের রাজবংশ এই ভূম্যধিকারীদের প্রতিনিধিস্বরূপ। আনুমানিক পঞ্চদশ শতক হইতে ছোটনাগপুর মালভূমিতে রাজনৈতিক পুনর্বিন্যাস শুরু হয়। ইহারই ফলে ভূম রাজ্যগুলির উদ্ভব হইয়াছিল। ভূম রাজ্যের রাজবংশগুলি বহুভাগে বিভক্ত ও বিচ্ছিন্ন অরণ্যবাসী জনগোষ্ঠীগুলিকে একত্র করিয়া যতদূর সম্ভব সংগঠিত শাসনব্যবস্থা গড়িয়া তুলিবার জন্য চেষ্টা করিতেছিলেন। এই চেষ্টা বিভিন্নমুখী ঃ রাজনৈতিক, আর্থিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক। স্থানীয় রাজবংশগুলির উদ্যোগে এবং ষোড়শ শতকের দ্বিতীয়ার্ধ হইতে বিহার ও বাঙ্গলায় মুঘল সাম্রাজ্য সম্প্রসারণের ফলে ছোটনাগপুর মালভূমির সঙ্গে বহির্জগতের রাজনৈতিক, বাণিজ্যিক ও সাংস্কৃতিক সম্পর্ক নূতন করিয়া তৈরী হইতে থাকে। সাংস্কৃতিক ব্যাপারে স্থানীয় রাজন্যবর্গ বরাবরই ব্রাহ্মণ্যবাদের অনুগামী। সাধারণ মানুষও ব্রাহ্মণ্য সমাজব্যবস্থা ও সংস্কৃতি দ্বারা গভীরভাবে প্রভাবান্বিত হইয়াছিল। আরণ্য সমাজব্যবস্থা ও সংস্কৃতির সঙ্গে ব্রাহ্মণ্য সমাজভাবনা, ভাব ও আচার ব্যবহারের সংশ্লেষজনিত সামাজিক-সাংস্কৃতিক রূপান্তরপ্রক্রিয়া ঝাড়খণ্ড অঞ্চলে জনজীবনের অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য (বসু ১৩৫৬ ঃ ১-৩৮)।

চৈতন্যদেব ঠিক কোন কারণে বহু ব্যবহৃত পথ ছাড়িয়া ঝাড়খণ্ডের উপপথে বারাণসীর দিকে রওনা দিয়াছিলেন তাহা জানা যায় না। তবে ঝাড়খণ্ডে তখন যে সামাজিক-সাংস্কৃতিক পরিবর্তন ঘটিতেছিল তাহার পরিপ্রেক্ষিতে সর্বজনীন প্রেমভক্তির তত্ত্ব ও সম্মেলক কীর্তন প্রচারের সুযোগ ছিল এ কথা ভাবা অসঙ্গত নয়। কৃষ্ণদাস কবিরাজের বিবরণে আছে যে চৈতন্যদেব

যেই গ্রাম দিয়া যান যাঁহা করেন স্থিতি।
সেই সব গ্রামের লোকের হয় প্রেমভক্তি ॥

সবে কৃষ্ণ বলি হরি বলি নাচে কান্দে হাসে।
পরম্পরায় বৈষ্ণব হৈল সর্ব্বদেশে ॥
... ...
ভিল্লপ্রায় লোক তাঁহা পরম পাষণ্ড ॥
নাম প্রেম দিঞা কৈল সবার নিস্তার।... (চৈ.চ. ২।১৭)

কৃষ্ণদাসের কথায় ঢের অত্যুক্তি আছে সন্দেহ নাই। তবে একথা বোধ হয় বলা যায় যে চৈতন্যদেব ঝাড়খণ্ডের অরণ্যবেষ্টিত জনপদসমূহে প্রেমধর্মের বীজ ছড়াইয়া গিয়াছিলেন। কিছু লোক তাঁহার প্রভাবে বৈষ্ণব হইয়াছিল ইহাও সম্ভব। চৈতন্যদেবের পরে তাঁহার পরিকরদের মধ্যে দুইজন, সনাতন ও জগদানন্দ পণ্ডিত বৃন্দাবন-নীলাচল পথে ঝাড়খণ্ডের মধ্য দিয়া গিয়াছিলেন, সনাতন নীলাচলে আসিবার সময় আর জগদানন্দ বৃন্দাবন যাইতে (চৈ.চ, ৩।৪, ১৩)। এই দুইজনের ভ্রমণবৃত্তান্ত কোথাও লেখা নাই। ফলে প্রচার ও সংগঠনের কাজ ইঁহারা কিছু করিয়া থাকিলে তাহার বিবরণ অজ্ঞাত। ঝাড়খণ্ডে সংগঠিত প্রচার শুরু হয় পরবর্তী সময়ে। ষোড়শ শতকের দ্বিতীয় ভাগে চৈতন্যপরিকর বৃন্দাবনের গোস্বামীদের দুই জন শিষ্য শ্যামানন্দ ও শ্রীনিবাস ঝাড়খণ্ডে আসিয়া গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্ম প্রচার করিয়াছিলেন। শ্রীনিবাস করিয়াছিলেন মল্লভূমে, প্রধানতঃ মল্ল রাজপরিবার ও রাজন্যবর্গের মধ্যে। শ্যামানন্দর কর্মক্ষেত্র অনেক বেশী প্রসারিত। তিনি ঝাড়গ্রাম, সিংভূম ও ময়ূরভঞ্জ এলাকায় গ্রামে গ্রামে কীর্তন ও মহোৎসব করিয়া রাজাপ্রজা নির্বিশেষে সকলের মধ্যে প্রচার করিয়াছিলেন। সপ্তদশ শতকে বীরভূম, বাঁকুড়া, পুরুলিয়া, মেদিনীপুর, সিংভূম ও ময়ূরভঞ্জের অরণ্যময় অঞ্চলে গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মের যথেষ্ট প্রসার হয়, এবং অনেকগুলি ঘাঁটি গড়িয়া ওঠে।

বৃন্দাবনে ভক্তিধর্মের একটা কেন্দ্র স্থাপন করিবার চিন্তা চৈতন্যদেবের মনে সন্ন্যাস জীবনের গোড়া হইতেই ছিল। দক্ষিণ ভ্রমণের সময় গোপাল ভট্টর প্রতি বৃন্দাবন যাইবার নির্দেশ এই কথার একটা প্রমাণ। নিত্যানন্দদাস-বিরচিত 'প্রেমবিলাস' কাব্যের সাক্ষ্য অনুসারে সন্ন্যাস নিবার আগেই চৈতন্যদেব লোকনাথ গোস্বামীকে বৃন্দাবনে যাইতে বলিয়াছিলেন (প্র. বি. ৭ বিলাস)। অন্য কোন সূত্রে এই তথ্যের সমর্থন পাওয়া যায় না বটে, তবে 'প্রেমবিলাসের' সাক্ষ্য সত্য হইলে বলিতে হইবে সন্ন্যাস নিবার আগেই চৈতন্যদেব অনুগামীদের বৃন্দাবনে পাঠাইবার উদ্যোগ শুরু করিয়াছিলেন। সনাতন, রূপ, গোপাল ভট্ট ও রঘুনাথ ভট্টর বৃন্দাবনবাস চৈতন্যদেবের নির্দেশ অনুসারে। চৈতন্য পরিকরদের মধ্যে সনাতন ও রূপ প্রথম বৃন্দাবনবাসী (লোকনাথ কবে বৃন্দাবনে আসিয়াছিলেন তাহা জানা যায়

না)। সনাতন ও রূপ বৃন্দাবনে যাইবার আগে সুবুদ্ধি রায় চৈতন্যদেবের উপদেশে স্থায়ীভাবে বৃন্দাবনে বাস করিতেছিলেন। এই কয়জন সম্পর্কে নির্দিষ্ট তথ্য পাওয়া যাইতেছে। চৈতন্যদেব বোধহয় অন্যান্য ভক্তদেরও বৃন্দাবনে যাইতে বলিয়াছিলেন। কাঁথা করঙ্গিয়া আমার ভক্তরা বৃন্দাবনে গেলে তাহাদের দেখাশোনা করিও, সনাতনের প্রতি চৈতন্যদেবের এই নির্দেশ হইতে ইহা অনুমান করা যায়। সনাতন ও রূপের প্রতি চৈতন্যদেবের প্রধান নির্দেশ ছিল ভক্তিশাস্ত্রপ্রচার, লুপ্ততীর্থউদ্ধার ও বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা। ইহার অর্থ বৃন্দাবনে চৈতন্যপন্থীদের একটা কেন্দ্র গড়িয়া তোলা।

বাঙলা হইতে অত দূরে বৃন্দাবনে গিয়া ঘাঁটি গড়িবার প্রয়োজন কি ছিল তাহা বোঝা দরকার। মথুরা-বৃন্দাবন হইতে কাশী পর্যন্ত বিস্তৃত গঙ্গা-যমুনা বিধৌত অঞ্চল চৈতন্যদেবের অনেক আগে হইতেই ভক্তিবাদী ধর্মান্দোলনের বিকাশক্ষেত্র হইয়া উঠিয়াছিল। বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী শ্রী সম্প্রদায়ের উত্তর ভারতীয় প্রধান কেন্দ্র, দ্বৈতাদ্বৈতবাদী সনকাদি সম্প্রদায় এবং শুদ্ধাদ্বৈতবাদী বল্লভাচারী সম্প্রদায়ের প্রধান কেন্দ্র ছিল এই অঞ্চলে। রামানন্দ এবং কবীর, রবিদাস, সেনা, ধনা, আসনানন্দ, মহানন্দ প্রমুখ রামানন্দর বারজন শিষ্য, মুলুকদাস, সদনা, নাভা প্রভৃতি সন্ত-সাধক ও ভক্তিপ্রচারকদের জন্ম ও কর্মস্থানও এইখানে। অন্যদিকে কাশী তখন ভক্তিবাদের মূল প্রতিপক্ষ বৈদান্তিক মায়াবাদীদের সবচেয়ে বড় কেন্দ্র। মাধবেন্দ্র পুরীর প্রেম-ভাবনার সূত্র ধরিয়া প্রচলিত ভক্তিবাদী ভাবাদর্শের বিকল্প প্রপত্তি স্থাপন করিবার ইচ্ছা চৈতন্যদেবের মনে ছিল। তাহা না হইলে নূতন করিয়া ভক্তিশাস্ত্র লেখানর আগ্রহ তাঁহার হইত না। সর্বভারতীয় প্রেক্ষাপটের কথা ভাবিলে গঙ্গা-যমুনা বিধৌত অঞ্চলই যে তখন ভক্তিধর্মের স্বতন্ত্র প্রপত্তি স্থাপনের পক্ষে সবচেয়ে প্রশস্ত তাহাতে সন্দেহ নাই। স্বতন্ত্র প্রপত্তির কেন্দ্র চৈতন্যদেব কেন বৃন্দাবনে স্থাপন করিতে চাহিয়াছিলেন তাহার কারণও সহজেই বোঝা যায়। বৃন্দাবন গোপালকৃষ্ণের লীলাভূমি। বৃন্দাবনে যমুনা পুলিনের কুঞ্জ রাধাকৃষ্ণের বিহারক্ষেত্র। রাধাকৃষ্ণের লীলা স্মরণ করিয়া যাঁহারা কৃষ্ণোপাসনা করেন তাঁহাদের কাছে বৃন্দাবন মহত্তম পুণ্যভূমি, নিত্যধামের আবির্ভাব। বৃন্দাবনের প্রতি ভক্তহৃদয়ের স্বতঃস্ফূর্ত আকর্ষণ সংগঠনের ভিত্তি হইতে পারে। এই কারণে রাধাকৃষ্ণের উপাসক সনকাদি সম্প্রদায় এবং বল্লভাচারী সম্প্রদায়ের প্রবর্তক নিম্বার্কাচার্য ও বল্লভাচার্য বৃন্দাবনে কেন্দ্র স্থাপন করিয়াছিলেন। নিম্বার্কের আবির্ভাবকাল দ্বাদশ শতক। বল্লভাচার্য (১৪৭৯-১৫৩২) চৈতন্যদেবের সমসাময়িক। নিম্বার্ক কর্ণাটক হইতে আসিয়া বৃন্দাবনে থাকিয়া যান। বল্লভাচার্য আন্ধ্র প্রদেশের লোক। বৃন্দাবনে কিছুদিন থাকিবার পর তিনি প্রয়াগের কাছে গিয়া বাস করেন। কিন্তু বৃন্দাবনে বল্লভাচারী

সম্প্রদায়ের খুব বড় ঘাঁটি ছিল। তীর্থাটন উপলক্ষে চৈতন্যদেব অল্প কিছুদিনের জন্য ব্রজমণ্ডলে গিয়া মথুরা বৃন্দাবনও দেখিয়া আসিয়াছিলেন। সনাতন ও রূপ বৃন্দাবনবাসী হইবার পর সেখানে গিয়া থাকিবার ইচ্ছা তাঁহার ছিল। কৃষ্ণদাস কবিরাজের লেখায় আছে চৈতন্যদেব বৃন্দাবনগামী জগদানন্দ পণ্ডিতের মুখে সনাতনকে বলিয়া পাঠান যে তিনি বৃন্দাবনে যাওয়া ঠিক করিয়াছেন, সনাতন যেন তাঁহার থাকার ব্যবস্থা করিয়া রাখেন (চৈ.চ. ৩।১৩)। বৃন্দাবনদাসের কাব্যে আছে চৈতন্যদেব নীলাচলে সনাতন ও রূপকে বলিয়াছিলেন আমিও বৃন্দাবনে যাইতে চাই, আমার জন্য বিরলে বাসস্থানের ব্যবস্থা করিয়া রাখিও (চৈ.ভা. ৩।১০)।

প্রেমভক্তি ধর্ম স্থাপনের জন্য চৈতন্যদেব দুইদিক দিয়া সংগঠন গড়িয়া তুলিবার ব্যবস্থা করিতেছিলেন। একদিকে বাঙ্গলায় প্রচারক্ষেত্র প্রস্তুত করা, অন্যদিকে বৃন্দাবন হইতে ভক্তিধর্মের স্বতন্ত্র তত্ত্ব প্রচারের আয়োজন। প্রথম উদ্দেশ্যে চৈতন্যদেব বাঙ্গলার বিভিন্ন স্থান ঘুরিয়া নিজে ভক্তি ও কীর্তন প্রচার করিয়াছিলেন এবং উপযুক্ত লোক দেখিয়া পর পর অনেকগুলি ঘাঁটি গড়িয়া দিয়াছিলেন। তাহার পর কর্মক্ষেত্রে নামাইয়াছিলেন নিত্যানন্দর মত প্রচারককে। শাস্ত্র ও রচনা ও প্রচারের উদ্দেশ্যে এক এক করিয়া লোক বাছিয়া নিলেন বৃন্দাবনের জন্য। সনাতন ও রূপ ছিলেন শাস্ত্রবিদ পণ্ডিত, কবিত্বশক্তি সম্পন্ন, পরম বৈষ্ণব এবং ব্যবহারিক জীবনে অভিজ্ঞ। সনাতন ও রূপ বৃন্দাবনে স্থায়ী বাস আরম্ভ করেন ১৫১৭ বা ১৫১৮ সালে। ক্রমে বৃন্দাবনে বাস করিতে আসেন সনাতন ও রূপের ছোট ভাই বল্লভের ছেলে শ্রীজীব, গোপালভট্ট, রঘুনাথ ভট্ট ও রঘুনাথ দাস। বৃন্দাবনের এই গোস্বামীরা চৈতন্যপন্থী ভক্তিধর্মের শাস্ত্রবেত্তা ও তত্ত্বসংস্থাপক। ইঁহাদের তাত্ত্বিক সিদ্ধান্ত ও শাস্ত্রীয় বিচারের জোরেই চৈতন্যপ্রবর্তিত সুনির্দিষ্ট ধর্মমতে পরিণত হয়। এই মত গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মের ভিত্তি। ছয় জন গোস্বামীর মধ্যে জীব কনিষ্ঠতম। একমাত্র তিনিই চৈতন্যদেবের সান্নিধ্য লাভ করেন নাই। আর সকলেই বৃন্দাবনে আগমন চৈতন্যদেবের কারকতায়। এই পাঁচজন ছাড়া আরও কয়েকজন চৈতন্যপরিকর বৃন্দাবনবাসী হইয়াছিলেন, যথা—লোকনাথ গোস্বামী, ভূগর্ভ পণ্ডিত ও কাশীশ্বর পণ্ডিত।

চৈতন্যপন্থী ভক্তিধর্মের আর একটা কেন্দ্র নীলাচল। এখানে চৈতন্যদেবের সঙ্গে ছিলেন রায় রামানন্দ, বাসুদেব সার্বভৌম, ও স্বরূপ দামোদরের মতো জ্ঞানীগুণী ব্যক্তি এবং হরিদাস ঠাকুর, গদাধর পণ্ডিত ও পরমানন্দ পুরীর মত মহদাশয় ভক্ত। ওড়িশার রাজা প্রতাপরুদ্র চৈতন্যদেবের অনুরাগী হইয়াছিলেন। রাজগুরু কাশী মিশ্র, দেবদাসীনিয়োগ শ্রেষ্ঠী লাবণ্য জগন্নাথ মন্দিরের লেখনাধিকারী শিখি

মাহিতি, তাঁহার ভগ্নী মাধবী দাসী এবং জগন্নাথ মন্দিরের মুখ্যসেবক এবং কহনাই খুণ্টিয়াও চৈতন্যভক্ত। ইঁহারা বাদে চৈতন্যদেবের ওড়িয়া ভক্তদের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য পঞ্চসখা নামে পরিচিত জগন্নাথ, বলরাম, অনন্ত, যশোবন্ত ও অনন্ত। ওড়িশার বহু বৌদ্ধ বৈষ্ণব ধর্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। পঞ্চসখা এই বৈষ্ণবদের প্রমুখ। পঞ্চসখা শাস্ত্রগ্রন্থ রচনা করিয়া বৈষ্ণবভাবে রূপান্তরিত বৌদ্ধ শূন্যতাবাদ মত স্থাপন করেন। পঞ্চসখার সঙ্গে চৈতন্যদেবের ঘনিষ্ঠতা ছিল। নীলাচলের কিছু প্রভাবশালী ব্যক্তি, যথা—জীবদেব গ্রহরাজ রাজগুরু, গোদাবর রাজগুরু চৈতন্যপ্রপত্তির বিরুদ্ধতা করিয়াছিলেন। চৈতন্যদেবের প্রভাব বৃদ্ধিতে অসন্তুষ্ট হইয়া গোদাবর রাজগুরু নীলাচল পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া যান (চৈতন্য কড়চা, পৃ. ২০, ২৫)। ইঁহাদের বিরোধিতা সত্ত্বেও স্বয়ং রাজা এবং রায় রামানন্দ, বাসুদেব সার্বভৌম, কাশী মিশ্রর মতো বিশিষ্ট ব্যক্তি ও পঞ্চসখার মতো সাধুসন্তদের সহায়তায় চৈতন্যদেব দীর্ঘদিন নীলাচলে বাস করিতে পারিয়াছিলেন। নীলাচলের কিছু প্রভাবশালী ব্যক্তি, যথা—জীবদেব গ্রহরাজ রাজগুরু ও গোদাবর রাজগুরু চৈতন্যপ্রপত্তির বিরুদ্ধতা করিয়াছিলেন। চৈতন্যদেবের প্রভাববৃদ্ধিতে অসন্তুষ্ট হইয়া গোদাবর রাজগুরু নীলাচল পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া যান (চৈতন্য কড়চা, পৃ. ২০, ২৫)। ইঁহাদের বিরুদ্ধতা সত্ত্বেও রাজা এবং রায় রামানন্দ, বাসুদেব সার্বভৌম ও কাশী মিশ্রর মতো প্রতিপত্তিশালী ব্যক্তিদের সহায়তায় চৈতন্যদেব স্বচ্ছন্দে দীর্ঘদিন নীলাচলে বাস করিয়াছিলেন। বাঙ্গলার বেশ কিছু চৈতন্যভক্তও নীলাচলে থাকিতেন (চৈ.ভা. ৩।৫; চৈ.চ. ১।১০)। সমুদ্রের ধারে সতাসনে বাঙ্গালী বৈষ্ণবদের পাড়া গড়িয়া উঠিয়াছিল। বাঙ্গলা হইতে ভক্তরা প্রত্যেক বছর দল বাঁধিয়া নীলাচলে আসিয়া চাতুর্মাস্য ব্রত (আষাঢ় শুক্লা দ্বাদশীতে আরম্ভ, কার্তিক শুক্লা দ্বাদশীতে উদ্‌যাপন) করিতেন। বাঙ্গলার ভক্তরা আসিলে কীর্তন খুব জমিয়া উঠিত। সেই সঙ্গে ভক্তিপ্রচারের বিষয়ে চৈতন্যদেবের সঙ্গে তাঁহাদের আলাপ আলোচনাও হইত। চৈতন্যদেব বৃন্দাবনের সঙ্গে নিয়মিত যোগ রাখিতেন। নীলাচল ও বৃন্দাবনের মধ্যে লোক যাতায়াত ও চিঠিপত্র চলিত। নীলাচলে চৈতন্যমণ্ডলীতে কাব্য ও সঙ্গীতচর্চার সঙ্গে আধিবিদ্যার বিচার এবং ভক্তিসিদ্ধান্তের আলোচনাও হইত। স্বরূপ দামোদর পঞ্চতত্ত্ব প্রচার করিয়াছিলেন নীলাচলে। চৈতন্যদেব এক দেহে কৃষ্ণ ও রাধার যুগল অবতার এই মতের পুষ্টি ও ব্যাপ্তি নীলাচলেই হইয়াছিল। স্বরূপ দামোদর ইহার মুখ্য প্রবক্তা। চৈতন্যপন্থী ভক্তিসিদ্ধান্তের আদি ব্যাখ্যাকার রায় রামানন্দ। বাঙ্গলার ভক্তি আন্দোলনে এই দুইজনের প্রভাব গভীর।

বাঙ্গলা, নীলাচল ও বৃন্দাবন এই তিন মিলিয়া চৈতন্যপন্থী ভক্তিধর্মের প্রচার ও সংগঠনের আয়োজন। ১৫১০ সালের গোড়া হইতে ১৫১৫ সালের মার্চ মাস পর্যন্ত চৈতন্যদেব নানাস্থানে ঘুরিয়াছেন। ইহার মধ্যে বাঙ্গলার ঘাঁটিগুলি তৈরী হইয়াছে আর বৃন্দাবনে কেন্দ্র স্থাপনের সূচনাও হইয়া গিয়াছে। বৃন্দাবনের আগে নীলাচলের কেন্দ্র সুপ্রতিষ্ঠিত। ১৫১৫ সালের মে মাসে চৈতন্যদেব বৃন্দাবন হইতে বাঙ্গলা হইয়া নীলাচলে ফিরিয়া আসিলেন। এই বছরের মাঝামাঝি চৈতন্যদেবের নির্দেশে নিত্যানন্দর প্রচার পরিক্রমণ শুরু হয়। চৈতন্যদেব সামাজিক ভেদনির্বিশেষে সর্বসাধারণের মধ্যে প্রেমভক্তি বিতরণের সংকল্প করিয়াছিলেন। সংকল্প সাধনের দায়িত্ব দিয়াছিলেন নিত্যানন্দকে। ১৫১৬-১৭ সালের মধ্যে রূপ ও সনাতন নীলাচলে চৈতন্যদেবের সঙ্গে কয়েক মাস কাটাইয়া বৃন্দাবনে স্থিতু হন ১৫১৭-১৮ সাল নাগাদ। বৃন্দাবন হইতে ফিরিবার পথে চৈতন্যদেব প্রয়াগে রূপের সঙ্গে এবং কাশীতে সনাতনের সঙ্গে ভগবৎস্বরূপভেদ ও ভক্তিতত্ত্ব বিষয়ে অনেক বিচার ও আলোচনা করিয়াছিলেন। রূপ ও সনাতন নীলাচলে আসিলে চৈতন্যদেবের সঙ্গে তাঁহাদের এইসব বিষয়ে আরও কিছু কথাবার্তা হয়। চৈতন্যদেবের উপদেশ ও নির্দেশ নিয়া তাঁহারা বৃন্দাবনে ফিরিয়া গেলেন। বৃন্দাবনে গিয়া সনাতন ও রূপ ভক্তিশাস্ত্র রচনা আরম্ভ করেন। ১৫১০ হইতে ১৫১৮ সালের মধ্যে চৈতন্যদেব প্রচার ও সংগঠনের প্রাথমিক আয়োজন সারিয়া ফেলিয়াছিলেন।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

নীলাচলে কীর্তনের সমারোহ

নীলাচলে থাকাকালীন, বিশেষতঃ শেষ আঠার বছর অর্থাৎ ১৫১৫ সালের মে মাস হইতে ১৫৩৩ সালের এপ্রিল বা জুন মাস পর্যন্ত, চৈতন্যদেবের জীবন ছিল 'শ্রীরাধাভাবমাধুর্য্যৈঃ পূর্ণ' (কড়চা, ৪।২৪।১) কৃষ্ণের সঙ্গে মিলনের আকাঙ্ক্ষায় তিনি ভাবোন্মত্ত হইয়া উঠিতেন, কৃষ্ণবিরহে হইতেন বিহ্বল; কিন্তু এই অবস্থাতেও দেখিতেছি কীর্তন তাঁহার প্রাত্যহিক কর্মসূচীর অপরিহার্য অঙ্গ। বৃন্দাবনদাস লিখিয়াছেন

…নীলাচলে করে প্রভু কীর্ত্তন বিহার ॥
নিরবধি নৃত্যগীত আনন্দ আবেশে।
রাত্রিদিন না জানেন প্রভু প্রেমরসে ॥
… … …
সর্ব্বরাত্রি সিন্ধুতীরে পরম বিরলে।
কীর্ত্তন করেন প্রভু মহাকুতুহলে ॥ (চৈ.ভা. ৩।৩)।

নীলাচলে চৈতন্যদেবের অন্তরঙ্গ গোষ্ঠীটি ছিল ছোট। আদিতে এই গোষ্ঠীতে ছিলেন গদাধর পণ্ডিত, হরিদাস ঠাকুর, পরমানন্দ পুরী, বাসুদেব সার্বভৌম, স্বরূপ দামোদর ও রায় রামানন্দ। পরে গোষ্ঠীটি আরও ছোট হইয়া যায়। বৃন্দাবনে তীর্থযাত্রা উপলক্ষ্যে চৈতন্যদেব যখন নীলাচলের বাহিরে ছিলেন সেই সময় রায় রামানন্দর মৃত্যু হয় (চৈতন্যচরিতামৃতম্, ২০।৩৬)। চৈতন্যদেবের বৃন্দাবনযাত্রার কিছু আগে বা বৃন্দাবন হইতে তাঁহার নীলাচল ফেরৎ আসার অল্প পরে বাসুদেব

সার্বভৌম নীলাচল ছাড়িয়া কাশীতে চলিয়া যান (চৈতন্যচরিতামৃতম্, ১৪।৪৯-৫৬)। চৈতন্যদেবের তিরোধান হইবার কিছুদিন আগে হরিদাস ঠাকুরের দেহান্ত হয় (চৈ.চ. ৩।১১)।

হরিদাস ঠাকুর ও গদাধর পণ্ডিত চৈতন্যদেবের নবদ্বীপ পর্যায়ের পরিকর। চৈতন্যদেব দক্ষিণ ভারত হইতে নীলাচলে ফিরিয়া আসিবার পর বাঙ্গলা হইতে যে ভক্তদল চৈতন্যদেবের সঙ্গে দেখা করিতে আসেন তাঁহাদের সঙ্গে হরিদাস ঠাকুর ফুলিয়া হইতে নীলাচলে চলিয়া আসেন। তিনি আর ফিরিয়া যান নাই। চৈতন্যদেব হরিদাস ঠাকুরকে খুব সম্মান ও সমাদর করিতেন এবং প্রায়ই তাঁহার কুটীরে গিয়া আলাপ করিতেন। গদাধর পণ্ডিত চৈতন্যদেবের সঙ্গে নীলাচলে আসিয়া ক্ষেত্র সন্ন্যাস নিয়াছিলেন। তিনি চমৎকার ভাগবতপাঠ করিতেন। এ জন্য তাঁহার সুনাম ছিল। চৈতন্যদেব প্রায়ই বিকালবেলা টোটা গোপীনাথে গদাধর পণ্ডিতের কাছে ভাগবত শুনিতে যাইতেন। পরমানন্দ পুরীর জন্ম ত্রিহুতে। তিনি ছিলেন চৈতন্যদেবের পরমগুরু মাধবেন্দ্র পুরীর শিষ্য। তিনি সন্ন্যাস নিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেন। চৈতন্যদেবের আগ্রহাতিশয্যে পরমানন্দ পুরী নীলাচলে আসিয়া বাস করেন। চৈতন্যদেব এই বয়োজ্যেষ্ঠ ভক্তিবাদী সাধকের সঙ্গ কামনা করিতেন (কড়চা, ৩।১৫।১৯-২৫)। নৈয়ায়িক ও বৈদান্তিক হিসাবে বাসুদেব সার্বভৌম বহুখ্যাত। বাঙ্গলা হইতে নীলাচলে আসিয়া তিনি ওড়িশার রাজা প্রতাপরুদ্রর সভাপণ্ডিত পদ লাভ করেন। সে কালের অনেক অদ্বৈতবাদীর মতো সার্বভৌম ছিলেন কৃষ্ণভক্ত। চৈতন্যদেব নীলাচলে আসিবার অব্যবহিত পরেই সার্বভৌমর সঙ্গে তাঁহার প্রগাঢ় স্নেহসম্বন্ধ স্থাপিত হয়। মায়াবাদ ও ভক্তিবাদ নিয়া চৈতন্যদেব ও সার্বভৌমর মধ্যে গভীর আলোচনা হইত (কড়চা, ৩।১২।১-২০, ৩।১৩।১-২৩ ; চৈ.চ. ২।৬)। স্বরূপ দামোদর সন্ন্যাসী। তাঁহার পূর্ব পরিচয় স্পষ্ট নয়। কৃষ্ণদাস কবিরাজ বলিয়াছেন যে পূর্বাশ্রমে স্বরূপ দামোদর নবদ্বীপের অধিবাসী ছিলেন। তখন তাঁহার নাম ছিল পুরুষোত্তম আচার্য। তিনি নবদ্বীপ হইতে কাশীতে গিয়া বেদান্ত পাঠ করেন। তাহার পর সন্ন্যাস নিয়া নীলাচলে চৈতন্যদেবের কাছে চলিয়া আসেন। নিত্যানন্দর মতো তিনিও সন্ন্যাসের সময় গুরুর কাছে যোগপট্ট নেন নাই বলিয়া স্বরূপ অভিধায় পরিচিত ছিলেন। চৈতন্যদেব দক্ষিণ ভারত হইতে ফিরিবার কিছুদিন পরে স্বরূপ দামোদর নীলাচলে আগমন করেন (চৈ.চ. ২।১০)। স্বরূপ দামোদর ছিলেন গুণী লোক। তিনি শাস্ত্রবিদ, রসজ্ঞ বোদ্ধা ও বড় গায়ক। রায় রামানন্দ গঞ্জামের অধিবাসী। ওড়িশার অন্যতম প্রতিপত্তিশালী রাজন্যবংশে তাঁহার জন্ম। রামানন্দর পিতা, ভ্রাতা এবং রামানন্দ

স্বয়ং অতিশয় উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারী ছিলেন। রায় রামানন্দর অন্য পরিচয় ছিল। ভক্ত বৈষ্ণব তো বটেই, তাহা ছাড়া রামানন্দ ছিলেন তত্ত্ববিদ, রসজ্ঞ বিদগ্ধজন, সঙ্গীতজ্ঞ, নৃত্য ও অভিনয়ে পারঙ্গম, উপরন্তু নাট্যকার। চৈতন্যদেব দাক্ষিণাত্য ভ্রমণের সময় গোদাবরী তীরে বিদ্যানগরে গিয়া রামানন্দর সঙ্গে ভক্তিসিদ্ধান্ত সম্পর্কে দীর্ঘ আলোচনা করেন। এই আলোচনার সূত্রে চৈতন্যদেবের সঙ্গে রামানন্দর গভীর সখ্যতা হয়। চৈতন্যদেবের সঙ্গে থাকিবার জন্য রায় রামানন্দ নীলাচলে চলিয়া আসেন। আমৃত্যু তিনি নীলাচলেই ছিলেন (চৈতন্যচরিতামৃতম্, ১৩।৩৫-৪৯, ৬০-৬১ ; চৈ.চ. ২।৮)।

নীলাচলে চৈতন্যদেব রায় রামানন্দ ও স্বরূপ দামোদরের সঙ্গে বসিয়া শাস্ত্রালোচনা এবং কাব্য ও সঙ্গীত আস্বাদন করিতেন।

চণ্ডীদাস বিদ্যাপতি রায়ের নাটক গীতি
কর্ণামৃত শ্রীগীতগোবিন্দ।
স্বরূপ রামানন্দ সনে মহাপ্রভু রাত্রিদিনে
গায় শুনে পরম আনন্দ॥ (চৈ.চ. ২।২)।

স্বরূপ দামোদরের সঙ্গে বসিয়া চৈতন্যদেব শাস্ত্র আলোচনা ও ব্যাখ্যাও করিতেন। ভাগবতের শ্লোকার্থ প্রসঙ্গে কৃষ্ণদাস বলিতেছেন।

এই সব অর্থ প্রভু স্বরূপের সনে।
রাত্রিদিন ঘরে বসি করে আস্বাদনে॥ (চৈ.চ. ২।১৩)।

অন্তরঙ্গ পরিকরদের সঙ্গে চৈতন্যদেব একান্তে শাস্ত্র ও সঙ্গীতচর্চা করিতেন। প্রকাশ্য কীর্তনের সময় অন্য ভক্তরাও আসিয়া জুটিত। নরহরি সরকারের লেখা একটা পদে আছে যে চৈতন্যদেব

সকল ভকত সঙ্গে সঙ্কীর্ত্তন মহারঙ্গে
বিহার করয়ে সিন্ধুতীরে।
স্বরূপ রূপ রামানন্দ গোবিন্দ পরমানন্দ
মিলিলা সকল সহচরে॥ (প.ক. পদসংখ্যা ২২৪১)

বাসু ঘোষের সাক্ষ্যে দেখা যাইতেছে কৃষ্ণাবেশে বিভোর চৈতন্যদেবকে ঘিরিয়া ভক্তরা কীর্তন করিতেছেন।

সিংহদ্বার ত্যাজি গোরা সমুদ্র আড়ে ধায়।
কোথা কৃষ্ণ কোথা কৃষ্ণ সভারে সুধায়॥

চৌদিকে ভকতগণ হরিগুণ গায়।
মাঝে কনয়াগিরি ধুলায় লোটায় ॥
(বাসু ঘোষের পদাবলী পদসংখ্যা, ১৪৫)

পঞ্চসখার অন্যতম অচ্যুতানন্দ "শূন্যসংহিতা" গ্রন্থে নীলাচলে ভক্তসঙ্গে চৈতন্যদেবের কীর্তন বর্ণনা করিয়া বলিতেছেন

বৈষ্ণবমণ্ডলী খোলকরতাল বজাই বোলন্ত হরি।
চৈতন্য ঠাকুর মহানৃত্যকার দণ্ডকমণ্ডুলুধারী ॥
অনন্ত অচ্যুত ঘেনি যশোবন্ত বলরাম জগন্নাথ।
এ পঞ্চ সখাহিঁ নৃত্য করি গলে গৌরচন্দ্র সঙ্গত ॥
(শূন্য সংহিতা, ১ অধ্যায়)

চৈতন্যদেব দক্ষিণ ভারত হইতে ফিরিয়া আসেন ১৫১২ সালের শরৎকালে। পরের বছর, ১৫১৩ সালে, বাঙ্গলায় ভক্তরা রথের আগে চৈতন্যদেবের সঙ্গে দেখা করিতে নীলাচলে আগমন করিলেন। চৈতন্যদেব তাঁহাদের প্রত্যেক বছর রথের সময় নীলাচলে আসিতে নির্দেশ দেন (চৈ.ভা. ৩।৯ ; চৈ.চ, ২।৯)। ১৫১৪ সালে চৈতন্যদেব বাঙ্গলা হইতে নীলাচল ফিরিয়া আসেন রথযাত্রার মাসখানেক আগে। সে বছর বাঙ্গলার ভক্তরা নীলাচল যান নাই। পরে একবার চৈতন্যদেব বাঙ্গলার ভক্তদের আসিতে নিষেধ করিয়াছিলেন। সে বছর বোধহয় তাঁহার বাঙ্গলায় যাইবার ইচ্ছা ছিল। এই দুইবার ছাড়া ১৫১৩ হইতে ১৫৩৩ সাল পর্যন্ত বাঙ্গলার ভক্তরা প্রতি বছর নীলাচল আসিতেন এবং সেখানে চাতুর্মাস্য ব্রত উপলক্ষে অর্থাৎ চার মাস যাপন করিতেন। রথযাত্রা দেখাও হইত আবার চৈতন্যদেবের সান্নিধ্য লাভও হইত।

বাঙ্গলা হইতে ভক্তরা আসিলে কীর্তনের সমারোহ খুব বাড়িয়া যাইত। ভক্তরা অনেকেই ছিলেন গীতবাদ্যনৃত্য বিশারদ এবং কীর্তনপ্রৌঢ়। বাঙ্গলার ভক্তরা প্রথমবার নীলাচলে আসিলে চৈতন্যদেব একদিন সন্ধ্যাবেলা কীর্তনীয়াদের চারটি সম্প্রদায়ে ভাগ করিয়া জগন্নাথ মন্দিরে কীর্তন করিয়াছিলেন। প্রতিটি সম্প্রদায় ছিল দুইটি করিয়া মৃদঙ্গ এবং আটটি করিয়া করতাল। সবশুদ্ধ আট মৃদঙ্গ এবং বত্রিশ করতাল বাজান হইয়াছিল। জগন্নাথ মন্দির বেড়িয়া কীর্তন করা হইল। চৈতন্যদেব স্বয়ং কীর্তন করিতে করিতে মন্দির প্রদক্ষিণ করিতে লাগিলেন আর তাঁহার আগে পাছে চার সম্প্রদায়ের গান হইতে লাগিল। এই ঘটনার বর্ণনায় কৃষ্ণদাস কবিরাজ বলিয়াছেন চৈতন্যদেব মন্দিরে বেড়া নৃত্য করিলেন অর্থাৎ কি না মন্দিরের চারিদিক বেড়িয়া নৃত্য করিলেন (চৈ.চ. ২।১১)।

ভক্তদের নিয়া দল গাড়িয়া কীর্তন করিবার কথা মুরারি গুপ্তর কাব্যেও আছে।

এবং জগৌ রাগবশান্নীলাচলে
শ্রীকৃষ্ণসঙ্কীর্তনপূর্ণমানসঃ।
স্বরূপমুখৈর্গদাধরাদ্যৈঃ
সমং ননর্ত্ত স হি নামকৌতুকী॥ (কড়চা, ৪।১।১)।

[শ্রীকৃষ্ণ সঙ্কীর্তনে পরিপূর্ণমানস সেই নামকীর্তনকুতূহলী (চৈতন্যদেব) কৃষ্ণের প্রতি অনুরাগবশতঃ নীলাচলে স্বরূপ যাহার প্রধান (সেই দল এবং) গদাধরাদিসহ নৃত্য করিয়াছিলেন।]

রথযাত্রায় জগন্নাথ মন্দির হইতে জগন্নাথ, বলরাম ও সুভদ্রা বিগহ রথে চাপাইয়া গুণ্ডিচাবাড়ীতে নিয়া যাওয়া হয়। সাতদিন পর উল্টোরথে বিগ্রহ আবার মূল মন্দিরে ফিরিয়া আসেন। এই সাতদিন ছাড়া গুণ্ডিচাবাড়ী অন্য সময় খালি পড়িয়া থাকে। তাই রথের আগে গুণ্ডিচাবাড়ী পরিষ্কার করিয়া নিতে হয়। জগন্নাথ মন্দিরে বেড়া কীর্তনের পর চৈতন্যদেব ভক্তদের নিয়া গুণ্ডিচাবাড়ী ধুইয়া মুছিয়া সাফ করিলেন। কাজ শেষ হইলে একটু বিশ্রামের পর চৈতন্যদেব গুণ্ডিচা-বাড়ীতে ভক্তদের সঙ্গে নৃত্যগীত শুরু করিলেন। কখনও সকলে একসঙ্গে, কখনও চৈতন্যদেবকে ছাড়াই, কখনও বা নৃত্যপর চৈতন্যদেবকে ঘিরিয়া ভক্তগণ নৃত্য-সহযোগে সংকীর্তন করিলেন (চৈতন্যচরিতামৃতম্, ১৫।৫৯-৬৩)।

চারিদিকে ভক্তগণ করেন কীর্ত্তন।
মহা নৃত্য করে প্রভু মত্ত সিংহ সম॥
... ...
স্বরূপের উচ্চগান প্রভু সদা ভায়।
আনন্দে উদ্দণ্ড নৃত্য করে গৌররায়॥ (চৈ.চ. ২।১২)।

জগন্নাথ মন্দিরে চার সম্প্রদায় নিয়া কীর্তন ও গুণ্ডিচাবাড়ীতে কীর্তন আসলে মহলা দেওয়ার ব্যাপার। চৈতন্যদেব রথযাত্রার দিন বিরাট কীর্তনসমারোহের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। গুণ্ডিচাযাত্রায় বলরাম, সুভদ্রা ও জগন্নাথের চলমান রথের সঙ্গে সঙ্গে কীর্তন হইবে। ইহাই রথাগ্রে কীর্তন বলিয়া পরিচিত। রথাগ্রে কীর্তনের বিবরণ আছে কবিকর্ণপুরের 'চৈতন্যচরিতামৃতম্' (১৫।১০২-১১০, ১৬।১-৪৯) এবং কৃষ্ণদাস কবিরাজের 'চৈতন্যচরিতামৃত' কাব্যে (২।১৩)। দুইজনের দুই বিবরণ স্বভাবতই আলাদা, তবে মৌলিক বৈসাদৃশ্য নাই। কবিকর্ণপুরের বিবরণ সংক্ষিপ্ত, কৃষ্ণদাস বলিয়াছেন বিস্তারিতভাবে। তাই 'চৈতন্যচরিতামৃত' হইতে রথাগ্রে কীর্তনের

বিবরণ দিতেছি। রথাগ্রে কীর্তন করিবার জন্য চৈতন্যদেব কীর্তনীয়াদের সাতটি দল বা সম্প্রদায়ে ভাগ করিয়াছিলেন। প্রত্যেক সম্প্রদায়ে একজন প্রধান গায়ক, একজন নর্তক, দুইজন মৃদঙ্গ বাদক ও পাঁচজন পালি গায়েন বা দোহার। মুখ্য চার সম্প্রদায়ের মূল গায়েন ছিলেন স্বরূপ দামোদর, শ্রীবাস পণ্ডিত, মুকুন্দ দত্ত ও গোবিন্দ ঘোষ। ইঁহাদের সঙ্গে নর্তক ছিলেন যথাক্রমে অদ্বৈত আচার্য, নিত্যানন্দ, হরিদাস (হরিদাস ঠাকুর ছাড়া দ্বিজ, বড় ও ছোট অভিধায় পরিচিত তিনজন হরিদাসের অন্যতম) ও বক্রেশ্বর পণ্ডিত। স্বরূপের পাঁচজন পালি গায়ক দামোদর আচার্য, গোবিন্দ দত্ত, রাঘব পণ্ডিত গোবিন্দানন্দ ঠাকুর ও নারায়ণ (গুপ্ত বা পণ্ডিত)। শ্রীবাসের সঙ্গে পালি গায়ক ছিলেন গঙ্গাদাস পণ্ডিত, শ্রীমান পণ্ডিত, শ্রীরাম পণ্ডিত, শুভানন্দ দ্বিজ ও হরিদাস। মুকুন্দর সঙ্গে শ্রীকান্ত সেন, বল্লভ সেন, হরিদাস ঠাকুর এবং আর দুইজন। মাধব ঘোষ, বাসু ঘোষ, রাঘব, (গোস্বামী ?), বিষ্ণুদাস (কবিন্দ্র বলিয়া খ্যাত) ও হরিদাস ছিলেন গোবিন্দ ঘোষের পালি গায়েন। অন্য তিন সম্প্রদায় কুলীনগ্রাম, শান্তিপুর ও শ্রীখণ্ডের। এই তিন সম্প্রদায়ের গায়করা অজ্ঞাত পরিচয়, শুধু নর্তকদের নাম পাওয়া যাইতেছে। কুলীনগ্রাম ও শান্তিপুরের নর্তক যথাক্রমে রামানন্দ বসু ও অদ্বৈতপুত্র অচ্যুতানন্দ। শ্রীখণ্ডের নর্তক দুইজন, নরহরি সরকার ও তাঁহার ভাইপো রঘুনন্দন। কীর্তন শুরু করিবার আগে চৈতন্যদেব নিজ হাতে কীর্তনীয়াদের মালা ও চন্দন দিয়া ভূষিত করিলেন। তাহার পর জগন্নাথের রথ ঘিরিয়া কীর্তন শুরু হইল।

জগন্নাথ আগে চারি সম্প্রদায় গায়।
দুইপাশে দুই পাছে এক সব সম্প্রদায় ॥
... ...
ত্রিভুবন ভরি উঠে কীর্ত্তনের ধ্বনি।
অন্য বাদ্যাদির ধ্বনি কিছুই না শুনি ॥
সাত ঠাঞি বুলে প্রভু হরি হরি বুলি।
জয় জগন্নাথ বলে হস্তযুগ তুলি ॥ (চৈ.চ. ২।১৩)

এইভাবে কিছুক্ষণ কীর্তন হইবার পর চৈতন্যদেব নিজেই নাচিবেন বলিয়া স্থির করিলেন। সাত সম্প্রদায় একত্র করিয়া তিনি উদ্দণ্ড নৃত্য আরম্ভ করিলেন। চৈতন্যদেবের আদেশে স্বরূপ দামোদর বাছাই করা নয়জন গায়ক নিয়া নৃত্যপর চৈতন্যদেবের সঙ্গে গাহিয়া চলিলেন। এই নয়জন গায়ক শ্রীবাস পণ্ডিত, শ্রীরাম পণ্ডিত, রাঘব পণ্ডিত, গোবিন্দ দত্ত, মুকুন্দ দত্ত, (ছোট) হরিদাস, গোবিন্দ ঘোষ,

মাধব ঘোষ ও গোবিন্দানন্দ। অন্যরা চারপাশ ঘিরিয়া গাহিতে লাগিলেন। চৈতন্যদেব তাণ্ডব নৃত্যের সঙ্গে জগন্নাথের স্তোত্রপাঠ করিতেছিলেন। নৃত্যরত চৈতন্যদেব ভাবাবেশে মাটিতে পড়িয়া যাইতেছিলেন। তাঁহাকে দেখিবার জন্য যাত্রীরা আগাইয়া আসিতে থাকিলে চাপ আটকাইবার জন্য নিত্যানন্দ আগলাইয়া দাঁড়াইলেন। তাঁহাকে ঘিরিয়া আর কয়েকজন ভক্ত। ওড়িষার রাজা প্রতাপরুদ্র স্বয়ং পাত্রদের নিয়া দ্বিতীয় মণ্ডল রচনা করিলেন।

কিছুক্ষণ তাণ্ডব নৃত্য করিবার পর চৈতন্যদেব স্বরূপ দামোদরকে একা গান করিতে আদেশ দিলেন। চৈতন্যদেবের মনোভাব বুঝিয়া স্বরূপ দামোদর এই ধুয়াটি গাহিলেন। ধুয়াটি বোধ হয় কোন পদের অংশ বিশেষ।

সেই ত পরাণনাথ পাইলুঁ
যাহা লাগি মদনমোহন ঝুরি গেলুঁ ॥

স্বরূপ দামোদর উচ্চৈস্বরে এই পদ গাহিতে থাকিলে চৈতন্যদেব মধুর নৃত্য করিতে লাগিলেন। মধুর নৃত্য করিয়া রথের সঙ্গে যাইতে যাইতে চৈতন্যদেবের ভাবান্তর হইল। তখন তিনি হাত তুলিয়া শীলা ভট্টারিকা রচিত এই অনবদ্য শ্লোকটি বার বার আবৃত্তি করিতে লাগিলেন।

যঃ কৌমারহরঃ স এব হি বরস্তা এব চৈত্রক্ষপা
স্তে চোন্মীলিতমালতীসুরভয়ঃ প্রৌঢ়া-কদম্বানিলাঃ।
সা চৈবাস্মি তথাপি তত্র সুরতব্যাপারলীলাবিধৌ
রেবারোধসি বেতসীতরুতলে চেতঃ সমুৎকণ্ঠতে ॥

[(এক নায়িকা কুমারীকালে যে নায়কের সঙ্গে গোপনে বিহার করিয়াছিলেন, পরে সেই প্রেমাস্পদের সঙ্গে বিবাহিতা হইয়া বলিতেছেন) যিনি আমার কুমারীত্ব হরণ করিয়াছিলেন সেই স্বামীও রহিয়াছেন, সেই চৈত্ররাত্রি এবং উন্মীলিত মালতী পুষ্পসুরভিত বায়ুও প্রবাহিত হইতেছে, সেই আমিও আছি, তথাপি রেবাতটে বেতসী তরুতলে (পূর্বের সেই) সুরতলীলার জন্য আমার মন উৎকণ্ঠিত হইতেছে]

ভাগবতের দশম স্কন্ধ হইতে কয়েকটি শ্লোক এবং বাসুদেব সার্বভৌম-রচিত একটি শ্লোকও চৈতন্যদেব পাঠ করিয়াছিলেন। কাব্যপ্রিয় তিনি নৃত্যগীতের সঙ্গে শ্লোক পাঠ করিয়া জগন্নাথের আরাধনা করিতেন। বাসুদেব সার্বভৌম-রচিত শ্লোকটি রূপ গোস্বামীর সংকলন করা 'পদ্যাবলীতে' ধৃত হইয়াছে। শ্লোকটি উদ্ধৃত করিতেছি।

নাহং বিপ্রো ন চ নরপতির্নাপি বৈশ্যো ন শূদ্রো
নো বা বর্ণী ন চ গৃহপতির্নো বনস্থো যতির্বা।
কিন্তু প্রদ্যান্নিখিলপরমানন্দপূর্ণামৃতাব্ধে
গোপীভর্ত্তুঃ পদকমলয়োর্দাসদাসানুদাসঃ।

[ব্রাহ্মণ, রাজা, বৈশ্য, শূদ্র, চিত্রকর, গৃহস্বামী অথবা বনবাসী সন্ন্যাসী আমি ইহার কিছুই নহি, কিন্তু সমুচ্ছলিত পরমানন্দের সুখসাগর গোপীবল্লভের পাদপদ্ম-যুগলের (আমি) দাসানুদাস]

বড় দেউল হইতে গুণ্ডিচাবাড়ী পর্যন্ত জগন্নাথ, বলরাম ও সুভদ্রার রথের সামনে চৈতন্যদেব ভক্তবৃন্দসহ নৃত্য, গীত, কাব্যপাঠ ও ভাববিহ্বলতা প্রকাশ করিতে করিতে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। চৈতন্যদেবের বোধ হয় নৃত্যভঙ্গীতেই অনেকটা ভাবপ্রকাশ করিয়াছিলেন। এই শ্লোকটিতে তাহার ইঙ্গিত আছে।

ইতি নটনকলাদৌ শ্রীলবৃন্দাবনেন্দোঃ
পরমমহিমবস্তুং নির্ভরার্ত্তো নিরূপ্য।
অতিশয়করুণার্দ্রঃ প্রেমভক্তিং বিতন্ব-
-ন্নয়মতিমধুরঙ্গো হর্ষপূর্ণো বভুব ॥ (চৈতন্যচরিতামৃতম্, ১৬।৫)

[এইভাবে (চৈতন্যদেব) অতিশয় করুণার্দ্র হইয়া নৃত্যকৌশলের মধ্যে শ্রীলবৃন্দাবনচন্দ্রের পরমমহিমা অতীব মর্মপীড়িতচিত্তে নিরূপণ করিয়া প্রেমভক্তি বিস্তার করিলেন (এবং সেই কারণে) তাঁহার অঙ্গসমূহ মধুর হইল এবং (হৃদয়) গভীর হর্ষে পরিপূর্ণ হইল]

কবিকর্ণপূর নীলাচলে রথাগ্রে কীর্তন দেখিয়াছিলেন। বৃন্দাবনবাসী কৃষ্ণদাস কবিরাজ সনাতন, রূপ, রঘুনাথদাস, কাশীশ্বর পণ্ডিত প্রমুখ প্রত্যক্ষদর্শীদের সঙ্গ অনেকদিন লাভ করিয়াছেন। কবিকর্ণপূর হইতে একটু বিশদভাবে তিনি বলিতেছেন

প্রভুর শরীর যেন শুদ্ধ হেমাচল।
ভাব পুষ্পদ্রুম তাহে পুষ্পিত সকল ॥
দেখিতে লোকের আকর্ষয়ে চিত্তমন।
প্রেমামৃত বৃষ্ট্যে প্রভু সিঞ্চে সবার মন ॥
জগন্নাথ সেবক যত রাজপাত্রগণ।
যাত্রিক লোক নীলাচলবাসী যতজন ॥
প্রভুর নৃত্যে প্রেম দেখি হয় চমৎকার।...

(চৈ.চ. ২।১৩)

গুণ্ডিচা মার্জন উপলক্ষে কীর্তন ও সাত সম্প্রদায় নিয়া রথাগ্রে কীর্তন পরেও কয়েকবার হইয়াছিল বলিয়া জানা যায় (চৈ.চ. ৩।৭, ৩।১০)। বোধহয় প্রতি বছরই হইত। একবার এই সাত সম্প্রদায় নিয়া চৈতন্যদেব জগন্নাথ মন্দিরে প্রভাতী কীর্তন করিয়াছিলেন। এবারও মন্দির ঘিরিয়া বেড়া কীর্তন হইয়াছিল। খানিকক্ষণ কীর্তন চলিবার পর চৈতন্যদেব নিজে নৃত্য আরম্ভ করিলেন। তাঁহাকে ঘিরিয়া চলিল সাত সম্প্রদায়ের গীতবাদ্য। নাচিতে নাচিতে চৈতন্যদেবের মনে পড়িল সুন্দর একটি ওড়িয়া পদ। পদটি মাধবী দাসীর রচনা। মনে পড়িতেই চৈতন্যদেব স্বরূপ দামোদরকে পদটি গাহিতে বলিলেন। তাঁহার কথায় স্বরূপ দামোদর পদটি গাহিলেন।

জগমোহন পরিমুণ্ডে যাই ॥
মন মাতিলারে কলা চন্দ্রমা চাহিং ॥
হেরিলু বিধুবদন গোপীহৃদয় চন্দন।
তার অঙ্গে জড়ি যিবি কাল কালকু মুঁহি।
মন মাতিলারে কলা চন্দ্রমা চাহিং ॥
সুনহে রসিকবর হে নট নাগরবর নব কৈশোর কর।
মধুর ছন্দা পয়র নাম তোর সদা মুখে রখ গোঁসাই।
মন মাতিলারে কলা চন্দ্রমা চাহিং।
মুঁতি প্রেমের চকোর তুমে প্রেমী সুধাকর।
প্রেমাস্পদ মো প্রেমর মহাভাব মো ভাবর।
যুগে যুগে থীবা নাথ একক হোই।
মন মাতিলারে কলা চন্দ্রমা চাহিং ॥

[জগমোহনের অন্তভাগে যাই। কালোবরণ চন্দ্র দেখিয়া মন আমার মাতিয়া গেল। (যিনি) চন্দ্রমুখী গোপীদের হৃদয়চন্দন হরণ করিয়াছেন তাঁহার অঙ্গে যুগ যুগ ধরিয়া জড়াইয়া থাকিব। কালোবরণ চন্দ্র দেখিয়া মন আমার মাতিয়া গেল। হে নট নাগরবর, নব কৈশোরের উজ্জল প্রতিমা, চরণে (যাঁর) মধুর ছন্দ, প্রভু হে ! শোন, তোমার নাম সর্বদা আমার মুখে (থাকুক), আমাকে রক্ষা কর। কালোবরণ চন্দ্র দেখিয়া মন আমার মাতিয়া গেল। আমি তোমার প্রেমের চকোর, তুমি প্রেমী সুধাকর ! প্রেমাস্পদ আমার ! (তুমি) আমায় চিত্তে প্রেমের মহাভাব-স্বরূপ। যুগে যুগে (আমি তোমার) সঙ্গে মিলিত হইয়া একাঙ্গ হইয়া থাকিব। কালবরণ চন্দ্র দেখিয়া মন আমার মাতিয়া গেল।]

নবদ্বীপের নগর কীর্তনের মত। নীলাচলে জগন্নাথ মন্দিরে প্রভাতী ও সান্ধ্য বেড়া কীর্তন এবং রথাগ্রে কীর্তন সংগঠিত কীর্তন। বিশেষ উদ্দেশ্যে ভাবনাচিন্তা করিয়া দল গড়িয়া কীর্তন গাওয়া হইয়াছিল। প্রত্যেক দলে মূল গায়েনের সঙ্গে নর্তক, বাদক ও পালি গায়েন। নবদ্বীপেও দল করিয়া কীর্তন হইত। তবে সে দল শুধু মূল গায়েন ও কয়েকজন পালি গায়েন অথবা একজন নর্তক ও কয়েকজন গায়ক নিয়া গঠিত। নবদ্বীপ পর্বে চৈতন্যমণ্ডলীতে কীর্তনের দল অসম্পূর্ণ। দল গঠন সম্পর্কে ভাবনা পরিণত হইয়াছে নীলাচলে। এই প্রসঙ্গে বাজনার কথাও বলিতে হয়। নবদ্বীপপর্বের কীর্তনে খুব জোর শব্দ করিয়া নানাপ্রকার বাদ্য বাজান হইত। বাদ্য বলিতে মৃদঙ্গ, করতাল, মন্দিরা, শঙ্খ, ঘণ্টা, এমন কি ঢাক পর্যন্ত। 'সঙ্কর্ত্তন সঙ্গে ধ্বনি বাজয়ে বিশাল' (চৈ.ভা. ৩।৪)। উদণ্ড কীর্তনের সঙ্গে বাদ্যভাণ্ডের প্রবল শব্দ হয়ত বেমানান হইত না। নীলাচলের বেড়া কীর্তন ও রথাগ্রে কীর্তনে চৈতন্যদেব উদ্দণ্ড নৃত্য করিতেন বটে, কিন্তু মৃদঙ্গ ও করতাল ছাড়া আর কোন বাদ্য দেখা যাইতেছে না। প্রবল বাদ্যে সঙ্গীত ও নৃত্যে রসহানি ঘটায়। সংযত ও সুশৃঙ্খলভাবে কীর্তন করিবার জন্যই বোধ হয় শঙ্খ ঘণ্টা প্রভৃতি বাদ দেওয়া হইয়াছিল। বাঙ্গলা হইতে আগত ভক্তদের নিয়া চৈতন্যদেব নীলাচলে সংগঠিত কীর্তনের ধারা প্রতিষ্ঠা করিলেন। সংগঠিত কীর্তনের এই ধারা বাঙ্গলায় খুব চালু হইয়াছিল। চৈতন্য-পরিকরদের ভক্তিপ্রচারে ইহাই বাহনস্বরূপ।

কীর্তনপ্রসঙ্গে নামগুণযশোগানের সঙ্গে পদগানের উল্লেখ বার বার পাওয়া যাইতেছে। নবদ্বীপে নগরকীর্তনের বিবরণে পদগানের কথা আছে। ইহা আকস্মিক ঘটনা নয়। নবদ্বীপপর্বে চৈতন্যপরিকরগণ পদগান করিতেন। সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া নীলাচলে যাইবার পথে চৈতন্যদেব নিত্যানন্দসহ শান্তিপুরে অদ্বৈত আচার্যের বাড়ীতে আসিয়াছিলেন. আচার্যগৃহে হরিদাস ঠাকুর ও মুকুন্দ দত্ত উপস্থিত ছিলেন। সন্ধ্যাবেলা নৃত্যগীত শুরু হইল। প্রথমে নাচ আরম্ভ করেন অদ্বৈত। তাঁহার সঙ্গে যোগ দিলেন হরিদাস ঠাকুর। নাচের সঙ্গে বিদ্যাপতির লেখা একটি পদ গাওয়া হইল। কৃষ্ণদাস কবিরাজ এই ঘটনার যে বিবরণ দিয়াছেন তাহাতে সংশ্লিষ্ট পদটি হইতে এই একটি কলি উদ্ধৃত করা আছে

কি কহিব রে সখি আনন্দ ওর।
চিরদিন মাধব মন্দিরে মোর॥

পদগান শুনিয়া চৈতন্যদেবের মনে কৃষ্ণপ্রেমের উৎকণ্ঠা বাড়িয়া গেল দেখিয়া মুকুন্দ দত্ত 'ভাবের সদৃশ পদ লাগিল গাইতে।' মুকুন্দ অতিশয় সুকণ্ঠ গায়ক।

নবদ্বীপে তিনিই ছিলেন চৈতন্যমণ্ডলীর সবচেয়ে বড় গায়েন। মুকুন্দের গান শুনিয়া চৈতন্যদেব ভাবাবেশে মাটিতে পড়িয়া গেলেন। তাঁহার শ্বাসপ্রশ্বাস বন্ধ হইয়া গেল। তারপর আচম্বিতে উঠিয়া 'বোল' 'বোল' বলিয়া নাচিতে শুরু করিলেন। মুকুন্দ গাহিয়াছিলেন

হা হা প্রিয় সখি কি না হৈল মোরে।
কানু প্রেমবিষে মোর তনু মন জারে ॥
রাত্রি দিন পোড়ে মন সোয়াস্তি না পাঙ।
যাহাঁ গেলে কানু পাঙ তাঁহা উড়ি যাঙ ॥

(উপর্যুক্ত বিবরণের জন্য দ্রষ্টব্য চৈ.চ. ২।৩)

পদটির রচয়িতা অজানা। তবে খগেন্দ্রনাথ মিত্র অনুমান করেন ইহা চণ্ডী-দাসের রচনা (খগেন্দ্রনাথ মিত্র ১৩৫৩ : ৮৪)।

নীলাচলপর্বে পদগানের দৃষ্টান্ত বেশী। কৃষ্ণদাস কবিরাজ বলিতেছেন নীলাচলে চৈতন্যদেব বিদগ্ধ রসিক ভক্তদের সঙ্গে একান্তে চণ্ডীদাস ও বিদ্যাপতির রচনা এবং গীতগোবিন্দ গান আস্বাদ করিতেন। নীলাচলে চৈতন্যদেব থাকিতেন কাশী মিশ্রের তোটায় (ওড়িয়া ভাষায় তোটা মানে বাগান বা গাছপালাযুক্ত স্থান) অবস্থিত একটি ঘরে। সম্ভবতঃ এখানেই চৈতন্যদেব রায় রামানন্দ ও স্বরূপ দামোদরের সঙ্গে বসিয়া পদগান করিতেন এবং তাঁহাদের মুখে গান শুনিতেন। এই পদগান বৈঠকীগান হওয়া সম্ভব। কবিকর্ণপূরের কাব্যে আছে যে রথাগ্রে কীর্তনের পর চৈতন্যদেব বাসুদেব দত্ত ও বক্রেশ্বর পণ্ডিতের সঙ্গে একান্তে নৃত্যগীত করিয়াছিলেন। চৈতন্যদেব মৃদুস্বরে গান করিবার পর বাসুদেব দত্ত পদগান করেন (চৈতন্যচরিতামৃতম্, ১৭।২৮-৩৫)। একান্তে এই পদগানও সম্ভবতঃ বৈঠকী গান। অদ্বৈত আচার্যের বাড়ীতে মুকুন্দ দত্ত বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাসের (?) যে দুইটি পদ গান করিয়াছিলেন তাহাও অল্প কয়েকজনের সমক্ষে হইয়াছিল। বাঙ্গলায় পদগানের ঐতিহ্য বেশ পুরানো। গুহ্য সম্প্রদায়সমূহে পদগানের রেওয়াজ ছিল। সে গান কতটা বৈঠকী ধাঁচে গাওয়া হইত তাহা বলিবার উপায় নাই। তবে সাধারণতঃ পদগান বৈঠকী গান হইবার কথা। দ্বাদশ শতকে রচিত 'গীতগোবিন্দ'র মধুরকোমলকান্ত পদাবলী গান বরাবরই প্রবন্ধসঙ্গীত, রাজসভায় বা মন্দিরে বৈঠকী গান হিসাবে গাওয়াই বরাবরের প্রথা। গীতগোবিন্দগান পদগানের আদর্শস্বরূপ। অন্যান্য পদও এই আদর্শ অনুসারে গাওয়া হইত ইহাই সম্ভব। চৈতন্যপরবর্তী পদাবলী কীর্তনে গীতগোবিন্দ গানের গভীর প্রভাব দেখা যায়। স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ এই

বিষয়ে বিশদ আলোচনা করিয়াছেন (প্রজ্ঞানানন্দ ১৯৭০ ঃ ৮২-৮৮, ১২০-১৩৪, ১৯৮-২০৭)।

নীলাচলে বহুলোকের সমক্ষে প্রকাশ্য কীর্তনে পদগান হইত। জগন্নাথ মন্দিরে প্রভাতী ও সান্ধ্য বেড়া কীর্তনে ও রথাগ্রে কীর্তনে উদ্দণ্ড কীর্তনের সঙ্গে পদগানও করা হইয়াছিল। ইহা বৈঠকী গান হইতে পারে না। একটু আগে নীলাচলে চৈতন্যদেবের কীর্তনে বাদ্যসংযমের কথা উল্লেখ করিয়াছি। উদ্দণ্ড কীর্তনে প্রবল বাদ্যধ্বনি ও উচ্চকণ্ঠে গান হয়। গায়করা খুব জোরে নাচিতে থাকে। বাজনা একটু মৃদু ও শৃঙ্খলাবদ্ধ হইবার ফলে উদ্দণ্ড কীর্তন খানিকটা সংযত হইয়া থাকিতে পারে। ইহার উপর মাঝে মধ্যে পদগান হওয়াতে প্রকাশ্য কীর্তনের চরিত্র বদলাইয়া গিয়াছিল। প্রকাশ্য কীর্তনে পদগানের যে রীতি চৈতন্যদেব প্রবর্তন করিলেন পরবর্তী সময়ে লীলাকীর্তন গানে তাহার অভিনব বিকাশ হইয়াছিল। লীলাকীর্তন পদগান, গাওয়া হইত খোলা আসরে।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

চৈতন্যকীর্তন

চৈতন্যভাবকদের দৃষ্টিতে চৈতন্যদেব স্বয়ং পরমেশ্বর। ভক্তরা তাঁহার বিগ্রহ গড়িয়া পূজা শুরু করেন। চৈতন্যদেবের জীবদ্দশাতেই তাঁহার পূজা প্রচলিত হইয়াছিল। শিবানন্দ সেন দশাক্ষর গৌরগোপাল মন্ত্র অবলম্বন করিয়াছিলেন। চৈতন্যদেবের ভক্তিধর্মে কীর্তনই পরম উপায়। অতএব চৈতন্যভাবকদের কাছে চৈতন্যদেবের নামগুণযশোগানই ভক্তিসাধন। প্রেমভক্তি লাভের জন্য চৈতন্যভক্তরা চৈতন্যকীর্তন চালু করিয়াছিলেন।

যে বছর চৈতন্যদেব বৃন্দাবন হইতে নীলাচলে ফিরিয়া আসেন (১৫১৫) সম্ভবতঃ সেই বছর রথযাত্রা উপলক্ষে নীলাচলে সমবেত ভক্তদের নিয়া অদ্বৈত আচার্য প্রকাশ্য চৈতন্যকীর্তন শুরু করেন। মুরারি গুপ্ত ইহার বিবরণ দিয়াছেন।

ততশ্চ প্রেমগোস্বামী সংমন্ত্র্য স্বজনৈঃ সহ।
নবীনং গৌরচন্দ্রস্য নামসঙ্কীর্ত্তনং শুভম্ ॥
করোতি মণ্ডলীকৃত্য হর্ষেণ বৈষ্ণবৈঃ সহ।
নৃত্যতি পরমোদ্দণ্ডং গর্জ্জতি ধাবতি ক্বচিৎ ॥
ত্বং প্রাণসর্বস্ব গৌরচন্দ্র মামুদ্ধর প্রভো।
নিত্যানন্দপ্রিয় গৌর গদাধররসপ্রদ ॥
শ্রীবাসাদিপ্রিয়প্রাণ প্রেমদ করুণার্ণব।
এবং সঙ্কীর্ত্তনং সোঽপি গৌরাঙ্গঃ কীর্ত্তনপ্রিয় ॥
কৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তনং মত্বা জগৌ প্রেমবশঃ স্বয়ম্।
স এব কীর্ত্তনানন্দো ব্রহ্মাণ্ডং পূরয়ন্ বভৌ ॥

সর্ব্বে পশ্যন্তি নৃত্যন্তং গৌরচন্দ্রংস্বসম্মুখম্
যথা মধ্যগতং কৃষ্ণং বালকাঃ বনভোজিনঃ ॥
ঈশ্বরোঽপি ভগবতাদ্বৈতাচার্য্যেণ সংযুতঃ।
নিত্যানন্দো মহাতেজাঃ প্রেমোন্মদেন নৃত্যতি ॥
মত্তপারীন্দ্রবিক্রান্তঃ কারয়ন্নবনীতলম্।
গৌরাঙ্গপ্রেমদাতা যস্তস্য কিং চিত্রমেব তৎ॥
গদাধরোঽপি গৌরাঙ্গপ্রীতিদো নৃত্যতি সুগম্।
শ্রীবাসাদ্যাঃ সুখং সর্ব্বে নৃত্যন্তি গৌরচেতসঃ॥
এতদন্তর্গতং যস্য গৌরাঙ্গগুণকীর্ত্তনম্।
স এব সাক্ষী নান্যে চ কোটিশো জ্ঞানপারগাঃ ॥

(কড়চা, ৪।১১।১৬-২৬)

[তাহার পর প্রেম গোস্বামী (অদ্বৈত আচার্য) নিজগণের সঙ্গে পরামর্শ করিয়া আনন্দসহকারে বৈষ্ণবগণের সঙ্গে মণ্ডলী বন্ধন করিয়া শুভদায়ক নূতন (প্রবর্তিত) গৌরচন্দ্রের নাম কীর্তন করিতে আরম্ভ করিলেন। (তাঁহারা) পরম উদ্দণ্ড নৃত্য করিতে লাগিলেন। (কীর্তনানন্দে তাঁহারা) কখন গর্জন করিতে লাগিলেন কখনও বা ধাবিত হইলেন।

নৃত্যকালে যাঁহার পদাঘাতে ত্রিভুবন কম্পিত হয় সেই নিত্যানন্দও গৌরাঙ্গভাবে ভাবিত হইয়া (কীর্তনে) যোগ দিলেন।

(তাঁহারা এই কথা বলিয়া গাহিতে লাগিলেন) হে প্রভু গৌরচন্দ্র প্রাণসর্বস্ব আমার, আমাকে উদ্ধার কর। হে গৌর তুমি নিত্যানন্দর প্রিয়, গদাধর রসদাতা, শ্রীবাস প্রভৃতির শ্রেষ্ঠ প্রাণ, (তুমি) প্রেমদাতা, করুণাসাগর।

এইভাবে সঙ্কীর্তন হইতে থাকিলে সেই কীর্তনপ্রিয় গৌরাঙ্গও (এই গৌর-কীর্তনকে) কৃষ্ণসঙ্কীর্তন মনে করিয়া স্বয়ং প্রেমবশে আগমন করিলেন। সেই কীর্তনানন্দ ব্রহ্মাণ্ড পূর্ণ করিয়া বিকশিত হইল। সকলেই দেখিতেছেন যে গৌরচন্দ্র তাঁহার সম্মুখে নৃত্য করিতেছেন (ঠিক) যেমন বনভোজনরত বালকেরা কৃষ্ণকে নিজেদের মধ্যে দর্শন করিয়াছিল। মহাতেজা নিত্যানন্দ স্বয়ং ঈশ্বর হইয়াও ভগবান্ অদ্বৈত আচার্যর সঙ্গে প্রেমোন্মত্ত হইয়া নৃত্য করিতে লাগিলেন। (অদ্বৈত আচার্য) মত্ত সিংহবিক্রমে (নৃত্য ও কীর্তনে) পৃথিবী প্লাবিত করিলেন। যিনি গৌরাঙ্গপ্রেমদাতা তাঁহার পক্ষে ইহা কিছুমাত্র বিচিত্র নয়।

গৌরাঙ্গের প্রীতিদায়ক গদাধর সুখে নৃত্য করিতে লাগিলেন এবং গৌরগতপ্রাণ শ্রীবাসাদি সকলে সুখে নৃত্য করিতে লাগিলেন।

এই গৌরাঙ্গগুণকীর্তন যাঁহার হৃদয়ে স্থান লাভ করিয়াছে তিনিই এই (লীলার) সাক্ষী। [(অন্যথা) কোটি কোটি জ্ঞানবান ব্যক্তিও (এই লীলার) কিছুই বোধ করিতে পারেন না।]

এই ঘটনার একটু অন্যরকম বিবরণ পাওয়া যাইবে বৃন্দাবনদাসের কাব্যে (চৈ.ভ. ৩।১০)। 'চৈতন্যভাগবত' হইতে এই ঘটনার বিবরণ দিতেছি।

একদিন নীলাচলে সমবেত ভক্তদের ডাকিয়া অদ্বৈত আচার্য বলিলেন

শুন ভাই সব এক কর সমবায়।
মুখ ভরি গাই আজি শ্রীচৈতন্যরায়॥
আজি আর কোন অবতার পাওয়া নাঞি।
সর্ব্ব অবতারময় চৈতন্যগোসাঞি।।

নিজের নামে কীর্তন শুনিয়া চৈতন্যদেব পাছে ক্রুদ্ধ হন এ ভয় ভক্তদের মনে ছিল। কিন্তু অদ্বৈত আচার্যের কথা কেহ ফেলিতে পারিলেন না। সকলে চৈতন্যমঙ্গল গাহিতে লাগিলেন। অদ্বৈত নিজে এই পদটি গাহিলেন

শ্রীচৈতন্য নারায়ণ করুণাসাগর।
দীন দুঃখিতের বন্ধু মোরে দয়া কর॥

ভক্তরা বলিতে লাগিলেন 'জয় জয় শ্রীশচীনন্দন' 'জয় গৌরচন্দ্র নারায়ণ' 'জয় সঙ্কীর্ত্তনপ্রিয় শ্রীগৌরগোপাল' 'জয় ভক্তজনপ্রিয় পাষণ্ডীর কাল।' ভক্তরা এই পদটিও গাহিয়াছিলেন

পুলকে রচিত গায় সুখে গড়াগড়ি যায়
দেখ রে চৈতন্য অবতার।
বৈকুণ্ঠ নায়ক হরি দ্বিজরূপে অবতরি
সঙ্কীর্ত্তনে করেন বিহার॥
কনক জিনিঞা শ্রীবিগ্রহ শোভে রে
অজানুলম্বিত মালা সাজে রে।
সন্ন্যাসীর রূপে আপন রসে বিহ্বল
না জানি কেমন সুখে নাচে রে॥
জয় জয় শ্রীগৌরসুন্দর করুণাসিন্ধু
জয় জয় বৃন্দাবনরায়া রে।
জয় জয় সম্প্রতি নবদ্বীপ পুরন্দর
চরণ কমল দেহ ছায়া রে॥

কীর্তনের শব্দ শুনিয়া চৈতন্যদেব সেখানে উপস্থিত হইলেন। চৈতন্যদেবকে দেখিয়া আনন্দে মত্ত ভক্তদের কিছুমাত্র ভয় হইল না। তাঁহার 'সাক্ষাতে গায়েন সভে চৈতন্যবিজয়।' নীলাচলপর্বে কেহ তাঁহাকে ঈশ্বর বা অবতার বলিলে চৈতন্যদেব বিরক্ত হইতেন 'মুঞি কৃষ্ণদাস বই না বলয়ে আর।' নিজের নামকীর্তন শুনিয়া চৈতন্যদেবের লজ্জা হইল, তিনি উঠিয়া চলিয়া গেলেন। কীর্তনানন্দে ভক্তদের মনপ্রাণ এমন ভরিয়া ছিল যে চৈতন্যদেবকে উঠিয়া যাইতে দেখিয়াও কাহারও মনে আশঙ্কা হইল না। কীর্তন শেষে ভক্তরা চৈতন্যদেবের কাছে গেলেন। শ্রীবাস পণ্ডিত এই দলে ছিলেন। চৈতন্যদেব তাঁহাকে বলিলেন, শ্রীবাস পণ্ডিত, কৃষ্ণের নাম ছাড়িয়া আজ তোমরা এ কি করিলে? শ্রীবাস পণ্ডিত তর্ক করিয়া বলিলেন, জীবের স্বতন্ত্র শক্তি কিছু নাই, ঈশ্বর যেমন করান সে তাহাই করিয়া থাকে। হাত দিয়া যেমন সূর্যকে ঢাকা যায় না, সেইরকম চৈতন্যদেবের ভগবত্তাও গোপন করা সম্ভব নয়। এই বাদানুবাদ চলাকালীন ত্রিপুরা, শ্রীহট্ট, চট্টগ্রাম প্রভৃতি স্থান হইতে জগন্নাথধামে আগত ভক্তরা সেখানে আসিয়া চৈতন্যকীর্তন করিয়া গাহিতে লাগিলেন

জয় জয় শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য বনমালী।
জয় জয় নিজভক্তিরসকুতূহলী॥
জয় জয় পরমসন্ন্যাসী রূপধারী।
জয় জয় সঙ্কীর্ত্তনরসিক মুরারি॥
জয় জয় দ্বিজরাজ বৈকুণ্ঠবিহারী।
জয় জয় জয় জগতের উপকারী।
জয় জয় কৃষ্ণচৈতন্য শ্রী শচীর নন্দন। ··

মুরারি গুপ্তর বর্ণনায় দেখিতেছি অদ্বৈত আচার্যর উদ্যোগে আয়োজিত চৈতন্য-কীর্তনে যোগ দিয়াছিলেন নিত্যানন্দ, গদাধর, শ্রীবাস ও অন্যান্য ভক্তগণ। বৃন্দাবন-দাস এই প্রসঙ্গে শ্রীবাস ছাড়া আর কাহারও নাম উল্লেখ করেন নাই। তবে তাঁহার বর্ণনা পড়িলে মনে হয় অনেকে এই কীর্তনে যোগ দিয়াছিলেন। মুরারি গুপ্ত ও বৃন্দাবনদাস উভয়েই চৈতন্য-কীর্তনের বর্ণনা দিবার আগে সে বার রথযাত্রায় উপস্থিত ভক্তদের তালিকা দিয়াছেন (কড়চা, ৪।১৭।১-২৪ এবং চৈ.ভা. ৩।৯)। মুরারির তালিকা একটু বড়। ইহাতে নবদ্বীপ পর্যায়ের পরিকরগণ ছাড়া সন্ন্যাসের পর চৈতন্যদেবের নবপরিচিত ভক্তদেরও নাম পাওয়া যাইতেছে। কয়েকজন নবদ্বীপ পরিকরের ভক্ত ও শিষ্যদের নামও আছে। যত জন উপস্থিত ছিলেন তাঁহাদের মধ্যে কয়েকজন ছাড়া সকলেই চৈতন্যদেবের ঈশত্বে বিশ্বাসী, গৌরপারম্যবাদী।

অনুমান করা যায় ইঁহারা সকলেই অদ্বৈত আচার্য কর্তৃক আয়োজিত চৈতন্যকীর্তনে যোগ দিয়াছিলেন। নবদ্বীপে ভাবপ্রকাশের সময় ভক্তরা স্বয়ং পরমেশ্বর বিষ্ণু বা তাঁহার অবতার হিসাবে চৈতন্যদেবের পূজা ও স্তব করিয়াছেন (কড়চা, ২।২।১৮-১৯, ২।১২।১০-১৭)। চৈতন্যদেবের নবপরিচিত ভক্তগণ বা নবদ্বীপ পরিকরদের শিষ্য ও ভক্তরা ইহা দেখেন নাই। নীলাচলে চৈতন্যকীর্তন উপলক্ষ্যে পুরাতন ও নূতন চৈতন্যভক্তগণ একত্রে মিলিয়া পরমেশ্বরজ্ঞানে চৈতন্যভজনা করিলেন। পূজা ও স্তব নয়, চৈতন্যোপাসনা হইল কীর্তন করিয়া। চৈতন্যদেব কীর্তন করিতেন কৃষ্ণলাভের আকাঙ্ক্ষায়, ভক্তরা কীর্তন করিলেন চৈতন্যদেবের নামগুণযশোগান করিয়া। তাঁহাদের কাছে ইহাই প্রেমসাধনা।

যে তিনটি পদ নীলাচলে চৈতন্যকীর্তনে গাওয়া হইয়াছিল তাহার রচয়িতৃ অজ্ঞাত। তবে বোঝা যাইতেছে চৈতন্যদেবের ভগবত্তা জ্ঞাপন করিয়া পদ লেখা হইতেছিল। গৌরাঙ্গবিষয়ক পদের আদি রচয়িতা নরহরি সরকার, মুরারি গুপ্ত শিবানন্দ সেন, বংশীবদন চাটুয্যে, রামানন্দ বসু, গোবিন্দ ঘোষ, বাসুদেব ঘোষ ও প্রেমদাস। ইঁহারা কে কবে গৌরাঙ্গবিষয়ক পদ লিখিতে শুরু করেন তাহা জানিবার উপায় নাই। তবে নীলাচলে চৈতন্যকীর্তন (১৫১৫) উপলক্ষে দেখা যাইতেছে চৈতন্যদেবের ঈশত্বজ্ঞাপক পদ তখন ভক্তসমাজে চালু হইয়া গিয়াছে। চৈতন্যকীর্তন করিয়া এইসব পদ প্রকাশ্যে গাওয়া আরম্ভ হইল।

নীলাচল যাইতে বাঙ্গলার ভক্তরা কীর্তন করিতে করিতে পথ চলিতেন। প্রেমদাসের একটি পদে নীলাচলের পথে কীর্তনের বর্ণনা আছে।

সকল ভকত সাথে কীর্ত্তন করিয়া পথে
যায় গৌরাঙ্গ দেখিতে।
কীর্ত্তনের মহারোল ঘন ঘন হরিবোল
অদ্বৈত নিতাই মাঝে নাচে ॥

(প. ক. ২২৮৩)

বাঙ্গলার ভক্তরা নীলাচলে যাইতেন পদব্রজে অথবা নৌকায়। চলার পথে সমবেত কীর্তন পথশ্রম লাঘব করিতে পারে, আবার ইহা প্রেমভক্তির কথা প্রচারের উপায়ও বটে। যাত্রীরা চৈতন্যদেবের নামগুণাদি গাহিয়া পথ চলিতেন। কবিকর্ণপুরের মহাকাব্যে দেখা যায় বাঙ্গলার ভক্তরা দল বাঁধিয়া নীলাচল যাইবার সময় পথে চৈতন্যকীর্তন করিতেছেন।

অথ তে শ্রীলগৌরাঙ্গচরণপ্রেমবিহ্বলাঃ।
তস্যৈব গুণনামাদি কীর্ত্তয়ন্তো মুদং যযুঃ॥
কীর্ত্তনং প্রাতরারভ্য সন্ধ্যায়ামথবা নিশি।
কুর্ব্বন্তি তেহথ বিশ্রামং পথিকৃত্যং তথা ততঃ॥
এবং দিনং কীর্ত্তনেন নৃত্যেন চ মহাশয়াঃ।
বিনীয় বর্ত্মনি যযু পরমোৎসুকচেতসঃ॥

(চৈতন্যচরিতামৃতম্, ১৪।২৯-৩১)

[অতঃপর তাঁহারা (নীলাচলগামী ভক্তগণ) শ্রীলগৌরাঙ্গের চরণ (চিন্তায়) বিহ্বল হইয়া তাঁহারই নামগুণাদি কীর্তন করিয়া প্রীতিসহকারে যাইতে লাগিলেন। (ইঁহারা) প্রাতঃকালে কীর্তন আরম্ভ করিয়া সন্ধ্যাবেলা বা রাত্রে বিশ্রাম করেন। সেখানে পথের অন্যান্য কৃত্যসমূহ সমাপন করিয়া এই মহাশয়গণ পথিমধ্যে পরম উৎসুক চিত্তে কীর্তন ও নৃত্যে (নিবিষ্ট হইয়া) গমন করিতে লাগিলেন।]

রথযাত্রার সময় নীলাচলে চৈতন্যকীর্তন প্রবর্তন আসলে চৈতন্যদেবের ঈশ্বরত্ব প্রচারের উপায়। রথযাত্রা উপলক্ষে নীলাচলে দেশের বিভিন্ন অংশ হইতে যাত্রী সমাগম হয়। এই সময় চৈতন্যকীর্তন শুরু করিবার তাৎপর্য হইল বৃহত্তর ভক্ত-সমাজের সামনে চৈতন্যদেবের ভগবত্তা ঘোষণা। বিমানবিহারী মজুমদার এই মত প্রকাশ করিয়াছেন (মজুমদার ১৯৫৯ : ৫৫৯-৫৬০) সম্ভবপর বটে। বাঙ্গলা নীলাচল পথে চৈতন্যকীর্তন করিবার উদ্দেশ্যও অনুরূপ। এমনিতে আঠারো কুড়িদিনের পথ। বাঙ্গলার যাত্রীরা স্ত্রী এবং সন্তানাদি, শিশু অবস্থাতেও, সঙ্গে নিয়া যাইতেন (চৈ. ভা. ৩।৯)। ফলে সময় আরও বেশী লাগিবার কথা। বহু জনপদ অতিক্রম করিয়া যাইতে হইত। এই পথে চৈতন্যকীর্তন করা চৈতন্য-দেবের মাহাত্ম্য প্রচারের অন্যতম প্রশস্ত উপায়।

চৈতন্যকীর্তনের বিবরণে মুরারি গুপ্ত নিত্যানন্দর কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করিয়াছেন। এই ঘটনার কিছুদিন পরে চৈতন্যদেবের নির্দেশে নিত্যানন্দ বাঙ্গলায় ফিরিয়া ভাগীরথীর দুই তীরে গ্রামে গ্রামে ঘুরিয়া চৈতন্যপ্রপত্তি প্রচার শুরু করেন। নিত্যানন্দ গৌরপারম্যবাদ অনুসারে চৈতন্যকীর্তন করিয়া প্রচার করিতেন। বৃন্দাবনদাস নিত্যানন্দর নামে জয়োচ্চারণ করিয়া বলিয়াছেন

জয় জয় হলধর নিত্যানন্দ রায়।
চৈতন্য কীর্ত্তন স্ফুরে যাঁহার কৃপায়॥ (চৈ. ভা. ২।১৭)

নিত্যানন্দ গ্রাম হইতে গ্রামান্তরে ঘুরিয়া প্রেমভক্তি কথা প্রচার করিতেন। প্রচারকালে নিত্যানন্দ

নিরবধি শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য সঙ্কীর্ত্তন।
করায়েন করেন লইয়া সর্ব্বগণ ॥ (চৈ. ভা. ৩।৫)

চৈতন্যকীর্তন করিয়া নিত্যানন্দ সর্বগণসহ গাহিতেন

চৈতন্য সেব চৈতন্য গাও লও চৈতন্য নাম।
চৈতন্যে যে ভক্তি করে সেই মোর প্রাণ ॥ (চৈ. চ. ২।১)

এই কলিটি একটু বদলাইয়া এখনও টহলদার বৈষ্ণব বাউল প্রভাতী সুরে গাহিয়া থাকে

ভজ গৌরাঙ্গ কহ গৌরাঙ্গ লহ গৌরাঙ্গের নাম রে।
যে জন ভজে গৌরাঙ্গ নাম সে হয় আমার প্রাণ রে ॥

সপ্তম পরিচ্ছেদ

ভক্তিধর্ম প্রসারের কারণ

চৈতন্যদেব কর্তৃক প্রবর্তিত ভক্তি আন্দোলনের গোড়া হইতেই সর্বজনীন প্রচারের কথা উঠিয়াছে। চৈতন্যদেব নিজ ও তাঁহার মুখ্য পরিকরগণ সর্বসাধারণের মধ্যে কীর্তন দ্বারা ভক্তিধর্ম প্রচার করিয়াছিলেন। তাঁহাদের প্রচারে সাড়াও মিলিয়াছিল প্রচুর। নবদ্বীপে চৈতন্যদেবের ভাবপ্রকাশ আরম্ভ হইতেই সাধারণ মানুষের আনাগোনা দেখিতেছি। নবদ্বীপের নগর সঙ্কীর্তনে লোক সমাবেশের জোর দেখা গিয়াছে। বাঙ্গলায় চৈতন্যদেবের প্রচারযাত্রার সময়ও সব জায়গাতেই বহু লোকের সমাগম হইত। নীলাচলের চৈতন্যকীর্তনেও খুব লোক সংঘট্ট হইয়াছিল।

ভক্তিসাধনার পথ সর্বজনীন। চতুর্দশ শতক হইতে ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে ভক্তি আন্দোলনের এই বাণী সাধারণ্যে প্রচারিত হইয়াছে। ইহার সূত্র আছে শ্রীমদ্ভাগবতে। ভাগবতপুরাণে চণ্ডালেরও ভক্তিলাভের অধিকার স্বীকৃত। ভক্তি-আন্দোলনের নায়কগণ সারা ভারতবর্ষে এই কথা প্রচার করিয়াছেন। ভক্তি সাধনায় আচার অনুষ্ঠানের কোনও প্রয়োজন নাই। শাস্ত্র ও তত্ত্ববিচার অনাবশ্যক। হিন্দু সমাজের জাতিব্যবস্থায় উচ্চনীচ, শুচি অশুচির ভেদ প্রকট। ব্রাহ্মণ্য স্মৃতিশাসনে ধর্মাচরণের অধিকার জাতিভেদের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। নিম্নতর জাতির ক্ষেত্রে এই অধিকার ক্রমশই সঙ্কুচিত হইয়া আসিয়াছে। ভক্তিধর্মে সামাজিক ভেদ বিচার নাই। জাতিনির্বিশেষে সকলেই ভক্তিসাধনের উপযুক্ত পাত্র, ভক্তিলাভের অধিকারও সকলের সমান। স্মৃতিশাসনের দরুণ যাহারা অবজ্ঞাত ও অবহেলিত তাহাদের কাছে ভক্তি অনধিকারের দৈন্য হইতে পরিত্রাণ পাইয়া

আধ্যাত্মিক জীবনে আত্মপ্রতিষ্ঠা লাভের উপায়। এই কারণে সমাজের নিম্নতর পর্যায়ে ভক্তিধর্মের প্রসার হওয়া স্বাভাবিক। সাধারণভাবে এই কথা বলা যায়। তবে বাঙ্গলায় ভক্তি ধর্মের দ্রুত বিস্তার হইবার কতকগুলি বিশেষ কারণও আছে। এই বিষয়ে একটু বিস্তারিত আলোচনা করা প্রয়োজন।

চৈতন্যদেবের আবির্ভাবকালে বাঙ্গলায় বৌদ্ধ, শৈব, শাক্ত ও বৈষ্ণব তন্ত্রসাধনার এবং নাথপন্থী প্রভৃতি গুহ্য সাধনার বিভিন্ন ধর্ম সম্প্রদায় প্রচলিত ছিল। এই সব গুহ্য সম্প্রদায়ের সাধনা হইত বামাচারী তান্ত্রিক যৌন-যৌগিক বা শুদ্ধ যৌগিক প্রক্রিয়ায়। নাথপন্থীরা দ্বিতীয় প্রকারের উদাহরণ। বিভিন্ন গুহ্য সম্প্রদায়ের সাধনপদ্ধতি স্বতন্ত্র, কিন্তু দর্শন চিন্তার মূল প্রত্যয় সকলেরই প্রায় এক। গুহ্য সম্প্রদায়গুলি মানববাদী। মানুষের মধ্যেই জগৎসংসারের সব রহস্য নিহিত আছে ইহাই তাহাদের বিশ্বাস। সুতরাং দেহকে অবলম্বন করিয়া সাধনা করিলে খণ্ড ব্যক্তি-জীবনের ব্যষ্টি অতিক্রম করিয়া বিশ্বজনীন অখণ্ডে উপনীত হওয়া সম্ভব। অখণ্ড বিশ্বজনীনতার বোধ জন্মিলে প্রাণবায়ু অচঞ্চল হয়, কালজ্ঞান ও জীবনমৃত্যুর ভেদ লোপ পায় এবং ব্যক্তিজীবন ও বিশ্বজীবন এক ও অভিন্ন হইয়া ওঠে। মনের এই অবস্থাই পরমজ্ঞান। তন্ত্রশাস্ত্রের মতে অখণ্ড বিশ্বজনীনতা বোধ আসে যৌন-যৌগিক সাধনার পথে। পুরুষ ও প্রকৃতি, নর ও নারী আপাতদৃষ্টিতে পৃথক। কিন্তু দ্বীন্দ্রিয়সমাপত্তি-যোগের অবিচ্ছিন্ন সুখাবস্থায় দ্বয় হইতে অদ্বয়ে উত্তরণ ঘটে। তন্ত্রশাস্ত্রের "এই অদ্বয়তত্ত্ব শুধু দ্বয়ের অভাব নয়—তাহা অদ্বয়ে মিথুনতত্ত্ব, দ্বয়ের নিঃশেষ সমরসতা" (দাশগুপ্ত ১৩৬৭ ঃ ১৩৪)। অদ্বয়বোধ বিশ্বজনীনতা, ইহাই পরম সত্য।

বৌদ্ধ, শাক্ত, শৈব ও বৈষ্ণব সব রকমের তন্ত্রসাধনা এই মৌলিক দর্শনের উপর প্রতিষ্ঠিত। যে দ্বয়ের সমরসতায় অদ্বয়সিদ্ধি শাক্ততন্ত্রে তাহা শিবতত্ত্ব ও শক্তিতত্ত্ব নামে পরিচিত। শিব ভগবান। শিবতত্ত্ব জ্ঞানমাত্র তনু নিবৃত্তিমূলক। শক্তি পরমেশ্বরী দেবী, তিনি ত্রিগুণাত্মিকা, প্রকাশাত্মিকা, প্রবৃত্তিমূলা। শিব ও শক্তির মিলনে সমরস উপজাত হয়। বৌদ্ধতন্ত্রের বিচারে অদ্বয়ের মধ্যে অবিনাভাবে মিথুনীকৃত দ্বয়তত্ত্ব প্রজ্ঞা ও উপায়ের মিলন। প্রজ্ঞা শূন্যতাস্বরূপিনী ভগবতী পরমেশ্বরী। উপায় প্রজ্ঞার প্রকাশ করুণারূপ, কুশল-ধর্মের প্রেরণাদায়ক ; উপায় নিখিল ক্রিয়াত্মক ভগবান। তন্ত্রমতে প্রত্যেক পুরুষই ভগবান, নারীমাত্রই ভগবতী। মানবদেহ অবলম্বন করিয়াই নরনারী অদ্বয়সিদ্ধি লাভ করিবে। অতএব তন্ত্র-সাধনা পুরুষ ও নারীর মিলিত সাধনা। নর ও নারীর সার্থক যৌন-যৌগিক মিলনে ঐহিক বন্ধন নাশ হইয়া আত্মজ্ঞানের উদ্বোধ হইবে। বৌদ্ধতন্ত্র অনুসারে আত্মজ্ঞান

বোধিচিত্তে অভিব্যক্ত হয়। বোধিচিত্ত হইতে নির্বাণ লাভ সম্ভব। শাক্ততন্ত্রের মতে আত্মজ্ঞানের বিকাশ হয় পরম সামরস্যের উপলব্ধিতে। সামরস্য অখণ্ড, অনাবিল আনন্দময় কৈবল্যানন্দের অনুভূতিতে উত্তরণ। কৈবল্যানন্দের অনুভূতিই সিদ্ধি।

বৌদ্ধদর্শন অনুসারে নির্বাণ লাভের অর্থ শূন্যতায় লয় প্রাপ্তি। বৌদ্ধতান্ত্রিক বজ্রযানী সাধকদের অনেকেই নেতিবাচক নির্বাণকে পরমার্থ বলিয়া মানিয়া নিতে পারেন নাই। ইঁহাদের উপলব্ধি স্বতন্ত্র ঃ বোধিচিত্ত আসলে পরম ইতিবাচক অবস্থা। বজ্রযানের তত্ত্বে বলে যৌনাবেগ নাশ করিলে তবেই বোধিচিত্ত লাভ করা সম্ভব। প্রতিবাদীদের মতে যৌনাবেগ নাশ করা অসম্ভব, সাধনায় সিদ্ধি-লাভের জন্য তাহার প্রয়োজনও নাই। যৌনাবেগের দ্বারা দ্বয়ের নিঃশেষ মিলনে অদ্বয়ের উপলব্ধি পরম আনন্দানুভূতিতে পরিণতি লাভ করে। বোধিচিত্তজনিত এই বিশুদ্ধ আনন্দই মহাসুখ। ইতিবাচক পরানন্দময় মহাসুখ সহজানন্দ। সহজ সমগ্র জগৎ সংসারের স্বরূপ, আনন্দ তাহার নিত্যস্বভাব। সুতরাং সহজই পরমসত্য। বুদ্ধি বা মনের দ্বারা ইহা অধিগত করা যায় না। ইহা ব্যক্তিগত অতীন্দ্রিয় অভিজ্ঞতা, অনুভবসাধ্য। যৌন-যৌগিক প্রক্রিয়া ইহার উপায়। তবে এই প্রক্রিয়ায় সহজবস্তু সরাসরি লাভ হয় না। বোধিচিত্তের দুইটি পর্যায় আছে। প্রথমে সংবৃত্ত বোধিচিত্ত। তাহার পরে বিবর্ত বোধিচিত্ত। সাংবৃত্তিক বোধিচিত্ত প্রকৃতিদোষযুক্ত, ইহাতে ঐহিক বন্ধনের গ্লানি থাকিয়াই যায়। কঠোর সাধনা দ্বারা সাংবৃত্তিক বোধিচিত্ত হইতে বিবর্ত বোধিচিত্তে উত্তীর্ণ হওয়াই সাধকের লক্ষ্য। অতএব সহজসাধনা দৈহিক-মনস্তাত্ত্বিক প্রক্রিয়া। কিন্তু পরিশেষে তত্ত্বগত বিবর্ত বোধিচিত্তের চিন্তা হইতে সহজসাধন মনস্তাত্ত্বিক প্রক্রিয়ায় পরিণত হইয়াছিল।

তন্ত্রসাধনার, বিশেষতঃ বৌদ্ধসহজসাধনার, উত্তরাধিকারসূত্রে বৈষ্ণব সহজসাধনার উদ্ভব। "বৈষ্ণব সহজিয়াগণের প্রেমের সাধনা মূলতঃ তন্ত্রসাধনা ; তন্ত্রের যোগ-সাধনার সহিত এখানে বৈষ্ণব-প্রেমের ভাব-সাধনা যুক্ত হইয়াছে। বৌদ্ধতন্ত্র-সাধনায় যেমন দেখিতে পাই অদ্বয় সহজের দুইটি ধারা—প্রজ্ঞা এবং উপায়—একটি বামস্থা, অপরটি দক্ষিণস্থ, একটি প্রাণ, অপরটি আপান ; হিন্দু-তন্ত্র-সাধনায়ও যেমন দেখিতে পাই, অদ্বয় পরম সত্যের দুইটি ধারা—শক্তি এবং শিব—শক্তি বামস্থা, শিব দক্ষিণস্থ, একটি প্রাণ, অপরটি আপান ; ঠিক তেমনই বৈষ্ণব-সহজিয়া সাধনায় দেখিতে পাই মহাভাবরূপ সহজের দুইটি ধারা, একটি রস, অপরটি রতি। রসই কৃষ্ণ, রতিই রাধা। রাধা বামস্থা, কৃষ্ণ দক্ষিণস্থ ; ···বৌদ্ধ-সহজিয়া সাধনার নর-নারী মিলিত সাধনার ভিত্তিভূমি, যেমন নারীতে প্রজ্ঞা-ভাবনা এবং নিঃশেষ উপলব্ধি

আর পরে উপায়-ভাবনা এবং উপায়-উপলব্ধি, হিন্দুতন্ত্র-সাধনায় যেমন দেখিতে পাই, নারীতে শক্তি-ভাবনা এবং শক্তি-উপলব্ধি আর পুরুষে শিব-ভাবনা এবং শিবোপলব্ধি, তেমনি মহাভাবের সাধনারও মূল কথা হইল প্রথমে রূপের মধ্যে স্বরূপের প্রতিষ্ঠা ব্যতীত কখনও মহাভাব-সাধনায় পূর্ণতা হয় না। নারীর রূপের মধ্যে স্বরূপে অবস্থিতি শ্রীরাধার ; পুরুষ-রূপের স্বরূপ শ্রীকৃষ্ণ ; প্রথমে চাই রূপে স্বরূপের আরোপ ; কিন্তু আরোপ-সাধনা প্রাথমিক স্তর মাত্র ; রূপে স্বরূপের আরোপের পরে চাই রূপে স্বরূপের প্রতিষ্ঠা। এই স্বরূপ-প্রতিষ্ঠ যুগলের সামরস্যেই মহাভাবের উৎপত্তি ; মহাভাবই জীবের সহজ-স্বরূপ" (দাশগুপ্ত ১৩৬৭ ঃ ১৪৯-৫০)।

তন্ত্র সাধনার তত্ত্ব অনুসারে বৈষ্ণব সহজসাধকরা মনে করেন প্রত্যেক নর ও নারী স্বরূপতঃ কৃষ্ণ ও রাধা। মানব মানবী সত্তা বাহ্য রূপ। এই বাহ্য রূপের চেতনা অতিক্রম করিতে হইবে। ইহার জন্য প্রয়োজন আরোপ সাধনা। সাধক সাধিকা নিজেদের মনে স্বরূপের ভাব অর্থাৎ কৃষ্ণ ও রাধার সত্তা আরোপ করিয়া যৌন-যৌগিক সাধনপথে রূপের আবরণ ঘুচাইয়া স্বরূপে মিলিত হইলে রাধাকৃষ্ণের অনির্বচনীয় প্রেম উপলব্ধি করিতে পারিবে। মানবদেহের মধ্যেই নিত্যবৃন্দাবনের অবস্থান, মানুষের মধ্যেই রাধাকৃষ্ণের নিত্য প্রেমলীলা অনুষ্ঠিত হইতেছে। এই উপলব্ধি জন্মিলে ঐহিক ও পারমার্থিক জগতের পার্থক্যজ্ঞান থাকে না। সাধক অখণ্ড আনন্দে স্থিত হন। প্রেমের স্বভাব আনন্দ। আনন্দেই মুক্তি।

বৈষ্ণব সহজ সাধনায় কাম ও প্রেমের পার্থক্য খুব জোর দিয়া বলা হয়। ঐহিক রূপের বন্ধনে নরনারীর যে সঙ্গম তাহা প্রাকৃত কাম। কিন্তু স্বরূপ প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে নরনারীর যে মিলন তাহা প্রেমলাভের প্রয়াস। স্বরূপের চিন্তায় প্রাকৃত কাম হইতে প্রেমে উত্তরণই সাধকের লক্ষ্য। যৌন-যৌগিক প্রক্রিয়া এই প্রচেষ্টার শুরু কিন্তু কাম হইতে প্রেমে উত্তরণ মনস্তাত্ত্বিক প্রক্রিয়া ছাড়া হয় না। বৌদ্ধ সহজসাধন মতে সংবৃত্ত হইতে বিবর্তে উপনীত হওয়ার অর্থ প্রকৃতিদোষমুক্ত বোধিচিত্তে মহাসুখরূপ সহজানন্দ লাভ। বৈষ্ণব সহজ সাধকগণ ভাবসাধনার দৃষ্টিতে এই সহজানন্দে প্রেমের পরিপূর্ণ বিকাশ কল্পনা করিয়াছেন। প্রেম পরানন্দময়, ইহাই মহাভাব। প্রেমবিগ্রহা রাধা মহাভাবস্বরূপিনী। রসরূপ কৃষ্ণ রতিরূপ রাধার মিলন প্রেমের চরম অভিব্যক্তি। সাধককে এই প্রেমের অনুভব পাইতে হইবে।

এ সব অতি উঁচুদরের তত্ত্বকথা। প্রেম ঐহিক কামনা বাসনার ঊর্ধ্বে গভীরতম উপলব্ধি। মনস্তাত্ত্বিক প্রক্রিয়াজাত এই প্রেমানুভব সাধারণতঃ দুঃসাধ্য ও দুর্লভ। সহজ সাধক বৈষ্ণব কবি চণ্ডীদাস তো স্পষ্টই বলিয়াছেন যে প্রকৃত সহজ সাধক

"কোটিকে গোটিক হয়"। যাহারা প্রকৃত সহজ সাধক নয় তাহাদের সাধনা মিথুনাচারে পর্যবসিত হইবে ইহাই সম্ভব। এ দিকে বৈষ্ণব সহজ সাধকদের সমূহে দূরারোহ প্রেমের প্রতীক স্বরূপ রসরাজ মহাভাব কৃষ্ণরাধার কল্পনায় দেবত্ব আরোপ করা হইতেছিল। তত্ত্বগতভাবে যে কৃষ্ণ ও রাধা নরনারীর স্বরূপ দেবত্বের কল্পনায় তাঁহারাই হইয়া উঠিলেন অপ্রমেয়। শ্রীকৃষ্ণের কৃপা ভিন্ন প্রেমানুভব হইতে পারে না, রাধা ঘনীভূত প্রেমের বিগ্রহবতী দেবী। অতএব তাঁহারা পূজ্য, ভক্তির পাত্র। এই ভাবে বৈষ্ণব তান্ত্রিক সাধনায় ভক্তির সূচনা দেখা দিল।

বিশুদ্ধ তন্ত্রসাধনায় ভক্তির স্থান নাই কেননা স্বরূপতঃ প্রত্যেক নর ও নারীই ভগবান ও ভগবতী। শাস্ত্রীয় বৈষ্ণবমতের সাধনা ভক্তিবাদী। ব্রহ্ম নিত্য, সর্বব্যাপী, সর্বজ্ঞ, সর্বশক্তিমান, সকল বিষয়ের কারণ ও আশ্রয়। ব্রহ্মের সঙ্গে জীবের সম্পর্ক বিচার ভক্তির দার্শনিক ভিত্তি। রামানুজের বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ হইতে ভক্তির দার্শনিক বিচার শুরু। বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ অনুসারে জীব পরম সত্য ব্রহ্মের অঙ্গমাত্র। অতএব জীব আপাততঃ ব্রহ্ম হইতে ভিন্নধর্মী, কিন্তু ব্রহ্মাশ্রিত বলিয়া জীব ব্রহ্মের সঙ্গে অভিন্ন। ব্রহ্ম ও জীবের মধ্যে মায়ার আবরণ আছে। ভক্তি সাধনার দ্বারা মায়া অতিক্রম করিলে ব্রহ্মের সঙ্গে অভিন্নতাবোধ জন্মে। ইহাই মুক্তি। দ্বৈতবাদ ব্যাখ্যা করিয়া মধ্বাচার্য বলিতেছেন ব্রহ্মের মতো জীব ও জগতও সত্য। অতএব পরমাত্মা অর্থাৎ ব্রহ্মের সঙ্গে জীবের ভেদ অনস্বীকার্য। তবে স্বরূপতঃ জীব পরমাত্মার অনুচর। ভক্তি সাধনায় স্বরূপের সন্ধান পাইলে জীব মুক্তি লাভ করে। নিম্বার্কাচার্য-প্রতিষ্ঠিত দ্বৈতাদ্বৈতবাদ অনুসারে জীব গুণতঃ ও কার্যতঃ পরমাত্মা হইতে ভিন্ন, কিন্তু ব্রহ্মাত্মক ও ব্রহ্মাশ্রয়ী বলিয়া ব্রহ্মের সঙ্গে অভিন্ন। তবে ব্রহ্ম কারণস্বরূপ জীব কার্যমাত্র, ব্রহ্ম অংশী জীব তাঁহার অতিক্ষুদ্র অংশ, ব্রহ্ম ধ্যেয় জীব ধ্যাতা। সুতরাং ভক্তিই পরমতত্ত্ব লাভের উপায়। গৌড়ীয় বৈষ্ণব দার্শনিক মত অচিন্ত্যভেদাভেদবাদ দ্বৈতাদ্বৈতবাদের কাছাকাছি। এই মতে পরমতত্ত্ব শ্রীকৃষ্ণ অদ্বয়, তিনি সর্বশক্তিমান। শক্তি শক্তিমানের অভিব্যক্তি, কিন্তু সে স্বয়ং শক্তিমান নয়। তাই উভয়ের মধ্যে ভেদ কল্পনা করা যায়। আবার শক্তিমান ছাড়া শক্তির অস্তিত্ব নাই বলিয়া শক্তি ও শক্তিমান অভেদ। যুগপৎ ভেদ ও অভেদের সম্পর্ক অচিন্ত্যজ্ঞানগোচর। কিন্তু শক্তিমানের প্রতি শক্তির আকর্ষণ স্বাভাবিক। এই আকর্ষণই প্রেম। "যে দার্শনিক দৃষ্টিতে প্রেমই শক্তির পরাকাষ্ঠা সেই দৃষ্টিতেই রাধা শক্তি-রূপিণী। ...গৌড়ীয় বৈষ্ণব দার্শনিকগণ তাঁহাদের শক্তি-তত্ত্বের আলোচনায়...কৃষ্ণের স্বরূপভূত সত্তা, চৈতন্য ও আনন্দকে লইয়া স্বরূপশক্তিকে ত্রিধা বিভক্ত করিয়াছেন, সত্তা-বিধৃতি-কারিণী সন্ধিনী, চৈতন্যদায়িনী সংবিৎ এবং আনন্দ-বিধায়িত্রী হ্লাদিনী। এই

হ্লাদিনী সন্ধিনী ও সংবিৎ-শক্তির বিরোধী বা বিকল্প শক্তি নহেন, হ্লাদিনীতে অপর দুই শক্তির পূর্ণতা। সত্তার সারাংশই ত হইল চৈতন্য, আবার চৈতন্যের সারাংশ হইল হ্লাদ ; সুতরাং সন্ধিনী-শক্তির সারভূতা শক্তি হইল সংবিৎ, আবার সংবিতের সারভূতা হইলেন হ্লাদিনী, এই হ্লাদিনীর ঘনীভূত বিগ্রহ হইলেন রাধা ; সুতরাং রাধার ভিতরে একাধারে সত্তা, চৈতন্য ও আনন্দের পরিপূর্ণতা। রাধারূপে এই পরিপূর্ণ হ্লাদিনীত্বেই দেবীর নিত্যস্থিতি—সুতরাং কৃষ্ণের মধ্যে প্রেমরূপে অনন্তরস-আস্বাদন আর ভক্তহৃদয়ে ভক্ত্যানন্দ-রূপে বিগলন—ইহা ব্যতীত দেবীর আর কোন কার্য নাই" (দাশগুপ্ত ১৩৬৭ ঃ ১৪৯)।

যে প্রেমভক্তির কথা বলিয়া চৈতন্যদেব নবদ্বীপে প্রচার শুরু করিয়াছিলেন তাহা কৃষ্ণপ্রেমলাভের ভক্তি সাধনা। জীব কৃষ্ণের অংশ তাই ভক্তিই প্রেমস্বরূপ। প্রেমভক্তির সঞ্চার হইলে সাধক অদ্বয়ে নিজের স্বরূপ উপলব্ধির আনন্দ লাভ করিবে। বৃন্দাবনের গোস্বামীরা যে ভাবে অচিন্ত্যভেদাভেদবাদ দাঁড় করাইলেন তাহাতে জীবের ভূমিকা ও লক্ষ্য একটু আলাদা। জীব কৃষ্ণের বহিরঙ্গা তটস্থ শক্তি। অতএব কৃষ্ণের মধ্যে তাহার স্থান হইতে পারে না, কৃষ্ণের সঙ্গলাভ করিবার অধিকারও তাহার নাই। কৃষ্ণের সঙ্গলাভ করিবার অধিকার শুধু তাহাদেরই যাহাদের মধ্যে কৃষ্ণের স্বরূপশক্তি প্রতীয়মান অর্থাৎ বৃন্দাবনলীলায় কৃষ্ণের পরিকর-বৃন্দ। ইহাদের মধ্যে রাধাই সর্বশ্রেষ্ঠ। রাধা কৃষ্ণ হইতে সৃষ্ট, রাধা ও কৃষ্ণ অদ্বয় হইতে দ্বয়। রাধাকৃষ্ণের মিলনে দ্বয় আবার অদ্বয়ে পরিণত হইতেছে। ভক্তির দ্বারা এই লীলার তাৎপর্য উপলব্ধিই প্রেমানুভব। সাধারণতঃ ইহাই সাধকের লক্ষ্য। শাস্ত্রীয় বৈষ্ণব ভক্তিবাদ, চৈতন্যধর্মের প্রেমভক্তি বা গৌড়ীয় বৈষ্ণব দার্শনিক মতের প্রেম কোনটাই বিশুদ্ধ তন্ত্রসাধনার পরিপোষক নয়। কিন্তু বৈষ্ণব তান্ত্রিক সাধনায় কৃষ্ণ এবং রাধাতে দেবত্ববোধের যে ঝোঁক দেখা গিয়াছিল তাহার সূত্রে বৈষ্ণব সহজ সাধকদের পক্ষে ভক্তির দিকে অগ্রসর হওয়া সম্ভব হইয়াছিল। ভক্তির পথ মানিয়া নিলে সহজানন্দস্বরূপ প্রেম আর মানুষের আয়ত্ত থাকে না, তাহা শুধু অপ্রকট বৃন্দাবনের দেবতা কৃষ্ণ ও রাধার মিলনেই সম্ভব ইহাও স্বীকার করিতে হয়। এই ভাবে সহজ সাধনার অভিনব ব্যাখ্যাও চালু হইয়াছিল। কবিরঞ্জন বিদ্যাপতির (নামান্তরে ছোট বিদ্যাপতি) একটা পদে আছে

নিজ দেহে যেবা ঘটায় সহজ
আচরিতে করে আশ।
ভনে বিদ্যাপতি কোটী জন্মে তার
রৌরবেতে হবে বাস ॥

(সুকুমার সেন ১৯৭০ ঃ ২১৭-১৮ পৃষ্ঠায় উদ্ধৃত)

বৈষ্ণব সহজসাধনার পরানন্দময় প্রেমরূপ পরমার্থতত্ত্ব আর বৌদ্ধ সহজসাধনার বিবর্ত অর্থাৎ প্রকৃতিদোষবিরহিত ইতিবাচক বোধিচিত্তে অনুভূত মহাসুখরূপ সহাজানন্দ আসলে একই বস্তু। ফলে বৌদ্ধধর্মের জীর্ণাবস্থায় প্রসর্পমান বৈষ্ণবধর্মের আশ্রয়ে রাধাকৃষ্ণের অপার্থিব প্রেমলীলা অবলম্বনে সহজসাধনার ভক্তিবাদী ব্যাখ্যা মানিয়া নেওয়া বৌদ্ধ সহজসাধকদের পক্ষেও কঠিন হয় নাই।

চৈতন্যদেবের সময় বাঙ্গালীসমাজে গুহ্য সাধন পন্থার প্রসার কতখানি ছিল তাহার পরিমাপ করা কঠিন। তবে কিছুটা আন্দাজ করা যায়। গুহ্য সাধন পন্থা সমূহ সম্পর্কে তথ্য পাওয়া যায় মোটামুটি অষ্টম শতক হইতে। বৌদ্ধ তান্ত্রিক বজ্রযান ও সহজযান, শৈব ও শাক্ত তান্ত্রিক এবং নাথপন্থার ধর্মমত ও সাধনপদ্ধতি সম্পর্কে অনেক মৌলিক রচনা এবং ভাষ্য ও টীকা আমাদের হাতে আসিয়াছে। গুহ্য সাধনার গান ও দোঁহাও কিছু পাওয়া গিয়াছে। এই সব সূত্র হইতে গুহ্য সাধকদের সামাজিক পরিচয় সম্বন্ধে স্পষ্ট তথ্য অল্পই জানা যায়। তবে অনুমান হয় যে সমাজের নিম্নতর পর্যায়েই গুহ্য সাধনার প্রসার বেশী ছিল। বৌদ্ধ সহজযান বজ্রযানপ্রসূত। বজ্রযানের বিরুদ্ধে সহজযানীদের মূল আপত্তি তত্ত্বগত। মানুষের স্বাভাবিক জীবনধর্মের প্রবণতা সহজযানীদের দৃষ্টিতে সাধনার উপায়। এই কারণে তাহারা বজ্রযানধর্মের তাত্ত্বিক বিচার বিশ্লেষণ ও ক্রিয়াকাণ্ডের বাহুল্যে বীতশ্রদ্ধ হইয়া উঠিয়াছিল। শুধু সহজযানী বৌদ্ধরাই নয়, সকল গুহ্য সম্প্রদায় পূজাপাঠ ব্রত উপবাস প্রভৃতি বিধিবদ্ধ আনুষ্ঠানিক ধর্মাচরণ এবং তাত্ত্বিক বিচার বিশ্লেষণ পরিহার করিয়া চলিত। সাধারণ লোকে এইরূপ ধর্মের প্রতি সহজেই আকৃষ্ট হইবে। তাহা ছাড়া গুহ্য সম্প্রদায়সমূহের ধর্মাচরণে বর্ণাশ্রমের প্রভাব অর্থাৎ জাতি-ভেদে উচ্চনীচ, শুচি অশুচি বিচার ছিল না। দৈনন্দিন সামাজিক জীবনে জাতি-ব্যবস্থা অলঙ্ঘনীয়। জাতিপ্রথাবদ্ধ সমাজে ধর্মাচরণে অধিকারীভেদ জাতি ব্যবস্থার বিধিনিয়ম দ্বারা নির্ধারিত। জাতিব্যবস্থা পরিহার করিয়া যে ধর্মাচরণ সম্ভব তাহা তো নিম্নতর জাতিভুক্ত লোকের কাছে স্বস্তির ব্যাপার বটেই। এখনও যে সব গুহ্য সম্প্রদায় প্রচলিত আছে তাহাতে নিম্নতর জাতিভুক্ত লোকের সংখ্যাই বেশী।

ত্রয়োদশ শতকের প্রথম দিকে বাঙ্গলায় তুর্কী-আফগান রাষ্ট্রক্ষমতা বিস্তারের সূচনা হয়। ক্রমশ ইহার প্রাধান্য ছড়াইয়া পড়িতে থাকে। বহিঃশক্তির আক্রমণে বাঙ্গলায় বৌদ্ধ ও ব্রাহ্মণ্য ধর্মের উপর প্রবল আঘাত পড়িয়াছিল। সংস্কৃতির ইতিহাসে ইহার অনেক প্রমাণ আছে। বিজেতাদের হাতে নালন্দা, বিক্রমশীলা, ওদন্তপুরী, সোমপুর, শালবন প্রমুখ বৌদ্ধ মহাবিহার ও অন্যান্য বিহারগুলি ধ্বংস হইয়া যায়। বহু মন্দিরও ইহারা ভাঙ্গিয়া ফেলিয়াছিল। একাদশ-দ্বাদশ শতকের

বেশ কিছু পুঁথি আছে। কিন্তু ত্রয়োদশ-চতুর্দশ শতকের কোন পুঁথি বাঙ্গলায় এখনও পাওয়া যায় নাই। ত্রয়োদশ শতক হইতে ভাস্কর্য ও চিত্রকলার অবনতি খুব প্রকট, নিদর্শনও খুব কম। অনেক ভাস্কর ও চিত্রশিল্পী নেপাল ও তিব্বতে পলাইয়া যান। আক্রমণের মুখে ব্রাহ্মণরা কূর্মবৃত্তি অবলম্বন করেন বলিয়া কথিত আছে। প্রকাশ্য ধর্মাচরণে ব্যাঘাত ঘটার ফলে লোকে বেশী করিয়া গুহ্য সম্প্রদায় সমূহের মধ্যে আত্মগোপন করিয়াছিল ইহা অনুমান করা অসঙ্গত নয়।

গুহ্য সাধনপন্থায় উচ্চবর্ণের লোকও ছিল। বৌদ্ধ চর্যা গীতিতে কয়েকজন উচ্চবর্ণের গুহ্য সাধকের পরিচয় আছে। উচ্চ ও নীচ উভয় পর্যায়ের মধ্যেই গুহ্য পন্থার প্রসার হইয়াছিল। কিন্তু শিষ্ট সমাজে গুহ্য সাধকদের সম্মান ছিল না। ইহাদের ধর্মাচরণ হইত গোপনে, সমাজদৃষ্টির আড়ালে। নাথপন্থা ছাড়া অন্য সব গুহ্য পন্থায় যৌন-যৌগিক তান্ত্রিক আচার প্রচলিত ছিল। স্ত্রী-পুরুষে মিলিত সাধনা গোপনেই করিতে হয়। নাথপন্থীদের যোগসাধনাও অপ্রকাশ্য। যৌন-যৌগিক সাধনার আদর্শ যত উচ্চই হোক না কেন সাধারণ সাধকসাধিকাদের হাতে এই সাধনা যৌন ব্যভিচারেমাত্র পর্যবসিত হইয়া পারে। বোধ হয় হইতও যথেষ্ট। একটু আগে চণ্ডীদাসের যে পদাংশটি উদ্ধার করা হইয়াছে তাহাতে ইহার ইঙ্গিত আছে। চণ্ডীদাসের মতো কবিরঞ্জন বিদ্যাপতিও সহজসাধক। কবিরঞ্জন বলিতেছেন

সহজ ভজন সহজাচরণ
এ বড় বিষম দায়।
স্বকাম লাগিয়া লোভেতে পড়িয়া
মিছা সুখ ভুঞ্জে তায় ॥

(তদেব)

বামাচারী তন্ত্রসাধনায় মদ্য, মাংস, মৎস্য মুদ্রা (মঙ্গের চাট) ও মৈথুন (সংক্ষেপে এই পাঁচটি উপাচারকে পঞ্চ 'ম'কার বলা হয়) আবশ্যক। শাস্ত্রমতে পঞ্চ 'ম'-কার সাধনার তাৎপর্য নিগূঢ়। কিন্তু তন্ত্রাচারের নামে ইহার অপব্যবহার হইত। মদ প্রভৃতি তামসিক বস্তু এবং মিথুনাচারের প্রক্রিয়া একত্র হইবার ফলে অনেক সাধকই পঙ্কিলতার আবর্তে পড়িয়া যাইতেন। উচ্চজাতির গুহ্য সাধকরা অনেক সময় নিম্নতর জাতির সাধনসঙ্গিনী গ্রহণ করিতেন। চর্যাগীতি হইতে জানা যায় যে ডোম্বী রাজা ছিলেন কিন্তু তাঁহার সহচরী ছিলেন ডোমকন্যা। কুক্কুরী জাতিতে ব্রাহ্মণ। কিন্তু তাঁহার সাধনসঙ্গিনী পূর্বজন্মে কুক্কুরী ছিলেন। বোধ হয় ইহার অর্থ এই যে তিনি নীচজাতি সম্ভূতা। এইরূপ মিলনের ফলে সাধকের সামাজিক মর্যাদা নষ্ট

হইত। চর্যাগীতির সূত্রে এই ধরণের দুই একটি ঘটনার কথা জানা যায়। কাহ্ণ সম্ভবতঃ কায়স্থজাতীয় ছিলেন, কিন্তু ডোমনী বিবাহ করায় তাঁহার জন্ম ও জাতিনাশ হয়। (আনিসুজ্জামান ১৯৭৬ ঃ ১৮-২০)। 'দোহাকোশে' বিধৃত বিনয়শ্রী রচিত একটি পদে এক ব্রাহ্মণের চণ্ডালনারীর সঙ্গে বসবাস করিবার দরুণ সামাজিক নিন্দা ও ধিক্কারভাজন হইবার কথা আছে (সুকুমার সেন ১৯৫৯ ঃ ৬৮ পৃষ্ঠায় উদ্ধৃত)।

সহজসাধক কবি চণ্ডীদাস ব্রাহ্মণসন্তান বলিয়া প্রসিদ্ধি আছে। তিনি না কি এক ধোবিনীর সঙ্গে সাধনা করিতেন। তরুণীরমন-রচিত 'সহজ উপাসনাতত্ত্ব' নামে একটি ক্ষুদ্র সহজসাধন নিবন্ধে এবং বিষ্ণুপুর (বাঁকুড়া) অঞ্চলে প্রাপ্ত একটি খণ্ডিত পুঁথিতে চণ্ডীদাস-ধোবিনীর কাহিনী পাওয়া গিয়াছে। 'নীচপ্রেমে উন্মাদ', 'কামখেপা' বলিয়া চণ্ডীদাস সমাজে পতিত হন। চণ্ডীদাসের ভাই নকুল ঠাকুর দাদাকে সমাজে তুলিবার জন্য খুব চেষ্টা করিয়াছিলেন। তরুণীরমনের বিবরণ অনুসারে নকুল ঠাকুর ধোবিনীর—এই পুঁথি অনুসারে তাহার নাম রামী—মাহাত্ম্য বুঝিতে পারিয়া সে চেষ্টা ত্যাগ করেন। বিষ্ণুপুরের পুঁথিতে এই কথা নাই। তবে পুঁথি খণ্ডিত বলিয়া গল্পের শেষটা অজ্ঞাত (সুকুমার সেন ১৯৭০ ঃ ১৮১-৮৬)।

চণ্ডীদাসের এই ঘটনা কবে ঘটিয়াছিল তাহা জানিবার উপায় নাই। তবে একদশ-দ্বাদশ শতকের মতো পঞ্চদশ-ষোড়শ শতকে এইরূপ ঘটনা ঘটা বিচিত্র নয়। দ্বাদশ শতকে হলায়ুধ, জীমূতবাহন ও ভট্টদেবের পর বাঙ্গলায় স্মৃতিশাস্ত্র চর্চা বোধ হয় কমিয়া গিয়াছিল। স্মৃতিনিবন্ধ সঙ্কলনের কাজ আবার শুরু হয় পঞ্চদশ শতকে। সম্ভবতঃ রায়মুকুট বৃহস্পতি মিশ্রর 'স্মৃতিরত্নহার' ইহার সূচনা। স্মৃতি-শাস্ত্রচর্চার পূর্ণ বিকাশ হয় রঘুনন্দন ভট্টাচার্যের অষ্টাবিংশতিতত্ত্বে (চক্রবর্তী ১৯৭০ ঃ পরিচ্ছেদ ৪-৮) রঘুনন্দন চৈতন্যদেবের সমসাময়িক। তাঁহার বিধান আজ পর্যন্ত বাঙ্গালী হিন্দুর জীবনযাত্রা নিয়ন্ত্রণ করিয়া আসিতেছে। পঞ্চদশ শতকে নব্য-ন্যায়চর্চায় নবদ্বীপের খ্যাতি প্রতিষ্ঠিত হয়। বাঙ্গলায় বেদান্তচর্চাও প্রসার লাভ করিয়াছিল। এ সবই ব্রাহ্মণ্য সামাজিক শক্তির পুনরভ্যুত্থানসূচক। শিষ্টসমাজ ইহার অনুরাগী ও অনুবর্তী।

তান্ত্রিক আচার অনুষ্ঠান শিষ্টসমাজে বরাবরই আছে। ব্রাহ্মণ্যবাদ বেদভিত্তিক, কিন্তু বৈদিক ধর্মের নীতি অনুসারে ব্রাহ্মণ্যবাদ সমন্বয়পন্থী। সমন্বয় ভাবনার ফলে হিন্দুসমাজের প্রত্যন্তভাগে অবস্থিত বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর মধ্যে প্রচলিত বহু অবৈদিক, অপৌরাণিক ধ্যান-ধারণা, রীতি-নীতি, ক্রিয়াকাণ্ড ব্রাহ্মণ্যবাদী ধর্মের অঙ্গীভূত হইয়া গিয়াছে। বস্তুতঃ ব্রাহ্মণ্যবাদী ধর্ম বৈদিক, পৌরাণিক, তান্ত্রিক উপাদান এবং

দেশাচার ও লোকাচারের সংমিশ্রনে গঠিত। তন্ত্রের কথা বিশেষভাবে বলিতে হয়। তন্ত্রধর্ম মূলতঃ বেদবাহ্য। তবুও কিন্তু ব্রাহ্মণ্যবাদে তান্ত্রিক উপাদানের গুরুত্ব বৈদিক বা পৌরাণিক উপাদানের চেয়ে কিছু কম নয়। বাঙলার নূতন স্মৃতি নিবন্ধকারগণও সমসাময়িক অনেক তন্ত্রাচার স্মৃতিশাস্ত্রবিধির মধ্যে ধরিয়া নিয়াছেন। ষোড়শ শতকের প্রথমার্ধে সঙ্কলিত রঘুনন্দনের নিবন্ধসমূহে বেশ কিছু তান্ত্রিক আচার বৈধ বলিয়া গৃহীত হইয়াছে (বন্দ্যোপাধ্যায় ১৩৬৮ঃ ১৯৮-৯৯)। রঘুনন্দনের সমসাময়িক গোবিন্দানন্দর 'বর্ষাক্রিয়াকৌমুদী' গ্রন্থেও কিছু বৈষ্ণব তান্ত্রিক আচারের স্বীকৃতি আছে (চক্রবর্তী ১৯৮৫ঃ ৩৯)। তবে স্মৃতিশাস্ত্রে তান্ত্রিক আচারগুলিকে আদিরূপে পাওয়া যাইবে না, ব্রাহ্মণ্য স্মৃতির নীতি ও রীতি অনুসারে সংস্কার ও শোধন করিয়া নেওয়া হইয়াছে। ফলে অসামঞ্জস্য চোখে পড়ে না। কিন্তু গূহ্য সাধনপন্থার সঙ্গে ব্রাহ্মণ্য ধ্যানধারণার সামঞ্জস্য হয় নাই, শিষ্ট-সমাজও কখনও ইহাদের মানিয়া নেয় নাই। বৃন্দাবনদাসের কাব্যে দুই জায়গায় (চৈ.ভা. ২।১৯, ৩।২) শাক্ত তান্ত্রিকের—এক জায়গায় বামপন্থী বলিয়া উল্লিখিত—প্রসঙ্গ আছে। 'ন্যাসী হঞা মদ্য পিয়ে স্ত্রীসঙ্গ আচরে' এই জন্য বৃন্দাবনদাস কঠোরভাবে শাক্ত তান্ত্রিকের নিন্দা করিয়াছেন (চৈ.ভা. ২।১৯)। নিত্যানন্দদাস-বিরচিত গৌড়ীয় বৈষ্ণব ঐতিহাসিক কাব্য 'প্রেমবিলাসে'ও মদ্যপায়ী যৌনসাধকদের প্রতি কঠিন ধিক্কার উচ্চারিত হইয়াছে (প্র.বি. ৭ বিলাস)। বৃন্দাবনদাস ও নিত্যানন্দদাসের উক্তি গূহ্যসাধনপদ্ধতি সম্পর্কে শিষ্ট-সমাজের বিরূপ মনোভাবের অভিব্যক্তি বলিয়া ধরিতে পারি। সাধনপদ্ধতির বৈশিষ্ট্য ও শিষ্টসমাজের বিরূপতার দরুণ গূহ্য সাধকদের ধর্মাচরণ ছিল গোপন এবং সমাজবিচ্ছিন্ন। লোকদৃষ্টির অগোচরে তাহাদের সাধনা চলিত। প্রকাশ্যে আসিয়া সামাজিক মর্যাদা লাভের কোন সম্ভাবনা তাহাদের ছিল না। গূহ্য পন্থার আশ্রয়ে সমাজের এক বিরাট অংশের ধর্মাচরণ গোপনতার অন্ধকারে ঢাকা পড়িয়া গিয়াছিল।

চৈতন্যদেব-কথিত প্রেমভক্তি অতীন্দ্রিয় অনুভূতিসঞ্জাত, বিশ্বজনীন সত্তার সঙ্গে অভিন্নতা উপলব্ধির গূঢ়তম আনন্দ। ভাবের দিক দিয়া গূহ্যসাধনা, বিশেষতঃ সহজসাধনা, ভক্তির দিকে অগ্রসর হইতেছিল। ভক্তির পথে প্রেমোপলব্ধির আনন্দ, চৈতন্যপ্রপত্তির এই ভাব গূহ্যপন্থার অনুগামীদের আকৃষ্ট করিয়াছিল। চৈতন্যধর্মের প্রেমসাধনায় সাধনার বিভিন্ন স্তর পার হইয়া ক্রমশ অগ্রসর হইতে হয় না। গোপন যৌন-যৌগিক প্রক্রিয়া ছাড়াই প্রেমভক্তি লাভ করা সম্ভব। দুর্গম, পিচ্ছিল বিবিক্ত পথে ক্রমোন্নতির সাধনা নয়, প্রেম দুরারোহ দুঃসাধ্যও নয়।

প্রকাশ্য সম্মেলক কীর্তনের নৃত্যগীতসঞ্জাত অষ্টসাত্ত্বিক ভাবের উন্মেষ ও তজ্জনিত ভাবোন্মত্ততা হইতে প্রেমের অনুভব জন্মাইবে। অনাড়ম্বর আচারবিরহিত ঋজু পথে এই সাধনা। জাতি, কুল, মান, বিদ্যা, নির্বিশেষে প্রেমলাভের অধিকার অবাধ। প্রত্যেক মানুষই নিজের সত্তার গুণে মুক্তিলাভ করিতে পারে। চৈতন্যপ্রপত্তির এই সব উপাদান গুহ্য সাধনপন্থাসমূহের বিশিষ্ট উপপত্তি। চৈতন্যদেব যে সাধন-পদ্ধতি প্রচার করিলেন তাহাও গুহ্যসাধনপন্থীদের অভিপ্রেত। সম্মেলক কীর্তনে জাতিবিচার নাই, শাস্ত্রীয় আচার অনুষ্ঠানের প্রশ্ন ওঠে না। গুহ্য সাধনপন্থীদের পক্ষে নিজেদের বিশ্বাস বজায় রাখিয়া সর্বজনসমক্ষে প্রকাশ্য ভক্তিসাধনায় যোগ দেওয়ায় বাধা ছিল না। চৈতন্যদেব গুহ্য সাধনপন্থীদের সসম্মানে আত্মপ্রকাশ করার সুযোগ করিয়া দিয়াছিলেন।

চৈতন্যদেবের অন্যতম প্রধান পরিকর নরহরি সরকার ঠাকুর 'শ্রীকৃষ্ণভজনামৃতম্' নামে একটি সাধন গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। এই গ্রন্থে চৈতন্যদেবের মাহাত্ম্য খ্যাপন করিয়া তিনি বলিতেছেন—

> শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যস্তু কৌপীনধারী দীনবেশঃ সন্ন্যাসাশ্রমালঙ্কৃতো-
> ঽত্যন্তদুর্দান্তবলবন্তং মহাবৃষভদুর্ধরণ্যমধ্যাত্মবাদিনং।
> বিষয়ান্ধং কুযোগিনং জড়মজস্রমদ্যপং পাপং চণ্ডালং
> যবনং মূর্খং কুলস্ত্রিয়ঞ্চ প্রেমসিন্ধৌ পাতয়ামাস।

(শ্রীকৃষ্ণভজনামৃতম্, অনুচ্ছেদ ১১)

[শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য কৌপীন ধারণ করিয়া দীনবেশে সন্ন্যাস আশ্রম অলঙ্কৃত করিয়া অসংখ্য দুর্দান্ত বলবান মহাবৃষভের মতো দুর্দমনীয় অধ্যাত্মবাদীকে, বিষয়ান্ধকে, মন্দমতি যোগীকে, নির্বোধকে, মদ্যপকে, পাপীকে, দুরাচারীকে, যবনকে, মূর্খকে এবং কূলবধূকে প্রেমরূপে সাগরে অবগাহন করাইয়াছিলেন।]

চৈতন্যপ্রপত্তি সাধারণ লোকের মধ্যে ব্যাপক প্রসার লাভ করিয়াছিল, নরহরি সরকারের লেখায় তাহারই ইঙ্গিত পাওয়া যাইতেছে। নরহরি উক্তি দেখিয়া মনে হয় একদিকে অধ্যাত্মবাদী অর্থাৎ বৈদান্তিকগণ এবং অন্যদিকে বহু সাধারণ মানুষ ভক্তি আন্দোলনের অংশভাক্ হইয়াছিল। গুহ্য পন্থার অনুগামীরাও ছিল। যোগমার্গী সম্বন্ধে নরহরি মন্দমতি এই বিশেষণ প্রয়োগ করিয়াছেন। ইহার কারণ বোধ হয় গুহ্যসাধন পন্থা সম্পর্কে বিরাগ অথবা যৌন-যৌগিক সাধনা উপলক্ষে যে গ্লানি পুঞ্জীভূত হইয়াছিল তাহার প্রতি বিতৃষ্ণা। চৈতন্যভক্তদের মধ্যে এই রকম মনোভাব বিরল নয়, আরও অনেকের ছিল। কিন্তু চৈতন্যদেবের ঘনিষ্ঠ

পরিকরদের মধ্যেও গুহ্যপন্থার সাধক ছিলেন এবং তাঁহাদের প্রভাবে বা শিষ্যপরম্পরায় চৈতন্যদেবের পরে ভক্তি আন্দোলনের গুহ্যপন্থীদের আগমন অব্যাহত ছিল।

অদ্বৈত আচার্য চৈতন্যপন্থী ভক্তি আন্দোলনের পিতৃস্থানীয় ব্যক্তি। তিনি ছিলেন নবদ্বীপে প্রাক্‌চৈতন্য আদি ভক্তিবাদী গোষ্ঠীর নায়ক। অদ্বৈত আচার্যর নির্বন্ধ্যাতিশয্যেই চৈতন্যদেব আচণ্ডালে প্রেমভক্তি বিতরণের প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন। অদ্বৈত আচার্যর আবার জ্ঞানবাদের দিকেও একটু ঝোঁক ছিল। কিন্তু তন্ত্র ও যোগেও তিনি পারঙ্গম ছিলেন। চৈতন্যদেবের দেহান্ত হইবার কিছু আগে অদ্বৈত আচার্য একটা তরজা প্রহেলী ('বাউলকে কহিয়…' ইত্যাদি তরজাটি অষ্টম পরিচ্ছেদে উদ্ধৃত আছে) রচনা করিয়া জগদানন্দ মারফৎ তাহা নীলাচলে চৈতন্যদেবের কাছে পাঠাইয়া দেন। স্বরূপ দামোদর তরজাটির অর্থ জিজ্ঞাসা করিলে চৈতন্যদেব বলিলেন

প্রভু কহে আচার্য হয় পূজক প্রবল।
আগমশাস্ত্রের বিধি বিধানে কুশল॥
… … …
মহাযোগেশ্বর আচার্য তরজাতে সমর্থ।
আমিহো বুঝিতে নারি তরজার অর্থ॥

(চৈ.চ. ৩৷১৯)

স্বয়ং চৈতন্যদেব অদ্বৈত আচার্যকে আগমশাস্ত্রবিদ ও মহাযোগেশ্বর বলিতেছেন। ভাবিবার কথা। প্রহেলিকা ছাঁদে তরজা পাঠানর ব্যাপারটিও খেয়াল করিতে হইবে। গুহ্যপন্থীরাই সন্ধ্যাভাষায় প্রহেলিকা ছাঁদের পদ্যে গূঢ় কথা ব্যক্ত করিয়া থাকে।

চৈতন্যদেব সর্বসাধারণ্যে ভক্তিপ্রচারের দায়িত্ব দিয়াছিলেন নিত্যানন্দকে। নিত্যানন্দ ছিলেন অবধূত। অবধূতরা তান্ত্রিক সন্ন্যাসী। চৈতন্যদেবের সঙ্গে যোগ দিবার পরও নিত্যানন্দ তান্ত্রিক সংস্রব বজায় রাখিয়াছিলেন। তাঁহার একটি ত্রিপুরেশ্বরী যন্ত্র ছিল। যন্ত্রটি সব সময় তাঁহার সঙ্গেই থাকিত। শেষ জীবনে নিত্যানন্দ স্থায়ীভাবে খড়দহে বাস করিয়াছিলেন। এখানে তিনি ত্রিপুরেশ্বরী যন্ত্র ও তাহার সঙ্গে নীলমাধব শিব প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। নীলমাধব শিব ত্রিপুরা হইতে আনীত। নিত্যানন্দ প্রতিষ্ঠিত শ্যামসুন্দরের দেবালয়ে নিত্যসেবার নিয়ম অনুসারে প্রথমে পূজা পান ত্রিপুরেশ্বরী, তাহার পর নীলমাধব শিব এবং সব শেষে রাধা শ্যামসুন্দরের

যুগল বিগ্রহ। প্রেমদাস প্রণীত 'আনন্দ ভৈরব' নামক নিবন্ধে আছে যে নিত্যানন্দ আড়াই হাজার বৌদ্ধ সন্ন্যাসী ও সন্ন্যাসিনীকে বৈষ্ণব ধর্মে দীক্ষা দিয়াছিলেন। তান্ত্রিক সংসর্গের দরুণ নিত্যানন্দর পক্ষে ইহা সম্ভবপর।

চৈতন্যদেবের তিরোধান হইবার পর বাঙ্গলার চৈতন্যভক্তরা বিভিন্ন গোষ্ঠীতে ভাগ হইয়া পড়েন। সবচেয়ে বড় গোষ্ঠী হয় নিত্যানন্দর নেতৃত্বে। নিত্যানন্দর পরে এই গোষ্ঠীর কর্তৃত্ব পান তাঁহার পত্নী জাহ্নবা দেবী। জাহ্নবা বাঙ্গলার বৈষ্ণব সমাজে প্রথম নারী মহান্ত (গোস্বামিনী বা মা গোস্বামী)। চৈতন্য পরিকর বংশীবদন তাঁহার পিতা ছকড়ি চাটুয্যের আধ্যাত্মিক উত্তরাধিকার নিয়া বৈষ্ণব তান্ত্রিক রসরাজ সাধনা গোষ্ঠী প্রবর্তন করিয়াছিলেন। বংশীবদনের নাতি রামচন্দ্র ছিলেন জাহ্নবার পুত্রকৃতক ও শিষ্য। রামচন্দ্র কালনার কাছে বামনাপাড়ায় (বর্ধমান) রসরাজ উপাসনার গুরুবংশ প্রতিষ্ঠা করিয়া তান্ত্রিক বৈষ্ণব সাধনার একটা বড় গোষ্ঠী তৈরী করেন। এই গুরুবংশের শিষ্য প্রেমদাস মিশ্রর লেখা 'বংশীশিক্ষা' কাব্যে রসরাজ সাধনার সম্যক্ পরিচয় পাওয়া যায়। বামনাপাড়া পাটের আর এক শিষ্য অকিঞ্চনদাস। তাঁহার লেখা 'বিবর্তবিলাস' সহজপন্থী বৈষ্ণবদের প্রধান নিবন্ধগ্রন্থ। 'বিবর্তবিলাস' তান্ত্রিক গুহ্য সাধনার দৃষ্টিতে 'চৈতন্যচরিতামৃত' কাব্যের টীকা।

নিত্যানন্দ গোষ্ঠীতে জাহ্নবার পরে নায়ক হন নিত্যানন্দর ছেলে বীরভদ্র বা বীরচন্দ্র। বৈষ্ণব সহজসাধকদের কাছে বীরভদ্র পরম শ্রদ্ধেয়। বিভিন্ন সহজসাধন নিবন্ধে বীরভদ্র সম্পর্কে অনেক কথা লেখা আছে (গোস্বামী ১৩৭৯ঃ ১৬৬-১৭১)। এই সব নিবন্ধ ছাড়া অন্যসূত্রেও বীরভদ্রর সঙ্গে সহজপন্থী বৈষ্ণব সংশ্রবের ইঙ্গিত পাওয়া যায়। 'নিত্যানন্দ বংশবিস্তার' নামে একটি গ্রন্থে লেখা আছে যে বীরভদ্র তেরশ নেড়াকে শিষ্য করিয়াছিলেন। তাহার পর বীরভদ্র প্রত্যেক নেড়ার জন্য একজন করিয়া যুবতী নিয়া আসিলেন। তেরশ নেড়ার মধ্যে একশ জন স্ত্রীলোক নিয়া সাধনের বিরোধী ছিল। তাহারা গুরুর সঙ্গ ছাড়িয়া দূরে চলিয়া যায়। বাদবাকী নেড়ারা নেড়ীদের সাথে নিয়া বীরভদ্রর অধীনে থাকিয়া গেল (নিত্যানন্দ বংশবিস্তার, ৩ স্তবক)। এই নেড়া নেড়ীরা সম্ভবতঃ বৌদ্ধ অথবা বৈষ্ণব সহজসাধক।

সহজসাধকদের একাংশ মনস্তাত্ত্বিক প্রক্রিয়ার সাধনায় গোপীভাব আরোপ করিয়াছিলেন। কৃষ্ণের জন্য গোপীদের যে একান্ত তন্ময়তা সেই কৃষ্ণপ্রেম লাভই ইঁহাদের সাধনার উদ্দেশ্য। এই লক্ষ্যে উপনীত হইতে হইলে গোপীদের মতো মন থাকা চাই। গোপীদের কৃষ্ণানুরক্তি সম্পূর্ণরূপে কামগন্ধহীন এবং আত্মবোধ-বিরহিত। কৃষ্ণের সুখের জন্যই তাহারা কৃষ্ণপ্রেমে আত্মদান করিয়া থাকে।

মনে পুরুষাভিমান থাকিলে গোপীভাব আশ্রয় করা সম্ভব নয়। তাই এই সাধকরা পুরুষাভিমান বিসর্জন দিয়া গোপীভাবেভাবিত চিত্তে শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গকামনায় ভজন করেন। চৈতন্যদেবের অনেক ভক্ত এই ভাবে সাধনা করিতেন। চৈতন্যদেবের রাধাভাবেও ইহার ইঙ্গিত আছে। চৈতন্যদেব অর্থাৎ গৌরাঙ্গ স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ এই মত অনুসারে তাঁহাকে শ্রীকৃষ্ণের মতো নাগর অর্থাৎ পরমপুরুষ বলিতে বাধা নাই। গৌরাঙ্গরূপ নাগরকে সুখী করিবার জন্য তাঁহার প্রতি প্রেমবশতঃ কান্তাভাবে ভজন করিবার যে প্রণালী চালু হয় তাহার নাম গৌরনাগরবাদ। শ্রীখণ্ড ছিল গৌরনাগরবাদের সবচেয়ে বড় ঘাঁটি। এখানে গৌরনাগরবাদের মুখ্য প্রবক্তা নরহরি সরকার ঠাকুর। নরহরি 'শ্রীকৃষ্ণভজনামৃতম্' গ্রন্থে (অনুচ্ছেদ ১১) বলিতেছেন যে চৈতন্যদেব পুরুষকে নারীতে পরিণত করিয়াছিলেন। সাধকের নাগরীরূপ গৌরনাগরবাদের সারাৎসার। গৌরনাগরবাদ মানসী সহজসাধনার সূক্ষ্মরূপ। কিন্তু শ্রীখণ্ডের সাধনায় তান্ত্রিকতাও ছিল বলিয়া মনে হয়। নরহরি সরকার ঠাকুরের উত্তরাধিকারীরা শ্রীখণ্ডের গৌরনাগরবাদী গুরুবংশ। এই বংশে ত্রিপুরেশ্বরী দেবীর পূজা হইত বলিয়া শোনা যায়। শ্রীখণ্ডের শিষ্য কবিবল্লভ 'রসকদম্ব' গ্রন্থে ত্রিপুরা দেবীকে রাধাকৃষ্ণের আবরণী শক্তি হিসাবে বর্ণনা করিয়াছেন (রসকদম্ব, পৃঃ ৩৮)। শ্রীখণ্ডের আর একজন শিষ্য কবিরঞ্জন বিদ্যাপতি দুইটি পদে ত্রিপুরা দেবীর প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করিয়াছেন (সুকুমার সেন ১৯৭০ ঃ ২১৩)। শ্রীখণ্ড অল্প একটু দূরে বড়ডাঙ্গা। এখানে নরহরি সরকার ঠাকুর ভজন করিতেন। গ্রাম হইতে বড়ডাঙ্গা যাইবার পথে প্রাচীন বটগাছের নীচে পঞ্চমুণ্ডীর আসন আছে। শ্রীখণ্ডের বৈষ্ণবদের কাছে এই আসনটি বিশেষ মাননীয়। প্রতি বছর বড়ডাঙ্গায় নরহরি সরকার ঠাকুরের তিরোভাব তিথিতে গৌর-নরহরি মিলন মহোৎসব হয়। উৎসব উপলক্ষে শ্রীখণ্ডের গৌরাঙ্গ ও গোপীনাথ বিগ্রহ চারদিনের জন্য বড়ডাঙ্গায় আসেন। যাওয়া ও আসার পথে বিগ্রহের চৌদোলা চিরাচরিত প্রথানুযায়ী সোজা পথ ছাড়িয়া বটগাছের নীচে পঞ্চমুণ্ডীর আসনের উপর দিয়া নিয়া যাওয়া হয়।

নীলাচলে চৈতন্যদেবের ঘনিষ্ঠতম পার্ষদদের মধ্যে স্বরূপ দামোদরের নাম অগ্রগণ্য। স্বরূপ দামোদরের পূর্ব ইতিহাস স্পষ্ট নয়। বোধ হয় কোন গুহ্য বৌদ্ধ সাধন গোষ্ঠীর সঙ্গে তাঁহার সংস্রব ছিল। চৈতন্যদেব যুগপৎ কৃষ্ণ ও রাধার অবতার এই সিদ্ধান্ত স্বরূপ দামোদরের নামে চলে। অন্য কাহারও মাথায় এ ভাবনা আসিয়া থাকিতে পারে তবে স্বরূপ দামোদর ইহার তত্ত্ব সংস্থাপক বলিয়া পরিচিত। যুগলাবতার আসলে তান্ত্রিক কল্পনা, দ্বয় হইতে অদ্বয়ে উত্তরণ। বৌদ্ধতন্ত্রে হেরুক ও নৈরাত্মা মিলিয়া যুগনদ্ধ রূপ। শাক্ত ও শৈব তন্ত্রে অর্ধনারীশ্বর

প্রতিমা। যুগলাবতারতত্ত্ব ইহারই বৈষ্ণব রূপান্তর। রাধা ও কৃষ্ণ আসলে এক তবে লীলার জন্য পৃথক। কৃষ্ণ ও রাধার মিলনে দ্বয় অদ্বয়ে পরিণত হয়। রাধার প্রেমে যে মাধুর্য রাধার মতো করিয়া তাহা আস্বাদন করিবার জন্য কৃষ্ণ রাধার ভাবকান্তি নিয়া চৈতন্যরূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন। অতএব চৈতন্যদেব অন্তরে কৃষ্ণ বহিরঙ্গে রাধা। চৈতন্যদেবের মধ্যেই দ্বয় অদ্বয়ের লীলা চলিতেছে। ইহাই যুগলাবতারতত্ত্ব। চৈতন্যদেবের জীবৎকালেই যুগলাবতারতত্ত্ব বাঙ্গলায় খুব চালু হইয়াছিল। পরবর্তীকালে নরোত্তমদাস যে সামঞ্জস্যমূলক ধর্মমত প্রবর্তন করেন তাহার মূল সূত্র যুগলাবতারতত্ত্ব। 'চৈতন্যচরিতামৃত' গ্রন্থে কৃষ্ণদাস কবিরাজ এই তত্ত্ব প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন।

যুগলাবতারতত্ত্ব জনপ্রিয় হইবার কারণ বোধ হয় তন্ত্রসাধনার ঐতিহ্য। যুগলাবতারতত্ত্ব তন্ত্রসাধনার তাত্ত্বিক ছাঁচে গড়া। যাঁহারা পরমপুরুষ ও পরমাপ্রকৃতির মিলনে প্রেমের সন্ধান করেন তাঁহারা যুগলাবতার চৈতন্যদেবের মধ্যে দ্বয়ের মিলনে প্রেমের চরমোৎকর্ষ দেখিতে পাইলেন। মনস্তাত্ত্বিক প্রক্রিয়ার ভাবসাধনায় যুগলাবতারতত্ত্ব চমৎকার খাটিয়া গেল। মিথুনাচারী তান্ত্রিকদের কাছেও এই তত্ত্ব বেশ উপযোগী। যৌন-যৌগিক প্রক্রিয়ায় প্রেমসাধকদের দৃষ্টিতে চৈতন্যদেবের মধ্যে রাধাকৃষ্ণের মিলন পরম আদর্শস্বরূপ

গুহ্য সাধকরা ভক্তিধর্মে আসিয়াছিল ভাবমূলক তত্ত্বচিন্তার সূত্র ধরিয়া। তত্ত্ব সামনে রাখিয়া আসিলেও গুহ্য সাধকরা সকলেই ভাবসাধনার পর্যায়ে উঠিয়া মনশ্চিন্তিত সাধনা করিতেন ইহা ভাবিবার কারণ নাই। সকলের পক্ষে তাহা সম্ভব হইবার কথাও নয়। বোধ করি বেশীর ভাগই এই রকম। ভক্তির ভাব মানিয়া নিয়াও ইহারা আগের মতোই মিথুনাচারী তান্ত্রিক সাধনা করিত। শুদ্ধ ভক্তির পথে মিথুনাচারের স্থান নাই। সেই হিসাবে ভক্তিধর্মের মধ্যে মিথুনাচারী সাধনা অসঙ্গত অযৌক্তিক ব্যাপার। তবুও ইহা চলিয়াছে। দেহ হইতে দেহাতীত প্রেমে উত্তরণ, এই তত্ত্বের আড়াল গোড়াগুড়িই ছিল। কৃষ্ণদাস কবিরাজের 'চৈতন্যচরিতামৃত' হইতে সামঞ্জস্য দেখাইবার কিছু উপায় বাহির করা হইল। কৃষ্ণদাসের মধ্যে বোধ হয় তান্ত্রিক সাধনার একটু রেশ ছিল। তবে সে ভাবের কথা, বিমূর্ত তত্ত্বচিন্তা। সে চিন্তার উপরে আবার গোস্বামী সিদ্ধান্তের প্রলেপ পড়িয়াছিল। কৃষ্ণদাস যে প্রেমের কথা বলিয়াছেন তাহা যৌন-যৌগিক সাধনপথের পরমার্থ নয়। কৃষ্ণদাস গোস্বামী সিদ্ধান্তমতে রাগানুগা সাধনভক্তির দ্বারা কৃষ্ণের প্রতি প্রেমসঞ্চারের কথা বলিয়াছেন। কৃষ্ণের প্রতি গোপীপ্রমুখ কৃষ্ণপরিকরদের স্বাভাবিক স্বতোৎসারিত আকর্ষণের নাম রাগ। কৃষ্ণ পরিকরদের রাগাত্মিক ভাবের অনুগ হইয়া যে ভক্তিসাধনা

তাহাই রাগানুগা সাধনভক্তি। ইহা সম্পূর্ণ অন্তশ্চিন্তিত মানসী সাধনা, ইহাতে দেহসম্বন্ধের ঘুণাক্ষরও নাই। কিন্তু তন্ত্রপ্রভাবিত বৈষ্ণব ভক্তিভাবকদের ঐতিহ্যমতে কৃষ্ণদাস রাধার মনে কৃষ্ণপ্রেমের ঐকান্তিক তীব্রতা ও কৃষ্ণসঙ্গলাভের জন্য উৎকণ্ঠা ব্যক্ত করিয়াছেন নরনারীর আদিরসাত্মক আকর্ষণের প্রতিমান দিয়া। তাও আবার পরকীয়া প্রেমের আধারে। কৃষ্ণদাস বলিতেছেন প্রেমানুভবে পরকীয়া সম্পর্ক অনুত্তর কেননা "পরকীয়া ভাবে অতি রসের উল্লাস"। কৃষ্ণদাস অবশ্য সঙ্গে সঙ্গেই বলিয়াছেন "ব্রজ বিনা ইহার অন্যত্র নাহি বাস" (চৈ.চ. ১।৪)। ব্রজ তো অপ্রাকৃত বৃন্দাবন, মানুষের আয়ত্ত নয়। কিন্তু পরকীয়াবাদের প্রতি কৃষ্ণদাসের পক্ষপাত সহজপন্থী প্রমুখ পরকীয়াবাদীদের কাছে খুবই উৎসাহব্যঞ্জক ঠেকিয়াছিল। তাহারা নিজেদের মতো করিয়া ইহার সোজা ব্যাখ্যা গড়িয়া নিল। সহজ পন্থামতে পরকীয়া সাধনসঙ্গিনীর সাহচর্যই প্রেম সাধনার পক্ষে প্রশস্ত। পরকীয়া ভাবের সাধনায় প্রেমের উদ্বোধ হইলে সাধকের মধ্যেই নিত্যবৃন্দাবনের লীলা চলিতে থাকে। ব্রজ কথাটা এই অর্থে বুঝিতে হইবে। কৃষ্ণদাস একটু আড়াল দিয়া বলিয়াছেন, এই মাত্র। শুধু পরকীয়াদের ব্যাপারে নয়, তত্ত্ববিচারে কৃষ্ণদাস গোস্বামীগ্রন্থের পরিভাষার সঙ্গে সঙ্গে সমরস, সহজ, রসরাজ মহাভাব এই সব গুহ্যপন্থার বিশেষার্থক শব্দ একেবারে পারিভাষিক অর্থে ব্যবহার করিয়াছেন। কয়েকটা উদাহরণ দিয়া বুঝাইতেছি।

প্রভুর সেই আচরণ সেই করি বর্ণন
সহজ বস্তু করি বিবরণ।
যদি হয় রাগোদ্দেশ তাহা হয় আবেশ
সহজবস্তু না যায় লিখন॥

(চৈ.চ. ২।২)

তবে হাসি তারে প্রভু দেখাইলা স্বরূপ।
রসরাজ মহাভাব দুই একরূপ॥

(চৈ.চ. ২।৮)

শব্দের পিছনে যে বিশেষ অর্থ আছে তাহা জ্ঞাপন করিতে না চাহিলে কৃষ্ণদাস কবিরাজ এই ভাবে গুহ্য সাধনার পরিভাষা ব্যবহার করিতেন না। কৃষ্ণদাসের কাছে ইহার তাৎপর্য সম্পূর্ণ ভাবগত। কিন্তু গুহ্য সাধকরা কৃষ্ণদাসের তত্ত্ববিচার নিজেদের পরিপোষক বলিয়া ধরিয়া নিলেন। বৈষ্ণবতান্ত্রিক সহজপন্থীদের দৃষ্টিতে 'চৈতন্যচরিতামৃত' যে শ্রেষ্ঠ শাস্ত্রগ্রন্থের মর্যাদা লাভ করিয়াছে ইহা তাহার অন্যতম কারণ।

সাধনসঙ্গিনী নিয়া তান্ত্রিক আচার গৌড়ীয় বৈষ্ণব ঐতিহ্যসম্মত করিয়া তোলার চেষ্টাও হইয়াছিল। বৈষ্ণব সহজপন্থার মতে পরমপুরুষ রসস্বরূপ কৃষ্ণ নিজরস আস্বাদনের জন্য পুরুষ ও প্রকৃতির দ্বৈতসত্তা নিয়া যুগলমিলনে মিলিত হন। এই মিলনের তাৎপর্য যে উপলব্ধি করিতে পারে সে-ই রসিক। সহজপন্থীদের মতে নিত্য বৃন্দাবনে রাধাকৃষ্ণের লীলা স্মরণ করিয়া যে সাধক আরোপ সাধনা দ্বারা রসোপলব্ধির চেষ্টা করে সে রসিকভক্ত। ভাবের পর্যায়ে অবশ্য আরোপ সাধনার প্রশ্ন ওঠে না। ভাববাদী মতে রসিকভক্তের মানসে রসসাক্ষাৎকার হইয়া থাকে। কৃষ্ণদাস কবিরাজ বার বার শ্রদ্ধার সঙ্গে রসিক ভক্তের উল্লেখ করিয়াছেন। 'চৈতন্যচরিতামৃতে' সাড়ে তিনজন রসিক ভক্তের কথা আছে। রায় রামানন্দ ইঁহাদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ, "পৃথিবীতে রসিকভক্ত নাই তার সম" (চৈ.চ. ২।৭)। রামানন্দ একান্তে তরুণী দেবদাসীদের অঙ্গমার্জনা করিয়া স্নান করাইতেন, তাহাদের বেশভূষা করিয়া দিতেন এবং নাচগানে তালিম দিতেন। কৃষ্ণদাস বলিতেছেন তরুণীস্পর্শে রামানন্দর মনে বিন্দুমাত্র চাঞ্চল্য হইত না কেননা তিনি সম্পূর্ণ নির্বিকার। রামানন্দ ব্রজলীলার প্রকৃত রস জানিয়া প্রেমভক্তি লাভ করিয়াছেন (চৈ.চ. ৩।৫)। সহজপন্থীরা রামানন্দর দেবদাসীসঙ্গ নিজেদের মতানুযায়ী রসিক-ভক্তর লক্ষণ বলিয়া ধরিয়া নিল। বামনাপাড়া পাটের শিষ্য প্রেমদাস মিশ্র প্রণীত 'বংশীশিক্ষা' গ্রন্থে আছে

রামানন্দ রায় বন্দ রসিকভূষণ।
নিভৃতে করিল যে'হ নিগূঢ় ভজন ॥
(বংশীশিক্ষা, ১ উল্লাস)

জয়দেব, চণ্ডীদাস ও বিদ্যাপতির পদগান এবং বিল্বমঙ্গল প্রণীত 'কৃষ্ণকর্ণামৃত' হইতে শ্লোকপাঠ চৈতন্যদেবের পরমপ্রীতিকর ছিল। প্রথম তিনজনের প্রত্যেকেই প্রকৃতি নিয়া সাধনা করিতেন বলিয়া প্রসিদ্ধি আছে। বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাস তো পরকীয়া প্রকৃতি নিয়া সাধনার জন্য বিখ্যাত। রামানন্দর সঙ্গে ইঁহারাও রসিকভক্ত বলিয়া পরিচিত হইলেন। 'কৃষ্ণকর্ণামৃতের' প্রথম শ্লোকে গুরুকে চিন্তামণি অর্থাৎ ইচ্ছাফল দাতা বলা হইয়াছে (চিন্তামণির্জয়তি সোমগিরি গুর্রু র্মে)। অর্থের বিকার ঘটাইয়া চিন্তামণি শব্দটিকে বিল্বমঙ্গলের প্রেমের গুরু সাধনসঙ্গিনীর নাম বলিরা ধরা হইল। এবার চিন্তামণির কারণে বিল্বমঙ্গলও রসিকভক্তের মর্যাদা পাইয়া গেলেন (বি.বি. ৪ বিলাস, সুকুমার সেন ১৯৭৫ঃ ৪৭)। "তাহার পর কৃষ্ণমূর্তির বামপাশে একে একে রাধামূর্তি বসাইয়া যুগলমূর্তি রাধাকৃষ্ণ পূজিত হইতে লাগিল তেমনি একে বড় বড় বৈষ্ণব ভাবক-মহান্তের নামের সঙ্গে এক একটি

সাধনসঙ্গিনীর নাম গাঁথিয়া তান্ত্রিক বৈষ্ণব-উপাসনার রসিকভক্তমালা প্রস্তুতি হইয়া গেল" (উপর্যুক্ত ঃ ৪৮)। এই মালায় বাঁধা পড়িলেন সনাতন গোস্বামী, রূপ গোস্বামী, রঘুনাথ ভট্ট গোস্বামী, রঘুনাথদাস গোস্বামী, গোপাল ভট্ট গোস্বামী, জীব গোস্বামী, লোকনাথ চক্রবর্তী ও কৃষ্ণদাস কবিরাজ (বি.বি. ৪ বিলাস) এমন কি স্বয়ং চৈতন্যদেবও বাদ পড়িলেন না। চৈতন্যদেব স্বয়ং রসরাজ কৃষ্ণ এই যুক্তিতে মহাভাব মিলনের জন্য তাঁহার সঙ্গে বাসুদেব সার্বভৌমের কন্যা শাঠির নাম জুড়িয়া দেওয়া হইল।

ধন্য শাঠি কন্যা সেই ব্রহ্মাণ্ড ভিতরে।
যার সঙ্গে মহাপ্রভু সতত বিহরে ॥

(ত দেব)।

বৈষ্ণব তান্ত্রিক সাধকরা স্বরূপ দামোদরকে তাঁহাদের মতের স্থাপক বলিয়া ধরেন। বৈষ্ণব তন্ত্র সাধনা চৈতন্যদেবের আগেও ছিল। তবে চৈতন্যপন্থায় ইহার তাত্ত্বিক ঠাট বোধ হয় স্বরূপ দামোদরের হাতেই শুরু হয়। সেই জন্য তাঁহার এই মান। স্বরূপ দামোদরকে দিয়া বৈষ্ণব তান্ত্রিক গুরু প্রণালী আরম্ভ। স্বরূপ দামোদর হইতে ভাব পান রূপ গোস্বামী, রূপ হইতে রঘুনাথদাস, রঘুনাথ হইতে কৃষ্ণদাস কবিরাজ।

স্বরূপ রূপ রঘুনাথ এই তিন ভক্ত।
আত্মতত্ত্ব নিয়া যাতে আপন মহত্ব ॥
কবিরাজ চাঁদের মর্ম যাহা হইতে পাই।
একস্থানে নাহি কহি অরসিকেরে ভয়াই ॥
শিক্ষাগুরু কেমনেতে সাধন কেমন।
পরকীয়া ধর্ম আর তত্ত্ব নিরূপণ ॥
... ...
বিবর্তের ধর্ম গোসাঞি স্বরূপ হইতে।
আসিয়া প্রকাশ হইল রসিক ভকতে ॥

(বি.বি. ১ বিলাস)।

কৃষ্ণদাস কবিরাজের 'চৈতন্যচরিতামৃত'কে বৈষ্ণব সহজ সাধকরা সর্বশ্রেষ্ঠ শাস্ত্র গ্রন্থ বলিয়া মনে করেন। কৃষ্ণদাস কবিরাজের শিষ্য মুকুন্দদাস বৈষ্ণব সহজ সাধনার রূপকার বলিয়া খ্যাত। মুকুন্দদাসের লেখা 'সিদ্ধান্তচন্দ্রোদয়' বৈষ্ণব সহজ সাধনার অন্যতম প্রধান নিবন্ধ। আকিঞ্চনদাসের 'বিবর্তবিলাস' 'চৈতন্যচরিতামৃতের' বৈষ্ণব তান্ত্রিক সহজপন্থী টীকা। এই সহজপন্থীরা যুগলাবতাররূপী চৈতন্যদেবকে

কৃষ্ণের সঙ্গে এক ও অভিন্ন বলিয়া মানেন। সেই কারণে 'চৈতন্যচরিতামৃত' গ্রন্থ 'কৃষ্ণলীলা গৌরলীলা একত্রে বর্ণন' (বি.বি. ২ বিলাস)। কৃষ্ণদাস কবিরাজ গূঢ় সত্য লীলাবর্ণনের আবরণ দিয়া আড়াল করিয়া রাখিয়াছেন। 'বির্বতবিলাস' কার টীকা লিখিয়া সেই সত্য প্রকাশ করিতেছেন। তবে যাহা কিছু তিনি লিখিতেছেন সবই কৃষ্ণদাস কবিরাজের কারকতায় কেননা 'মনে বসি হস্তে ধরি লেখে কবিরাজ' (বি.বি. ১ বিলাস)।

সহজমতে রাগমার্গের অর্থ প্রেমরূপ পরমার্থের সন্ধানে পুরুষ ও নারীর মিলিত যৌন-যৌগিক সাধনা। গোস্বামীমতে রাগাত্মিকা ভক্তির যে অর্থ—যে অর্থ নরোত্তমদাস ও কৃষ্ণদাস বুঝিয়াছেন—তাহার সঙ্গে ইহার বিন্দুমাত্র সাদৃশ্য নাই। কিন্তু সহজপন্থী বৈষ্ণবরা বলেন তাঁহাদের পরকীয়াবাদী তান্ত্রিক বির্বত ধর্মের সব নিগূঢ় তত্ত্বই নাকি গোস্বামীদের গ্রন্থে আছে। গোস্বামীরা "ধর্ম প্রকাশিয়া তাহা রাখিলা ঢাকিয়া" (বি.বি. ২ বিলাস)। কৃষ্ণদাস পরকীয়া ভাবের কথায় তাহার কিছুটা আভাস দিয়াছেন। অবশেষে সব কিছু খুলিয়া বলিলেন অকিঞ্চনদাসের মতো নিবন্ধকাররা। এই ভাবে বৈষ্ণব তান্ত্রিকরা ভক্তি আন্দোলনের সবটুকু সহজ সাধনার মধ্যে আত্মসাৎ করিয়া নিবার চেষ্টা করিয়াছেন।

গোস্বামীরা গূঢ় কথা ঢাকিয়া রাখিয়াছেন এইটুকু বলিয়া তাঁহাদের ছাড়িয়া দেওয়া হইয়াছে। কিন্তু কৃষ্ণদাস কবিরাজ ও নরোত্তমদাস অত সহজে রেহাই পান নাই। অনেকগুলি ছোট ছোট সহজসাধন নিবন্ধ নরোত্তমদাস ও কৃষ্ণদাস কবিরাজের নামে চালু আছে। নরোত্তমদাসের নামে প্রচলিত নিবন্ধ : দেহকড়চ, স্মরণমঙ্গল, স্বরূপকল্পতরু, ছায়াতত্ত্ববিলাস, বস্তুতত্ত্ব, কিশোরী ভজনের পদ, ভজননির্দেশ, আশ্রয় নির্ণয়, রাধাতত্ত্ব, রাগমালা, মঙ্গলারতি ইত্যাদি (সুকুমার সেন ১৯৫৯ : ৪৩৭-৩৮)। কৃষ্ণদাস কবিরাজের নামে প্রচলিত নিবন্ধ : আত্মজিজ্ঞাসা, আত্মনিরূপন, আত্মসাধন, আদ্যচিন্তামণি, আশ্রয়নির্ণয়, কিশোরীমঙ্গল, নিগূঢ়তত্ত্বসার, স্বরূপবর্ণন, রসময়চন্দ্রিকা, রসকদম্বলিকা ইত্যাদি (সুকুমার সেন ১৯৭৫ : ৫০-১)।

নিবন্ধগুলি কাহার লেখা জোর করিয়া বলার উপায় নাই। তবে রচনার ভার ও ভাষা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই কাঁচা। নরোত্তমদাসের মতো উঁচুদরের ভাবক ও কবি এবং কৃষ্ণদাস কবিরাজের মতো বিদগ্ধ গ্রন্থকারের হাত দিয়া এই রকম রচনা বাহির হইতে পারে বিশ্বাস করা কঠিন। সাধারণতঃ বলা যায় যে এই সব নিবন্ধের প্রামাণিকতা সন্দিগ্ধ। প্রমাণিক বলিয়া প্রচার করিবার উদ্দেশ্যেই এগুলি নরোত্তম ও কৃষ্ণদাসের নামে চালাইয়া দেওয়া হইয়াছে। তবে কিছু সূত্র না পাইলে ইহা সম্ভব হইত না। যুগলাবতারতত্ত্ব একটা সূত্র। 'চৈতন্যচরিতামৃতে' গূহ্য সাধনার

ভাব ও পরকীয়াবাদের কথা আছে, এও একটা সুবিধা বটে। নরোত্তমদাসের ক্ষেত্রে সুবিধা হইয়াছে তাঁহার সামঞ্জস্যমূলক ধর্মমত। ইহার মধ্যে সহজপন্থী মতের একটু মিশেল আছে। এই সব সূত্র ধরিয়া সহজপন্থীরা নরোত্তম দাস ও কৃষ্ণদাস কবিরাজকে পুরাপুরি দলে টানিয়াছেন।

নরোত্তমদাস গৌরপারম্যবাদ, গোস্বামী সিদ্ধান্ত ও সহজপন্থীমতের সামঞ্জস্য করিয়া যে ধর্মমত খাড়া করিয়াছিলেন সহজ সাধকরা সেই মতের আশ্রয়ে থাকিয়া চৈতন্যপন্থী বৈষ্ণব ধর্মের মধ্যে নিজেদের প্রতিষ্ঠা গড়িয়া তুলিবার চেষ্টা করিতেছিলেন। সহজপন্থীরা "পরতত্ত্ব শ্রীচৈতন্য উপাস্য" (বি.বি. ৩ বিলাস) বলিয়া বিশ্বাস করিতেন। আবার "গোস্বামী ধর্ম স্থায়ী স্থিতির নিদ্ধার" (বি.বি. ১ বিলাস) বলিয়াও মানিতেন। সবটাই অবশ্য নিজেদের ছাঁচে ফেলিয়া। এই চিন্তার একটা ধারা গড়িয়া উঠিয়াছিল। গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মমতের চমৎকার সহজপন্থী ব্যাখ্যা পাওয়া যাইবে প্রেমদাস মিশ্রর লেখা 'বংশী শিক্ষা' গ্রন্থে। চৈতন্যদেবের ভগবত্তা ও গোস্বামী সিদ্ধান্ত স্বীকার করার ফলে চৈতন্যধর্মের আদি প্রেমভক্তিবাদীদের ও গোস্বামীমতের অনুগামী নৈষ্ঠিক বৈষ্ণবদের সঙ্গে সহজপন্থীদের মেলামেশার পথ সবসময়ই খোলা ছিল। এই কারণে তন্ত্রাচার বজায় রাখিয়াও সহজপন্থীরা গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মে প্রবেশ করিতে করিয়াছে। একেবারে প্রথম হইতে সহজপন্থীরা ভক্তিবাদী আন্দোলনের মধ্যে থাকায় গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মে তাহাদের প্রভাব অবিশ্লেষ্যভাবে জড়াইয়া আছে।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

নিত্যানন্দর প্রচারপরিক্রম ও প্রভাব

চৈতন্যপ্রপত্তির সবচেয়ে বড় প্রচারক নিত্যানন্দ। সন্ন্যাস নিবার আগে চৈতন্যদেব সাধারণ্যে ভক্তিধর্ম প্রচারের দায়িত্ব দিয়াছিলেন নিত্যানন্দ ও হরিদাস ঠাকুরকে। ইঁহারা দুইজনে নবদ্বীপের পথে পথে ঘুরিয়া কীর্তন করিয়া বেড়াইতেন। কাটোয়ায় সন্ন্যাস নেওয়া এবং তাহার পর রাঢ় অঞ্চল ও শান্তিপুর হইয়া নীলাচল আসা পর্যন্ত নিত্যানন্দ চৈতন্যদেবের প্রায় সর্বসময়ের সঙ্গী ছিলেন। সন্ন্যাসের পর চৈতন্যদেব দুইবার বাঙ্গলায় আসিয়া কীর্তন ও ভক্তিধর্ম প্রচারের বন্দোবস্ত করিয়াছিলেন। দুই বারই নিত্যানন্দ তাঁহার সহচর ছিলেন। চৈতন্যদেবের প্রচার ও সংগঠন গড়িবার প্রচেষ্টা নিত্যানন্দ তাঁহার পাশে থাকিয়া দেখিয়াছেন। অন্য কোন চৈতন্যপরিকরের এই সুযোগ হয় নাই।

১৫১৫ সালে চৈতন্যদেব বৃন্দাবন হইতে বাঙ্গলা ঘুরিয়া নীলাচলে ফিরিলে নিত্যানন্দ তাঁহার সহগামী হইয়া চলিয়া আসেন। এই বছর রথযাত্রার সময় অদ্বৈত আচার্য চৈতন্যকীর্তন করিয়াছিলেন। বাঙ্গলার ভক্তরা চলিয়া গেলে চৈতন্যদেব একদিন

নিত্যানন্দং সমালিঙ্গ্য ধৃত্বা তস্য করদ্বয়ম্।
প্রাহ সগদ্‌গদং যাহি গৌড়দেশং তমীশ্বরম্ ॥
তব দেহংবিজ্ঞানীয়াদ্বিশ্বাসভরণং মম।
এতজ্‌জ্ঞাত্বা যথেচ্ছং ত্বং কর্তুমর্হসি হি প্রভো ॥
মূর্খনীচজড়ান্ধাখ্যা যে চ পাতকিনোঽপরে।
তানেব সর্বথা সর্বান্ কুরু প্রেমাধিকারিণঃ।

তমিতি প্রহসন্ প্রাহ নর্ত্তকোহহং তব প্রভো।
করিষ্যামি যথাজ্ঞা তে যতস্ত্ব সূত্রধারকঃ ॥

(কড়চা, ৪।২১৮-১১)

[নিত্যানন্দকে আলিঙ্গন করিয়া, তাঁহার দুই হাত ধরিয়া ঈশ্বর (চৈতন্যদেব) গদগদ কণ্ঠে বলিলেন, গৌড়দেশে (বাঙ্গলায়) যাও। তোমার এই দেহ (অর্থাৎ তুমি) আমার একমাত্র বিশ্বাসস্থল। প্রভো! এই কথা জানিয়া তুমি যাহা ইচ্ছা করিতে পার। মূর্খ, নীচ, জড়, অন্ধ ও মহাপাতকীগণকে তথা সকলকেই তুমি সর্বথা প্রেমাধিকারী কর। ইহাতে (নিত্যানন্দ) হাসিয়া বলিলেন, প্রভো! আমি তোমার নর্তক তুমি সূত্রধারক)। (তোমার) যেরূপ আজ্ঞা তাহাই পালন করিব।]

এই সব কথাবার্তার পরও নিত্যানন্দ বোধ হয় বাঙ্গলায় যাইতে ইতস্তত করিতেছিলেন। অনন্তর চৈতন্যদেব ভক্তগণকে সঙ্গে নিয়া পুনরায়, এবার একটু জোর দিয়াই, নিত্যানন্দকে বলিলেন

পূর্ব্বং যৎ কথিতং তচ্চ কর্ত্তব্যং ভবতা কিল।
গচ্ছং গৌড়ং হি তৎ শ্রুত্বা স জগাম হসন্ প্রভুঃ ॥

(কড়চা, ৪।২২।২)

[আগে (তোমাকে) যাহা বলিয়াছি তাহাই তোমাকে করিতে হইবে, তুমি গৌড়ে যাও। ইহা শুনিয়া তিনি (নিত্যানন্দ) সহাস্যে গমন করিলেন।]

বাঙ্গলায় আসিয়া নিত্যানন্দ অনুগামীদের সঙ্গে নিয়া গঙ্গার তীরে ভক্তদের বাড়ী বাড়ী ঘুরিয়া কীর্তন করিতে লাগিলেন (কড়চা, ৪।২১৩-২৫, ৪।২২।১-২৫)।

চৈতন্যদেব বুঝিয়াছিলেন যে তাঁহার পরিকরদের মধ্যে সাধারণ্যে ভক্তি ধর্মের বাণী ও কীর্তন প্রচারে নিত্যানন্দ যোগ্যতম। নিত্যানন্দ বাঙ্গলায় থাকিয়া একাগ্র-চিত্তে নিরবচ্ছিন্ন প্রচারে ব্যাপৃত থাকুন ইহাই ছিল চৈতন্যদেবের অভিপ্রায়। রথযাত্রা উপলক্ষে নিত্যানন্দের নীলাচল আসাও তাঁহার মনঃপুত ছিল না। বাঙ্গলা হইতে নীলাচলে আসা এবং চাতুর্মাস্য যাপন করিয়া ফেরত যাইতে প্রায় ছয় মাস লাগিয়া যাইত। প্রচারে এতদিন ছেদ বোধ হয় চৈতন্যদেবের পছন্দ হয় নাই।

নিত্যানন্দে কহে প্রভু শুনহ শ্রীপাদ।
এই আমি মাগি তুমি করহ প্রসাদ ॥
প্রতিবর্ষ নীলাচলে তুমি না আসিবা।
গৌড়ে রহি মোর ইচ্ছা সকল করিবা ॥
তাহাঁ সিদ্ধ করে হেন অন্য না দেখিয়ে।
আমার দুষ্কর কর্ম তোমা হৈতে হয়ে ॥ (চৈ.চ. ২।১৬)

নিত্যানন্দ প্রচার পরিক্রমণের বিশদ বিবরণ দিয়াছেন বৃন্দাবনদাস। 'চৈতন্য-ভাগবত' কাব্যে চৈতন্যদেব নিত্যানন্দকে প্রচারের জন্য বাঙ্গলায় যাইতে নির্দেশ দিয়া বলিলেন—

প্রতিজ্ঞা করিয়া আছি আমি নিজমুখে।
মূর্খ নীচ দরিদ্র ভাসাব প্রেমসুখে॥
তুমিও থাকিলা যদি মুনিধর্ম্ম করি।
আপন উদ্দামভাব সব পরিহরি॥
তবে মূর্খ নীচ যত পতিত সংসার।
বোল দেখি আর কেবা করিব উদ্ধার॥
... ...
এতেক আমার বাক্য সত্য যদি চাও।
তবে অবিলম্বে তুমি গৌড়দেশে যাও॥
মূর্খ নীচ পতিত দুঃখিত যত জন।
ভক্তি দিয়া কর গিয়া সভার মোচন॥

চৈতন্যদেবের নির্দেশে নিত্যানন্দ নীলাচল হইতে বাঙ্গলায় ফিরিয়া গেলেন। তাঁহার সঙ্গে চলিলেন রামদাস (অভিরাম গোস্বামী), গদাধরদাস, রঘুনাথ বৈদ্য, কৃষ্ণদাস পণ্ডিত ও পুরন্দর পণ্ডিত। পানিহাটিতে রাঘব পণ্ডিতের বাড়ী হইতে প্রচার পরিক্রমা শুরু। সেখানে নিত্যানন্দ

নিরন্তর পরানন্দে করেন হুঙ্কার।
বিহ্বলতা বই দেহে বাহ্য নাহি আর॥
নৃত্য করিবারে ইচ্ছা হইল অন্তরে।
গায়ক সকল আসি মিলিল সত্বরে॥
সুকৃতি মাধব ঘোষ কীর্ত্তনে তৎপর।
হেন কীর্ত্তনীয়া নাহি পৃথিবী ভিতর।
... ...
মাধব গোবিন্দ বাসুদেব তিন ভাই।
গাইতে লাগিল নাচে ঈশ্বর নিতাই॥
... ...
নিরবধি হরি বলি করেন হুঙ্কার।
আছাড় দেখিতে লোকে লাগে চমৎকার॥

যারে করেন দৃষ্টি নাচিতে নাচিতে।
সেই প্রেমে ঢলিয়া পড়েন পৃথিবীতে॥

পানিহাটিতে তিনমাসকাল কীর্তন করিয়া নিত্যানন্দ পার্ষদগণ সহ বাহির হইয়া গঙ্গার কূলে কূলে ঘুরিতে লাগিলেন

জাহ্নবীর দুই কূলে আছে যত গ্রাম।
সর্ব্বত্র ফিরেন নিত্যানন্দ জ্যোতির্ধাম॥
... ...
প্রেমভক্তি বিকারের আছে যত নাম।
সব প্রকাশিয়া নৃত্য করে অনুপাম॥
যে দিগে চাহেন নিত্যানন্দ প্রেমরসে।
সেই দিগে স্ত্রীপুরুষ কৃষ্ণসুখে ভাসে।

নিত্যানন্দ পার্ষদগণ সহ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য সংকীর্তন গাহিতেন। চারদিকে ধ্বনি উঠিত 'হরিবোল', 'শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য জয় নিত্যানন্দ।'

নিত্যানন্দের প্রচারকালে কীর্তন সবচেয়ে জমিয়া উঠিয়াছিল সপ্তগ্রামে। চুঁচুড়া সহরের মাইল চারেক উত্তরপশ্চিমে সরস্বতী নদীর তীরে অবস্থিত সপ্তগ্রাম ছিল সেকালে বাঙ্গলার অন্যতম প্রধান বৈদেশিক নৌ-বাণিজ্য বন্দর। ব্যবসা বাণিজ্য উপলক্ষে এখানে অনেক সুবর্ণবণিক, গন্ধবণিক, তাম্বুলীবণিক, কংসবণিক বাস করিত। সপ্তগ্রামের বেণেরা হইল নিত্যানন্দের প্রধান অনুরাগী। বেণেরা সব আসিয়া জুটিলে

সপ্তগ্রামে মহাপ্রভু নিত্যানন্দ রায়।
গণসহ সঁকীর্ত্তন করেন লীলায়॥
সপ্তগ্রামে যত হৈল কীর্ত্তন বিহার।
শত বৎসরেও তাহা নারি বর্ণিবার॥
পূর্ব্বে যেন সুখ হৈল নদীয়া নগরে।
সেই মত সুখ হৈল সপ্তগ্রাম পুরে॥
রাত্রি দিনে ক্ষুধা তৃষ্ণা নাহি নিদ্রা ভয়।
সর্ব্বদিগ হৈল হরিসঙ্কীর্ত্তনময়॥
প্রতি ঘরে ঘরে প্রতি নগরে চত্বরে।
নিত্যানন্দ মহাপ্রভু কীর্ত্তন বিহারে॥

(উপর্যুক্ত বিবরণের জন্য দ্রষ্টব্য চৈ.ভা. ৩।৫, ৬।৭)।

বৃন্দাবনদাসের বিবরণে আছে নিত্যানন্দ উত্তরে নবদ্বীপ হইতে দক্ষিণে গদাধর-দাসের বাড়ী এঁড়েদহ (কলিকাতার উত্তরে উত্তর চব্বিশ পরগনা) পর্যন্ত ঘুরিয়া প্রচার করিয়াছিলেন। মধ্যে কয়েকটি জায়গার নাম বৃন্দাবনদাস করিয়াছেন ঃ পানিহাটি, খড়দহ, ত্রিবেণী, সপ্তগ্রাম, শান্তিপুর, কুলিয়া, খানাযোড়া, বড়গাছি ও দোগাছিয়া। সবগুলি জায়গাই জানা। জয়ানন্দর বিবরণ অনুসারে নিত্যানন্দর প্রচারক্ষেত্রটি আর একটু বড়। যে সব জায়গায় নিত্যানন্দ গিয়াছিলেন তাহার একটা তালিকা জয়ানন্দ দিয়াছেন।

গঙ্গার দুকুলে গ্রাম রম্যস্থান।
জথা জথা নিত্যানন্দের হইল অধিষ্ঠান ॥
আদৌ পানিহাটি আর আকনা মাহেশ।
পূণ্যভূমি সপ্তগ্রাম মধ্য রাঢ় দেশ ॥
আগরপাড়া কুমারহট্ট চৌহাটা।
খড়দহ কোঠনা তাম্মুলিত পাথরঘাটা ॥
হাথ্যাগড় ছত্রভোগ বরাহনগর।
কোতরঙ্গ বানেদিরঙ্গ চাতড়া মনোহর ॥
হাথিকান্দা পাঁচপাড়া বেতড়ি বুড়ন।
অম্বুয়া বড়গাছি কাঁচড়াপাড়া সুপত্তন।
কাশিআই পণ্ডাগাঁড়ি যাজহ কালিয়া।
খানা কুলিয়া চৌড়া দোগাছিয়া ॥
নিমদা চৌয়ারিগাছা উদ্ধারণপুর নৈহাটি।
বসই বেনেড়া খণ্ড হাটাই চরখি ॥

(জয়ানন্দ, চৈ.ম. ৮।৭।১-৭)

জয়ানন্দ যে সব জায়গার নাম করিয়াছেন তাহার মধ্যে এই কয়েকটির অবস্থান জানা যায় নাই ঃ কোঠনা, বানেদিরঙ্গ, হাতিকান্দা, যাজহ, বেনেড়া ও হাটাই। বাদ বাকী জায়গাগুলি ধরিলে দেখা যায় নিত্যানন্দর প্রচারক্ষেত্র সুবিস্তৃত ঃ উত্তরে মুর্শিদাবাদ জেলার অন্তর্গত চৌয়ারিগাছা হইতে দক্ষিণে সুন্দরবনের মধ্যে আদিগঙ্গার মোহনায় ছত্রভোগ ও হাতিয়াগড় পর্যন্ত ইহার প্রসার। নিত্যানন্দ পূর্বদিকে প্রচার-যাত্রায় গিয়াছিলেন বুড়ন (যশোহর জেলা, বাংলাদেশ) পর্যন্ত এবং পশ্চিমদিকে তমলুক (মেদিনীপুর, তাম্মুলিতকে তমলুক ধরিতেছি) ও খানাকুলিয়া অর্থাৎ খানাকুল (হুগলী) অবধি। অধিকাংশ স্থানই ভাগরথী তীরবর্তী বা এক দুইদিনের হাঁটাপথ। উত্তর হইতে শুরু করিলে প্রথমে চৌয়ারিগাছা, কাটোয়ার পাঁচশ মাইল

উত্তরে ভাগীরথীর তীরে অবস্থিত। চৌয়ারিগাছা হইতে প্রায় বাইশ মাইল দক্ষিণে নামিলে ভাগীরথী তীরবর্তী নৈহাটি। কাটোয়ার (বর্ধমান) তিনমাইল উত্তরে নৈহাটি ও তাহার দক্ষিণে উদ্ধারণপুর। তাহার পর বর্ধমান জেলাতেই কাটোয়ার সাত মাইল উত্তর-পশ্চিমে অজয় নদের তীরে চরখি, কাটোয়ার পাঁচ মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে খণ্ড (শ্রীখণ্ড) এবং কাটোয়া হইতে মাইল চৌদ্দ দক্ষিণপূর্বে নিমদা। এখান হইতে বার মাইল দক্ষিণপূর্বে গেলে নবদ্বীপ। চৌড়া বা খানচৌড়া নবদ্বীপ সন্নিহিত। এই গ্রাম খানাজোড়া নামেও পরিচিত। বৃন্দাবনদাস খানা-জোড়ার নাম করিয়াছেন। নবদ্বীপ হইতে মাইল কুড়ি উত্তরপূর্বে দোগাছিয়া (নদীয়া) এবং ষোল মাইল দক্ষিণে গঙ্গা নদীর তীরে অম্বুয়া বা কালনা (বর্ধমান)। কালনা ছাড়াইয়া দক্ষিণের দিকে গেলে পাঁচপাড়া (হুগলী), বলাগড়ের দেড় মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে অবস্থিত। ইহার পর পণ্ডগাঁড়ি (হুগলী)। এই গ্রামটি পাণ্ডুয়ার দুই মাইল উত্তর-পশ্চিমে এবং গঙ্গার তীর হইতে পনেরো-ষোল মাইল পশ্চিমে (ইহার কাছাকাছি পাঁচপাড়া নামে আর একটা গ্রাম আছে)। বলাগড় হইতে ভাগীরথী বাহিয়া মাইল দশেক দক্ষিণে ত্রিবেণী। ইহার দক্ষিণপশ্চিম দিকে লাগোয়া সপ্তগ্রাম। ত্রিবেণী হইতে দক্ষিণপূর্বে একটু নামিলে গঙ্গার বাম তীরে কাঁচরাপাড়া (নদীয়া)। আরও খানিকটা গেলে গঙ্গার পশ্চিমতীরে পর পর পড়িবে চাতরা, আকনা ও মাহেশ (তিনটিই শ্রীরামপুর সহরের আশপাশে, হুগলী), কোতরঙ্গ (উত্তরপাড়ার উত্তরদিকে লাগোয়া, হুগলী) এবং উত্তরপাড়ার দেড়মাইল উত্তরপশ্চিমে বসই। মাহেশের পর গঙ্গার পূর্বতীরে পানিহাটি, খড়দহ, আগরপাড়া ও বরাহনগর (চারটি জায়গাই উত্তর চব্বিশ পরগনায়)। অতঃপর কলিকাতার হেস্টিংস এলাকার উল্টো দিকে গঙ্গার পশ্চিমতীরে বেতাড় (বেতড়, হাওড়া সহরের অংশ)। কলিকাতা হইতে আদিগঙ্গা ধরিয়া দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার ভিতর গেলে চৌহাটি (সোনারপুরের কাছে), কালিয়া (ছত্রভাগের কিছুটা উত্তরপশ্চিমে), ছত্রভোগ এবং তাহার কিছুটা দক্ষিণপশ্চিমে হাথ্যাগড় বা হাতিয়াগড়। দুইটি জায়গার কথা এখনও বাদ আছে, কাশিআই এবং পাথরঘাটা। অনুমান করি কাশিআই বর্তমান কাটোয়া রেল স্টেশনের উত্তরদিকে অবস্থিত কেশিয়া। পাথর-ঘাটা নাম অনেক জায়গায় পাওয়া যায়। সম্ভাব্য স্থান দুইটি। একটি কালনার চার মাইল দক্ষিণে গঙ্গার পশ্চিম তীরে। আর একটি পাথরঘাটা মেদিনীপুর জেলায় কেলেঘাই নদীর তীরে। ইহার বিষয় আগেই বলা হইয়াছে।

বৃন্দাবনদাস যে সব জায়গার নাম করিতেছেন তাহার মধ্যে পানিহাটি, দোগাছিয়া, চৌড়া ও সপ্তগ্রাম ও খড়দহ জয়ানন্দের তালিকাতেও আছে। নবদ্বীপ,

শান্তিপুর, কুলিয়া ও বড়গাছির উল্লেখ জয়ানন্দ করেন নাই। তবে এই জায়গাগুলি জয়ানন্দ-কথিত অঞ্চলের মধ্যেই পড়ে। বড়গাছি বাদে অন্য তিনটি স্থান ভাগীরথী তীরবর্তী। বড়গাছি দোগাছিয়ার উত্তরে, একটা গ্রাম পরে।

উপর্যুক্ত স্থানগুলি ছাড়া নিত্যানন্দ গাঙীবনগর (নদীয়া) ও নিত্যানন্দপুরে (হুগলী) প্রচার করিতে গিয়াছিলেন বলিয়া জানা যায়। গাঙীবনগর কৃষ্ণনগর হইতে চোদ্দ মাইল পূর্বে। এখানকার নিত্যানন্দতলী নিত্যানন্দের স্মারক। নিত্যানন্দপুর সপ্তগ্রামের কাছে। এখানে শ্রীধর ও বাণীনাথ নামে দুই ভাই, বিত্তবান সুবর্ণবণিক, বাস করিতেন। দুইজনেই নিত্যানন্দর পরম অনুরাগী।

নিত্যানন্দর প্রচার ক্ষেত্রটি বেশ বিস্তৃত অঞ্চল। জয়ানন্দ বলিতেছেন এই অঞ্চলের

গ্রামে গ্রামে নগরে নগরে সেবক প্রতি ঘরে।
চৈতন্যআনন্দে নিত্যানন্দ নৃত্য করে।

(উপর্যুক্ত, ৮।৭।১৬)

চৈতন্যদেবের তিরোভাব হইবার সময় নিত্যানন্দ প্রচার পরিক্রমণে রত ছিলেন। দুঃসংবাদ শুনিয়া তিনি মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন (জয়ানন্দ, চৈ.ম. ৯।১৫৪)। তাহার পর

চৈতন্য-বিচ্ছেদে নিত্যানন্দ অনুক্ষণ।
চৈতন্য-বিজয় বিনে না করে শ্রবণ ॥
নিত্যানন্দে প্রবোধিয়া সর্ব্ব পারিষদ।
চৈতন্যানন্দে নাচে কীর্ত্তন সম্পদ ॥

(তখন নিত্যানন্দ বলিলেন)

নিত্যানন্দস্বরূপ জদি নাম ধরোঁ।
আচণ্ডাল আদি জদি বৈষ্ণব না করোঁ ॥
জাতিভেদ না করিমু চণ্ডাল যবনে।
প্রেমভক্তি দিআ সভাএ নাচামু কীর্ত্তনে ॥
... ...
কুলবধূ নাচাইমু কীর্ত্তনানন্দে।
অন্ধ বধির পঙ্গু নাচিব স্বচ্ছন্দে ॥
গাওয়াইমু চৈতন্য নুঙাএমু চৈতন্য।
গৌড় উৎকল রাজ্য করামু ধন্য ধন্য ॥

(উপর্যুক্ত ৯।১৫৬-১৬২)

আধ্যাত্মিক জীবনের শুরুতে চৈতন্যদের প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন যে আচণ্ডাল সকলের—স্ত্রী, শূদ্র, মূর্খ, দরিদ্র পতিতজনের মধ্যে দরিদ্র পতিতজনের—মধ্যে ভক্তি বিতরণ করিয়া তাহাদের কৃষ্ণপ্রেমে উদ্বুদ্ধ করিবেন। সন্ন্যাস নিয়া নীলাচলে চলিয়া যাইবার পর বাঙলায় থাকিয়া এই সত্যপালনের দায়িত্ব দিয়াছিলেন নিত্যানন্দকে। নিত্যানন্দ নিষ্ঠাভরে দায়িত্ব পালন করিতেছিলেন। চৈতন্যদেবের তিরোধানের পর সামাজিক ভেদজ্ঞান পরিহার করিয়া সর্বজনের মধ্যে সমভাবে ভক্তি প্রচারই হইল নিত্যানন্দের জীবনের ব্রত। আমৃত্যু (আনুমানিক ১৫৪১-৪২) তিনি এই ব্রত উদ্‌যাপন করিয়া গিয়াছেন। ১৫১৫ খ্রীষ্টাব্দে শুরু হইয়াছিল ধরিলে নিত্যানন্দর প্রচারকাল প্রায় সাতাশ বৎসরব্যাপী।

প্রচার পরিক্রমণের বিবরণের প্রসঙ্গে বৃন্দাবনদাস নিতানন্দের সাঁইত্রিশ জন অনুগামীর নাম করিয়াছেন। অনুমান করি ইঁহারা নিত্যানন্দর প্রচারকার্যের সহায়ক। বৃন্দাবনদাসের তালিকায় আছেন রামদাস (অভিরাম), মুরারি চৈতন্যদাস, সুন্দরানন্দ, রঘুনাথ বৈদ্য, মকরধ্বজ কর, কালিয়া কৃষ্ণদাস, পরমেশ্বরদাস, কমলাকর পণ্ডিত, গৌরীদাস পণ্ডিত, ধনঞ্জয় পণ্ডিত, পুরন্দর পণ্ডিত, বলরামদাস, যদুনাথ কবিচন্দ্র, জগদীশ পণ্ডিত, মহান্ত আচার্যচন্দ্র, মহেশ পণ্ডিত, পুরুষোত্তম পণ্ডিত, তিন ভাই গোবিন্দ ঘোষ, মাধবানন্দ ঘোষ ও বাসুদেব ঘোষ, পরমানন্দ গুপ্ত, আচার্য বৈষ্ণবানন্দ, পরমানন্দ উপাধ্যায়, উদ্ধারণ দত্ত, দেবানন্দ, নারায়ণ, চতুর্ভুজ পণ্ডিত ও তাঁহার পুত্র গঙ্গাদাস, জীব পণ্ডিত, গদাধরদাস, বড়গাছির কৃষ্ণদাস, বিপ্র কৃষ্ণদাস, সদাশির কবিরাজ, ও তাঁহার পুত্র পুরুষোত্তমদাস, কৃষ্ণদাস, মনোহর এবং রাঘব পণ্ডিত (চৈ.ভ. ৩।৬)।

জয়ানন্দর কাব্যে নিত্যানন্দর তেতাল্লিশ জন অনুগামীর তালিকা আছে (জয়ানন্দ, চৈ.ম. ৮।৭।১৮-৫৫)। বৃন্দাবনদাসের তালিকাভুক্ত গোবিন্দ ঘোষ, কৃষ্ণদাস পণ্ডিত, বড়গাছির কৃষ্ণদাস, বিপ্র কৃষ্ণদাস, সদাশিব কবিরাজ, গঙ্গাদাস এবং কৃষ্ণদাসের নাম জয়ানন্দর তালিকায় নাই। বৃন্দাবনদাসের তালিকায় অনুল্লিখিত যে কয়জনের নাম জয়ানন্দ করিতেছেন তাঁহারা হইলেন জগদীশ, হিরণ্য, পুরুষোত্তম দত্ত, চিরঞ্জীব কৃষ্ণদাস, রামদাস, (মীনকেতন ?), পরমেশ্বর পুরী, নন্দন আচার্য, বংশীবদন, নরহরিদাস, রঘুনন্দন, ছাওয়াল কৃষ্ণদাস, শ্রীগর্ভ পণ্ডিত। দুই তালিকাতেই যে ঊনত্রিশ জনের নাম আছে তাঁহারা বাদে বৃন্দাবনদাসের তালিকাতে সাতজন আর জয়ানন্দর তালিকায় বার জনের উল্লেখ পাওয়া যায়। তাহা হইলে সাকুল্যে আটচল্লিশ জন নিত্যানন্দ অনুগামীর নাম পাওয়া যাইতেছে।

বৃন্দাবনদাস ও জয়ানন্দর কাব্যে উল্লিখিত ব্যক্তিদের মধ্যে কয়েকজন চৈতন্যদেবের প্রত্যক্ষ সংস্পর্শে আসিয়াছিলেন যথা, রামদাস (অভিরাম), গদাধরদাস, রঘুনাথ বৈদ্য, কালিয়া কৃষ্ণদাস, গৌরীদাস পণ্ডিত, পুরন্দর পণ্ডিত, পরমেশ্বরদাস, জগদীশ পণ্ডিত, দেবানন্দ, মাধবানন্দ ঘোষ, বাসুদেব ঘোষ, রাঘব পণ্ডিত, শ্রীগর্ভ পণ্ডিত, নন্দন আচার্য, জগদীশ ও হিরণ্য। ইঁহারা নিত্যানন্দর প্রচারকার্যে যোগ দিয়া বা সহায়তা করিয়া তাঁহার অনুগামী হইয়াছিলেন। বাদবাকি তেত্রিশজন আসিয়াছিলেন নিত্যানন্দর কারকতায়। নিত্যানন্দর প্রচার পরিক্রমণের বিবরণে যে জায়গাগুলির নাম পাওয়া যাইতেছে তাহার প্রত্যেকটিতেই ভক্তিপ্রচারের ঘাঁটি তৈরী হইয়াছিল। কতকগুলি ঘাঁটি আগেকার, চৈতন্যদেব বা তাঁহার ভক্তদের উদ্যোগে স্থাপিত। অন্যগুলি গড়িয়া উঠিয়াছিল নিত্যানন্দর প্রচার পরিক্রমণের সময়। আগেকার ঘাঁটিগুলি বাদ দিলে নিত্যানন্দর প্রচার যাত্রায় প্রায় ত্রিশটি নূতন ঘাঁটির সন্ধান পাওয়া যাইতেছে। ব্যক্তি ও স্থানের নাম ধরিয়া বিচার করিলে বোঝা যায় নিত্যানন্দর উদ্যোগে ভাগীরথী তীরবর্তী অঞ্চলে ভক্তিধর্মের প্রসার ব্যাপক হইয়া উঠিয়াছিল। নিত্যানন্দর অনুগামীদের চেষ্টায় ভক্তিধর্মের বিস্তার ব্যাপকতর হইয়া ওঠে। ইঁহাদের কর্মক্ষেত্রের পরিচয় দিলে নিত্যানন্দর কীর্তি ও তাঁহার প্রভাবমণ্ডল সম্পর্কে ধারণা আরও স্পষ্ট হইবে।

চৈতন্যদেবের তিরোধান হইবার কিছুদিন পরে (১৫৩৩ সালে বা পরের বছর) নিত্যানন্দ সন্ন্যাস ছাড়িয়া গৃহস্থ হন। বড়গাছির (নদীয়া) সূর্যদাস সরখেলের দুই কন্যা বসুধা ও জাহ্নবীকে (বৈষ্ণব সাহিত্যে জাহ্নবা নামে বেশি পরিচিত) বিবাহ করিয়া খড়দহে স্থায়ীভাবে বাস করেন। ভক্তপ্রবর পুরন্দর পণ্ডিত খড়দহের লোক। এখানে তাঁহার মন্দিরাদি ছিল। নিত্যানন্দর খড়দহ আসার মূলে বোধহয় পুরন্দর পণ্ডিত। সপত্নীকে নিত্যানন্দকে ইনি নিজের মন্দিরের কাছে আশ্রয় দিয়াছিলেন। নিত্যানন্দ ঘরবাড়ি করিয়া স্থিতু হওয়ায় খড়দহ নিত্যানন্দ গোষ্ঠীর মূল কেন্দ্র হইয়া ওঠে। নিত্যানন্দর কয়েকজন বিশিষ্ট অনুগামী যথা, মীনকেতন রামদাস, ও নৃসিংহ চৈতন্য খড়দহ পাটে (বৈষ্ণব মহান্তদের বাসস্থান ও কর্মস্থানকে শ্রীপাট বলা হয়) থাকিতেন। 'চৈতন্যভাগবত' প্রণেতা বৃন্দাবনদাসও নাকি নিত্যানন্দর কাছে খড়দহে ছিলেন। নিত্যানন্দর শিষ্য ও ভক্তরা খড়দহে যাতায়াত করিতেন।

নিত্যানন্দর অনুগামীরা প্রায় সকলেই খুব ভাল প্রচারক ও করিৎকর্মা ব্যক্তি। গঙ্গার দুইদিকে উত্তর চব্বিশ পরগণা, নদীয়া, হুগলী ও বর্ধমান জেলা এবং উত্তর চব্বিশ পরগণার পূর্বদিকে যশোহর জেলার (বর্তমানে বাংলাদেশে) বিভিন্ন স্থানে

ঘাঁটি গড়িয়া নিত্যানন্দর অনুগামীরা ভক্তিপ্রচার করিয়াছিলেন। উত্তর চব্বিশ পরগনায় এঁড়েদহের গদাধরদাস, পানিহাটির রাঘব পণ্ডিত এবং খড়দহের পুরন্দর পণ্ডিতের কথা ইতিপূর্বে বলা হইয়াছে। নদীয়া জেলায় নিত্যানন্দর বিশিষ্ট অনুগামীদের বাস ছিল নবদ্বীপ, সরডাঙ্গা, শালিগ্রাম, বড়গাছি, দোগাছিয়া ও যশড়ায়। নবদ্বীপে নিত্যানন্দর অনুগামী ছিলেন শ্রীধর, পুরুষোত্তম পণ্ডিত, নন্দন আচার্য, চতুর্ভুজ পণ্ডিত, গঙ্গাদাস, জগদীশ ও হিরণ্য। চৈতন্যদেব চলিয়া যাইবার পর নিত্যানন্দ বেশ কয়েকবার নবদ্বীপে আসিয়াছিলেন। এখানে তাঁহার আরও অনুগামী থাকা সম্ভব। নবদ্বীপের পরপারে গঙ্গার পুরান খাতের ধারে অবস্থিত কুলিয়াতে ছিল বংশীবদনের বাড়ী। নবদ্বীপ হইতে আঠার মাইল উত্তরপূর্বে শালিগ্রাম। ইহার উত্তরে দোগাছিয়া ও বড়গাছি। পর পর এই তিনটি গ্রামের ভক্তিবাদীরা নিত্যানন্দর অনুগামী হইয়াছিলেন। বড়গাছির কৃষ্ণদাস হোড় ও বেহারী কৃষ্ণদাস এবং শালিগ্রামের সরখেল ভ্রাতৃবৃন্দ। শালিগ্রাম নিত্যানন্দর শ্বশুরবাড়ী। সূর্যদাস সরখেলের দুই মেয়ের সঙ্গে নিত্যানন্দর বিবাহের উদ্যোক্তা ছিলেন কৃষ্ণদাস হোড়। বলরামদাসের বাড়ি দোগাছিয়ায়। বলরামদাস খ্যাতনামা পদকর্তা। শ্রীকৃষ্ণের বাল্যলীলা এবং চৈতন্যদেব ও নিত্যানন্দ সম্বন্ধে বলরামদাসের লেখা উৎকৃষ্ট পদ আছে। বলরামদাস দোগাছিয়ায় বালগোপাল বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। নবদ্বীপ হইতে গঙ্গা বাহিয়া দক্ষিণে চাকদহের কাছে যশড়া ও পালপাড়ায় ছিল দুই ভাই জগদীশ পণ্ডিত ও মহেশ পণ্ডিতের পাট।

হুগলী জেলায়, নিত্যানন্দ ভক্তদের ঘাঁটি ছিল সপ্তগ্রাম, নিত্যানন্দপুর, আকনা, মাহেশ, তড়া আঁটপুর ও খানাকুলে। সপ্তগ্রামের বেণেরা নিত্যানন্দর প্রভাবে চৈতন্যপন্থী হইয়াছিলেন। সেই কারণে সপ্তগ্রাম নিত্যানন্দভক্তদের বড় ঘাঁটি। সপ্তগ্রামের বিত্তবান সুবর্ণবণিক উদ্ধারণ দত্ত এখানে নিজের ঠাকুরবাড়িতে ষড়ভুজ গৌরাঙ্গ বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করেন। বিবাহের পরে সস্ত্রীক নিত্যানন্দকে শ্রীধর ও বাণীনাথ নিজেদের কাছে নিত্যানন্দপুরে আনিয়া রাখিয়াছিলেন। শ্রীধর ও বাণীনাথ দুই ভাই নিত্যানন্দর মহিমাজ্ঞাপক গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন বলিয়া জানা যায়। শ্রীধর লিখিয়াছিলেন 'নিত্যানন্দ পটল', বাণীনাথ রচিত গ্রন্থের নাম 'নিত্যানন্দ চৌত্রিশা'। শ্রীরামপুরের দুই মাইল দক্ষিণে আকনা ও মাহেশ পাশাপাশি জায়গা। মাহেশ কমলাকর পিপলাইয়ের শ্রীপাট। কমলাকরের জন্মস্থান সুন্দরবনের খালিজুলি গ্রাম। পৈতৃক গ্রাম ছাড়িয়া কমলাকর মাহেশে জগন্নাথ বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করিয়া বাস করেন। কমলাকরের দরুণ মাহেশ নিত্যানন্দ ভক্তদের মিলনস্থল হইয়া উঠিয়াছিল। শ্রীরামপুর হইতে প্রায় পাঁচিশ মাইল উত্তর পশ্চিমে

গেলে তড়াআঁটপুরে পরমেশ্বরদাসের পাট। পরমেশ্বরদাস ডানকুনির কাছে গরলগাছা গ্রাম (তাঁহার জন্মস্থান) হইতে তড়া-আঁটপুরে (হুগলী) চলিয়া যান। এখানে তাঁহার প্রতিষ্ঠিত গোপীনাথ বিগ্রহ আছে। নিত্যানন্দর অনুগামীদের মধ্যে সবচেয়ে প্রভাবশালী ছিলেন রামদাস বা অভিরাম গোস্বামী। ইনি খানাকুলে (তড়া-আঁটপুরের প্রায় কুড়ি মাইল দক্ষিণ পশ্চিমে) থাকিয়া ভক্তি প্রচার করিতেন। অভিরাম সংকীর্তন পরিক্রমণ ও মহোৎসবাদি করিয়া বিশেষ প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিলেন। খানাকুলে তিনি গোপীনাথ বিগ্রহের মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। হুগলী জেলার আরামবাগ মহকুমা ও তাহার পাশে বাঁকুড়া জেলা ও হাওড়া জেলায় অভিরামের অনেক শিষ্য সেবক ছিল। অভিরামের বেশ কয়েকজন শিষ্য প্রচারক ও সংগঠক বলিয়া খ্যাত। শিষ্য প্রশিষ্য মণ্ডলীর বাহিরেও অভিরামের প্রতিপত্তি ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। বাঙ্গলার বৈষ্ণব সমাজে তিনি নেতৃস্থানীয় হিসাবে মাননীয় ছিলেন। তিলকরামদাস রচিত 'অভিরামলীলামৃত' গ্রন্থে অভিরাম গোস্বামী ও তাঁহার শিষ্যদের কর্মকৃতি সবিস্তারে লেখা আছে।

বর্ধমান জেলায় নিত্যানন্দ ভক্তদের বড় ঘাঁটি নৈহাটি, উদ্ধারণপুর, কাটোয়া দেনুড় ও অম্বিকা কালনা। কাটোয়ার তিন মাইল উত্তরে গঙ্গার তীরে নৈহাটি। উদ্ধারণ দত্ত সপ্তগ্রাম হইতে এখানে চলিয়া আসেন। নৈহাটির ঠিক দক্ষিণে উদ্ধারণ দত্তর ভজনস্থান উদ্ধারণপুর। উদ্ধারণ দত্ত এখানে গৌর নিতাই বিগ্রহ স্থাপন করিয়াছিলেন। তাঁহার কীর্তির জন্য গ্রামটি উদ্ধারণপুর নামে পরিচিত হইয়াছে। এঁড়েদহের গদাধরদাস পরবর্তী জীবনে কাটোয়ায় থাকিতেন। তাঁহার গৌরাঙ্গমন্দির চৈতন্যপন্থী বৈষ্ণবদের আকর্ষণস্থল হইয়া উঠিয়াছিল। গদাধরদাসের অনেক শিষ্য ও অনুরক্ত লোক ছিল। কাটোয়ার কাছে শ্রীখণ্ডে ছিলেন নরহরি সরকার ঠাকুর ও তাঁহার ভাইপো রঘুনন্দন। নরহরি ও তাঁহার শিষ্য লোচনদাস নিত্যানন্দর অনুরাগী ছিলেন। কাটোয়ায় প্রায় কুড়ি মাইল দক্ষিণে দেনুড়। এখানে বেশ কয়েকজন নিত্যানন্দভক্ত বাস করিতেন। নিত্যানন্দর তিরোভাব হইবার পর বৃন্দাবনদাস দেনুড়ে চলিয়া আসেন। কথিত আছে বৃন্দাবনদাস দেনুড়ে থাকার সময় 'চৈতন্যভাগবত' রচনা করিয়াছিলেন। দেনুড়ের নিতাই গৌর, রাধাকান্ত, শ্যামসুন্দর ও বৃন্দাবনচন্দ্র বিগ্রহ বৃন্দাবনদাস কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত বলিয়া শোনা যায়। অম্বিকা গৌরীদাস পণ্ডিতের পাট। গদাধর পণ্ডিতের ভাইপো হৃদয়ানন্দ গৌরীদাস পণ্ডিতের শিষ্য। বৈষ্ণবসমাজে ইনি হৃদয় চৈতন্য নামে পরিচিত। হৃদয় চৈতন্য অম্বুয়ার কাছেই বালিগ্রামে থাকিতেন। বালিগ্রাম এখন কালনা সহরের অংশ। হৃদয় চৈতন্যের শিষ্য শ্যামানন্দ গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মের অন্যতম শ্রেষ্ঠ প্রচারক।

বর্ধমানে আর ছিলেন কালিয়া কৃষ্ণদাস, যদুনাথ কবিচন্দ্র বৃন্দাবনবাস ও ধনঞ্জয় পণ্ডিত। কালিয়া কৃষ্ণদাসের জন্মস্থান ও কর্মক্ষেত্র কাটোয়ার সামান্য দক্ষিণে আকাইহাট গ্রামে। ইনি এখানে মন্দির স্থাপন করিয়াছিলেন। শ্রীহট্টের লোক যদুনাথ কবিচন্দ্র বিখ্যাত বৈষ্ণবস্থান কুলিনগ্রামে আসিয়া বাস করিয়াছিলেন। কুলীনগ্রাম কালনার মাইল পাঁচিশ দক্ষিণপশ্চিমে অবস্থিত। ধনঞ্জয় পণ্ডিত চট্টগ্রামের লোক। ইনি ঠাকুরবাড়ী স্থাপন করিয়া বাস করিয়াছিলেন শীতলগ্রামে। এই গ্রামটি কাটোয়া হইতে মাইল দশেক দক্ষিণপশ্চিমে অবস্থিত। ইনি কিছুদিন কুলীন গ্রামের কাছে সাঁচড়া পাঁচড়া গ্রামে বাস করিয়াছিলেন। বর্ধমান প্রসঙ্গে বিপ্র কৃষ্ণদাসের নাম করিতে হয়। বিপ্র কৃষ্ণদাসকে রাঢ় দেশবাসী বলা হইয়াছে। তাঁহার বাসস্থান অজ্ঞাত।

যশোহর জেলায় (বাংলাদেশ) নিত্যানন্দর কয়েকজন অনুগামী ছিলেন। বোধখানা গ্রামে বাস করিতেন সদাশিব কবিরাজ ও তাঁহার পুত্র পুরুষোত্তমদাস। পুরুষোত্তমদাসের পুত্র কানু ঠাকুরও নিত্যানন্দর অনুরাগী। আর একজন সুন্দরানন্দ পণ্ডিত। ইঁহার বাড়ী মহেশপুর গ্রামে।

দ্বাদশ গোপাল নামে পরিচিত নিত্যানন্দর বার জন শিষ্যর খুব প্রসিদ্ধি আছে। লোচনদাসের 'চৈতন্যমঙ্গল' কাব্যে সর্বপ্রথম দ্বাদশ গোপালের উল্লেখ পাওয়া যাইতেছে। তবে তাঁহার তালিকায় নাম আছে আটজনের ঃ রামদাস (অভিরাম), গৌরীদাস, সুন্দরানন্দ, কৃষ্ণদাস, পুরুষোত্তমদাস, কমলাকর, কালা কৃষ্ণদাস ও উদ্ধারণ দত্ত (চৈ.ম. ১।২৩১-২৩২)। পরবর্তীকালে প্রচলিত দ্বাদশ গোপালের তালিকায় কৃষ্ণদাসের নাম নাই। এই তালিকায় লোচনকথিত আর সাতজন ছাড়া আছেন ধনঞ্জয় পণ্ডিত, পরমেশ্বরদাস, পুরুষোত্তম পণ্ডিত, মহেশ পণ্ডিত ও শ্রীধর। আর একটি প্রচলিত তালিকায় পুরুষোত্তম পণ্ডিতের জায়গায় পুরুষোত্তমদাসের নাম আছে। কোন বারজন দ্বাদশ গোপাল সে বিষয়ে মতভেদ থাকিলেও বলা যায় যে লোচনদাসের কাব্য রচনাকালে (১৫৬০ হইতে ১৫৬৬ সালের মধ্যে) অর্থাৎ নিত্যানন্দ লোকান্তরিত হইবার কুড়ি পাঁচিশ বছরের মধ্যে নিত্যানন্দর বার জন শিষ্য বিশেষ খ্যাতাপন্ন হইয়াছিলেন এবং তাঁহাদের যৌথ পরিচয় বৈষ্ণব সমাজে সুপরিজ্ঞাত হইয়াছিলেন।

আচণ্ডালে প্রেমভক্তি বিতরণ করিবার পক্ষে চৈতন্যপরিকরদের মধ্যে নিত্যানন্দই সবচেয়ে উপযুক্ত পাত্র ছিলেন। নিত্যানন্দর জন্ম ব্রাহ্মণবংশে। পিতৃদত্ত নাম বোধ হয় কুবের। চৈতন্যদেবের চেয়ে বয়সে আনুমানিক আট বৎসরের বড়। অল্প বয়সে নিত্যানন্দ এক সন্ন্যাসীর সঙ্গে গৃহত্যাগ করেন। পরে তিনি সন্ন্যাসী

হন। স্বরূপ দামোদরের মত নিত্যানন্দও সন্ন্যাসগুরুর কাছে যোগপট্ট নেন নাই বলিয়া তিনি স্বরূপ সন্ন্যাসী। তাঁহার নাম নিত্যানন্দস্বরূপ। দীর্ঘ বিশ বছর ভারতবর্ষে বিভিন্ন তীর্থস্থান ঘুরিয়া ১৫০৯ সালের এপ্রিল বা মে মাসে নিত্যানন্দ নবদ্বীপে আসিয়া উপস্থিত হন। নবদ্বীপে তখন নিমাই পণ্ডিতের ভাবপ্রকাশ চলিতেছিল। নিত্যানন্দ ভক্তমণ্ডলীতে যোগ দিয়া অচিরে নিমাই পণ্ডিতের অন্যতম প্রধান পরিকর বলিয়া গণ্য হন এবং সাধারণ্যে ভক্তি প্রচারের দায়িত্ব লাভ করেন। বহুদোক সন্ন্যাসী নিত্যানন্দস্বরূপ মানবচরিত্র সম্পর্কে বিস্তর অভিজ্ঞতা অর্জন করিয়াছিলেন। তাঁহার আকর্ষণী ক্ষমতাও খুব ছিল। সম্ভবতঃ এই সব কারণে চৈতন্যদেব নিত্যানন্দকে প্রবীণ ভজনপরায়ণ বৈরাগী হরিদাস ঠাকুরের সঙ্গে নবদ্বীপে নগরিয়াদের বাড়ী বাড়ী ঘুরিয়া ভক্তিপ্রচারে পাঠাইয়াছিলেন।

নিত্যানন্দ অবধূত সন্ন্যাসী। যিনি সম্পূর্ণ নিরাসক্ত হইয়া যুগপৎ ত্যাগ ও ভোগ আচরণ করেন তিনিই অবধূত। সর্বপ্রকার প্রকৃতিবিকার উপেক্ষা করেন (অবধুনোতি) বলিয়া এইরূপ সাধক অবধূত পরিচয় লাভ করেন। নাথ সম্প্রদায়ের সিদ্ধযোগীরা অবধূত নামে অভিহিত হন। আবার তান্ত্রিক সন্ন্যাসীরাও অবধূত বলিয়া পরিচিত। তন্ত্রমতে অবধূতাশ্রমই কলিযুগে একমাত্র সন্ন্যাসাশ্রম (মহানির্বানতন্ত্রম্, ৮ উল্লাস) তান্ত্রিক অবধূতদের একটি ভাগের নাম ভক্তাবধূত। ভক্তাবধূত দুইপ্রকার, অপূর্ণ বা পরিব্রাজক আর পূর্ণ বা পরমহংস। নিত্যানন্দ ছিলেন পরিব্রাজক ভক্তাবধূত। বৃন্দাবনদাসের কাব্যে তিনি নিজেই বলিয়াছেন 'পরমহংসের পথে আমি অধিকারী' (চৈ.ভা. ২।২৪)। তান্ত্রিক অবধূতরা ত্যাগে ও ভোগে সমদর্শী ও নিরপেক্ষ এবং বিধিনিষেধের অনধীন বলিয়া বৈদিক শাস্ত্রাচারী দশনামী সন্ন্যাসীদের সঙ্গে তাঁহাদের পার্থক্য সুস্পষ্ট। আদি শঙ্করাচার্য কর্তৃক প্রবর্তিত দশনামী সন্ন্যাসীদের আচরণই সন্ন্যাসের আদর্শ, ইহাই শিষ্ট সমাজের ধারণা। লোকে বোধ হয় সব সন্ন্যাসীর কাছেই বৈদিক সন্ন্যাসী সুলভ আচরণ আশা করিত এবং অবধূতদের মত গৃহ্য সম্প্রদায়ের সন্ন্যাসীদের প্রকাশ্য আচার ব্যবহারে তাহার ব্যতিক্রম দেখিলে বিরক্ত হইত (চৈ.ভা. ৩।৭)। উপরন্তু নিত্যানন্দ ছিলেন স্বরূপ এবং তাঁহার গুরু পরিচয় অজ্ঞাত (চৈ.ভা. ২।১৯)। এই সব কারণে নিত্যানন্দকে নিয়া বৈষ্ণবসমাজে বেশ গোল বাধিয়াছিল। সন্ন্যাসী হইয়াও নিত্যানন্দ গৃহস্থ বাড়ীতে বাস করিতেন কিন্তু সন্ন্যাসীবিধায় গৃহস্থের সামাজিক নিয়মকানুন কিছুই মানিয়া চলিতেন বলিয়া মনে হয় না। বৈষ্ণব ভক্তমণ্ডলীতে থাকিয়াও নিত্যানন্দ মাছ মাংস খাইতেন, মদ্যপানও বোধ হয় ভালই করিতেন। বিলাস-ব্যসনে তাঁহার আসক্তি ছিল। ভাল ভাল

কাপড়-চোপড় গয়নাগাঁটি পরিতেন, এবং কর্পূর দিয়া পান খাইতেন। তাহার উপর নিত্যানন্দ ছিলেন দুর্মুখ ও কোপনস্বভাব। রাগিলে ক্রোধভাজন ব্যক্তি বয়োজ্যেষ্ঠ বা মানী লোক হইলেও তাঁহাকে অপমান করিতে নিত্যানন্দর বাধিত না (চৈ.ভা. ২।২৪)। অদ্বৈত আচার্য বেশ কয়েকবার নিত্যানন্দকে মাতাল, আমিষাশী ও জাতিবিচারবিহীন বলিয়া নিন্দা করিয়াছেন। তিনি বার বার বলিয়াছেন এই মাতাল সর্বনাশ করিবে (চৈ.ভা. ২।১৩, ১৯, ২৪)। নিত্যানন্দর ধরণধারণ হরিদাস ঠাকুরেরও পছন্দ হয় নাই। চৈতন্যদেবের কথায় নিত্যানন্দ ও হরিদাস নবদ্বীপের পথে পথে কৃষ্ণভক্তি প্রচার করিতে গিয়াছিলেন। সেই সময় হরিদাস ঠাকুর অদ্বৈত আচার্যর কাছে নিত্যানন্দ সম্বন্ধে অনেক অভিযোগ করিয়া বলিয়াছিলেন প্রচারে গিয়া এই লোক গোয়ালার ঘি, দই নিয়া সরিয়া পড়ে, অন্যের গরু দুহিয়া দুধ খায়। কুমারী কন্যা দেখিলে বলে আমাকে বিবাহ কর। আবার ষাঁড়ের পিঠে চড়িয়া বলে আমি শিব হইয়াছি। হরিদাস ঠাকুর দুঃখ করিয়া বলিয়াছিলেন 'চণ্ডলের সঙ্গে প্রভু আমারে পাঠায়' (চৈ.ভা. ২।১৩)। এই সব দেখিয়া অন্যরাও বিরক্ত হইয়াছিল। চৈতন্যমণ্ডলীতে নিত্যানন্দর প্রতি বিরূপতার অনেক প্রমাণ পাওয়া যায় (চৈ.ভা. ১৭, ১৫, ; ২।৩, ১১ ; ৩।৭)। কোন কোন চৈতন্যভক্তর মনে নিত্যানন্দবিদ্বেষ এত প্রবল ছিল যে তাঁহার নাম পর্যন্ত তাহারা শুনিতে পারিত না। নিত্যানন্দর প্রসঙ্গ হওয়ামাত্র তাহারা উঠিয়া যাইত (চৈ.ভা. ২।৩)।

যে যাহাই বলুক বাধাবন্ধহীন আচরণের জন্যই বোধ হয় নিত্যানন্দ লোকপ্রিয় হইয়াছিলেন। প্রচার করিবার সময় দেখিতেছি নিত্যানন্দ শূদ্রের বাড়ীতে বাস করিতেন, সম্ভবতঃ জলাব্যবহার্য জাতির অন্নও গ্রহণ করিতেন (চৈ.ভা. ৩।৫, ৭)। মহোৎসব করিয়া তিনি বিভিন্ন জাতির লোককে পংক্তি ভোজনে বসাইয়াছেন (দাস ১৩৬৫ঃ ১১৫৬)। মাছ মাংস মদ তান্ত্রিক ও তন্ত্রপ্রভাবিত সাধনে অপরিহার্য উপাচার। গুহ্য সম্প্রদায়সমূহের ধর্মাচরণ জাতিভেদ বর্জিত। অনেক গুহ্য সম্প্রদায় তো সামাজিকক্ষেত্রেও ঘোরতর বর্ণাশ্রমবিরোধী। সে দিক দিয়া দেখিলে নিত্যানন্দর আচরণ যথাধর্ম। সাধারণ লোকের মধ্যে তখন বৌদ্ধ সহজপন্থী, নাথপন্থী, বৈষ্ণব সহজপন্থী, বামাচারী ও কৌল তান্ত্রিক গুহ্য সম্প্রদায় সমূহের ব্যাপক প্রভাব ছিল। এই সব সম্প্রদায়ের অনুগামীরাই ভক্তিধর্মে বিশেষভাবে আকৃষ্ট হইয়াছিল। নিত্যানন্দর বাধাবন্ধহীন আচরণ ও সমদৃষ্টি ইহাদের মনোহরণ করিবে, ইহাই সম্ভব।

ভক্তি প্রচারে নিত্যানন্দর সামাজিক রীতি বহির্ভূত কাজকর্ম অনেকের ভাল ঠেকে নাই। তাহারা চৈতন্যদেবের কাছে এ বিষয়ে অভিযোগও করিয়াছিল।

সন্ন্যাস আশ্রম তান বোলে সর্ব্বজন।
কর্পূর তাম্বুল সে ভক্ষণ অনুক্ষণ ॥
ধাতুদ্রব্য পরশিতে নাহি সন্ন্যাসীরে।
সোণা রূপা মুক্তা সে সকল কলেবরে ॥
কাষায় কৌপীন ছাড়ি দিব্য পট্টবাস।
ধরেন চন্দনমালা সদাই বিলাস ॥
দণ্ড ছাড়ি লৌহদণ্ড ধরেন বা কেনে।
শূদ্রের আশ্রমে সে থাকেন সর্ব্বক্ষণে ॥
শাস্ত্রমতে মুঞি তান না দেখোঁ আচার।
এতেকে মোহর চিত্তে সন্দেহ অপার ॥
বড়লোক বলি তাঁরে বোলে সর্ব্বজনে।
তথাপি আশ্রমাচার না করেন কেনে ॥

(চৈ.ভা. ৩।৭)

জগদানন্দ পণ্ডিতের হাতে অদ্বৈত আচার্য নীলাচলে চৈতন্যদেবের কাছে একটা তরজা-প্রহেলী পাঠাইয়াছিলেন। তরজাটিতে তিনি বলিয়াছিলেন

বাউলকে কহিয় লোকে হৈল আউল।
বাউলকে কহিয় হাটে না বিকায় চাউল ॥
বাউলকে কহিয় কাজে নাহিক আউল।
বাউলকে কহিয় ইহা কহিয়াছে বাউল ॥ (চৈ.চ. ৩।১৯)

অনেকে মনে করেন অদ্বৈত আচার্যর এই তরজায় নিত্যানন্দ সম্পর্কে কটাক্ষ আছে। নিত্যানন্দ সামাজিক রীতিনীতি উপেক্ষা করিয়া যে ভাবে প্রচার করিতেছেন তাহাতে সব কিছু আউলাইয়া যাইতেছে, লোক—সংঘট করিয়া নির্বিচারে প্রেমভক্তি প্রচার করা ঠিক নয় সম্ভবতঃ এইরকম অর্থেই তরজাটি বলা হইয়াছিল। নিত্যানন্দের কিছু কিছু কাজকর্ম সম্পর্কে বোধহয় চৈতন্যদেবের মনেও সংশয় ছিল। একবার রথযাত্রা উপলক্ষে নিত্যানন্দ নীলাচলে গেলে চৈতন্যদেব তাঁহাকে বলিলেন

তুমার গৌড়রাজ্যে কার অধিকার নাঞি ॥
(কিন্তু) করতাল মৃদঙ্গ যন্ত্র মাল্য চন্দনে।
শিঙ্গা বেত্র গুঞ্জাহারে নূপুর আভরণে ॥

মহোৎসবে মাগি জায় নাচে সঙ্কীর্ত্তনে।
হেন যুক্তি তুমারে দিলেক কোনজনে॥

(জয়ানন্দ, চৈ.ম. ৯।১০১-৩)

মনে হয় নিত্যানন্দ যে সাজিয়া গুজিয়া সঙ্কীর্ত্তন করেন, অনুগত লোকের বাড়ীতে দিনের পর দিন থাকিয়া ভক্তদের দিয়া মহোৎসবের আয়োজন করেন ইহা চৈতন্য-দেবের পছন্দ হয় নাই। নিত্যানন্দ চৈতন্যদেবের আপত্তি মানিতে পারিলেন না। চৈতন্যদেবের কথা

শুনি নিত্যানন্দ গোঁসাই হাসি হাসি কহে।
কাঠিন্য কীর্ত্তন কলিযুগ ধর্ম্ম নহে॥

(উপর্যুক্ত ৯।১০৪)

নিত্যানন্দের বক্তব্য বোধ হয় এই যে শাস্ত্রাচার, লোকাচার মানিয়া সর্বসাধারণের মধ্যে প্রেমভক্তি-প্রচার করা যায় না, সকলকে একত্র করিয়া সঙ্কীর্তনে নামানও সম্ভব নয়। আচণ্ডাল সকল মূর্খ দরিদ্র পতিতজনের মধ্যে ভক্তি বিতরণ করিতে হইলে নিয়মকানুনের কড়াকড়ি বাদ দিতে হইবে। নিত্যানন্দের যুক্তি শুনিবার পর চৈতন্যদেবও আর আপত্তি করিলেন না। সর্বসাধারণ্যে প্রেমভক্তি প্রচারের ব্যাপারে নিত্যানন্দই যোগ্যতম পাত্র, বাঙ্গলায় তাঁহার সমতুল্য আর কেহ নাই চৈতন্যদেবের মনে এই বিশ্বাস ছিল। এই জন্যই তিনি নিত্যানন্দকে ডাকিয়া বাঙ্গলায় প্রচারের দায়িত্ব দিয়াছিলেন। নিত্যানন্দ দ্বারাই যে তাঁহার জীবনের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইতেছে ইহা চৈতন্যদেব মুক্ত কণ্ঠে স্বীকার করিয়াছিলেন। গঙ্গাতীরে প্রচারকালে একবার চৈতন্যদেবকে দেখিতে ইচ্ছা হইলে নিত্যানন্দ নীলাচলে গিয়াছিলেন। নিত্যানন্দের আগমনবার্তা পাইয়া চৈতন্যদেব একাকী কমলপুরে গিয়া তাঁহার প্রত্যুদ্গমন করিলেন। নিত্যানন্দের বহু প্রশংসা করিয়া চৈতন্যদেব বলিলেন

নীচজাতি পতিত অধম যত জন।
তোমা হইতে সভার হৈল বিমোচন॥
যে ভক্তি দিয়াছ তুমি বণিকসভারে।
তাহা বাঞ্ছে সুর সিদ্ধ মুনি যোগেশ্বরে॥ (চৈ.ভা. ৩।৮)

চৈতন্যদেবের পরিকরদের মধ্যে নিত্যানন্দ সর্বাপেক্ষা বিতর্কিত ব্যক্তি। অপর পক্ষে তিনিই ছিলেন সবচেয়ে বেশী ব্যক্তিত্বসম্পন্ন এবং প্রভাবশালী। চৈতন্য-ভাবকদের দৃষ্টিতে চৈতন্যদেব ছিলেন স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ। বৃন্দাবনে লীলা অপূর্ণ ছিল। লীলা পূর্ণ করিবার জন্যই চৈতন্যরূপে নবদ্বীপে তাঁহার আবির্ভাব। কৃষ্ণের সঙ্গে

অবতীর্ণ হইয়াছিলেন তাঁহার সকল পরিকর। নিত্যানন্দকে বলা হইত বলরামের অবতার, সেই অর্থে চৈতন্যদেবের অগ্রজ। এই হিসাবে চৈতন্যমণ্ডলীতে নিত্যানন্দর স্থান খুব উঁচু। কর্মতৎপরতা ও নেতৃত্বর প্রশ্নেও তাহাই। চৈতন্যদেব নীলাচলে চলিয়া যাইবার পর, বিশষতঃ তাঁহার তিরোধান হইলে, চৈতন্যদেবের অনুগামীরা বিভিন্ন দলে ভাগ হইয়া যান। নিত্যানন্দ, অদ্বৈত, নরহরি সরকার, গদাধর পণ্ডিত, গদাধরদাস প্রত্যেককে কেন্দ্র করিয়া এক এক গোষ্ঠী গড়িয়া ওঠে (নবম পরিচ্ছেদ দ্রষ্টব্য)। ইহার মধ্যে নিত্যানন্দর অনুগামীরাই ছিল সংখ্যায় সবচেয়ে বেশী। গঙ্গার দুইকূল ধরিয়া নিত্যানন্দর যে প্রভাবমণ্ডল গড়িয়া উঠিয়াছিল তাহা অল্প সময়ের মধ্যে অন্যত্র ছড়াইয়া পড়ে। জয়ানন্দ বলিতেছেন 'নিত্যানন্দে গৌড় রাজ্য ভাসিলা', (নিত্যানন্দ) 'ঘরে ঘরে সঙ্কীর্তন পাতিলেক খেলা' (চৈ.ম. ৯।৯৯, ১০৫)।

নিত্যানন্দ নিজে ছিলেন অতিশয় উদ্যমশীল এবং অক্লান্তকর্মা। চৈতন্যদেবের নামে প্রেমভক্তি প্রচারে তিনি মাতিয়া বেড়াইতেন। আজও নিত্যানন্দ স্মরণে-কীর্তনীয়ারা গাহিয়া থাকেন 'নিতাই আমার মাতা হাতি।' বাঙ্গলায় গৌরপারম্য-বাদের তিনিই ছিলেন সবচেয়ে বড় প্রবক্তা। তাঁহার ব্যক্তিত্বের আকর্ষণও কম ছিল না। সে সময়ের অনেক বিশিষ্ট ব্যক্তি নিত্যানন্দ গোষ্ঠীভুক্ত ছিলেন। নিত্যানন্দর অনুগামীদের মধ্যে ছিলেন দ্বাদশ গোপালের মত প্রভাবশালী প্রচারক, বাসু ঘোষ ও বলরামদাসের মত শ্রেষ্ঠ পদকর্তা এবং মাধব ঘোষের মত যশস্বী গায়ক। চৈতন্যদেবের পাঁচজন বাঙ্গলা জীবনীকারের মধ্যে তিনজন, বৃন্দাবনদাস, জয়ানন্দ ও চূড়ামণিদাস ছিলেন নিত্যানন্দর একান্ত ভক্ত ও সেবক। 'চৈতন্যচরিতামৃত' রচয়িতা কৃষ্ণদাস কবিরাজও ছিলেন নিত্যানন্দর বিশেষ অনুরাগী। বিখ্যাত পদকর্তা জ্ঞানদাস ও আদি বৈষ্ণব ঐতিহাসিক নিবন্ধ 'প্রেমবিলাস' রচয়িতা নিত্যানন্দদাস জাহ্নবা দেবীর সময় নিত্যানন্দ গোষ্ঠীতে যোগ দেন। গুণীজনের সমাবেশ ধরিয়া বিচার করিলে এক শ্রীখণ্ড গোষ্ঠী ছাড়া চৈতন্য-পন্থীদের অন্য কোন গোষ্ঠীই নিত্যানন্দ গোষ্ঠীর সঙ্গে তুলনীয় নয়। শ্রীখণ্ড গোষ্ঠীতেও প্রথম দিকে এত বিশিষ্ট ব্যক্তি ছিলেন না। এই সব কারণেই নিত্যানন্দ পরিচালিত প্রেমভক্তি প্রচারের ব্যাপকতা ও কার্যকারিতা অন্যদের তুলনায় অনেক বেশী হইয়াছিল। চৈতন্যদেব প্রচারের আয়োজন করিয়া দিয়াছিলেন। কিন্তু চৈতন্যপ্রপত্তি ও সঙ্কীর্তন সর্বসাধারণের ঘরে ঘরে হাটে মাঠে ছড়াইয়া দিয়াছিলেন নিত্যানন্দ এবং তাঁহার অনুগামীগণ। চৈতন্যদেবের অন্যতম জীবনীকার লোচনদাস ছিলেন নরহরি সরকারের প্রভাবাধীন গৌরনাগরবাদী গোষ্ঠীভুক্ত। নিত্যানন্দর

অনুগামীরা গৌরনাগরবাদীদের উপর প্রসন্ন ছিলেন না (চৈ.ভা. ১।১০)। কিন্তু নিত্যানন্দর সর্বজনীন প্রেম প্রচারের প্রশস্তি করিয়া লোচন লিখিয়াছেন

নিতাই গুণমণি আমার নিতাই গুণমণি।
আনিয়া প্রেমের বন্যা ভাসাল অবনী ॥
প্রেমের বন্যা লৈয়া নিতাই আইলা গৌড়দেশে।
ডুবিল ভকতগণ দীনহীন ভাসে ॥

(লোচন, চৈ.ম., ভগবানদাস সংস্করণ, পরিশিষ্ট)

অতএব, প্রেমভক্তি প্রচারে চৈতন্যদেবের সঙ্গে নিত্যানন্দর নাম যতটা ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত অন্য কাহারও ততটা নয়। এই পরম ঘনিষ্ঠতা স্মরণ করিয়াই লোকে আজও কথায় বলে গৌরনিতাই। বিগ্রহ স্থাপন করিয়া চৈতন্যদেবের পূজা যেসব জায়গায় হয় তাহার অধিকাংশ ক্ষেত্রে দেখা যায় গৌরাঙ্গর পাশে সমানভাবে পূজা পাইতেছেন নিত্যানন্দ। উভয়ের প্রতিমালক্ষণও অনুরূপ।

নবম পরিচ্ছেদ

চৈতন্যোত্তর বাংলায় ভক্তিআন্দোলনের অবস্থা

চৈতন্যদেবের তিরোভাব হইবার পর বাঙ্গলায় চৈতন্যপন্থীরা বিভিন্ন গোষ্ঠীতে ভাগ হইয়া যান। বিশিষ্ট চৈতন্য পরিকরদের নেতৃত্বে এক একটি গোষ্ঠীর উদ্ভব হয়। গোষ্ঠী নায়ক মহান্তদের ভাব আলাদা আলাদা। ভক্তিধর্মের এই অবস্থা দেখিয়া চৈতনাদেবের অন্যতম পরিকর প্রবোধানন্দ সরস্বতী দুঃখ করিয়া লিখিয়াছিলেন

জাড্যং কর্ম্মসু কুত্রচিজ্জপতপো যোগাদিকং কুত্রচিৎ
গোবিন্দার্চ্চনবিক্রিয়ঃ ক্বচিদপি জ্ঞানাভিমানঃ ক্বচিৎ
শ্রীভক্তিঃ ক্বচিদুজ্জ্বলাপি চ হরে র্বাঙমাত্র এব স্থিতা
হা চৈতন্য কুতো গতোহসি পদবী কুত্রাপি তে নেক্ষ্যতে।

(শ্রীশ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্, শ্লোক ১৩৮)

[হা শ্রীচৈতন্যদেব তুমি কোথায় গমন করিলে। তোমার সেই উজ্জ্বল ভক্তি আর কোথাও তো দেখিতে পাই না। বরং দেখিতেছি কাহারও মধ্যে কর্মজড়তা, জপ-তপ-যোগাদির প্রাবল্য, কোথও শুধুমাত্র বিধিপূর্বক গোবিন্দার্চন হইতেছে, কোথাও বা জ্ঞানাভিমান পরিদৃশ্যমান আবার কোথাও বা পরমোজ্জ্বল ভক্তি শুধু কথায় পর্যবসিত]।

প্রবোধানন্দ যাহা লিখিয়াছেন তাহার উপরে অনেক কিছু বলিবার আছে। সাধন বিষয়ে বিভিন্ন গোষ্ঠীর মধ্যে গুরুতর মতপার্থক্য দেখা দিয়াছিল। তাহা ছাড়া ব্যক্তিগত বিরোধ ও বিদ্বেষের লক্ষণও দুর্লভ নয়। এই দুই কারণে বিভিন্ন গোষ্ঠীর মধ্যে বৈষম্যরোগ প্রবল হইয়া উঠিয়াছিল।

নিত্যানন্দ সখ্যরসের উপাসক। নিজেকে ব্রজের কৃষ্ণ পরিকর গোপালরূপে কল্পনা করিয়া সখা সম্বন্ধে শ্রীকৃষ্ণের ভজনা করাই সখ্যরসের উপাসনা। চৈতন্য-পন্থীদের মধ্যে নিত্যানন্দ বলরামের অবতার বলিয়া পরিচিত। বলরামভাব সখ্যরসের পরাকাষ্ঠা। গদাধরদাস, পুরন্দর পণ্ডিত, মাধব ঘোষ ও রঘুনাথ বৈদ্য ছাড়া নিত্যানন্দর সব অনুগামীই সখ্যরসে উপাসনা করিতেন এবং ব্রজের গোপাল বা কৃষ্ণসখার ভাবে থাকিতেন (চৈ.ভা. ৩।৫)।

নিত্যানন্দর গণ যত সব ব্রজের সখা।
শিঙ্গাবেত্র গোপবেশ শিরে শিখিপাখা ॥ (চৈ.চ. ১।১১)

নিত্যানন্দর প্রধান অনুগামীগণ ব্রজের কৃষ্ণসখা গোপালদের অবতার বলিয়া পরিচিত হইয়াছিলেন (গৌরগণোদ্দেশদীপিকা, শ্লোক ১৬৬-১৩৬)। সখ্যরসের উপাসনা করিলেও নিত্যানন্দ তন্ত্রাচার ছাড়িয়া দিয়াছিলেন বলিয়া মনে হয় না। নিত্যানন্দর পর গোষ্ঠী চালাইতেন তাঁহার পত্নী জাহ্নবা দেবী। জাহ্নবার উত্তরাধিকারী নিত্যানন্দর পুত্র বীরভদ্র। দুইজনেই মধুর রসের সাধক। দুইজনের সঙ্গেই তান্ত্রিক সহজসাধনপন্থীদের ঘনিষ্ঠ যোগ ছিল।

পরমেশ্বর গৌরাঙ্গকে নাগর ও নিজের নাগরী ভাবিয়া মধুর রসে কান্তাভাবের যে সাধনা তাহাই গৌরনাগরবাদের সাধনা। শ্রীখণ্ড গৌরনাগরবাদী সাধনার জন্য বিখ্যাত ছিল। এখানকার মহান্ত চৈতন্যদেবের অন্যতম প্রিয় পরিকর নরহরি সরকার ঠাকুর ও তাঁহার ভাইপো রঘুনন্দনের প্রভাবে গৌরনাগরবাদের খুব প্রসার হয়। নরহরির শিষ্য লোচনদাস গৌরনাগরবাদ অনুসারে চৈতন্যজীবন ব্যাখ্যা করিয়া 'চৈতন্যমঙ্গল' রচনা করেন। চৈতন্য পরিকর পদকর্তা বাসু ঘোষ গৌর-নাগরবাদের অন্যতম প্রধান প্রবক্তা। 'চৈতন্যচন্দ্রামৃতম্' প্রণেতা প্রবোধানন্দ সরস্বতীও গৌরনাগরবাদী। বিপরীতপক্ষে কোন কোন চৈতন্যভক্ত চৈতন্যদেবকে ব্রজগোপী সাব্যস্ত করিয়া সেইভাবে তাঁহার উপাসনা করিতেন (চৈ.ভা. ২।১৮)। সম্ভবতঃ নীলাচলে চৈতন্যদেবের জীবনে রাধাভাবের তীব্রতা এই ভাবনা জোর পাইয়াছিল।

অদ্বৈত আচার্য চৈতন্যপূর্ব নবদ্বীপে ভক্তিবাদের প্রধান সমাহর্তা। কিন্তু তাঁহার মনে জ্ঞানবাদের অর্থাৎ জ্ঞানের পথে মুক্তির ঝোঁক ছিল। নবদ্বীপে চৈতন্যদেবের ভাবপ্রকাশের সময় তিনি একবার ভক্তির চেয়ে জ্ঞানকে বড় বলিতে শুরু করিয়াছিলেন (চৈ.ভা. ২'১৯)। চৈতন্যদেবের প্রভাবে তাঁহার সে ভাব তখন কাটিয়া যায়, তিনি ভক্তির পথে ফিরিয়া আসেন। ভক্তিমার্গে অদ্বৈত আচার্য দাস্য ও সখ্য রসে উপাসনা করিতেন (গৌরগণোদ্দেশদীপিকা, শ্লোক ২৪)। কিন্তু শেষে বোধ হয় তিনি আবার জ্ঞানের দিকে সরিয়া গিয়াছিলেন (প্র.বি. ১ বিলাস)।

অদ্বৈত আচার্যের জন কতক শিষ্যও যথা, কামদেব নাগর ও শঙ্কর জ্ঞানযোগ অবলম্বন করিয়াছিলেন। তবে এই জ্ঞানবাদীরা অদ্বৈত গোষ্ঠী হইতে আলাদা হইয়া যান (প্র.বি. ২৪ বিলাস ; ভ.র. ১২।১৯৮৪-৮৭ ; মজুমদার ১৯৫৯ : ৫৮৮)। ইহার কারণ বোধ হয় এই যে অদ্বৈত আচার্যের গোষ্ঠীতে জ্ঞানবাদের প্রাধান্য হয় নাই। চৈতন্যদেবের সন্ন্যাসী পরিকরদের মধ্যে কয়েকজন জ্ঞানমিশ্রা ভক্তির পথ গ্রহণ করিয়াছিলেন (মজুমদার ১৯৫৯ : ৫৮৮)।

অদ্বৈত আচার্যর অনুগামীদের একাংশ তাঁহাকেই ঈশ্বরজ্ঞান করিতেন (চৈ.ভা. ২।১০)। অদ্বৈতর বড় ছেলে অচ্যুতানন্দ এ পথে যান নাই। কিন্তু অদ্বৈতর আচার্যর অন্য দুই ছেলে কৃষ্ণ মিশ্র ও গোপাল বোধ হয় অদ্বৈতভজনের একটা গোষ্ঠী তৈরী করিয়াছিলন (চৈ.ভা. ৩।৪)। জীব গোস্বামীতে আরোপিত বৈষ্ণববন্দনায় আছে যে অদ্বৈত পুত্রদের মধ্যে অচ্যুতানন্দ ভিন্ন অন্যরা চৈতন্যদেবকে পরমেশ্বর না মানায় অদ্বৈত তাঁহাদের পরিত্যাগ করিয়াছিলেন (মজুমদার ১৯৫৯ : ৭১৬-১৭)। অদ্বৈত আচার্যর মৃত্যুর পর অদ্বৈত গোষ্ঠীর কর্তৃত্ব পান তাঁহার পত্নী সীতা দেবী। কিন্তু তাহার আগের অদ্বৈত গোষ্ঠী একাধিক খণ্ডে ভাগ হইয়া গিয়াছিল (চৈ.চ. ১।১২)। সীতা দেবীর কয়েকজন শিষ্য গোপীভাবের উপাসক ছিলেন। ইঁহারা নিজেদের ব্রজগোপী ভাবিয়া স্ত্রীবেশ ধারণপূর্বক কৃষ্ণের সঙ্গে মিলন কামনায় ভজন করিতেন (মজুমদার : ৫৮৭)।

নবদ্বীপপর্বের গোড়া হইতেই গদাধর পণ্ডিত চৈতন্যদেবের অতি অন্তরঙ্গ পরিকর। নীলাচলে চৈতন্যদেবের তিরোভাব পর্যন্ত গদাধর পণ্ডিত তাঁহার সঙ্গে ছিলেন। গদাধর পণ্ডিতকে বলা হইত লক্ষ্মী ও রাধার অবতার (গৌরগণোদ্দেশ-দীপিকা, শ্লোক ১৫৩)। তাঁহার শিষ্যরা মিলিয়া একটা গোষ্ঠী তৈরী করিয়া-ছিলেন। এই গেষ্ঠীতে ছিলেন বাণীনাথ ব্রহ্মচারী, লক্ষ্মীনাথ পণ্ডিত, চৈতন্যবল্লভ-দাস, শ্রীহর্ষ প্রভৃতি। গদাধর পণ্ডিতের গোষ্ঠী মধুর রসে সাধনা করিতেন। গদাধরদাসও মধুর রসে গোপীভাবের উপাসক (গৌরগণোদ্দেশদীপিকা, শ্লোক ১৫৪, ১৫৫ ; চৈ.ভা. ৩।৫)। এই ভাব নিয়া গদাধরদাস একটা গোষ্ঠী গড়িয়া-ছিলেন। তাঁহার গোষ্ঠীর সদর ছিল কাটোয়ায়। যদুনন্দন চক্রবর্তী গদাধরদাসের প্রধান শিষ্য। কুলিয়ানিবাসী চৈতন্য পরিকর বংশীবদন চট্ট তাঁহার পিতা দুকড়ি চট্টর ভজন প্রণালী অনুসারে বৈষ্ণব তান্ত্রিক রসরাজ উপাসনার গোষ্ঠী চালাইতেন। বংশীবদনের পর এই গোষ্ঠী চালাইতেন তাঁহার ছেলে চৈতন্যদাস।

চৈতন্য পরিকরদের মধ্যে বেশ কয়েকজন গোষ্ঠীবৃদ্ধি করেন নাই। ইঁহারা নিজেদের মতো সতন্ত্র থাকিতেন। দৃষ্টান্তস্বরূপ এই কয়েকজনের নাম করিতেছি :

শিবানন্দ সেন, ও তাঁহার পুত্র পরমানন্দ সেন কবিকর্ণপুর, মুরারি গুপ্ত, শ্রীপতি পণ্ডিত, শ্রীনাথ পণ্ডিত, রামানন্দ বসু, শুক্লাম্বর ব্রহ্মচারী, রঙ্গ পুরী, রামচন্দ্রপুরী, গোবিন্দানন্দ, গোবিন্দ ঘোষ ও তাঁহার ভাই বাসু ঘোষ এবং মুকুন্দ দত্ত ও তাঁহার দুই ভাই গোবিন্দ ও বাসুদেব। এই ভক্তরা নিজ নিজ মত অনুসারে স্বতন্ত্রভাবে ভজন করিতেন। রামচন্দ্র পুরী ও মুরারি গুপ্ত ছিলেন রামোপাসক (গৌরগণোদ্দেশ-দীপিকা, শ্লোক ৯১)। রঙ্গ পুরী উপাসনা করিতেন বাৎসল্যরসে (গৌরগণোদ্দেশ-দীপিকা, শ্লোক ২৪)। গোবিন্দ ঘোষও সম্ভবতঃ বাৎসল্যরসের উপাসক। বাসু ঘোষ ছিলেন গৌরনাগরবাদী।

গোষ্ঠীগুলির মধ্যে বেশ বিবাদ বিসম্বাদ চলিত। বৃন্দাবন দাসের কাব্যে ইহার অনেক ইঙ্গিত আছে। চৈতন্য ভক্তদের মধ্যে বেশ কিছু লোক নিত্যানন্দকে একেবারেই বরদাস্ত করিতে পারিতেন না।

এই অবতারে কেহো গৌরচন্দ্র পায়।
নিত্যানন্দ নাম শুনি উঠিয়া পলায়॥ (চৈ. ভা. ২।৩)

নিত্যানন্দ বিরোধীরা নাকি নিত্যানন্দের তিরোভাব মহোৎসবেও যোগ দেন নাই (নিত্যানন্দবংশবিস্তার, ৩ স্তবক)। অপরদিকে গদাধর পণ্ডিত নিত্যানন্দ বিরোধীদের প্রতি এতদূর রুষ্ট ছিলেন যে তাহাদের মুখদর্শন করিবেন না বলিয়া কৃত-সঙ্কল্প হইয়াছিলেন (চৈ. ভা.)। বৃন্দাবনদাস পরম নিত্যানন্দ ভক্ত। নিত্যানন্দ বিরোধীদের প্রতি অসহিষ্ণুতার আতিশয্যবশত তিনি ক্রুদ্ধ ভর্ৎসনা সহকারে বলিয়াছেন—

এত পরিহারেও যে পাপী নিন্দা করে।
তবে লাথি মারোঁ তার শিরের উপরে॥ (চৈ.ভা. ৯।১২)

গৌরনাগরবাদীদের সম্পর্কেও বৃন্দাবনদাসের বিরূপতা প্রবল। নিত্যানন্দ গোষ্ঠীতে এই মনোভাব থাকা সম্ভব। নরহরির নাম কোথাও নাই। গৌরনাগরবাদীদের প্রতি কটাক্ষ করিয়া বৃন্দাবনদাস লিখিয়াছেন—

অতএব মহামহিম সকলে।
গৌরাঙ্গ নাগর হেন স্তব নাহি বলে॥ (চৈ.ভ ২।৩)

যে ভক্তরা চৈতন্যদেবকে ব্রজগোপী বলিয়া মনে করিতেন তাঁহাদের উপরেও বৃন্দাবনদাস প্রসন্ন ছিলেন না। গৌরপারম্যবাদীদের দৃষ্টিতে এইরূপ চিন্তা গর্হিত। গৌরপারম্যবাদীদের মনোভাব প্রকাশ পাইয়াছে বৃন্দাবনদাসের উক্তিতে। চৈতন্যদেব পরমেশ্বর স্বয়ং

ইহা না বুঝিয়া কোন পাপী জনা জনা।
প্রভুরে বলয়ে গোপী খাইয়া আপনা ॥ (চৈ.ভা. ২।১৮)

অদ্বৈতভজনাকারী গোষ্ঠী খুব চৈতন্যবিরোধী ছিল (চৈ.ভা. ২।১৩, ৩।৪)। ইহারা গদাধর পণ্ডিতেরও নিন্দা করিয়া বেড়াইত (চৈ.ভা. ২।১৩, ২৩)। অদ্বৈত উপাসকদের স্বভাবও বোধ হয় একটু উগ্র। বৃন্দাবনদাসের লেখায় আছে, যে চৈতন্যদেবের কৃপায় অদ্বৈত সর্বসিদ্ধি লাভ করিয়াছেন, তাঁহাকেই তোমরা মান না এই কথা বলিবামাত্র তাহারা না কি 'আসে ধাঞা মারিবারে' (চৈ.ভা. ২।১০)। বৃন্দাবনদাস ইহাদের ধ্বংস কামনা করিয়াছেন (চৈ.ভা. ২।১৩, ২৩)।

অদ্বৈত আচার্য কোনদিনই নিত্যানন্দকে পছন্দ করিতেন না। নবদ্বীপ ও শান্তিপুরে চৈতন্যদেবের সমক্ষেই তিনি নিত্যানন্দকে কটুভাষায় গালিগালাজ করিয়াছেন। নিত্যানন্দও অদ্বৈত আচার্যকে অপমান করিতে ছাড়েন নাই (চৈ.ভা. ২।২৪)। চৈতন্যদেবের জীবদ্দশায় দুইজনের বিচ্ছেদ হইয়াছিল বলিয়া মনে হয় না। তবে পরবর্তী সময়ে বিরোধ অনেক দূর গড়াইয়াছিল। নিত্যানন্দর দেহান্ত হইবার (আনুমানিক ১৫৪১-৪২) পর অদ্বৈত আচার্য আটদশ বৎসর বাঁচিয়া ছিলেন। নিত্যানন্দর পুত্র বীরভদ্র অদ্বৈত আচার্যর কাছে দীক্ষা নেওয়া স্থির করিলে জাহ্নবা দেবী তাঁহাকে বাধা দেন। শান্তিপুরগামী বীরভদ্রকে জোর করিয়া ফিরাইয়া আনা হয়। অবশেষে বীরভদ্র দীক্ষা নিলেন জাহ্নবা দেবীর কাছে (নিত্যানন্দ-বংশবিস্তার, ৩ স্তবক)। এইভাবে নিত্যানন্দ ও অদ্বৈত গোষ্ঠীর মধ্যে আনুষ্ঠানিক সম্পর্ক নষ্ট হইয়া রায়।

দৃষ্টিভঙ্গীর পার্থক্য ও ব্যক্তিগত বিরোধ সত্ত্বেও অল্প কয়েকজন বাদে চৈতন্য-পরিকর ও ভক্তগণ সকলেই ছিলেন গৌরপারম্যবাদী অর্থাৎ চৈতন্যদেবকে সর্বেশ্বর বলিয়া মানিতেন এবং তাঁহার নামে প্রেমভক্তি লাভের সাধনা করিতেন। বিভিন্ন গোষ্ঠীতে, বিশেষতঃ নিত্যানন্দ গোষ্ঠী ও শ্রীখণ্ড গোষ্ঠীতে অনেক কবি, গায়ক, বাদক, নর্তক ও সুধী ব্যক্তি ছিলেন। ভক্তিপ্রচার ও সংগঠনের মাধ্যম হিসাবে ইঁহাদের ভূমিকা খুব বড়। প্রত্যেক গোষ্ঠীর হাতে কতকগুলি ঘাঁটি ও নিজস্ব অনুগামীমণ্ডলী ছিল। সকল গোষ্ঠীর সহায় সম্বল একত্র হইলে বাংলায় ভক্তিধর্মের প্রভাব উত্তরোত্তর প্রবল হইয়া উঠিতে পারিত। কিন্তু চৈতন্যদেবের পর বাঙ্গলায় বৈষ্ণবদের সর্বসম্মত কোন অধিনেতা ছিল না। গোষ্ঠীবুদ্ধি ছাড়িবার মতিও কাহারও হয় নাই। চৈতন্যোত্তর বাঙ্গলায় ভক্তি আন্দোলনের আর একটা বড় দুর্বলতা তত্ত্ববিচার ও শাস্ত্রা-লোচনার অভাব। বাঙ্গলার চৈতন্যপন্থীদের সাধন ও প্রচার ভাবাবেগপ্রধান। তাঁহাদের দৃষ্টিতে কীর্তন পরম উপায় এবং অনুভবই চরম উপলব্ধি। চৈতন্য-

প্রপত্তির ব্যাপক তাত্ত্বিক ভিত্তি থাকিলে তাহার যুক্তিতেই বিভিন্ন গোষ্ঠীর সাধন-পদ্ধতির মধ্যে সামঞ্জস্য স্থাপন করিয়া চৈতন্যপন্থাকে সংহত করিয়া তোলা সম্ভব হইত। এই সব অনুপপত্তির দরুণ চৈতন্যদেবের তিরোধান হইবার পরেই বাঙ্গলার ভক্তি আন্দোলনে ভাঁটা পড়িতে শুরু করে। নিত্যানন্দ গোষ্ঠী ও শ্রীখণ্ড-কেন্দ্রিক গৌরনাগরবাদী গোষ্ঠী ছাড়াও আর সকলেই সর্বসাধারণের মধ্যে ভক্তি প্রচারে নিস্পৃহ হইয়া উঠিয়াছিলেন। মহান্তরা যে যাহার শ্রীপাটে বসিয়া শিষ্যসেবকসহ বিগ্রহ-সেবা ও কীর্তনাদি করিয়া দিন যাপন করিতেছিলেন। এইভাবে চলিতে থাকিলে চৈতন্যপ্রপত্তি বাঙ্গালী সমাজে খুব বেশীদিন বাঁচিয়া থাকিতে পারিত না।

বাঙ্গলার ভক্তি আন্দোলন যখন গোষ্ঠীবিরোধের ফলে খণ্ডবিখণ্ড হইয়া পড়িতেছিল সেই সময় চৈতন্যপন্থার সবচেয়ে বড় কেন্দ্র গড়িয়া উঠিল বৃন্দাবনে। বৃন্দাবনে কেন্দ্র গড়ার উদ্যোগী ছিলেন চৈতন্যদেব স্বয়ং। চৈতন্যদেবের জীবদ্দশায় ও তাহার পরে তাঁহার বেশ কয়েকজন পরিকর ও ভক্ত বৃন্দাবনবাসী হইয়াছিলেন। বৃন্দাবনে সমবেত চৈতন্য পরিকর ও ভক্তদের মধ্যে ষড়্‌গোস্বামী অর্থাৎ সনাতন, রূপ, রঘুনাথ ভট্ট, রঘুনাথদাস, গোপালভট্ট ও জীব বাঙ্গলার বৈষ্ণবসমাজে বিশেষ ভক্তিভাজন। শাস্ত্র রচনা করিয়া, বিগ্রহ ও মন্দির প্রতিষ্ঠা করিয়া, ব্রজমণ্ডলে অর্থাৎ বৃন্দাবন-মথুরাকেন্দ্রিক অঞ্চলে কৃষ্ণলীলা খ্যাত তীর্থস্থানসমূহ উদ্ধার করিয়া ইঁহারা ব্রজমণ্ডলে নিম্বার্ক ও বল্লভাচারী বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের পাশাপাশি চৈতন্যপন্থাকে প্রতিষ্ঠিত করেন। ব্রজমণ্ডলে বৃন্দাবনই চৈতন্যপন্থীদের কেন্দ্র হইয়া ওঠে। ষড়্‌গোস্বামীর মধ্যে আবার পাণ্ডিত্য, শাস্ত্রজ্ঞান ও আধ্যাত্মিকতার জন্য সনাতন, রূপ ও জীবের খ্যাতিই সর্বাধিক। ইঁহারা তিনজনে অধিবিদ্যা, দর্শন ও রসতত্ত্ব বিষয়ে যে বিপুল গ্রন্থসম্ভার রচনা করিয়াছিলেন তাহাই চৈতন্যপন্থার (সাধারণতঃ গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায় নামে পরিচিত) তাত্ত্বিক ও শাস্ত্রীয় ভিত্তি বলিয়া সর্বজনস্বীকৃত। ইঁহাদের পরে নাম করিতে হয় গোপাল ভট্টর। ইনি (সম্ভবতঃ সনাতন গোস্বামীর নির্দেশাধীনে) 'হরিভক্তিবিলাস' নামক বৈষ্ণব-স্মৃতি গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। রঘুনাথদাস কৃষ্ণলীলা বিষয়ে তত্ত্বমূলক একটি কাব্য ও গদ্যপদ্যময় চম্পূ রচনা করিয়াছিলেন। (বৃন্দাবনে ষড়্‌গোস্বামী প্রমুখ চৈতন্য-সম্প্রদারের বিবরণের জন্য দ্রষ্টব্য জানা ১৯৭০ ; দে ১৯৬১ ঃ ১১১-৬৭৫)।

বৃন্দাবনের মতো তত্ত্বচিন্তা ও শাস্ত্র প্রণয়নের চেষ্টা গৌড়মণ্ডলে কোথাও হয় নাই (তখনকার দিনে বাঙ্গলাকে লোকে গৌড় বলিত, বাঙ্গালীদের বলিত গৌড়িয়া, মোটামুটিভাবে বঙ্গভাষী অঞ্চলকে বৈষ্ণবসাহিত্যে গৌড়মণ্ডল বলা হইয়াছে)। সনাতন ও রূপ বৃন্দাবনে স্থায়ী বাস শুরু করেন ১৫১৭-১৮ সাল নাগাদ। জীব গোস্বামী-কৃত সর্বশেষ গ্রন্থের রচনাকাল ১৫৯৬ সাল। গোস্বামীদের গ্রন্থসমূহ

রচিত হইয়াছে এই সময়ের মধ্যে। ইহারই সমকালে গৌড়মণ্ডলে চৈতন্যদেবকে নিয়া বহু পদ এবং কয়েকখানি গ্রন্থ রচিত হইয়াছে। গ্রন্থের মধ্যে আছে মুরারি গুপ্তর কড়চা, কবিকর্ণপুরের মহাকাব্য, নাটক ও 'গৌরগণোদ্দেশদীপিকা', এবং বৃন্দাবনদাস, লোচনদাস, চূড়ামণিদাস ও জয়নন্দর জীবনীকাব্য। এইসব রচনার সারকথা গৌরপারম্যবাদ। কিন্তু সব ক্ষেত্রেই চৈতন্যদেবের পরমেশ্বরত্বে বিশ্বাস স্বচ্ছন্দ ও অনুভব-সাপেক্ষ। কবিকর্ণপূরের মনে তাত্ত্বিক চিন্তা ছিল। তত্ত্বমূলক গ্রন্থও তিনি রচনা করিয়াছিলেন। কিন্তু গৌরপারম্যবাদের প্রশ্নে তিনিও অনুভব-পন্থী। এই বিষয়ে তাত্ত্বিক আলোচনা কবিকর্ণপূর করেন নাই। চৈতন্যপ্রপত্তি নিয়া কিছুটা তাত্ত্বিক আলোচনা করিয়াছেন নরহরি সরকার ঠাকুর ও তাঁহার শিষ্য পণ্ডিতপ্রবর লোকানন্দ আচার্য। 'ভক্তিচন্দ্রিকা' গ্রন্থে নরহরি চৈতন্যপ্রপত্তি অনুসারে দ্বাত্রিংশাক্ষর মহামন্ত্র এবং কাম্যসাধনার উপায় সম্বন্ধে তত্ত্ববিচারের অবতারণা করিয়াছেন। নরহরি সরকারের 'কৃষ্ণভজনামৃতম্' অধিবিদ্যা গ্রন্থ। ইহাতে শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে চৈতন্যদেবের অভিন্নতার কথা বলা হইয়াছে বটে, কিন্তু প্রতিপন্ন করার চেষ্টা নাই। আসলে নরহরির লেখায় তত্ত্ববিচারের চেয়ে বিশ্বাসের দিকে ঝোঁকটাই বেশি। লোকানন্দ লিখিয়াছিলেন 'ভক্তিসারসমুচ্চয়'। এই গ্রন্থে শাস্ত্রীয় প্রমাণ দিয়া গৌরাঙ্গতত্ত্ব, ভক্তিলক্ষণ ও গৌরাঙ্গ উপাসনার বিভিন্ন অঙ্গের বিচারমূলক আলোচনা আছে। কিন্তু লোকানন্দর লেখা শুধু বিধিমার্গের আলোচনাতেই সীমাবদ্ধ, প্রেমভক্তির কথায় তিনি যান নাই। এই জন্যই বোধ হয় 'ভক্তিসারসমুচ্চয়' চৈতন্যভাবকদের মধ্যে প্রতিষ্ঠা পায় নাই। কীর্তনের নৃত্যগীতজনিত বিহ্বলতাই ভক্তের মনে প্রেমভক্তির অনুভব সঞ্চার করে, সুতরাং তত্ত্বচিন্তা অবান্তর ইহাই গৌড়-মণ্ডলের প্রত্যয়। বোধ করি নির্বিচার ভক্তিভাবের প্রতি আনুগত্যবশতঃ নরহরি সরকার লিখিয়াছেন

'ভক্তা এব চতুরা, ভক্তা এব ধন্যা, ভক্তা এব পণ্ডিতা, ভক্তা এব গুণিনো, ভক্তা এব সুখিনো, ভক্তা এব নির্ভয়াঃ (কৃষ্ণভজনামৃতম্, ১২ অনুচ্ছেদ)।

[ভক্তগণই চতুর, ভক্তগণই ধন্য, ভক্তগণই পণ্ডিত, ভক্তগণই গুণী, ভক্তগণই সুখী, ভক্তগণই নির্ভয়।]

বৃন্দাবনের গোস্বামীরা চৈতন্যদেবের অনুগামী ছিলেন। চৈতন্যপন্থার মূল দার্শনিক প্রপত্তি প্রেমভক্তি। ইহাই গোস্বামীদের সমস্ত চিন্তার উৎস ও কর্মের প্রেরণামন্ত্র। কিন্তু বাঙ্গলার গৌরপারম্যবাদী মহান্তদের সঙ্গে বৃন্দাবনবাসী গোস্বামীদের মত ও পথের বিস্তর ফারাক ছিল। নানাভাবে এই পার্থক্য ধরা পড়ে। এই বিষয়ে বিশদ আলোচনা এখানে নিষ্প্রয়োজন। আপাততঃ কয়েকটি উদাহরণই যথেষ্ট। চৈতন্য

ভাবনার কথা দিয়াই শুরু করি। বাঙ্গলার গৌরপারম্যবাদী চৈতন্যভাবকদের কাছে চৈতন্যদেবই পরমেশ্বর অতএব তিনিই অখিল প্রেমাস্পদ এবং উপাস্য। শাস্ত্রমতে পরমেশ্বর ও তাঁহার অবতারের মধ্যে যে শক্তিভেদ আছে বাঙ্গলার চৈতন্যভাবকরা সে প্রশ্নে বিশেষ মাথা ঘামান নাই। চৈতন্যদেবকে তাঁহারা অবতার বলিলেও স্বয়ং পরমেশ্বর বলিয়াই জ্ঞান করিয়াছেন। বাঙ্গলায় চৈতন্যপূজা ও চৈতন্যকীর্তন চালু হইয়াছিল। গোস্বামীরা চৈতন্যদেবের ভগবত্তা বিশ্বাস করিতেন। ইহার প্রমাণ পাওয়া যায় সনাতন গোস্বামী-কৃত 'বৃহৎভাগবতামৃতে'র নমস্ক্রিয়ায় (৩য় শ্লোক), রূপ গোস্বামী-কৃত 'ভক্তিরসামৃত-সিন্ধু'র নমস্ক্রিয়ায় (২য় শ্লোক) ও 'উজ্জ্বলনীলমণি'র নমস্ক্রিয়ায় রঘুনাথ গোস্বামীর 'স্তবাবলী' ধৃত প্রথম স্তোত্রে এবং জীব গোস্বামীর 'সর্বসম্বাদিনী' গ্রন্থে। কিন্তু গোস্বামীরা ভক্তি শাস্ত্রের কোথাও চৈতন্যদেবের ভগবত্তা সম্বন্ধে আলোচনা করেন নাই, এমন কি ইহার উল্লেখ পর্যন্ত রাখেন নাই। গোস্বামীশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণই পরমতত্ত্ব, সর্বেশ্বর। গোস্বামী গ্রন্থেই আবার চৈতন্যদেবকে কৃষ্ণের অবতার বলা হইয়াছে। একটু আশ্চর্যের কথা এই যে 'বৃহৎভাগবতামৃত' ও 'উজ্জ্বলনীলমণি'র নমস্ক্রিয়াতেই চৈতন্যদেব কৃষ্ণের অবতার বলিয়া অভিহিত হইয়াছেন। রঘুনাথ গোস্বামীর 'মুক্তাচরিত' গ্রন্থের নমস্ক্রিয়াতেও এই কথাই আছে। বস্তুতঃ গোস্বামীরা চৈতন্যদেবের ভগবত্তার চেয়ে অবতারত্বের উপর জোর দিয়াছেন বেশী। 'বৃহৎভাগবতামৃত' গ্রন্থে শ্লোকের সঙ্গে তাহার টীকাও আছে। টীকা সম্ভবতঃ সনাতন গোস্বামীর নিজেরই লেখা। নমস্ক্রিয়ার তৃতীয় শ্লোকটির টীকায় চৈতন্যদেবকে বলা হইয়াছে ভক্তরূপ অবতার, পরমগুরু শ্রীভগবানের প্রিয়তম অবতার। 'বৃহৎবৈষ্ণবতোষণীর নমস্ক্রিয়ায় সনাতন গোস্বামী বলিতেছেন প্রেমভক্তি বিস্তারের জন্যই চৈতন্যঅবতারের আবির্ভাব। 'উজ্জ্বলনীলমণি'র নমস্ক্রিয়ায় রূপ গোস্বামী বলিয়াছেন যে দৃষ্টান্ত দেখাইয়া উজ্জ্বল বা মধুর রসের নিগূঢ় তত্ত্ব শিক্ষা দিবার জন্যই ভগবানের চৈতন্যরূপ অবতার। প্রেমভক্তির চরম উৎকর্ষ মণ্ডনমহাভাব যিনি নিজ জীবনে প্রকাশ করিয়াছেন সেই চৈতন্যদেব ভক্তিসাধনার পথে আদর্শস্বরূপ, তিনি পরমগুরু। তাঁহাকে অবলম্বন করিলে পরমার্থ লাভের দিকে অগ্রসর হওয়া যাইবে। চৈতন্যাবতার সাধ্য লাভের উপায়। উপেয় স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ। সর্বশক্তিমান্ শ্রীকৃষ্ণ অনন্য, তিনিই একমাত্র উপাস্য। গোস্বামীমতে চৈতন্যোপাসনা অবিধেয়।

প্রেমভক্তির তাৎপর্য ও উপায় সম্বন্ধে বাঙ্গলার চৈতন্যভাবকরা চৈতন্যদেবের মত পুরাপুরি মানিতেন না। গোস্বামীরা এই ব্যাপারে চৈতন্যপ্রপত্তি হইতে অনেকটা সরিয়া আসিয়া নিজেদের স্বতন্ত্র সিদ্ধান্ত স্থাপন করিয়াছিলেন। চৈতন্যদেবের

ভাবনায় পরমাত্মা শ্রীকৃষ্ণ সর্বব্যাপী, তিনি স্বতন্ত্র কিন্তু লীলাময়। সাধনের ফলে জীব কৃষ্ণের লীলামাহাত্ম্য অনুভব করিতে পারে। এই অনুভব হইতে জন্মায় প্রেম। ইহাই সার্বভৌম ভক্তি। কৃষ্ণের প্রতি প্রেমসঞ্চার হইলে জীব মুক্তি লাভ করে। আচার বিচার স্থান কাল পাত্র নিরপেক্ষ কীর্তনই মুক্তিলাভের পরম উপায়। তদগতচিত্তে ভাবাবেগময় কীর্তনে মগ্ন হইলে সাধকচিত্তে প্রেম সঞ্চার হইবে। চিত্তে প্রেম সঞ্চার হইলে কৃষ্ণলাভ অর্থাৎ স্বয়ং পরমেশ্বরের সান্নিধ্যলাভ হয়। মুক্তজীব বৃন্দাবনের কৃষ্ণলীলায় প্রবেশ করিয়া সেই পরানন্দের অংশভাক্ হইবার অধিকারী। চৈতন্যদেব 'কৃষ্ণলাভ হোক' বলিয়া ভক্তজনকে আশীর্বাদ করিতেন। চৈতন্যভাবকদেরও বিশ্বাস ছিল যে তাঁহারা পরমেশ্বরের সান্নিধ্য পাইবার অধিকারী। চৈতন্যদেব স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ, তাঁহার নবদ্বীপলীলা প্রকৃতপক্ষে বৃন্দাবনের অসম্পূর্ণ লীলা সমাপ্ত করিবার জন্য অনুষ্ঠিত হইতেছে ইহাতে চৈতন্য-পরিকরগণ কৃতনিশ্চয় ছিলেন। কৃষ্ণপরিকরগণই চৈতন্য পরিকররূপে আবির্ভূত হইয়াছেন, কৃষ্ণের নবদ্বীপলীলা শেষ হইলে তাঁহারা সকলেই বৃন্দাবনে নিজের জায়গায় ফিরিয়া যাইবেন। পরিকরগণ ছাড়া অন্য চৈতন্যভাবকরাও কৃষ্ণের সান্নিধ্যলাভ কামনায় সাধনা করিতেন। কাহারও সাধনা ছিল সখাভাবের, কাহারও সাধনা ছিল কান্তাভাবের, কেহ বা কৃষ্ণের প্রতি বাৎসল্য ভাবিয়া সাধনা করিতেন। এইভাবে একনিষ্ঠ সাধনা করিলে আপনজ্ঞানে কৃষ্ণের প্রতি যে ঐকান্তিক নির্বিকল্প আকর্ষণ জন্মিবে তাহাই প্রেমভক্তি।

গোস্বামীশাস্ত্রে প্রেমের অর্থ অন্য। গোস্বামীমতের প্রেমতত্ত্ব সরাসরি বোঝা যায় না, সোজাসুজি কীর্তনের দ্বারা প্রেমলাভ করাও সম্ভব নয়। গোস্বামীশাস্ত্রে বিস্তারিত দার্শনিক বিচার করিয়া প্রেমের তত্ত্ব ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। প্রেমতত্ত্ব বিচারে গোস্বামীদের দার্শনিক মত অচিন্ত্যভেদাভেদবাদ নামে প্রসিদ্ধ। এই তত্ত্ব অনুসারে পরব্রহ্মের সঙ্গে জীবের যুগপৎ অভেদ ও ভেদ সম্বন্ধ আছে। সূর্যের কিরণ যেমন সূর্যের অংশ হইলেও সূর্য নয় এবং সূর্যের বাহিরে বিচ্ছুরিত, তেমনই জীব শ্রীকৃষ্ণের অংশ, শ্রীকৃষ্ণ হইতে উৎপন্ন এবং তাঁহার শক্তির অভিব্যক্তি হইলেও তাঁহার অন্তরঙ্গা চিৎশক্তি বা স্বরূপশক্তি নয়। কৃষ্ণের মধ্যে তাহার স্থানও নাই। জীব কৃষ্ণের বহিরঙ্গা চিৎশক্তি। স্বরূপশক্তি ও জীবশক্তি ছাড়া পরব্রহ্মের আর একটি প্রধান শক্তি আছে। ইহার নাম মায়াশক্তি। ইহা অজ্ঞান ও জড়রূপা। স্বরূপশক্তি ও মায়াশক্তির মধ্যবর্তী স্থানে অবস্থিত বলিয়া জীবশক্তি কৃষ্ণের তটস্থা শক্তি। মায়াশক্তির স্থান সবার নীচে। স্বরূপশক্তিকে ইহা স্পর্শ করিতে পারে না, কিন্তু জীব-শক্তিকে আবৃত করিয়া প্রাকৃত ভোগলালসায় আকৃষ্ট করিয়া কৃষ্ণবিমুখ করিয়া

তোলে। সব শক্তিই কৃষ্ণ হইতে উৎসারিত কেননা তিনি সর্বশক্তিমান। কিন্তু জীব তাঁহার চিৎশক্তি হইয়াও বহিরঙ্গা, মায়াশক্তির প্রভাবে বহির্মুখ। বহির্মুখী ভাবের প্রভাবে জীব উৎস হইতে আলাদা হইয়া যায়। এই ভেদাভেদতত্ত্ব অচিন্ত্যজ্ঞানগোচর। যুক্তি দ্বারা ইহা বোঝা যায় না। মায়ার পাশ ছিঁড়িয়া নিজের প্রকৃত বিশিষ্টতা জানাই জীবের কর্তব্য। জ্ঞান বা কর্মদ্বারা ইহা সম্ভব নয়। একমাত্র উপায় কৃষ্ণের শরণাপন্ন হওয়া ও একাগ্রচিত্তে তাঁহার ভজন করা। ইহাই ভক্তিসাধনা। ভক্তির চূড়ান্ত পরিণতি প্রেম। তটস্থশক্তিবিধায় কৃষ্ণের স্পর্শ বা সান্নিধ্য জীবের লভ্য নয়। কৃষ্ণসেবার বাসনাই জীবের ধর্ম। ভক্তিসাধনায় কৃষ্ণের সঙ্গে প্রকৃত সম্বন্ধ জানিবার পর তাঁহার প্রতি অত্যন্ত মমতাবশতঃ যে সেবাবাসনা জাগ্রত হয় তাহাই জীবের কৃষ্ণপ্রেম। ইহাই অনুত্তর প্রেমভক্তি। প্রেমলাভ হইলে মুক্ত জীব আনন্দময় নিত্য বৃন্দাবনে কৃষ্ণলীলায় সেবাধিকার পাইবার জন্য অপেক্ষা করিয়া থাকিবে।

প্রেমলাভ সহজে হয় না, সকলের পক্ষে ইহা সম্ভবও নয়। ভক্তিমার্গ দীর্ঘ এবং সিদ্ধি কঠোর সাধনাসাপেক্ষ। ক্রমান্বয়ে অনেকগুলি স্তর অতিক্রম করিলে অবশেষে প্রেমভক্তি লাভ হয়। শুধু অনুভবের জোরে সরাসরি প্রেমভক্তি লাভ অসম্ভব। রূপ গোস্বামী 'ভক্তিরসামৃতসিন্ধু' গ্রন্থের পূর্ববিভাগে ভক্তিমার্গের বিভিন্ন স্তর সম্পর্কে সুবিস্তৃত আলোচনা করিয়াছেন। আদৌ ভক্তি দুইপ্রকার, সামান্য ভক্তি ও উত্তমা ভক্তি। সাধারণভাবে ঈশ্বরানুরাগের নাম সামান্য ভক্তি। এই স্তর হইতে উন্নীত হইলে উত্তমা ভক্তির সর্বনিম্ন স্তরে পৌঁছান যায়। উত্তমা ভক্তির তিনটি স্তর সাধনভক্তি, ভাবভক্তি ও প্রেমভক্তি। সাধনভক্তি কৃতিসাধ্যা অর্থাৎ ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য। ইহার দুইটি আভ্যন্তরিক স্তর আছে, বৈধী সাধনভক্তি ও রাগানুগা সাধনভক্তি।

যত্র রাগানবাপ্তত্বাৎ প্রবৃত্তিরূপজায়তে।
শাসনেনৈব শাস্ত্রস্য সা বৈধীভক্তিরুচ্যতে ॥ (১।২।৫)

[রাগের প্রাপ্তি হয় নাই (অর্থাৎ হৃদয়ে অনুরাগ জন্মে নাই), কেবল শাস্ত্র শাসনের ভয়েই যাহাতে প্রবৃত্তি জন্মিয়া থাকে তাহাকেই বৈধী ভক্তি বলে।]

বৈধীর স্তর পার হইলে রাগানুগাভক্তির সূচনা হইবে।

ইষ্টে স্বারসিকী রাগঃ পরমাবিষ্টতা ভবেৎ।
তন্ময়ী যা ভবেভক্তি সাএ রাগাত্মিকোদিতা ॥ (১।২।১৩১)

[অভিলাষিত বস্তুতে যে স্বাভাবিকী পরম আবিষ্টতা তাহার নাম রাগ। সেই রাগময়ী যে ভক্তি তাহাকে রাগাত্মিকা ভক্তি বলে।]

শ্রীকৃষ্ণের প্রতি ব্রজবাসীগণের স্বারসিকী তন্ময়ী পরাবিষ্টতা অর্থাৎ প্রেমময় তৃষ্ণাযুক্ত ভক্তি আছে। ইহাই রাগাত্মিকা ভক্তি। কৃষ্ণপরিকরগণের এই রাগ উপলব্ধি করিবার ঐকান্তিক ইচ্ছা, 'তদ্‌ভাবলিপ্সা' হইতে রাগের অনুগামী হইয়া তদ্‌গতচিত্তে অনুক্ষণ ব্রজলীলা স্মরণ ও ব্রজলীলার অনুসরণ করাই রাগানুগাভক্তি।

ভাবভক্তি সাধনাভিনিবেশজ। রাগানুগা সাধনভক্তি পরিপক্ক হইলে ভাবভক্তিতে উত্তরণ হয়। রাগানুগা মার্গের সাধন ভক্তহৃদয়ের অন্তর্নিবিষ্ট ভাব উন্মোচিত করে। ইহাতেই ভাবভক্তির সূচনা। শ্রীকৃষ্ণ বা কৃষ্ণভক্তের অনুগ্রহে সরাসরি ভাবভক্তি লাভ হইতে পারে। তবে ইহার সম্ভাবনা অতিশয় বিরল। পরিণত ভাবভক্তিতে (সান্দ্রাত্মা) প্রেমের উন্মেষ। প্রেম উপজাত হইলে ভক্তচিত্ত সম্য, মসৃণ ও স্বান্ত হইয়া অনন্য মমতাপূর্ণ অর্থাৎ সম্পূর্ণ কৃষ্ণময় হইয়া ওঠে। ভাবভক্তির মত প্রেমভক্তিও কদাচিৎ শ্রীকৃষ্ণের প্রসাদে সরাসরি লাভ হইতে পারে। কিন্তু সাধারণতঃ ভক্তির পূর্বোক্ত বিভিন্ন স্তরের ভিতর দিয়া অনেকগুলি সোপান অতিক্রম করিলে তবেই প্রেমভক্তি লাভ হয়। শুরুতে শ্রদ্ধা তাহার পর ক্রমান্বয়ে সাধুসঙ্গ, ভজনক্রিয়া, অনর্থনিবৃত্তি, নিষ্ঠা, রুচি, আসক্তি, ভাব সর্বশেষে প্রেম। এই সুদীর্ঘ কঠিন সাধনপথ সকলে অতিক্রম করিতে পারে না। তাই প্রেমলাভ অতিশয় দুষ্কর।

গৌরপারম্যবাদীদের সঙ্গে গোস্বামীমতের তৃতীয় পার্থক্য কীর্তন বিষয়ে। সানুরাগে অভিনিবেশ সহকারে কীর্তন করিলে তাহার ফলে প্রেমভক্তিলাভ অবশ্যম্ভাবী, চৈতন্যদেবের শিক্ষা অনুযায়ী বাঙ্গলার মহান্তগণ এই কথা প্রচার করিয়াছেন। গোস্বামীমতে কীর্তন বৈধীভক্তির অনুষ্ঠানমাত্র। 'ভক্তিরসামৃতসিন্ধু' গ্রন্থে রূপ গোস্বামী কীর্তনকে বৈধী ভক্তির চৌষট্টিটি অঙ্গের অন্যতম বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন (১.২.৬৩-৬৫)। বিশ্বনাথ চক্রবর্তীকৃত 'ভক্তিরসামৃতসিন্ধু' গ্রন্থের 'সারার্থদর্শিনী' টীকা অনুসারে ভাবভক্তির স্তরে কীর্তনের একটা স্থান আছে। তবে ইহা গৌণ। ভাবের অভিব্যক্তি রুচি। বিশ্বনাথের টীকায় রুচির নয়টি অনুভাব উল্লেখ করা হইয়াছে। নয়টির মধ্যে দুইটি অনুভাব নামগান ও গুণব্যাখ্যান। জীব গোস্বামীর মতেও নামাদি (নাম, রূপ, গুণ ও লীলা) কীর্তন বৈধীভক্তির অঙ্গ। তবে শাস্ত্রের প্রমাণ ধরিয়া জীব গোস্বামী নামকীর্তনের বিশেষ মহিমা, বিশেষতঃ কলিকালে, ব্যাখ্যা করিয়াছেন। নামকীর্তনই পরম সাধন ও পরম সাধ্য। নাম কীর্তনের প্রভাবে সাধক জাতানুরাগ হন। নামের আশ্রয় গ্রহণ করিলে নামবশেই মুক্তিলাভ সম্ভব। কলিযুগে নামকীর্তনই প্রশস্ততম। সত্যযুগে ধ্যান দ্বারা, ত্রেতাযুগে যজ্ঞ দ্বারা, দ্বাপরযুগে অর্চনা দ্বারা লোকে যাহা লাভ করিয়া থাকে তাহার সমুদয় কলিযুগে হরিকীর্তন হইতেই পাওয়া যায়। অর্থাৎ অন্য কোন রকম ভজন না

করিলেও শুধু নামকীর্তন হইতেই সর্বোৎকৃষ্ট ভগবন্নিষ্ঠা অধিগত হয়। (ভক্তিসন্দর্ভ, পৃ. ৪৭৫-৪৭) শাস্ত্রমতে এতখানি মাহাত্ম্য থাকা সত্ত্বেও রূপ গোস্বামী ও জীব গোস্বামীর সিদ্ধান্ত অনুসারে ভক্তিসাধনের উপায় হিসাবে কীর্তনের স্থান গৌণ। তাঁহাদের মতে কীর্তন শাস্ত্রানুশাসনের প্রেরণাজাত, সুতরাং বৈধীভক্তি অন্তর্গত। গোস্বামীশাস্ত্রে প্রেমভক্তি অর্জনের কথা বৈধীমার্গ অতিক্রমণের প্রয়োজনীয়তা এবং রাগানুগাভক্তির উৎকর্ষ সুস্পষ্টভাবে ব্যক্ত। ফলে সুপ্রাচীন শাস্ত্রবাক্য সত্ত্বেও গোস্বামী সিদ্ধান্তে কীর্তনের মহিমা অনেকটাই ম্লান হইয়া গেছে। গোস্বামীদের সময়ে বৃন্দাবনের ভজনপ্রণালীতে কীর্তনের বিশেষ স্থান ছিল বলিয়া মনে হয় না।

প্রচলিত বৈষ্ণব সম্প্রদায়সমূহের বিকল্প হিসাবে প্রেমভক্তি তত্ত্বমূলে নূতন সম্প্রদায় গঠন করাই ছিল গোস্বামীদের উদ্দেশ্য। এই ভাবনার আদি ভাবক চৈতন্যদেব স্বয়ং। এই জন্যই তিনি বৃন্দাবনে ঘাঁটি গড়িয়া গোস্বামীদের সেখানে পাঠাইয়াছিলেন। প্রচলিত বৈষ্ণব সম্প্রদায়সমূহের উপাস্য বিষ্ণু অথবা কৃষ্ণ। উভয়েই বহু শতাব্দী ধরিয়া সর্বভারতে উপাসিত এবং তাঁহাদের রূপ ও মহিমা শাস্ত্রাদিতে সুপ্রতিষ্ঠিত। বাঙ্গলায় চৈতন্যদেব উপাস্য বলিয়া গৃহীত হইয়াছিলেন। ওড়িশাতে চৈতন্যোপাসনা কিছুটা ছড়াইয়াছিল। কিন্তু বৃন্দাবনে বসিয়া সর্বভারতীয় পরিপ্রেক্ষিতে বিষ্ণু বা কৃষ্ণের বদলে গৌরপারম্যবাদ ধরিয়া অভিনব প্রেমভক্তির সাধ্যসাধনতত্ত্ব স্থাপন করা দুরূহ ব্যাপার ইহা সহজেই বোঝা যায়। বোধ করি এই কারণে গোস্বামীরা চৈতন্যদেবের ভগবত্তা স্বীকার করিয়াও ভক্তিশাস্ত্র রচনায় কৃষ্ণপারম্যবাদ অবলম্বন করিয়াছিলেন।

আদি শঙ্করাচার্য (অষ্টম শতক) অদ্বৈত বেদান্তবাদ প্রচার করার পর হইতে ব্রহ্মসূত্রের মৌলিক ভাষ্য অর্থাৎ ব্রহ্ম বা পরমাত্মার সঙ্গে জীবের সম্পর্ক সম্বন্ধে বিশিষ্ট মত স্থাপন করিয়া রামানুজ, মধ্বাচার্য, নিম্বার্ক, বল্লভাচার্য প্রভৃতি আচার্যগণ বিভিন্ন সম্প্রদায় স্থাপন করিয়াছেন। শাস্ত্রীয় ঐতিহ্য অনুসারে সর্বভারতীয় পর্যায়ে সম্প্রদায় প্রতিষ্ঠার ইহাই সর্বজনস্বীকৃত উপায়। চৈতন্যপ্রপত্তিতে যে আধ্যাত্মিক ও সামাজিক তাৎপর্য নিহিত আছে তাহা সুগভীর সন্দেহ নাই। কিন্তু চৈতন্যদেব ও তাঁহার নবদ্বীপমণ্ডলীর পরিকরগণ তাত্ত্বিক ও শাস্ত্রীয় বিচার দ্বারা এই প্রপত্তি প্রতিষ্ঠা করেন নাই। তাঁহারা প্রেমভক্তির কথা বলিয়াছিলেন সহজ ও সরলভাবে সরাসরি। দার্শনিক বিচার বিশ্লেষণ দ্বারা প্রতিষ্ঠিত সুনির্দিষ্ট মত নয়, ব্যক্তিগত উপলব্ধি অর্থাৎ অনুভব, ইহার ভিত্তি। ভক্তিধর্ম প্রাচীন এবং সর্বভারতীয় ব্যাপার। কিন্তু প্রেমভক্তির তত্ত্ব তুলনায় অর্বাচীন, ইহার প্রভাবমণ্ডলও অনেক ছোট। প্রেমভক্তি তত্ত্ব চৈতন্যদেবের পরমগুরু মাধবেন্দ্র পুরীর অবদান। প্রথমদিকে মাধবেন্দ্র পুরীর

অধ্যাত্ম-ভাবনা খুব একটা ছড়ায় নাই। তাঁহার শিষ্য ও প্রশিষ্য ও অনুগামীদের সংখ্যা কমই ছিল। প্রেমভক্তি তত্ত্বের বিস্ফুরণ হয় চৈতন্যদেবের সাধনায়। রাধাকৃষ্ণ যুগলরূপের প্রতীক সামনে রাখিয়া চৈতন্যদেব যে প্রেমসাধনা প্রচার করিলেন তাহা বাঙ্গলার আঞ্চলিক ধর্মভাবনায় গভীরভাবে সম্পৃক্ত। বাঙ্গালী সমাজে যুগলরূপের প্রতীকের প্রতি গভীর আকর্ষণ ছিল। মাধবেন্দ্র পুরীর স্বল্প প্রচারিত প্রেমধর্ম চৈতন্যদেব কীর্তনের মতো সহজ সর্বজনসাধ্য ভজনপ্রণালী দিয়া বাঙ্গলার আঞ্চলিক পর্যায়ে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। প্রেমসাধনার এই প্রপত্তি সর্বভারতীয় পর্যায়ে দাঁড় করাইতে হইলে তত্ত্ববিচার ও যুক্তি দ্বারা পরমাত্মা ও জীবের সম্পর্ক নির্ণয় করা এবং ভক্তির লক্ষণ ও চরিত্র ব্যাখ্যা করিয়া তদনুসারে সুনির্দিষ্ট ভজনপ্রণালী নির্দেশ করা প্রয়োজন। চৈতন্যদেব নিজে এই কাজ করেন নাই, তিনি দায়িত্ব দিয়াছিলেন গোস্বামীদের উপর। গোস্বামীরা চৈতন্যপ্রপত্তির মূল ধরিয়াই অধিবিদ্যা, দর্শন ও রসশাস্ত্র প্রণয়ন করিয়াছিলেন। তবে প্রচলিত সম্প্রদায়-সমূহের পাশাপাশি সর্বভারতীয় উৎকর্ষের মানসম্মত তত্ত্ববিচার ও যুক্তি প্রমাণবলে সাধ্য সাধন অর্থাৎ লক্ষ্য ও উপায় নির্দেশ করিতে গিয়া গোস্বামীগণ ভক্তি আন্দোলনের আদিরূপ অনেকটা বদলাইয়া দিয়াছিলেন।

বাঙ্গলায় ভক্তিধর্ম প্রচার ও বৃন্দাবনে ভক্তিশাস্ত্রচর্চা পরস্পরের পরিপূরক হইলে ভক্তি আন্দোলনের জোর খুব বাড়িয়া যাইত। চৈতন্যদেবের মনে হয়ত এই চিন্তাই ছিল। কিন্তু চৈতন্যদেবের তিরোধান হইবার পর বাঙ্গলা ও বৃন্দাবনের সংযোগ একেবারে ছিন্ন হইয়া যায়। বাঙ্গলার গোষ্ঠীনায়কগণের মনে বৃন্দাবনের শাস্ত্রচর্চা সম্পর্কে কোনও আগ্রহ ছিল না। অপরদিকে বৃন্দাবনবাসী গোস্বামীরা বাঙ্গলায় চৈতন্যপরিকরদের ভক্তিধর্ম প্রচার সম্বন্ধে কখনও উৎসাহ দেখান নাই। অদ্বৈত আচার্য, নিত্যানন্দ প্রমুখ চৈতন্যপরিকরদের মাহাত্ম্য সম্বন্ধেও তাঁহারা বিশেষ কিছু বলেন নাই। স্বরূপ দামোদর চৈতন্যদেবের সঙ্গে অদ্বৈত, নিত্যানন্দ, গদাধর পণ্ডিত ও শ্রীবাস পণ্ডিতকে একত্র করিয়া যে পঞ্চতত্ত্ব নিরূপণ করিয়াছিলেন গোস্বামীরা তাহা মানিতেন বলিয়া মনে হয় না। সনাতন গোস্বামীর 'বৃহৎ বৈষ্ণবতোষণীর' নর্মক্রিয়ায় এই চারজন মুখ্য চৈতন্যপরিকরের বন্দনা আছে। অন্যকোন গোস্বামীগ্রন্থে গৌড়-মণ্ডলের চৈতন্যপরিকর ভক্তিপ্রচারকদের নাম পর্যন্ত উল্লেখ করা হয় নাই। সনাতন ও রূপ যে সময় বৃন্দাবনে বসিয়া ভক্তিশাস্ত্র প্রণয়ন করিতেছিলেন সেই সময়ে গৌড়মণ্ডলে চৈতন্যলীলা ও চৈতন্যতত্ত্ব সম্বন্ধে গ্রন্থ রচনা করিতেছিলেন মুরারি গুপ্ত, বৃন্দাবনদাস ও কবিকর্ণপূর। ইঁহারা গোস্বামীদের নাম করিয়াছেন বটে, কিন্তু তাঁহাদের কীর্তির কথা উল্লেখ করেন নাই। মুরারি গুপ্ত ও বৃন্দাবন-

দাসের গ্রন্থরচনার সময় (ষোড়শ শতকের চতুর্থ-পঞ্চম দশক) গোস্বামীদের কথা হয়ত বাঙ্গলায় খুব একটা জানাজানি হয় নাই, কিন্তু কবিকর্ণপূরের বেলায় এ যুক্তি খাটিবে না। 'চৈতন্যচরিতামৃতম্' (১৫৪২) ছাড়া কবিকর্ণপূরের সব গ্রন্থই ষোড়শ শতকের ষষ্ঠ-অষ্টম দশকে লেখা। এই সময় গোস্বামীদের খ্যাতি প্রতিষ্ঠিত হইয়া গেছে। একই কথা বলা যায় ষোড়শ শতকের সপ্তম-অষ্টম দশকে রচিত জয়ানন্দর 'চৈতন্যমঙ্গল' ও লোচনের 'চৈতন্যমঙ্গল' সম্বন্ধে। এই দুই চৈতন্যচরিতকারও গোস্বামীদের সম্পর্কে উদাসীন। উপাস্য ও উপাসনাপদ্ধতি নিয়া গুরুতর মতভেদের ফলে বাঙ্গলার ভক্তিপ্রচারকদের সঙ্গে গোস্বামীদের বিচ্ছেদ ঘটিয়াছিল এই অনুমান (নাথ ১৯৭৫ ঃ ১৩৩-৩৪) যুক্তিসঙ্গত বলিয়া মনে হয়।

চৈতন্যদেবের তিরোধান হইবার পর ভক্তি আন্দোলনে এত ভাঙ্গাভাঙ্গি সত্বেও চৈতন্যপ্রপত্তি বাঙ্গলার বহু ধৃতিমান প্রতিভাধর ব্যক্তিকে আকৃষ্ট করিয়াছিল। তাঁহাদের মধ্যে অনেকে প্রথমদিকে চৈতন্যপরিকর গোষ্ঠীনায়কদের সংস্পর্শে আসিয়াছিলেন। কিন্তু গৌড়মণ্ডলের ভক্তিধর্ম-প্রচারক চৈতন্যপরিকরগণের অনুভব-নির্ভর গৌরপারম্যবাদ ও ভাবাবেগময় সাধনপদ্ধতি তত্ত্বজিজ্ঞাসুদের মনে প্রেরণা সঞ্চার করিতে পারে নাই। ষোড়শ শতকের ষষ্ঠদশ নাগাদ বৃন্দাবনবাসী গোস্বামীদের তত্ত্ববিচার ও শাস্ত্রালোচনার খ্যাতি বাঙ্গলায় প্রচার হইয়া গিয়াছে। নবীন তত্ত্বজিজ্ঞাসুরা গোস্বামীদের কাছে শিক্ষা ও দীক্ষা পাইবার উদ্দেশ্যে বাঙ্গলা হইতে বৃন্দাবনে চলিয়া যাইতে লাগিলেন। এই প্রসঙ্গে জীবগোস্বামী, শ্রীনিবাস আচার্য, নরোত্তমদাস, শ্যামানন্দ ও কৃষ্ণদাস কবিরাজের নাম উল্লেখযোগ্য। চৈতন্যপ্রপত্তিকে গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মে পরিণত করা এবং ভক্তি আন্দোলনকে গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায়ে (যদিও স্বকথিত এবং সর্বভারতীয় পর্যায়ে স্বীকৃত নয়) রূপান্তরিত করায় এই পাঁচজনের খুব বড় ভূমিকা আছে।

দশম পরিচ্ছেদ

ব্রজমণ্ডল ও গৌড়মণ্ডলের মধ্যে সমন্বয় এবং নূতন কীর্তন কৌশল

নরোত্তমদাস, শ্রীনিবাস আচার্য ও শ্যামানন্দ বৃন্দাবনে গিয়াছিলেন ১৫৫৬ সালের কিছু আগে অথবা কিছু পরে। তিনজনেই বৃন্দাবনে জীব গোস্বামীর নিকট গোস্বামী শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। তখন পর্যন্ত বাঙ্গলায় গোস্বামী-শাস্ত্র চালু হয় নাই। বাঙ্গলায় গোস্বামী সিদ্ধান্ত প্রতিষ্ঠা করিতে ইচ্ছা করিয়া জীব গোস্বামী শ্রীনিবাসের হাত দিয়া গোস্বামী গ্রন্থসমূহ বাঙ্গলায় পাঠাইবার ব্যবস্থা করিলেন এবং তাঁহার সঙ্গে দিলেন নরোত্তম ও শ্যামানন্দকে। জীব গোস্বামী বাঙ্গলায় গোস্বামী সিদ্ধান্ত প্রচারের দায়িত্ব দিলেন এই তিনজনের উপর। (প্র.বি. ১২ বিলাস, নরোত্তমবিলাস, ৩ বিলাস)। তিনজনের মধ্যে নরোত্তম ছিলেন বড় দরের প্রচারক ও সংগঠক। যুক্তি এবং শাস্ত্রসম্মত তত্ত্বালোচনা বাদ দিয়া চৈতন্য পন্থা দাঁড়াইতে পারিবে না নরোত্তম ইহা বুঝিয়াছিলেন। চৈতন্য পন্থীদের তত্ত্ব ও শাস্ত্রালোচনার ফল গোস্বামীসিদ্ধান্ত। সুতরাং চৈতন্যপন্থাকে দৃঢ়মূল করিতে হইলে গোস্বামী সিদ্ধান্ত অপরিহার্য। অথচ গৌড়মণ্ডল নিঃসংশয়ে গৌরপারম্যবাদী। প্রেমভক্তি সর্বজনলভ্য এবং কীর্তন সর্বধর্মসার ও প্রেমলাভের পরম উপায় বলিয়া লোকের দৃঢ় বিশ্বাস। অতএব সমন্বয় ভিন্ন বাঙ্গলায় গোস্বামী সিদ্ধান্ত প্রচার অসম্ভব। নরোত্তমদাস নিজে গোস্বামীসিদ্ধান্ত পুরাপুরি মানিতেন কি না সন্দেহের বিষয়। নরোত্তমের দীক্ষাগুরু লোকনাথ গোস্বামী গৌরপারম্যবাদী ছিলেন। নরোত্তম

নিজেও সম্ভবতঃ গুরুর মতাবলম্বী। নরোত্তম যখন বাঙ্গলায় ফিরিবার জন্য বৃন্দাবন ছাড়িয়া আসেন তখন লোকনাথ গোস্বামী শিষ্যকে বলিয়াছিলেন—

প্রথমেই গৌরাঙ্গের সেবা আচরিবা।
তার পর রাধাকৃষ্ণ সেবা যে করিবা ॥
... ...
সঙ্কীর্ত্তন মহোৎসব যাত্রাদিক কারণ।
সমাধানে করিবে মোর আজ্ঞার পালন ॥

(প্র.বি. ১২ বিলাস)

অপরপক্ষে নরোত্তমের শিক্ষাগুরু ছিলেন জীব গোস্বামী। গোস্বামীশাস্ত্রে পারঙ্গমতার জন্য জীব গোস্বামী নরোত্তমকে ঠাকুর মহাশয় উপাধি দিয়াছিলেন। গোস্বামীগ্রন্থসহ বাঙ্গলায় যাইবার সময় জীব গোস্বামী নরোত্তমকে নির্দেশ দিয়া বলিয়াছিলেন—

গ্রন্থ অনুসারে ধর্ম্ম সব প্রচারিবে।
আপনার নিজ ধর্ম্ম পালন করিবে ॥ (তদেব)।

দীক্ষাগুরু ও শিক্ষাগুরুর আদেশ বিচার করিয়া দেখিলে মনে হয় নরোত্তম দুই দিকের টানে পড়িয়াছিলেন। দ্বৈতভাবের প্রভাবে পড়িয়া গৌরমণ্ডল ও ব্রজ-মণ্ডলের মতাদর্শের মধ্যে সমন্বয় সাধন করিবার ইচ্ছা নরোত্তমের মনে স্বাভাবিক-ভাবেই হইয়া থাকিতে পারে। বাঙ্গলায় ফিরিবার পর সমন্বয়ের প্রয়োজন বড় হইয়া দেখা দিল। সমন্বয়ের কিছু কিছু সূত্র ইতিপূর্বেই গড়িয়া উঠিয়াছিল। বাঙ্গলার ভক্তি-আন্দোলনে গৌরপারম্যবাদ ও কৃষ্ণপারম্যবাদ উভয়েরই উৎস চৈতন্যদেবের জীবন ও সাধনা। নবদ্বীপ পর্বে চৈতন্যদেব বারংবার নিজের ভগবত্তা ঘোষণা করিয়াছেন। নবদ্বীপ পর্বের ভক্তরাও চৈতন্যদেবের পরমেশ্বরত্বে সুনিশ্চয় ছিলেন। কিন্তু নীলাচলে থাকাকালীন চৈতন্যদেব নিজের ভগবত্তার কথা কখনও উচ্চারণ করেন নাই। সন্ন্যাস অবস্থায় তিনি রাধাভাবে আবিষ্ট হইয়া নিয়ত কৃষ্ণমিলন আকাঙ্ক্ষা করিতেন। নিজের পরিচয় দিতেন কৃষ্ণের দাস বলিয়া। ফলতঃ কৃষ্ণই তাঁহার ইষ্ট। এই অবস্থায় কৃষ্ণপারম্যবাদের উপরেই জোর পড়িবার কথা। গৌরপারম্যবাদ ও কৃষ্ণপারম্যবাদের মধ্যে সামঞ্জস্য স্থাপনের ইঙ্গিতও চৈতন্যজীবন ও সাধনার ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ হইতেই মিলিয়াছিল। নবদ্বীপে ভাবপ্রকাশের সময় চৈতন্যদেব কখনও কখনও রাধাভাব প্রকাশ করিয়াছেন (দ্রষ্টব্য নরহরি সরকারের পদ, প.ক., পদ সংখ্যা ১০৩, ৩০৭, ৩১৬, ৪২১,

৮৫৩, ১৭৪৬, ১৯০২)। চৈতন্যদেবের মধ্যে রাধাভাবের আবেশ প্রকট হয় দাক্ষিণাত্য ভ্রমণের সময় রায় রামানন্দর সঙ্গে একান্ত আলোচনার পর। নীলাচলে চৈতন্যদেবের জীবন ছিল সম্পূর্ণরূপে রাধাভাবদ্যুতি-সুবলিত। চৈতন্যদেবকে যাঁহারা স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ বলিয়া বিশ্বাস করিতেন সেই ভক্তরা তাঁহার রাধাভাব দেখিয়া বুঝিয়াছিলেন যে শ্রীরাধার ঐকান্তিক কৃষ্ণানুরাগের অনির্বচনীয় মাধুর্য উপলব্ধি করিবার জন্য শ্রীকৃষ্ণই রাধার ভাবসম্পদ নিয়া চৈতন্যরূপে আবির্ভূত হইয়াছেন। এই প্রত্যয় হইতে যুগলাবতার তত্ত্ব রসজ্ঞ ভক্তমহলে সুপ্রচলিত হয়। চৈতন্যদেব অন্তরে কৃষ্ণ কিন্তু বহিরঙ্গের ভাবে তিনি রাধা। রাধাকৃষ্ণ যুগল চৈতন্যরূপে অবতীর্ণ ইহাই যুগলাবতার তত্ত্বের বিষয়। স্বরূপ দামোদর ইহার সবচেয়ে বড় প্রবক্তা। নীলাচলে যুগলাবতার তত্ত্বে খুব চলন হইয়াছিল। বাঙ্গলাতেও কিছুটা ছড়াইয়াছিল। যুগলাবতার ভাবনায় নরহরি সরকারের গৌরাঙ্গবিষয়ক পদ আছে (প.ক., পদ সংখ্যা ২২৫৯)। 'বৃহৎভাগবতামৃত' ও 'উজ্জ্বলনীলমণি'র নমস্ক্রিয়ায় (অষ্টম পরিচ্ছেদে উল্লিখিত) যুগল অবতার তত্ত্বের ইঙ্গিত আছে। কিন্তু ওই পর্যন্তই। চৈতন্যদেবের ভগবত্তা সংক্রান্ত প্রশ্নের মতো যুগল অবতারতত্ত্বও গোস্বামীগ্রন্থে আলোচিত হয় নাই। অনুমোদনের তো প্রশ্নই ওঠে না। কিন্তু গোস্বামীশাস্ত্র মানিয়াও অনেকে চৈতন্যদেবের ভগবত্তায় বিশ্বাস করিতেন। যুগলাবতার তত্ত্বের সূত্র ধরিয়া ইহাঁরা দুই বিরুদ্ধ চিন্তার মধ্যে সামঞ্জস্য করিয়াছেন। নরোত্তমদাস এই সামঞ্জস্য ভাবনার অন্যতম পৃথিকৃৎ।

নরোত্তমের দৃষ্টিতে চৈতন্যদেবের ভগবত্তা স্বতঃসিদ্ধ কেননা শ্রীকৃষ্ণ ও চৈতন্যদেব এক এবং অভিন্ন। কৃষ্ণই চৈতন্যরূপে আবির্ভূত হইয়াছেন। শুধু অবতার নন, চৈতন্যদেব সকল অবতারের শ্রেষ্ঠতম। তবে মূলগত কারণে কৃষ্ণই অনন্য। গোস্বামীসিদ্ধান্ত অনুসারে কৃষ্ণের সঙ্গে তাঁহার হ্লাদিনীশক্তি রাধার মিলনই বৃন্দাবনের মহত্তম লীলা, বৃন্দাবনের নিগূঢ় রহস্য মধুর রসের এই লীলাতেই নিহিত আছে। এই কারণে মধুর রসে রাগের সর্বোত্তম বিকাশ হইয়া থাকে। তাই মধুর রসে ভজনা করিয়া আনন্দবৃন্দাবনে রাধাকৃষ্ণের প্রেমসেবা করিবার অধিকার অর্জন করাই ভক্তজীবনের লক্ষ্য। নরোত্তমদাস বলিতেছেন এই লক্ষ্যে উপনীত হইতে হইলে অবতারশ্রেষ্ঠ চৈতন্যদেবকে অবলম্বন করিতে হইবে কারণ স্বয়ং কৃষ্ণ রাধার ভাব-কান্তিসহ চৈতন্যরূপে অবতীর্ণ হইয়া জগতের সম্মুখে কৃষ্ণপ্রেমের পরাকাষ্ঠা দেখাইয়াছেন। তাই চৈতন্যস্মরণ ভিন্ন রাধাকৃষ্ণের লীলাস্মরণ হইতে পারে না। অতএব কৃষ্ণের মত চৈতন্যদেবও উপাস্য।

গোস্বামীমতে বৈধী ও রাগানুগা সাধন গুরুমুখী সাধনা। মধুর রসে অন্তরঙ্গ-

রাগানুগা সাধনভক্তির ভজনপ্রণালী শেষ পর্যন্ত মঞ্জরী সাধনায় পর্যবসিত হইয়াছিল। মঞ্জরীগণ ব্রজলোকে রাধাকৃষ্ণের সেবিকা। রাধার সখীদের মতো তাহারা লীলার সহায়ক নয়, ব্রজে তাহাদের কর্ম কিঙ্করীযোগ্য। তবে মঞ্জরীগণ কৃষ্ণের নিজস্ব পরিকর বলিয়া কৃষ্ণের প্রতি তাহাদের আকর্ষণ রাগাত্মিক, রাধাকৃষ্ণের সেবা তাহারা রাগবশতঃ করিয়া থাকে। সেবাই জীবের পক্ষে কৃষ্ণলীলার আনন্দ উপলব্ধি করিবার সর্বোৎকৃষ্ট উপায়। অতএব মঞ্জরী সাধক কায়মনোবাক্যে সেবাপরায়ণা মঞ্জরীগণের রাগাত্মিকা ভক্তির অনুগ হইয়া রাধাকৃষ্ণের সেবাধিকার লিপ্সায় সাধনা করেন। মঞ্জরী সাধনা গুরুর নির্দেশ অনুসারে একান্তে এবং সম্পূর্ণ স্বতন্ত্রভাবে করিতে হয়। ইহা অতিশয় গুহ্য অন্তশ্চিন্তিত মানসী সাধন। মঞ্জরী সাধনার উৎস রূপ গোস্বামীর 'স্তবমালা' ও রঘুনাথ দাস গোস্বামীর 'স্তবাবলী'। স্তবসমূহে ইঁহারা রাধাকৃষ্ণের লীলাপুষ্টির উদ্দেশ্যে রাধার সেবা করিবার বাসনা ব্যক্ত করিয়াছেন। গোস্বামীদের এই সূত্র বিস্তারিত করিয়া মঞ্জরী সাধনার পদ্ধতি গড়িয়া তোলেন নরোত্তমদাস, শ্রীনিবাস আচার্য ও শ্যামানন্দ। তত্ত্বাগতভাবে মঞ্জরী সাধনা গোস্বামীশাস্ত্রসম্মত, ইহা রাগানুগা সাধনভক্তির সাধনা। কিন্তু সহজসাধনার ধারা সূক্ষ্মভাবে মঞ্জরী সাধনায় মিশিয়া আছে। মঞ্জরী সাধনা যুগলমিলনে অখণ্ড আনন্দ উপলব্ধির প্রয়াস। তবে মঞ্জরী সাধক সাধিকা নিজদেহে কৃষ্ণ বা রাধার অস্তিত্ব কল্পনা করিয়া নরনারীর যুগ্ম সাধনা দ্বারা আনন্দানুসন্ধান করেন না। মঞ্জরী সাধক ব্রজে রাধাকৃষ্ণের মিলনই পরানন্দস্বরূপ জানিয়া যুগলমিলনের লীলা-পুষ্টির জন্য মঞ্জরীর অনুগত হইয়া প্রেমসেবার অধিকার প্রার্থনা করেন। সেবা-ধিকার লাভই সাধকের চরম সার্থকতা, ইহাতেই আনন্দের উপলব্ধি হয়। আনন্দের উপলব্ধিই মুক্তির উৎস।

মঞ্জরী সাধনা সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র, বিবিক্ত ব্যক্তিগত ব্যাপার, ইহা সাধকের নিজস্ব মুক্তির পথ। সর্বসাধারণের প্রকাশ্য সম্মেলক ধর্মাচরণের জন্য নরোত্তমদাস নাম-কীর্তনের মহিমা প্রচার করিয়াছেন। নামগানকে তিনি বলিয়াছেন 'চিন্তামণি সর্বফলদাতা'। নামগানের অনুষ্ঠানে দেশকালপাত্র ভেদ নাই, শুচি অশুচি বিচার বা দীক্ষা পুরশ্চরণ প্রভৃতি আচার অবান্তর। যে কেহ তদগতচিত্তে নামগান করিয়া পরমার্থ লাভ করিতে পারে এই বিশ্বাস নরোত্তম বার বার নানভাবে ব্যক্ত করিয়াছেন। সঙ্কীর্তনে নামগুণযশোগান ভক্তি আন্দোলনের আদি সংগঠন ও সর্বজনীন রূপ। চৈতন্যদেব ইহার প্রবর্তক। নিত্যানন্দ প্রমুখ ভক্তিপ্রচারকগণ সম্মেলক সঙ্কীর্তন দ্বারা ভক্তিধর্মকে সমাজের বিভিন্ন স্তরে ছড়াইয়া দিয়াছিলেন। নবরূপে ভক্তিধর্ম প্রচার করিতে গিয়া নরোত্তমদাস নামগানের সর্বজনীন পন্থা

অবলম্বন করিলেন (নরোত্তমদাসের চিন্তা ও মতাদর্শের বিস্তারিত বিবরণের জন্য দ্রষ্টব্য নাথ ১৯৭৫ : ৫৫-১৫০)।

নিত্যানন্দ প্রমুখ চৈতন্য পরিকরদের মতো নরোত্তমদাসেরও উদ্দেশ্য ছিল সর্বসাধারণের মধ্যে ব্যাপকভাবে ভক্তিধর্ম প্রচার করা। সুতরাং তিনি নামগানের উপর জোর দিবেন ইহাই স্বাভাবিক। তবে নামকীর্তনের ব্যাপারে আগেকার মহান্তদের সঙ্গে নরোত্তমের একটা পার্থক্য আছে। এই পার্থক্য তাৎপর্যপূর্ণ। আগেকার চৈতন্যপন্থী মহান্তদের মত ভাবাবেগের পথে অনুভবের জন্য নয়, তত্ত্ব-বিচার ও শাস্ত্রপ্রমাণ অবলম্বন করিয়া নরোত্তমদাস উচ্চতর সাধনমার্গে উন্নমনের উপায় হিসাবে নামকীর্তনের মহিমা ব্যক্ত করিয়াছেন। আপাতদৃষ্টিতে নরোত্তমের মত গোস্বামীশাস্ত্র অনুযায়ী। গোস্বামীমতে কীর্তন আসলে বৈধীভক্তির অঙ্গ। বৈধী অনুষ্ঠানের জোরে ভক্তির উচ্চতর স্তরে আরোহণ করা যায়। কিন্তু নরোত্তম নাম-গানকে শুধু বৈধীভক্তির অন্যতম অঙ্গ হিসাবে দেখেন নাই। তাঁহার দৃষ্টিতে নামগান ভক্তিলাভের স্বতন্ত্রও বিশিষ্ট উপায়। 'ভক্তিসন্দর্ভে' জীব গোস্বামী নাম-কীর্তনের মহিমাজ্ঞাপক যে সব শাস্ত্রবাক্য উদ্ধৃত করিয়াছেন তাহা হইতেই এইরূপ সিদ্ধান্ত করা চলে। নাম ও নামী এক এবং অভিন্ন এই শাস্ত্রীয় উপপত্তির যে ব্যাখ্যান নরোত্তমদাস করিয়াছেন তাহার মর্ম এই যে নাম অবলম্বন করিয়া অগ্রসর হইলে তত্ত্বের যুক্তি ও শাস্ত্রের শৃঙ্খলা অনুসারে উচ্চতর আধ্যাত্মিক স্তরে উন্নীত হইয়া ব্রজলীলার নিগূঢ় রহস্য ভেদ করা যাইতে পারে। ইহার ফলে সর্বসাধারণের আয়ত্ব নামকীর্তন হইতে তত্ত্বচিন্তা ও শাস্ত্রভাবনা সম্ভবপর হইয়া উঠিল।

গোস্বামীসিদ্ধান্তকে ভিত্তি ধরিয়া গোস্বামীশাস্ত্রকথিত কৃষ্ণপারম্যবাদের সঙ্গে বাঙ্গলায় প্রচলিত ভক্তিধর্মের বৈশিষ্ট্যসমূহ যথা গৌরাঙ্গ উপাসনা ও কীর্তনের মাহাত্ম্য এবং সহজপন্থী ধ্যানধারণার সমন্বয় হইবার ফলে যে ধর্মমতের উদ্ভব হইল তাহাই গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্ম। নরোত্তমদাস ইহার মুখ্য সংগঠক। এই ধর্মের তাত্ত্বিক ও শাস্ত্রীয় রূপ দিয়াছেন কৃষ্ণদাস কবিরাজ। 'চৈতন্যচরিতামৃত' কাব্যে কৃষ্ণদাস কবিরাজ এই সমন্বয়বাদের দৃষ্টিতে চৈতন্যদেবের জীবন ও সাধনার তত্ত্বগত ব্যাখ্যা করিয়াছেন। সমন্বয়বাদী গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্ম বাঙ্গালী হিন্দুদের মধ্যে সবচেয়ে প্রভাবশালী ধর্মমত। 'চৈতন্যচরিতামৃত' ইহার সর্বজনমান্য শাস্ত্রগ্রন্থ। গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায়ে 'চৈতন্যচরিতামৃত' বেদের তুল্য শিরোধার্য।

নরোত্তমদাসের বাড়ী ছিল গোপালপুর গ্রামে। পদ্মানদীর পূর্বতীরে অবস্থিত প্রেমতলী হইতে দুই মাইল ভিতরে খেতুরী, তাহার কাছে গোপালপুর (রাজসাহী জেলা, বাংলাদেশ)। দেশে ফিরিয়া নরোত্তম দাস খেতুরীতে থাকা স্থির

করিলেন। খেতুরী হইতে তিনি বাঙ্গলার খণ্ডবিখণ্ড বৈষ্ণব সমাজকে একত্র করিয়া সংগঠিত করিবার চেষ্টা শুরু করিয়া দিলেন। এই উদ্দেশ্যে তিনি বাঙ্গলা ও ওড়িশার বিভিন্ন স্থানে দীর্ঘদিন পরিভ্রমণ করিয়া বৈষ্ণব সমাজের গোষ্ঠীনায়কদের সঙ্গে দেখা করিতে লাগিলেন। 'নরোত্তমবিলাস' (৩, ৪, ৫ বিলাস) এবং 'ভক্তিরত্নাকর' (৮ তরঙ্গ) গ্রন্থে নরোত্তমদাসের ভ্রমণ বৃত্তান্ত ও মহান্তসঙ্গের বিবরণ পড়িয়া মনে হয় বৈষ্ণবগোষ্ঠীনায়কদের উপর তিনি বেশ প্রভাব বিস্তার করিতে পারিয়াছিলেন। পরিভ্রমণ শেষে নরোত্তম খেতুরীতে একটা বিরাট মহোৎসবের আয়োজন করেন। বাঙ্গলার সকল গোষ্ঠীনায়ক মহান্তদের তিনি এই মহোৎসবে যোগ দিবার জন্য আমন্ত্রণ করিয়াছিলেন। নূতন ভাবাদর্শের সূত্রে বাঙ্গলার বিচ্ছিন্ন বৈষ্ণব গোষ্ঠীসমূহকে একত্রীকৃত করাই ছিল খেতুরী মহোৎসবের মূল উদ্দেশ্য।

নরোত্তমের কাজ অনেকটা সহজ করিয়া দিয়াছিলেন শ্রীনিবাস আচার্য। শ্রীনিবাস থাকিতেন শ্রীখণ্ডের কাছে যাজিগ্রামে। দেশে ফিরিয়া শ্রীনিবাস ভক্তিশাস্ত্র অধ্যাপনা শুরু করিলেন। অনেক তত্ত্বজিজ্ঞাসু বৈষ্ণব তাঁহার কাছে আসিয়া গোস্বামীশাস্ত্রে পাঠ নিতে থাকেন। অনেকে তাঁহার শিষ্যও হইয়াছিলেন। শ্রীনিবাসের শিষ্যদের মধ্যে একদিকে ছিলেন সপারিজন মল্লরাজা (বিষ্ণুপুরাধিপতি) বীর হম্বীরের মত প্রতিপত্তিশালী করদ রাজ্যাধিপতি অন্যদিকে অষ্ট কবিরাজের মত জ্ঞানীগুণী ও কবি। শ্রুতকীর্তি পদকর্তা গোবিন্দদাস এই আটজনের অন্যতম। আশপাশের গোষ্ঠীনায়ক মহান্ত যথা, শ্রীখণ্ডের নরহরি সরকার ও রঘুনন্দন এবং কাটোয়ার গদাধরদাস এবং যদুনন্দনের সঙ্গে শ্রীনিবাসের সশ্রদ্ধ প্রীতির সম্পর্ক গড়িয়া উঠিয়াছিল।

শ্রীনিবাস দেশে ফিরিবার কিছুদিন পরে অল্পদিনের ব্যবধানে গদাধরদাস ও নরহরি সরকারের দেহান্ত হয়। মৃত্যুর এক বছর পরে তাহাদের তিরোধান তিথি উদ্‌যাপনের জন্য কাটোয়া ও শ্রীখণ্ডে মহোৎসব হইয়াছিল। দুই মহোৎসবেই শ্রীনিবাসের ভূমিকা উল্লেখযোগ্য। কাটোয়ায় গদাধরদাসের গোষ্ঠী কর্তৃক আয়োজিত মহোৎসবে যোগ দিয়াছিলেন নিত্যানন্দ, অদ্বৈত, গদাধর পণ্ডিত ও শ্রীখণ্ড গোষ্ঠীর মহান্তগণ। গোস্বামীদের মতাবলম্বী গোষ্ঠীর প্রতিনিধি ছিলেন শ্রীনিবাস স্বয়ং। গোষ্ঠী বহির্ভূত নবদ্বীপ, কুলীনগ্রাম ও কাঁচরাপাড়ার মহান্তগণও কাটোয়া মহোৎসবে যোগ দিয়াছিলেন। গোষ্ঠীবিরোধ বেশ খানিকটা কমিয়া না আসিলে এইরূপ সমাবেশ সম্ভব হইত না। মনে হয় শ্রীনিবাস ও নরোত্তমের প্রচেষ্টাই ইহার কারণ। কাটোয়া মহোৎসবে ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব ছিল শ্রীনিবাসের হাতে। কাটোয়া মহোৎসবের পর মহান্তগণ আসিলেন যাজিগ্রামে। সেখান হইতে তাঁহাদের

শ্রীখণ্ড যাইবার কথা। যাজিগ্রামে উপস্থিত মহান্তদের নিয়া শ্রীনিবাস নিজেই একটা মহোৎসব করিলেন। যাজিগ্রামে কয়েকটা দিন কাটাইয়া শ্রীনিবাসসহ মহান্তরা আসিলেন শ্রীখণ্ডে। ইতিমধ্যে তাঁহারা শ্রীনিবাসের গুণমুগ্ধ। শ্রীখণ্ড মহোৎসবের দিন মহান্তদের উপরোধে শ্রীনিবাস ভাগবত পাঠ ও ব্যাখ্যা করিলেন। শ্রীনিবাস গোস্বামীসিদ্ধান্ত অনুযায়ী ভাগবত ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন ইহাই সম্ভব। শ্রীনিবাসের ব্যাখ্যা উপস্থিত সকল মহান্তরই খুব মনঃপূত হইয়াছিল। শ্রীখণ্ডে বিভিন্ন গোষ্ঠীনায়ক মহান্তদের মধ্যে সম্প্রীতির ইঙ্গিতও দেখা গিয়াছিল। তাঁহারা পরস্পরকে মালা ও চন্দন দিয়া সংবর্দ্ধনা করিয়াছিলেন এবং একত্রে বসিয়া ভোজনও করিয়াছিলেন। চৈতন্যোত্তর বৈষ্ণব সমাজে এসব অভিনব ঘটনা।

শ্রীখণ্ডের মহোৎসবের পর চৈতন্যভক্ত হরিদাস আচার্যর তিরোভাব তিথি মহোৎসব হয় কাঞ্চনগোড়িয়াতে। হরিদাসের দুই ছেলে গোকুলদাস ও শ্রীদাস শ্রীনিবাসের কাছে গোস্বামীশাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। শ্রীনিবাসের নির্দেশে তাঁহারা মহোৎসবের আয়োজন করিলেন। এই মহোৎসবেও বহু মহান্ত উপস্থিত হইয়াছিলেন। শ্রীনিবাস ছিলেন কাঞ্চনগোড়িয়া মহোৎসবের মধ্যমণি। মহোৎসব উপলক্ষে শ্রীনিবাস আচার্য গোকুলদাস ও শ্রীদাসকে মন্ত্রদীক্ষা দেন। শ্রীকৃষ্ণের পূজায় পৌরহিত্যও তিনিই করিয়াছিলেন। মহান্তদের উপস্থিতিতে পূজার্চনা করিয়া ও দীক্ষা দিয়া শ্রীনিবাস আনুষ্ঠানিকভাবে বাঙ্গলায় গোস্বামীসিদ্ধান্তের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠার সূচনা করিয়া দিলেন।

খেতুরী মহোৎসব ঠিক কবে হইয়াছিল তাহা জানা যায় না। বিশেষজ্ঞদের অনুমান ১৫৭৬ সাল বা তাহার অব্যবহিত পরে খেতুরী মহোৎসব অনুষ্ঠিত হয় (নাথ ১৯৭৫ : ১৫-১৭)। পাঁচটি রাধাকৃষ্ণ ও একটি গৌরাঙ্গ বিষ্ণুপ্রিয়া যুগল বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা উপলক্ষে নরোত্তম এই মহোৎসবের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। 'নরোত্তমবিলাস' (৬, ৭, ৮ বিলাস), 'ভক্তিরত্নাকর' (১০ তরঙ্গ) এবং 'প্রেমবিলাস' (১৪ বিলাস) গ্রন্থে খেতুরী মহোৎসবের বর্ণনা আছে।

নরোত্তমের আমন্ত্রণে বাঙ্গলার প্রায় সব গোষ্ঠীনায়ক মহান্তগণ অনুগামীদের নিয়া খেতুরী মহোৎসবে যোগ দিতে আসিয়াছিলেন। কাটোয়া ও শ্রীখণ্ড মহোৎসবে যে গোষ্ঠীগুলির সমাবেশ ঘটিয়াছিল সেই সব গোষ্ঠীর মহান্তরা সকলেই শিষ্যসেবক সঙ্গে নিয়া খেতুরীতে আসিয়াছিলেন। আগেকার মহোৎসবে যাঁহারা যান নাই তাঁহারাও খেতুরী মহোৎসবে যোগ দিয়াছিলেন যথা, রসরাজ সাধনগোষ্ঠীর চৈতন্য-দাস, জ্ঞানবাদী গোষ্ঠীর কামদেব নাগর, অম্বিকা কালনা গোষ্ঠীর (নিত্যানন্দ গোষ্ঠী হইতে উৎপন্ন) হৃদয়চৈতন্য এবং গোস্বামী সিদ্ধান্তবাদীদের শ্যামানন্দ গোষ্ঠী।

গোষ্ঠীবহির্ভূত মহান্তরা আসিয়াছিলেন নবদ্বীপ ও কুমারহট্ট হইতে। নিত্যানন্দগোষ্ঠীর পরিচালিকা জাহ্নবীদেবী কাটোয়া ও শ্রীখণ্ড মহোৎসবে যান নাই। তিনি খেতুরীতে আসিয়াছিলেন। নিত্যানন্দগোষ্ঠীর প্রধান হিসাবে জাহ্নবী দেবীর তখন খুব খ্যাতি প্রতিপত্তি। বাঙ্গলার বৈষ্ণব সমাজে তিনি বহুজনমান্য মা গোস্বামিনী। অদ্বৈতগোষ্ঠীর নায়ক অচ্যুতানন্দ খেতুরী মহোৎসবে যোগ দিয়াছিলেন। তিনিও কাটোয়া ও শ্রীখণ্ড যান নাই। স্বতন্ত্র মতাবলম্বী সকল গোষ্ঠী ও প্রভাবশালী মহান্তদের সামগ্রিক সমাবেশ এই প্রথম। জাহ্নবা দেবী ও অচ্যুতানন্দসহ এতগুলি গোষ্ঠীকে এক জায়গায় জড়ো করা নরোত্তমদাসের অভিনব সাফল্য তাহাতে সন্দেহ নাই।

চৈতন্যদেবের জন্মতিথি ফাল্গুনী পূর্ণিমার দিনে সমবেত বৈষ্ণবগুলের সম্মুখে শ্রীনিবাস আচার্য গোস্বামীমতে পূজার্চনা করিয়া ছয়টি যুগল বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করিলেন। উপস্থিত সকলে তাহা মানিয়া নিলেন। মহান্তরা গোস্বামী-সিদ্ধান্তের উৎকর্ষ স্বীকার না করিলে ইহা সম্ভব হইত না। তবে লক্ষ্য করিবার বিষয় খেতুরীতে বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা ব্যাপারের সবটাই গোস্বামীসিদ্ধান্ত সম্মত নয়। চৈতন্যপূজা গোস্বামীমতে অনভিপ্রেত। গোস্বামীরা চৈতন্যদেবকে দেখিয়াছিলেন সন্ন্যাসের পরে। যতিবেশধারী শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যকেই গোস্বামীগণ তাঁহাদের গ্রন্থে বন্দনা করিয়াছেন, নবদ্বীপের গৌরাঙ্গকে নয়। প্রিয়াসহ গৌরাঙ্গ-মূর্তি তাঁহাদের পক্ষে অকল্পনীয়। বিপরীতপক্ষে গৌড়মণ্ডলের ভক্তরা চৈতন্য-দেবের সন্ন্যাসরূপের বিশেষ অনুরাগী নন। বাঙ্গলায় গোস্বামীমত প্রচারের আগে নবদ্বীপ, অম্বিকা কালনা, শ্রীখণ্ড, কাটোয়া, দাঁইহাট, ভাগকোলা, যশড়া, আটিসারা প্রভৃতিস্থানে চৈতন্যদেবের বিগ্রহ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। এই সব প্রতিমা নবযৌবন সমৃদ্ধ পরমরূপবান গৌরকিশোর বিগ্রহ। এই রূপই ছিল বাঙ্গলায় ভক্তমণ্ডলীর আরাধ্য। ষোড়শ শতকের পদকর্তাগণ গৌরাঙ্গরূপগুণের বর্ণনাই দিয়াছেন বেশী। সন্ন্যাসের কথা তাঁহাদের রচনায় কম। জীবনীকাব্য সমূহে মুরারি গুপ্ত, কবিকর্ণপুর, বৃন্দাবনদাস, লোচনদাস, জয়ানন্দ সকলেই নীলাচল পর্বের বিবরণ সংক্ষেপে সারিয়াছেন। নরোত্তম গৌরাঙ্গ বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন খুব সম্ভব বাঙ্গলায় প্রচলিত ঐতিহ্যের কথা ভাবিয়া। গৌরাঙ্গের পাশে বিষ্ণুপ্রিয়ার অধিষ্ঠান, কৃষ্ণের পাশে রাধার মত। ইঙ্গিতটা এই যে গৌরাঙ্গ ও কৃষ্ণ অভিন্ন। তবে পাঁচটি রাধাকৃষ্ণ বিগ্রহের সঙ্গে একটি গৌরাঙ্গ বিষ্ণুপ্রিয়ার যুগলমূর্তি। অর্থাৎ সংখ্যা ও পূজার্চনার দিক দিয়া কৃষ্ণের ভাগই বেশী। দেখা যাইতেছে বাঙ্গলার ঐতিহ্য অনুসারে গৌরাঙ্গপূজা হইলেও নরোত্তমের অনুষ্ঠানে গোস্বামীমতের কৃষ্ণোপসানাই প্রাধান্যই লাভ করিয়াছে। বাঙ্গলায় গৌরাঙ্গপূজার বিশিষ্ট পদ্ধতি চালু ছিল।

সেই পদ্ধতিকে যুগল উপাসনার প্রয়োজনমত সংস্কার না করিয়া গৌরাঙ্গবিষ্ণুপ্রিয়ার পূজা করা হইল গোস্বামীশাস্ত্রের বিধান অনুসারে। গোস্বামী সিদ্ধান্তের মধ্যে থাকিয়া নরোত্তম যে ভাবে তাহার সঙ্গে বাঙ্গলায় প্রচলিত ঐতিহ্যের সামঞ্জস্য করিতেছিলেন বিগ্রহ প্রতিষ্ঠার ঘটনা তাহার চমৎকার দৃষ্টান্ত।

'প্রেমবিলাস', 'নরোত্তমবিলাস' ও 'ভক্তিরত্নাকর' গ্রন্থে খেতুরী মহোৎসব ও তাহার পরবর্তী ঘটনাবলীর বিবরণ পড়িলে মনে হয় যে বাঙ্গলার বৈষ্ণবগোষ্ঠীনায়কগণ গোস্বামীসিদ্ধান্তের ভিত্তিতে নরোত্তমের সমন্বয় প্রচেষ্টা মানিয়া নিয়াছিলেন। খেতুরী মহোৎসবের পরেই দেখিতেছি জাহ্নবা দেবীর মত অগ্রগণ্য ও প্রভাবশালী গোষ্ঠী-নায়কও শিষ্যসেবকসহ বৃন্দাবনে যাইতেছেন। তিনি বৃন্দাবনে গিয়া জীব গোস্বামী, গোপাল ভট্ট গোস্বামী ও রঘুনাথদাস গোস্বামীর সঙ্গে দেখা করেন (প্র.বি. ৭, ৮, ১৫ বিলাস)। জাহ্নবা দেবীকে দিয়া বাঙ্গলার গোষ্ঠীনায়কদের বৃন্দাবনযাত্রা শুরু। নিত্যানন্দ, অদ্বৈত আচার্য, নরহরি সরকার বা গদাধরদাস কখনও বৃন্দাবন যান নাই। চৈতন্যদেব স্বয়ং ভক্তিশাস্ত্র রচনা, লুপ্ত-তীর্থ উদ্ধার ও বিগ্রহ প্রতিষ্ঠার জন্য বৃন্দাবনে ঘাঁটি বসাইয়াছেন, এ কথা তাঁহারা জানিতেন। তবুও বৃন্দাবন সম্পর্কে তাঁহাদের কোন ঔৎসুক্য ছিল না। নরোত্তমদাস বাঙ্গলার ভক্তিপ্রচারকদের সঙ্গে বৃন্দাবনের যোগ সাধন করিয়া দিলেন। বাঙ্গলার মহান্তরা বৃন্দাবনের শ্রেষ্ঠতা স্বীকার করিয়া নিলেন। তাঁহাদের কাছে গোস্বামীশাস্ত্র হইয়া উঠিল গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মের অধিবিদ্যা, অধ্যাত্মদর্শন, রসশাস্ত্র ও সদাচারের উৎস ও প্রমাণস্থল।

আঞ্চলিক ঐতিহ্যের সঙ্গে তত্ত্ব ও শাস্ত্রের সমন্বয় করিয়া নরোত্তমদাস গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মের সামাজিক সংগঠন দৃঢ় ও ব্যাপক করিয়া তুলিবার চেষ্টা করিতেছিলেন। এই প্রচেষ্টার অভিনব স্ফূর্তি দেখিতে পাই নরোত্তম-প্রবর্তিত নূতন কীর্তন কৌশলে। বাঙ্গলায় প্রচলিত কাব্যসঙ্গীত ও লোকসঙ্গীতের সঙ্গে প্রবাহমান ভারতীয় রাগসঙ্গীতের মিলনমিশ্রন করিয়া নরোত্তমদাস নূতন কীর্তন কৌশল প্রবর্তন করেন। ত্রয়োদশ শতকের গোড়ার দিকে বাঙ্গলায় তুর্কী-আফগান আধিপত্য শুরু হওয়ার পর হইতে বাঙ্গলার সঙ্গীতচর্চা ভারতীয় রাগসঙ্গীতের ধারা হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়ে। ইতিপূর্বে সঙ্গীতের ক্ষেত্রে বাঙ্গালী যে বিশিষ্টতা অর্জন করিয়াছিল ত্রয়োদশ-ষোড়শ শতকে তাহা কোনক্রমে বজায় ছিল বটে, কিন্তু এই সময়ে বাঙ্গলায় সঙ্গীতের বিকাশ কিছুই হয় নাই। পঞ্চদশ-ষোড়শ শতকে উত্তর ভারতে রাগসঙ্গীতের খুব বড় বিবর্তন হইতেছিল। প্রচলিত বিভিন্ন প্রবন্ধ-সঙ্গীত নির্দিষ্ট পন্থা হইতে বিচ্যুত হইয়া গিয়াছিল। এই সময় সেগুলিকে রীতিসম্মতভাবে সংগঠিত করিবার চেষ্টা শুরু হয়। এই চেষ্টা হইতেই ধ্রুবপদের

জন্ম (রাজেশ্বর মিত্র ১৯৫৫ ঃ ১৮)। নরোত্তমদাস বৃন্দাবনে যান ১৫৫৬ সাল নাগাদ। বৃন্দাবনে তিনি ছিলেন সম্ভবতঃ চোদ্দ পনেরো বছর অর্থাৎ ১৫৭০ সাল পর্যন্ত বা আর একটু বেশী (নাথ ১৯৭৫ ঃ ১৪-১৭)। এই সময় উত্তর ভারতে রাগসঙ্গীতের বিবর্তন পরিণত পর্যায়ে আসিয়া গিয়াছে। আধ্যাত্মিক চিন্তা ও শাস্ত্রচর্চার সঙ্গে নরোত্তমদাসের সঙ্গীতেও খুব আগ্রহ ছিল। বৃন্দাবনে থাকিবার সময় তিনি রীতিমত রাগসঙ্গীত চর্চা করিয়াছিলেন। সঙ্গীতে তাঁহার গুরু ছিলেন বোধ হয় হরিদাস স্বামী (হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় ১৯৭১ ঃ ১৫-১৬)।

খেতুরী মহোৎসবে নরোত্তমদাস তাঁহার নূতন কীর্তন কৌশল প্রবর্তন করিলেন। মহোৎসব উপলক্ষ্যে সমবেত গোষ্ঠীনায়কগণসহ বৈষ্ণবমণ্ডলীর সামনে নূতন গায়ন-পদ্ধতি প্রকাশ করিবার জন্য নরোত্তম তৈরী হইয়া ছিলেন। অনেক খোল ও করতাল গড়াইয়া রাখা হইয়াছিল। নরোত্তমদাসের সহযোগীরা সকলেই ছিলেন গীতবাদ্য ও নৃত্যবিশারদ। ইঁহাদের মধ্যে মুখ্য ভূমিকায় ছিলেন চারজন দেবীদাস, বল্লভদাস, গৌরাঙ্গদাস ও গোকুলদাস। নরোত্তমদাসের নূতন কীর্তন কৌশল প্রকাশের বিবরণ নরহরি চক্রবর্তীর লেখা 'ভক্তিরত্নাকর' গ্রন্থে আছে। বিশেষ প্রণিধানযোগ্য বলিয়া দীর্ঘ হইলেও বিবরণটি পুরাপুরি উদ্ধার করিতেছি। উপস্থিত মহান্তগণ কীর্তন শুরু করিবার অনুমতি দিলে নরোত্তম সকলকে প্রণাম করিয়া বৈষ্ণবোচিত দৈন্যসহকারে নিজের সহযোগীদের দিকে তাকাইলেন। নরোত্তমের ইঙ্গিতে কীর্তন আরম্ভ হইল।

প্রথমেই দেবী দাস মর্দল বামেতে।
করে হস্তাঘাত—প্রেমময় শব্দ তাতে ॥
অমৃত অক্ষর প্রায় বাদ্য সঞ্চারয়ে।
শ্রীবল্লবদাসাদি সহিত বিস্তারয়ে ॥
শ্রীগৌরাঙ্গদাসাদিক মনের উল্লাসে।
বায় কাংস্যতালাদি প্রভেদ পরকাশে ॥
অনিবদ্ধ নিবদ্ধ গীতের ভেদদ্বয়।
অনিবদ্ধ গীত গোকুলাদি আলাপয় ॥
অনিবদ্ধ গীতে বর্ণন্যাস স্বরালাপ।
আলাপে গোকুল কণ্ঠধ্বনি নাশে তাপ ॥
আলাপে গমক মন্দ্র মধ্যতার স্বরে।
সে আলাপ শুনিতে কেবা বা ধৈর্য্য ধরে ॥

গায়ক বাদক যৈছে করে অভিনয়।
যৈছে সে সবার শোভা কহিল না হয়॥
নরোত্তম বেষ্টিত এ সব পরিকরে।
তারাগণ মধ্যে যেন চন্দ্র শোভা করে॥
সর্ব্বাঙ্গসুন্দর মাধুর্য্যের নাই সীমা।
সঙ্কীর্ত্তন আবেশে কি মধুর ভঙ্গিমা॥
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নিত্যানন্দাদ্বৈতচন্দ্রে।
গণসহ চিন্তয়ে মানসে মহানন্দে॥
বার বার প্রণমিয়া সবার চরণে।
আলাপ অদ্ভুতরাগ প্রকট কারণে॥
রাগিণী সহিত রাগ মূর্ত্তির্মন্ত কৈলা।
শ্রুতি স্বর গ্রাম মূর্ছনাদি প্রকাশিলা॥
সুমধুর কণ্ঠধ্বনি ভেদয়ে গগন।
পরম মাদক সুধা নহে তার সম॥
তাল পাঠাক্ষর চারু ছান্দে উচ্চারয়।
বাদকগণের যাতে মোদবৃদ্ধি হয়॥
ক্রমে ক্রমে গীতবাদ্য বৃদ্ধি হয় যৈছে।
শ্রী প্রভুগণের প্রেমানন্দ বাঢ়ে তৈছে॥
খণ্ডবাসী শ্রী রঘুনন্দন প্রেমময়।
সঙ্কীর্ত্তন সুখের সমুদ্রে সাঁতারয়॥
শ্রী প্রভুর সম্পত্তি শ্রীখোল করতাল।
তাহে স্পর্শাইলা চন্দন পুষ্পমাল॥
গণসহ নরোত্তমে করি আলিঙ্গন।
নিজহস্তে পরাইলা শ্রীমালাচন্দন॥
নরোত্তম গণসহ তাঁরে প্রণময়।
নিবদ্ধ গীতের পরিপাটী প্রচারয়॥

(ভ.র. ১০।৫২৮-৫৪৬)

'ভক্তিরত্নাকরের' বর্ণনায় দেখা যাইতেছে কীর্তন শুরু হইল বাজনা দিয়া। প্রথমে মর্দল অর্থাৎ খোলবাদ্য আরম্ভ করিলেন দেবীদাস। কিছু পরে তাঁহার সঙ্গে যোগ দিলেন বল্লভদাস। করতাল বাজাইতেছিলেন গৌরাঙ্গদাস। বাজনার সঙ্গে

সঙ্গে তালের বোল উচ্চারণ করা হইতেছিল। কীর্তনগানে এই প্রথা আগে হইতেই চালু ছিল এখনও আছে। বোল উচ্চারণ করিবার রীতিকে বলে পাট। বাজনা বেশ জমিয়া উঠিলে গোকুলদাস আরম্ভ করিলেন অনিবদ্ধগীত অর্থাৎ রাগ-রাগিনী লইয়া আলাপচারী, বর্ণন্যাস স্বরালাপ। আলাপে রাগের আলাপন হয়। আলাপ অর্থযুক্ত কথার দ্বারা আবদ্ধ নয় বলিয়া ইহার নাম অনিবদ্ধ গীত। ইহাতে আলের প্রয়োজন হয় না। অর্থযুক্ত পদে রাগরাগিনীর প্রকাশ হইলে তাহাকে বলা হয় নিবদ্ধ সঙ্গীত। অনিবদ্ধ গান শেষ হইলে নিবদ্ধ গান আরম্ভ করিলেন নরোত্তম স্বয়ং। কীর্তন গাওয়া হইয়াছিল সে কালের প্রবন্ধ সঙ্গীত অর্থাৎ শুদ্ধ সঙ্গীতের নিয়ম অনুসারে, ধ্রুবপদের মত আলাপের পর গীত। গান হইয়াছিল সুর, তান, মূর্ছনা বিস্তার করিয়া। গান আরম্ভ করিবার আগে জমাট বাজনা দিয়া আসর জমাইয়া নেওয়া হইয়াছিল। আসর করিয়া গান করিবার পদ্ধতি হিসাবে ইহা চমৎকার। বিশেষতঃ কীর্তনের মত গানে। কীর্তনে বাজনা গানের পরিপোষকমাত্র নয়, গানের মত তাহা ভাবের বাহকও বটে। গায়ক ও বাদক উভয়ের দ্বারা সমভাবে অনুভূতি বিস্তার না হইলে কীর্তন সার্থক হয় না। কীর্তনে বাদ্যের এই ভূমিকা বোধকরি নরোত্তমই নির্দেশ করিয়া দিয়াছিলেন। খেতুরীর কীর্তনে বাদ্যের সমারোহ ইহারই ইঙ্গিত দিতেছে।

খেতুরীতে নরোত্তম নিবদ্ধ সঙ্গীত আরম্ভ করিয়াছিলেন গৌরাঙ্গবিষয়ক গান গাহিয়া। নির্দিষ্ট বিষয়বস্তুর ইঙ্গিত দিয়াছেন নরহরি চক্রবর্তী।

শ্রীরাধিকার ভাবে মগ্ন নদীয়ার চান্দ।
সেই ভাবময় গীত রচনা সুছান্দ ॥ (ভ.র. ১০।৫৪৭)

অর্থাৎ চৈতন্যদেবের রাধাভাব নিয়া রচিত পদ গাওয়া হইল। 'ভক্তিরত্নাকরে' আছে যে এই গান গাহিবার পর নরোত্তমদাস রাধাকৃষ্ণের বিলাস গাহিবার অভিলাষ করিয়াছিলেন। 'প্রেমবিলাস' কাব্যে এই প্রসঙ্গে বলা হইয়াছে যে নরোত্তমদাস

প্রথমে করয়ে গান চৈতন্যমঙ্গল।
তারপর হয় গান শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল ॥
পরে হয় গোবিন্দের গৌরকৃষ্ণলীলা গান।
নরোত্তমের গানে সবার জুড়ায় পরাণ ॥
বিদ্যাপতি চণ্ডীদাসের কৃষ্ণলীলা গান।
যে শুনয়ে হরয়ে তার মন প্রাণ ॥ (প্র.বি. ১৯ বিলাস)

'ভক্তিরত্নাকর' ও 'প্রেমবিলাসের' সাম্য মিলাইয়া দেখিলে বোঝা যায় যে গৌরাঙ্গবিষয়ক গান হইবার পর কৃষ্ণলীলা গান হইয়াছিল। কৃষ্ণের লীলাকাহিনী গাওয়া হয় বলিয়া কৃষ্ণলীলা গান লীলাকীর্তন নামে পরিচিত। লীলাকীর্তনে প্রচলিত প্রথা অনুসারে কৃষ্ণলীলা গাহিবার আগে গৌরাঙ্গবিষয়ক গান গাহিতে হয়। ইহাকে বলে গৌরচন্দ্রিকা বা সংক্ষেপে গৌরচন্দ্র। কৃষ্ণলীলার যে বিশেষ রসের গান গাওয়া হইবে ঠিক সেই রসে রাধাভাবে ভাবিত গৌরাঙ্গের লীলা বিষয়ক পদ গৌরচন্দ্রিকা হিসাবে গাওয়া হয়। এই কারণে মুখবন্ধে গৌরাঙ্গবিষয়ক পদ গান তদুচিত গৌরচন্দ্রিকা বলিয়া পরিচিত। খেতুরী মহোৎসবে নরোত্তমদাস এই রীতি প্রবর্তন করিয়াছিলেন। রাধিকার ভাবে মগ্ন গৌরাঙ্গের লীলা গাহিয়া তাহার পর বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাসের পদ গাওয়া হইয়াছিল। বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাস রাধাকৃষ্ণ লীলার শ্রেষ্ঠ কবি।

তদুচিত গৌরচন্দ্র গাহিবার গভীর তাত্ত্বিক যুক্তি আছে। যুক্তিটা টানা হইয়াছে যুগলাবতার তত্ত্ব হইতে। রাধাকৃষ্ণ প্রেমলীলার যে অপ্রাকৃত অর্থ আছে একমাত্র চৈতন্যদেবের লীলাতেই তাহার সার্থক প্রকাশ হইয়াছে। রাধা কৃষ্ণ হইতে পৃথক নন, তিনি কৃষ্ণেরই হ্লাদিনীশক্তি। অতএব কৃষ্ণ ও রাধার মিলনে দ্বয় অখণ্ড আনন্দস্বরূপ অদ্বয়ে স্থিতি লাভ করে। এই নিগূঢ় প্রেমতত্ত্ব বিস্ফূরিত হইয়াছে চৈতন্যদেবের মধ্যে, কেননা তিনি এক দেহে যুগপৎ কৃষ্ণ ও রাধার অবতার, দ্বয়, ও অদ্বয় উভয়েই তাঁহার মধ্যে বিগ্রহবান। অন্তরে তিনি অদ্বয় কৃষ্ণ, বাহ্যতঃ তিনি রাধাভাবে কৃষ্ণপ্রেমবিহ্বল। সুতরাং চৈতন্যদেবের রাধাভাব অপ্রাকৃত বৃন্দাবনে কৃষ্ণপ্রেম উপলব্ধির কুঞ্চিকাস্বরূপ। বাসু ঘোষের একটি পদে এই ভাবটি চমৎকার ফুটিয়াছে। পদটির একাংশ উদ্ধার করিতেছি।

গৌরাঙ্গ নহিত   কি মেনে হইত
কেমনে ধরিতাম দে।
রাধার মহিমা   রসসিন্ধুসীমা
জগতে জানাত কে॥
মধুর বৃন্দা   বিপিন মাধুরী
প্রবেশ চাতুরী সার।
বরজ যুবতী   ভাবের ভকতি
শকতি হইত কার॥

(বাসু ঘোষের পদাবলী, পৃ. ১৬০-৬১)

'প্রেমবিলাসের' সাক্ষ্যে দেখা যাইতেছে নরোত্তম বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাসের পদ গান করিয়াছিলেন। পদগান আসলে বৈঠকী গান, প্রবন্ধ সঙ্গীত। চৈতন্যমণ্ডলীতে বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাসের পদগান হইত। চৈতন্য পরিকরদের মধ্যে বেশ কয়েকজন বড়দরের গাইয়ে ছিলেন। শান্তিপুরে অদ্বৈত আচার্যর বাড়ীতে ও নীলাচলে চৈতন্যদেবের অন্তরঙ্গ সভায় যে পদগান হইত তাহা বৈঠকী গান হওয়াই সম্ভব। কিন্তু চৈতন্যদেব বহুজনসমক্ষে প্রকাশ্যে পদগানের রেওয়াজ চালু করিয়াছিলেন। তাঁহার নির্দেশে নীলাচলের রথাগ্রে কীর্তনে ও জগন্নাথ মন্দিরে বেড়া কীর্তনে পদ গাওয়া হইত। তবে এ সব ক্ষেত্রে একজনই গান করিতেন, বৈঠকী গানের রীতি বোধ হয় যতদূর সম্ভব মানিয়া চলা হইত। নীলাচলে অদ্বৈত আচার্যের চৈতন্য কীর্তনে ভক্তরা পদ গান করিয়াছিলেন। এই গান ভক্তরা গাহিয়াছিলেন ভক্তিভাবের উদ্দীপনায়, নিয়ম মানিয়া নয়। চৈতন্যদেবের পর প্রকাশ্যে পদগান কতটা কি চালু হইয়াছিল বা কি ভাবে গাওয়া হইত, জানি না। প্রকাশ্যে পদগান করার প্রথা পাকাপাকিভাবে চালু করিলেন নরোত্তমদাস। নরোত্তমদাস পদগানকে বৈঠকী পর্যায় হইতে সরাইয়া প্রচলিত পাঁচালী গানের ধাঁচে খোলা আসরে আনিয়া গাহিলেন। পাঁচালী গানে একজন মূল গায়েন, তাঁহার সঙ্গে থাকে পালি ও বাদক। মূল গায়েন দাঁড়াইয়া গান করেন। গানের সঙ্গে একটু আধটু নাচও চলে। পালি সহকারী গায়ক। নীলাচলে চৈতন্যদেবের রথাগ্রে কীর্তনে পালি গায়েন ছিল! পরবর্তীকালে কীর্তনের পালি গায়েনকে দোহার নাম দেওয়া হয়। খেতুরীতে নরোত্তম দোহার নিয়া গাহিয়াছিলেন। বাদক ও দোহারসহ নরোত্তম একাধিক দিবস ধরিয়া সকালে ও সন্ধ্যায় গাহিয়াছিলেন। নরোত্তম নিজে দাঁড়াইয়া গান করিয়াছিলেন। অনুমান করি বাদক ও দোহাররাও দাঁড়াইয়া গান বাজনা করিয়াছিলেন। 'ভক্তিরত্নাকরে' খেতুরী মহোৎসবের যে বিবরণ আছে তাহাতে দেখা যাইতেছে গায়ক ও বাদকগণ গান বাজনার সঙ্গে অভিনয় করিয়াছিলেন। তাঁহাদের এই অভিনয় নাট্যশাস্ত্রসম্মত আঙ্গিকাভিনয় বলিয়া মনে হয়। নাচের কথা আছে মনোহরদাসের লেখা 'অনুরাগবল্লীতে' খেতুরীতে নূতন কীর্তন কৌশল প্রবর্তন প্রসঙ্গে নরোত্তমের উল্লেখ করিয়া মনোহর-দাস বলিতেছেন

যাঁহার নর্ত্তন আস্বাদন অনুসার।
গড়েরহাটী কীর্ত্তন বুলি খ্যাত হৈল যার॥

(অনুরাগবল্লী, ৬ মঞ্জরী)

গান হইয়াছিল সদ্যপ্রতিষ্ঠিত ছয় বিগ্রহের সামনে গৌরাঙ্গ প্রাঙ্গণে খোলা জায়গায়। বহুলোকে সেখানে একত্র হইয়া গান শুনিয়াছিল। খেতুরীর মহোৎসবে নরোত্তমদাস পদগান আসরে আনিয়া গাহিলেন।

খেতুরীতে লীলাকীর্তন উপলক্ষে পদগান সর্বজনসমক্ষে আসিয়া গেল। নরোত্তমদাস পদগানকে লীলাকীর্তনরূপে আসরে আনিলেন প্রণালীবদ্ধ করিয়া। গায়ক, বাদক ও দোহার মিলিয়া যে কীর্তন পরিবেশন করিবে তাহার সাঙ্গীতিক কাঠামো নরোত্তম ঠিক করিয়া দিয়াছিলেন। তদুচিত গৌরচন্দ্রিকা গাহিয়া তাহার পর রাধাকৃষ্ণের লীলাকীর্তন আরম্ভ করিবার কারণ ভাবাদর্শগত। এই ভাবাদর্শগত উদ্দেশ্যও খেতুরীতে নরোত্তমের গানে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। খেতুরীর পর হইতে নরোত্তম প্রবর্তিত রীতি অনুসারে মূল গায়েন দোহার ও বাদক নিয়া দল বাঁধিয়া গান করেন। আসর জমানর কিছু বাহ্য অনুষ্ঠানও খেতুরী মহোৎসবে করা হইয়াছিল। নীলাচলে রথাগ্রে কীর্তনের অনুষ্ঠানে গান আরম্ভ হইবার আগে চৈতন্যদেব স্বয়ং কীর্তনীয়াদের ও অন্যান্য ভক্ত বৈষ্ণবদের মালাচন্দন দিয়া সম্মান করিয়াছিলেন (চৈ.চ. ২।১৩) খেতুরী মহোৎসবে গান আরম্ভ হইবার আগে জাহ্নবা দেবীর আদেশে উপস্থিত বৈষ্ণবসজ্জনদের মালাচন্দন দিয়া বরণ করা হইয়াছিল। অনিবদ্ধ গীত শেষ হইলে নরোত্তমদাস নিবদ্ধ গীত আরম্ভ করার আগে শ্রীখণ্ডের রঘুনন্দন খোল ও করতালে চন্দন ও মালা স্পর্শ করাইয়া নরোত্তম-দাস ও তাঁহার সহযোগীদের মালা ও চন্দন পরাইয়া দিয়াছিলেন (ভ.র. ১০।৫১০-৫২১, ৫৪৩-৫৪৫)। নীলাচলে চৈতন্যদেব অন্য সব বাজনা বাদ দিয়া শুধু খোল ও করতাল বাজাইয়া কীর্তনের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। বৈষবরা খোল ও করতালকে বলেন মহাপ্রভুর নিজস্ব সম্পত্তি। তাই বৈষ্ণবসমাজে খোল করতালের এত মর্যাদা। বোধ হয় খেতুরী মহোৎসবের পর হইতেই কীর্তনের আসরে খোলমঙ্গল প্রথা চালু হয়। কীর্তনারম্ভে শুভ অধিবাসে প্রথমে মালাচন্দন দিয়া খোল ও করতালের পূজা হয় তাহার পর যথাক্রমে মূল গায়ক, দোহার বাদক এবং উপস্থিত বৈষ্ণবসজ্জনদের মালাচন্দন দিয়া সংবর্ধন করা হয়। এই অনুষ্ঠানের নাম খোলমঙ্গল।

ভক্ত বৈষ্ণবের কাছে লীলাকীর্তনের আসল মূল্য সাঙ্গীতিক নয়, আধ্যাত্মিক। ইহা ভক্তিলাভের উপায়। নরোত্তমদাসের আগেও রাধাকৃষ্ণের লীলা বিষয়ক পদগান চালু ছিল এবং পদগানকে সাধনার অঙ্গ বলিয়া মনে করা হইত। গীত-গোবিন্দ গান তো ভক্তিসাধনার নামান্তর হিসাবে ভারতবর্ষের বিভিন্ন অংশে প্রচলিত ছিল। নরোত্তমদাস যে লীলাকীর্তন প্রবর্তন করিয়াছিলেন তাহা

গোস্বামীসিদ্ধান্তের সাধনা। গোস্বামীমতে ব্রজলীলার নিরবচ্ছিন্ন স্মরণ ও অনুসরণেই রাগানুগা সাধনভক্তির পরিপুষ্টি হয়। স্মরণ হইতে অনুসরণ। এই মতের ব্যাখ্যা হিসাবে লীলাকীর্তন গান করিলে ও শুনিলে ব্রজলীলা স্মরণ করা হয় এবং ব্রজলীলায় ভাব উপলব্ধি হয়। অতএব গায়ক ও শ্রোতা উভয়ের পক্ষেই লীলাকীর্তন ভক্তিসাধনা। তদুচিত গৌরচন্দ্রিকাসহ লীলাকীর্তন নরোত্তম কর্তৃক প্রচলিত সমন্বয়মূলক মতের সাধনা। ধর্মমত ও সঙ্গীত পরস্পরের পরিপূরক। নূতন কীর্তন কৌশল প্রবর্তনের জন্য ধর্মমতের ভিত্তিটি শক্তভাবে গাঁথিয়া তোলা প্রয়োজন ছিল। তাহারই উপর দাঁড়াইয়া সঙ্গীতের সৌধটি ধর্মমতের মাহাত্ম্য বিস্তার করিবে। নরোত্তম কর্তৃক প্রবর্তিত কীর্তনের এই দিকটির প্রতি লক্ষ্য করিয়া মনোহরদাস লিখিয়াছেন

নিরন্তর ভাবাবেশ বিশেষ কীর্ত্তনে।
মূর্তিমন্ত প্রেম যেন ফিরয়ে আপনে ॥

(অনুরাগবল্লী, ৬ মঞ্জরী)

তবে নরোত্তম কীর্তনকে শুধুমাত্র ভক্তিলাভের উপায় হিসাবে দেখেন নাই। তাহার সঙ্গীতিক সত্তা ও সম্ভাবনা বজায় রাখিয়াছেন। নরোত্তমদাস ভক্তিসাধনার সঙ্গে মার্গ সঙ্গীতের রস ও শৃঙ্খলা অবিভাজ্যভাবে মিশাইয়া দিয়াছেন। এই কারণে নরোত্তমের পরে কীর্তন সাঙ্গীতিক বিকাশ সম্ভব হইয়াছিল।

চৈতন্যদেবের পর কীর্তনের কতটা কি বিবর্তন হইয়াছিল তাহা জানা যায় না। মূল গায়েনের সঙ্গে পালি গায়েন, বাদক ও নর্তক নিয়া দল গড়া, বাদ্য হিসাবে শুধু খোল ও করতালের ব্যবহার এবং প্রকাশ্যে বহু লোকের সমক্ষে পদগানের যে সব রীতি তিনি প্রবর্তন করিয়াছিলেন তাহা বাঙ্গলার বৈষ্ণব সমাজে কতটা চালু হইয়াছিল সে কথা বলিবার উপায় নাই। শ্রীখণ্ডে নরহরি সরকার ঠাকুরের তিরোধান তিথি মহোৎসবে অনুষ্ঠিত কীর্তনের সংক্ষিপ্ত বিবরণ 'ভক্তিরত্নাকর' গ্রন্থে আছে (৯।৬০০-৬৪৯)। এই বিবরণে দেখা যাইতেছে যে গায়করা আলাপ দিয়া গান শুরু করিতেছেন। নানা প্রকার আলাপের পর তাঁহারা রাগ প্রকট করিলেন এবং শ্রুতি, স্বর, গ্রাম, মূর্চ্ছনা, তালাদি ও গমকভেদ প্রকাশ করিলেন। এই বর্ণনায় উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের লক্ষণ আছে। কিন্তু ইহাতে পদগানের কথা নাই। গানের সঙ্গে বাজনা হইয়াছিল খোল, করতাল, ঝাঁঝ, খমক ও খঞ্জরী। উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের সঙ্গে ঝাঁঝ, খমক, খঞ্জরী একেবারেই চলে না। এইগুলি উদ্দণ্ড কীর্তনের পক্ষে প্রশস্ত। সারারাত্রিব্যাপী কীর্তনের সঙ্গে উপস্থিত মহান্তগণ 'আত্মবিস্মরিত' হইয়া নাচিয়াছিলেন এবং ঊর্ধবাহু হইয়া পরলোকগত চৈতন্যপরিকরদের নাম করিয়া খেদ প্রকাশ

করিয়াছিলেন। এইগুলিও উদ্দণ্ড কীর্তনের ব্যাপার। নরহরি সরকার ঠাকুরের তিরোধান তিথি উৎসবে হয়ত উচ্চাঙ্গ ও উদ্দণ্ড দুইরকম গানই হইয়াছিল। শ্রীখণ্ড বরাবর গান বাজনার জন্য বিখ্যাত। এখানে উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের চর্চা থাকাই সম্ভব। শ্রীখণ্ডের নিজস্ব (মনোহরসাহী হইতে স্বতন্ত্র) ঘরাণার কীর্তন এখনও অবশিষ্ট আছে। বিলম্বিত লয়ের ধীর, গম্ভীর ও মাধুর্যময় শ্রীখণ্ড ঘরাণার গান উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের ঐতিহ্যবাহী। শ্রীখণ্ডের প্রভাবে উচ্চাঙ্গ মনোহরসাহী কীর্তনের উদ্ভব হয়। তবে মার্গসঙ্গীতের আশ্রয়ে উচ্চাঙ্গ কীর্তনের বিশিষ্ট গায়ন পদ্ধতি উদ্ভাবন করিবার কৃতিত্ব নরোত্তমদাসের। মনোহরসাহীর উদ্ভব খেতুরী মহোৎসবের কিছুকাল পরে।

কীর্তনগানের যে পদ্ধতি নরোত্তমদাস প্রবর্তন করিলেন তাহার নাম গরাণহাটি বা গড়েরহাটি। খেতুরী গরাণহাটি বা গড়েরহাটি পরগণার অন্তর্গত বলিয়া এই নাম হইয়াছে। বছর কুড়ি পঁচিশ আগে পর্যন্ত বড় বড় কীর্তনীয়ারা অনেকেই গরাণহাটি ঢঙের চর্চা করিতেন। ইদানীং গরাণহাটি কীর্তনের বিশুদ্ধ রূপ গাহিবার মত কীর্তনীয়া বিরল হইয়া উঠিয়াছে। তবে কীর্তনগানে গরাণহাটি ঢঙের স্মৃতি এখনও জাগরূক আছে। বিলম্বিত, স্থির, ধীরা, গম্ভীর, প্রসন্ন কীর্তন গানকে এখনও গরাণহাটি ঢঙের গান বা বটুক গান বলা হয়। এই ধরণের গানেই বোধ হয় গরাণহাটি ঢঙের ইঙ্গিত আছে।

খেতুরী মহোৎসবে নরোত্তমদাস, বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাসের পদ গান করিয়াছিলেন। কৃষ্ণলীলা বিষয়ক পদগান, বিশেষতঃ জয়দেব, বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাসের পদ, অনেক আগে হইতেই প্রচলিত ছিল। জয়দেবের পদ সবচেয়ে পুরানো। বৈষ্ণব মন্দিরে বিগ্রহ সেবায় 'গীতগোবিন্দর' মধুরকোমলকান্ত পদাবলী গাওয়া বহুদিনের প্রথা। জয়দেবের পদ বরাবরই প্রবন্ধ সঙ্গীত হিসাবে গাওয়া হইত। বিদ্যাপতির পদ গাওয়া হইত মিথিলাগীতগতি অর্থাৎ মিথিলায় প্রচলিত নিবদ্ধ সঙ্গীতের রীতি অনুসারে (রাগতরঙ্গিণী ঃ তৃতীয় তরঙ্গ)। চণ্ডীদাসের পদগান সম্পর্কে প্রামানিক তথ্য কিছু পাওয়া যায় না। তবে বিশেষজ্ঞদের অনুমান চণ্ডীদাসের পদ বিদ্যাপতির মতোই নিবদ্ধ সঙ্গীতে গাওয়া হইত এবং চণ্ডীদাসের পদ গাওয়ার একটা স্বতন্ত্র পদ্ধতি ছিল। নরোত্তমদাসও বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাসের পদ প্রবন্ধ সঙ্গীতে গাহিয়াছিলেন। এই গানের নির্দিষ্ট রূপটা আমাদের অজানা। তবে মৈথিল রীতি বোধ হয় নরোত্তমদাস নেন নাই, এমন কি বিদ্যাপতির গান গাওয়ার জন্যও নয়। বাঙ্গলা কীর্তনে যেভাবে পদ গাওয়া হয় তাহার সঙ্গে মৈথিল প্রবন্ধ সঙ্গীতের কোন সাদৃশ্য নাই। উত্তর ভারতীয় ধ্রুপদ

গানে নরোত্তমের পারদর্শিতা ছিল। অনেকের ধারণা নরোত্তম ধ্রুপদ গানের সঙ্গে বাঙলায় প্রচলিত কাব্য সঙ্গীতের সামঞ্জস্য করিয়া নূতন গায়ন পদ্ধতি তৈরী করিয়াছিলেন। স্বামী প্রজ্ঞানানন্দর মতে গরাণহাটি কীর্তন ধ্রুপদ গানের ঠাটে শুদ্ধ রাগ ও বিলম্বিত লয়ের গান (প্রজ্ঞানানন্দ ১৯৭০ঃ ১৯৯, ২০৩)। খগেন্দ্রনাথ মিত্র বলিয়াছেন সরলতা ও গাম্ভীর্যে গরাণহাটি গান ধ্রুপদের সঙ্গে তুলনীয় (খগেন্দ্রনাথ মিত্র ১৩৫২ঃ ৩৩)। আসল গরাণহাটি গান এখন বিশেষ শোনা যায় না, তবে উচ্চাঙ্গ কীর্তনের রাগ রাগিণীর ভঙ্গীতে ও তালের বিশিষ্টতায় ধ্রুপদ গানের গভীর প্রভাব বিশেষজ্ঞদের চোখে পড়িয়াছে। উমা রায় এই বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করিয়াছেন (উমা রায় ১৩৯১ঃ ৯০-৯৪)।

গরাণহাটি গানের সরলীকৃত রূপ মনোহরসাহী কীর্তন। গরাণহাটির কিছুকাল পরেই ইহার উদ্ভব। কালক্রমে মনোহরসাহী ঢঙের কিছু কিছু পরিবর্তন হইয়াছে বটে, কিন্তু উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের ভিত্তি হইতে ইহা সরিয়া যায় নাই। সুর ও তালের মূল কাঠামো বজায় আছে। এই দিকে লক্ষ্য রাখিয়া খগেন্দ্রনাথ মিত্র ও রাজেশ্বর মিত্র কীর্তনের চরিত্র বিচার করিয়াছেন। উভয়েরই ধারণা কীর্তন আসলে উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত। এই প্রসঙ্গে রাজেশ্বর মিত্রর মন্তব্য উল্লেখযোগ্য। গরাণহাটি ও মনোহরসাহী ঢংকে ঠিক লোক সংগীতের পর্যায়ে ফেলা যায় না কেননা সম্মেলক এবং অনাড়ম্বর গীত হলেও আসলে কীর্তনের আঙ্গিক হচ্ছে উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের আঙ্গিক। অনিবদ্ধ ও নিবদ্ধ পদের প্রতিটি অঙ্গ প্রাচীন কীর্তনে বর্তমান। এর সঙ্গে যে তালপদ্ধতি নির্ণীত হয়েছে তাও উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের অনুরূপ। অতএব কীর্তন প্রবন্ধ লোকসঙ্গীতের অন্তর্ভুক্ত হওয়া উচিত নয়, তবে আখর পদ্ধতিতে কতকটা লোকসঙ্গীতের পরিচয় এতে রয়েছে। পদাবলী বা লীলাকীর্তন .... লোক-সঙ্গীতের উর্ধেই অবস্থিতি করে (রাজেশ্বর মিত্র ১৯৫৫ঃ ২৩)।

কীর্তনে অনেক বৈচিত্রপূর্ণ তালের সমাবেশ দেখা যায়। রাজ্যেশ্বর মিত্র এই বিষয়েও আলোচনা করিয়াছেন। কীর্তনে অনেক প্রাচীন তাল যথা, একতালী, সমতাল, রূপক, যতি, ঝম্প, বীরবিক্রম, নন্দন, চঞ্চৎপুট, ঘণ্টক এবং ইহাদের সঙ্গে কিছু বিলম্বিত তাল ব্যবহার করা হয়। "বিলম্বিত কীর্তনের তালগুলো হিন্দুস্থানী সঙ্গীতের তালের মত ওস্তাদি প্রাধান্য নিয়ে বিরাজ করছে না,...কীর্তনের গতির সঙ্গে এই তাল আপনাকে মিলিয়ে দিয়ে সমগ্র সঙ্গীতকে প্রস্ফুটিত করে চলেছে। হিন্দুস্থানী উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের এবং কীর্তনের তাল—এই দুটির মধ্যে যথেষ্ট বৈশিষ্ট্য রয়েছে...হিন্দুস্থানী সঙ্গীতে তাল ওস্তাদি টেকনিক ফোটাবার একটা বিশিষ্ট এবং স্বতন্ত্র অঙ্গ কিন্তু কীর্তনের তাল প্রধানতঃ অন্তর্মুখী, সুরের সঙ্গে সঙ্গোপনে

লাতিয়ে চলেছে। এই কারণে কীর্তনের বিলম্বিত তাল আয়ত্ব করা রীতিমত কঠিন ব্যাপার” (রাজ্যেশ্বর মিত্র ১৯৫৫ ঃ ২২-২৩)

খেতুরী মহোৎসবে নরোত্তমদাস লীলাকীর্তনের যে রূপ ও তাৎপর্য প্রকাশ করিয়াছিলেন পরবর্তীকালে নানা পরিবর্তন সত্ত্বেও আজ পর্যন্ত তাহাই আদর্শ বলিয়া গণ্য হইয়া আসিতেছে। গৌড়ীয় বৈষ্ণব তথা বাঙ্গলার সংস্কৃতিতে নরোত্তমদাসের এই অবদান অতুলনীয়। খেতুরী মহোৎসবের শতাধিক বৎসর পরে বৈষ্ণবাচার্য বিশ্বনাথ চক্রবর্তী নরোত্তমদাসের এই অনির্বচনীয় কৃতি স্মরণ করিয়া ‘স্তবামৃতলহরী’ কাব্যে শ্রীনরোত্তমপ্রভোরষ্টক স্তোত্রের চতুর্থ শ্লোকে বলিয়াছেন

গন্ধর্ব্বগর্বক্ষপণস্বলাস্যাবিজ্ঞাপিতাশেষকলিপ্রজায়।
স্বসৃষ্টগানপ্রথিতায় তস্মৈ নমো নমঃ শ্রীলনরোত্তমায় ॥

[গন্ধর্বদের গর্বনাশকারী নিজসৃষ্ট কলা দ্বারা যিনি কলিযুগের শেষ পর্যন্ত প্রজামণ্ডলীর কাছে নিজের জয় বিজ্ঞাপিত করিয়াছেন (এবং) সুসৃষ্ট গানের জন্য যিনি প্রখ্যাত সেই শ্রীলনরোত্তমকে নমস্কার করি।

একাদশ পরিচ্ছেদ

লীলাকীর্তন

খেতরীর মহোৎসবের পর বাঙ্গলায় গোস্বামী সিদ্ধান্তের সঙ্গে লীলাকীর্তনের খুব চলন হয়। কৃষ্ণের বিভিন্ন লীলা কাহিনী পালা বাঁধিয়া গাওয়া হইত বলিয়া লীলাকীর্তন পালাগান নামেও পরিচিত। ষোড়শ শতকের দ্বিতীয় ভাগে ও সপ্তদশ শতকে গোবিন্দদাস, বলরামদাস (দ্বিতীয়,) জ্ঞানদাস, রায়শেখর, কবিরঞ্জন (ছোট) বিদ্যাপতি, বসন্ত রায়, কবিশেখর, অনন্তদাস (দুখিয়া), যদুনন্দন প্রমুখ বড় বড় মহাজন পদকর্তার আবির্ভাব হয়। নরোত্তম নিজেও ছিলেন উৎকৃষ্ট পদকর্তা। তাঁহার সতীর্থ ও পরম সুহৃদ শ্রীনিবাস আচার্যও কিছু সুন্দর পদ রচনা করিয়াছিলেন। এই সব মহাজনদের পদ গোস্বামী রসতত্ত্ব অনুযায়ী লেখা। চৈতন্যপূর্ব মহাজন বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাস (যাহার পদগান চৈতন্যদেব শুনিতেন এবং নিজেও করিতেন) এবং মুরারি গুপ্ত, নরহরি সরকার, বাসু ঘোষ, বংশীবদন চ্যাটুয্যে, নয়নানন্দ মিশ্র প্রমুখ চৈতন্যপরিকর পদকর্তাদের কৃষ্ণলীলা বিষয়ে অনেক পদ ছিল। কৃষ্ণের ব্রজলীলা বিষয়ক বলিয়া এইসব পদ গোস্বামী রসতত্ত্ব অনুযায়ী সাজান কঠিন হয় নাই। পূর্ববর্তী ও পরবর্তী পদসমূহ একত্রে ধরিলে গোস্বামী-শাস্ত্রের রসপর্যায় অনুযায়ী প্রত্যেকটি লীলা বিষয়েই বেশ কিছু পদ পাওয়া যায়। এক একটি লীলার পদসমূহ ঘটনা ক্রম অনুসারে সাজাইয়া বড় বড় পালাগান গাওয়া রেওয়াজ হইয়া উঠিল।

লীলাকীর্তন গোস্বামী রসশাস্ত্রদ্বারা নিয়ন্ত্রিত। গোস্বামী রসতত্ত্বের মুখ্য গ্রন্থ রূপ গোস্বামীকৃত 'উজ্জ্বলনীলমণি'। ইহাতে রসপর্যায়, নায়ক-নায়িকা লক্ষণ ও তাহাদের ভাবের ব্যাখ্যান আছে। তাই 'উজ্জ্বলনীলমণি' না পড়িলে ভাল কীর্তনীয়া

হওয়া যায় না। ইহার সঙ্গে গোস্বামীদের ভক্তিসিদ্ধান্ত সম্পর্কে অবহিত হইবার জন্য 'ভক্তিরসামৃতসিন্ধু' ও 'ভক্তিসন্দর্ভ' পাঠ করা প্রয়োজন। কীর্তনের বোদ্ধা হইতে হইলেও এই সব গ্রন্থ ভাল করিয়া জানা থাকা দরকার। গোস্বামী শাস্ত্রমতে প্রধান রস চারটি: দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য এবং উজ্জ্বল বা মধুর। রস অর্থে পারমার্থিক আস্বাদন, লক্ষ্য শ্রীকৃষ্ণ। লীলাকীর্তনে রসের বিলাসদ্বারা শ্রীকৃষ্ণের উপভোগকে ফুটাইয়া তোলা হয়। এই কারণে লীলাকীর্তনের অন্য নাম রস-কীর্তন। চার মুখ্য রসের মধ্যে উজ্জ্বল বা মধুর রসই কৃষ্ণের উপভোগের পক্ষে প্রশস্ততম কেননা অন্য তিনটি রসই ইহার মধ্যে নিহিত আছে। তাই মধুর রসের গানই লীলাকীর্তনে বেশী শোনা যায়।

উজ্জ্বলরস বিপ্রলম্ভ ও সম্ভোগ এই দুইভাগে বিভক্ত। গভীরভাবে অনুরক্ত নায়ক-নায়িকার অপূর্ণ মিলনাকাঙ্ক্ষা হইতে যে অবস্থার উদ্ভব হয় তাহাই বিপ্রলম্ভ। পরস্পর মিলনের উল্লাস সম্ভোগ নামে অভিহিত। বিপ্রলম্ভের চারভাগ: পূর্বরাগ, মান, প্রেমবৈচিত্ত্য ও প্রবাস। সম্ভোগের ভাগ চারটি: সংক্ষিপ্ত, সঙ্কীর্ণ, সম্পন্ন ও সমৃদ্ধিমান্। এই আটটি রসের প্রত্যেকটি আবার আটটি উপভাগে বিভক্ত। ফলে মধুর রসের মোট ভাগের সংখ্যা চৌষট্টি। তবে চৌষট্টি রসেরই লীলাগান হয় না। ইহার মধ্যে বিপ্রলম্ভের পূর্বরাগ, মান, প্রেমবৈচিত্ত্য বা আক্ষেপানুরাগ ও প্রবাস এবং সম্ভোগের গোষ্ঠ, রাস, দানলীলা, নৌকাবিলাস, ঝুলন, হোলি, অভিসার, বিপ্রলব্ধা, খণ্ডিতা, কলহন্তরিতা ও প্রোষিতভর্তৃকা (মাথুর) প্রধান।

গৌরচন্দ্রিকা ছাড়া কীর্তনে চৈতন্যলীলা, বিশেষতঃ নিমাইসন্ন্যাস পালা, খুব গাওয়া হয়। স্বতন্ত্র চৈতন্যলীলার গান খেতুরী মহোৎসবেই গাওয়া হইয়াছিল। 'ভক্তিরত্নাকরের' বর্ণনা অনুসারে ফাল্গুনী পূর্ণিমার দিন বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা ও নরোত্তমের কীর্তনপ্রকাশ হইবার পর ফাগ খেলা হয়। তাহার পর সন্ধ্যাবেলা শুরু হয় গৌরাঙ্গদেবের জন্ম অভিষেকের অনুষ্ঠান। পূজা পাঠ হইবার পর

নানাদেশী গায়ক গায়েন নানা গীত।
নদীয়াবিহার যাতে ব্রহ্মাদি মোহিত ॥ (ভ.র. ১০।৬৭১)

তাহার পর জন্ম অভিষেক গান শুরু হয়। 'প্রেমবিলাসে' ইহার উল্লেখ করিয়া বলা হইয়াছে

সকল মহান্ত অতি আনন্দ অন্তরে।
গৌরাঙ্গের জন্মগীত গায় মৃদুস্বরে ॥ (প্র.বি. ৭ বিলাস)

বিভিন্ন মহাজনপদ রসপর্যায় ও ঘটনাক্রম অনুসারে সাজাইয়া পালা বাঁধা হইত। পালাকীর্তনের চলন বাড়িলে গোছান পালার পুঁথি প্রয়োজন হইয়া

পড়ে। ইহার ফল পদাবলী সংহিতা। সপ্তদশ, অষ্টাদশ ও উনবিংশ শতকে বেশ কয়টি পদাবলী সঙ্কলিত হইয়াছিল। তবে পদাবলী সংগ্রহের কাজ ষোড়শ শতকের শেষদিকেই শুরু হইয়াছিল বলিয়া মনে হয়। রাধামোহন ঠাকুরের 'পদামৃতসমুদ্র' নামক পদ সংহিতার 'মহাভাবানুসারিণী' টীকার সাক্ষ্য অনুসারে বলা যায় যে সুপ্রসিদ্ধ পদকর্তা শ্রীনিবাস আচার্যর শিষ্য গোবিন্দদাস কবিরাজ স্বরচিত পদসমূহের একটি বা একাধিক সঙ্কলন প্রস্তুত করিয়াছিলেন (রায় ১৩৯১ : ৭৪-৭৫, ৫০১, ৫০৬-৭)। তাহার পর পাইতেছি বিভিন্ন মহাজনকৃত প্রকীর্ণ পদসমূহ নিয়া সঙ্কলিত পদসংহিতা। এইরূপ সঙ্কলনের প্রাচীনতম নিদর্শন রামগোপালদাস (বা গোপালদাস) কর্তৃক সঙ্কলিত 'রসকল্পবল্লী'। সপ্তদশ শতকের মাঝামাঝি সময়ে এটি সঙ্কলিত হয়। মোটামুটি এই সময়েই গোবিন্দদাস কবিরাজের পৌত্র ঘনশ্যামদাস 'উজ্জ্বলনীলমনি' অনুসরণ করিয়া 'গোবিন্দরতিমঞ্জরী' নামে একটি পদাবলী সঙ্কলন তৈরী করেন (রাণা ১৩৯২ : পৃ. ১০)। অষ্টাদশ শতকের প্রথম দিকে বিশ্বনাথ চক্রবর্তী 'ক্ষণদাগীতচিন্তামণি' নামক পদসংহিতা সঙ্কলন করেন। ইহাতে পঁয়তাল্লিশজন পদকর্তার লেখা তিনশতেরও বেশী পদ আছে। বিশ্বনাথ চক্রবর্তীর কিছুদিন পরে রাধামোহন ঠাকুর যে পদসংগ্রহ সঙ্কলন করেন তাহার নাম 'পদামৃতসমুদ্র'। রসপর্যায় অনুযায়ী সযত্নে বাছিয়া বাছিয়া প্রায় পঞ্চাশজন মহাজনের সাড়ে সাতশতর মতো পদ রাধামোহন এই গ্রন্থে স্থান দিয়াছেন। অষ্টাদশ শতকের মাঝামাঝি সময়ে 'ভক্তিরত্নাকর' প্রণেতা নরহরি চক্রবর্তী 'গীতচন্দ্রোদয়' নামে বিরাট একটি পদসংগ্রহ প্রস্তুত করিয়াছিলেন। ইহার সম্পূর্ণ পুঁথি পাওয়া যায় নাই। খণ্ডিত পুঁথিতে এক হাজার সাতশত নয়টি পদ পাওয়া গিয়াছে (দাস ৪৭১ : ১৪৯৫-৯৭)। নরহরি চক্রবর্তীর সমসাময়িক দীনবন্ধু 'সঙ্কীর্ত্তনামৃত' সঙ্কলন করেন। আকারে ইহা অনেক ছোট : চল্লিশজন মহাজনের একানব্বইটি পদের সঙ্কলন। পদসংখ্যার দিক দিয়া সবচেয়ে বড় সংহিতা বৈষ্ণবদাসের (প্রকৃত নাম গোকুলানন্দ সেন) সঙ্কলন 'গীতকল্পতরু' বা 'পদকল্পতরু'। ইহাতে একশত ত্রিশ জনের বেশী পদকর্তার তিন হাজারেরও বেশী পদ ধরা আছে। বৈষ্ণবদাস কাজটি করিয়াছিলেন অষ্টাদশ শতকের শেষ দিকে। বৈষ্ণবদাসের সমসময়ে বা অল্প পরে দ্বিজ মাধব 'শ্রীপদমেরুগ্রন্থ' নামে একটি পদসংহিতা প্রস্তুত করেন। ইহাতে এক হাজার তিনশত চৌষট্টিটি পদ আছে। বৈষ্ণবদাসের দৃষ্টান্তে উদ্বুদ্ধ হইয়া রাধামুকুন্দদাস 'মুকুন্দানন্দ' নামে একটি পদসংহিতা প্রস্তুত করেন। উনবিংশ শতকের উল্লেখযোগ্য পদ সঙ্কলন কমলাকান্ত-দাসের 'পদরত্নাকর', নিমানন্দদাসের 'পদরত্নসার', গৌরমোহনদাসের 'পদকল্প-

লতিকা' ও নটবরদাসের 'রসকলিকা'। উল্লিখিত সংহিতাগুলি ছাড়া 'কৃষ্ণপদামৃতসিন্ধু' নামে একটি পদসংহিতার কথা জানা যায়। ইহার সঙ্কলক অজ্ঞাত-পরিচয়। প্রচলিত সঙ্কলনগুলি ছাড়াও বড় বড় কীর্তনীয়ারা নিজেদের মতো করিয়া পদ সাজাইয়া পালা তৈরী করিয়া নিতেন। বর্তমান শতকের প্রথমভাগে অবধূত বন্দ্যোপাধ্যায় অন্যতম শ্রেষ্ঠ কীর্তনীয়া ছিলেন। তিনি একটি চমৎকার পদসংহিতা সঙ্কলন করিয়াছিলেন (হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় ১৯৭১ : ২৪৩)।

পদসঙ্কলনের আর একটা উদ্দেশ্য ছিল পদের শুদ্ধতা রক্ষা করা। লিপিকরের দোষে পদের পাঠ বিকৃত হইত। ছাপাখানা প্রচলনের আগে এ সমস্যা সব দেশেই ছিল। তাহার উপর পদ বহু গায়কের মুখে মুখে ফিরিত। অল্প-শিক্ষিত গায়কদের উচ্চারণদোষে পদের বিকৃতি ঘটিত। অনেকে পদের অর্থ বুঝিতে না পারিয়া বা পদ ঠিক মত মনে না করিতে পারিলে নিজেদের জ্ঞানবুদ্ধি মতো শব্দ বসাইয়া নিতেন। ফলে ভুল পাঠ গাওয়া হইত এবং শিষ্যপরম্পরা ভুল পাঠই চলিতে থাকিত। এই সমস্যা সমাধানের জন্য রাধামোহন ঠাকুর 'পদামৃতসমুদ্র' সঙ্কলনের সময় সংশ্লিষ্ট পদসমূহের বিভিন্ন পাঠান্তর বিচার করিয়া বিশুদ্ধ পাঠ নির্ণয় করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। এই বিষয়ে তাঁহার প্রচেষ্টা আধুনিক গবেষকদের মতো। অবধূত বন্দ্যোপাধ্যায় অশুদ্ধ পাঠ সম্পর্কে খুব সতর্ক ছিলেন এবং সর্বদা শুদ্ধ পাঠ নির্ণয়ের জন্য চেষ্টা করিয়া যাইতেন। তাঁহার স্বকৃত পদসংগ্রহে 'বহু পদের বিশুদ্ধ পাঠ ও রসপর্যায়-গ্রথিত গানের পালা সাজান ছিল' (তদেব)। এই বিষয়ে অবধূত বন্দ্যোপাধ্যায়ের নিরলস উৎসাহের প্রশংসা করিয়া হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় বলিতেছেন 'তাঁহার জ্ঞানস্পৃহা এতই বলবতী ছিল, জানিবার কৌতূহল ও অনুসন্ধিৎসা এতই প্রবল ছিল যে, পদের বিশুদ্ধ পাঠ অথবা প্রকৃত অর্থগ্রহণে দেশব্যাপী প্রতিষ্ঠার দিনে পরিণত বয়সেও তিনি কোনরূপ কুণ্ঠাবোধ করিতেন না। তাঁহার স্বাভাবিক বিচারবুদ্ধিও পরিমার্জিত এবং উচ্চস্তরের ছিল।' (তদেব)।

পদসংহিতাগুলি সংগ্রহমাত্র নয়। বিভিন্ন মহাজনের লেখা পদগুলিকে রসপর্যায় অনুযায়ী সাজান সঙ্কলন। পদসংহিতা সমূহের সঙ্কলকগণ ভক্তিশাস্ত্র-বিশারদ রসজ্ঞ ব্যক্তি। রাধামোহন সংগৃহীত পদগুলির উপর 'মহাভাবানুসারিণী' নামে বিস্তৃত ও অতিশয় পাণ্ডিত্যপূর্ণ টীকা রচনা করিয়াছিলেন। দীনবন্ধু বিভিন্ন রসের লক্ষণ সম্বন্ধে চমৎকার আলোচনা করিয়াছেন। বৈষ্ণবদাসের গ্রন্থে বৈষ্ণব রসশাস্ত্র প্রাঞ্জলভাবে বুঝাইয়া দেওয়া আছে। সঙ্কলকদের মধ্যে কয়েকজন নিজেরাই পদকর্তা। নিজের লেখা পদ তাঁহারা সঙ্কলনের মধ্যে ধরিয়াছেন।

আত্মগরিমা প্রচারের ইচ্ছায় যে ইহা করিয়াছেন জোর করিয়া তাহা বলা যাইবে না। রসপর্যায় অনুযায়ী পদ সাজাইতে গিয়া কোথাও উপযুক্ত পদের অভাব চোখে পড়িলে নিজে পদ রচনা করিয়া তাহা পূরণ করিয়া দিয়াছেন। অন্ততঃ রাধামোহনের ক্ষেত্রে তাহাই মনে হয় (উমা রায় ১৩৯১ঃ ২৮)। সঙ্কলকদের সঙ্গীতের জ্ঞানও ছিল। রাধামোহন ও বৈষ্ণবদাসের গায়ক হিসাবে যশ ছিল। নরহরি চক্রবর্তী সঙ্গীতশাস্ত্রে সুপণ্ডিত ছিলেন। 'মহাভাবানুসারিণী' টীকায় রাধামোহন সাঙ্গীতিক বিষয়ে আলোচনা করিয়াছেন। নরহরি চক্রবর্তীর 'গীতচন্দ্রোদয়' গ্রন্থের মঙ্গলাচরণে সঙ্গীত বিষয়ে আলোচনা আছে। বস্তুত রসশাস্ত্র, কাব্য ও সংগীত এই তিন দিক দিয়া পদসংহিতাগুলির বিচার করা উচিত।

লীলাকীর্তন সম্বন্ধেও এই কথা প্রযোজ্য। লীলাকীর্তন শুধু গান হিসাবে দেখিলে চলিবে না। ভক্তবৈষ্ণবের কাছে লীলাকীর্তন শুধু রাধাকৃষ্ণলীলার বাঙ্ময়রূপ। লীলাকীর্তন গাহিলে ও আস্বাদন করিলে ব্রজলীলা স্মরণ ও মনন হয়। গৌড়ীয় বৈষ্ণব শাস্ত্রমতে লীলাস্মরণ ও মনন রাগাত্মিকা ভক্তিলাভের উপায়স্বরূপ। অতএব লীলাকীর্তন ভক্তিসাধন, ভক্ত চিত্তে রসপুষ্টিই লীলাকীর্তনের উদ্দেশ্য। গায়ক, বাদক শ্রোতার মনে ভক্তি না থাকিলে কীর্তনের আসর সার্থক হয় না। লীলাকীর্তনে কাব্য ও সুর ভক্তির বাহন। রসের প্রকাশ হয় কাব্যে, তাহার স্ফুরণ হয় সুরে। লীলাকীর্তনে কাব্য ও সুর পরস্পরের পরিপূরক। কাব্য ও সুরের মিলন ঘটিলে রস পরিস্ফুট হয়। পরিস্ফুট রসই ভক্তিভাবনার উপাদান। খগেন্দ্রনাথ মিত্র বলিয়াছেন 'কীর্তন শুধু গীত নহে, কীর্তন সুরের বিলাসমাত্র নয়, কীর্তনের সুরশিল্প শুধু সংগীতের বিকাশের জন্য কল্পিত নয়। কীর্তন সুর, কাব্য ও ধর্মের ত্রিবেণী। ইহার কোনটিকেও উপেক্ষা করা চলে না। সুরের আবেদনে প্রাণ মাতিয়া উঠিবে, কাব্যের অলঙ্কারে ও শব্দের ঝংকারে চিত্ত মুগ্ধ হইবে এবং ধর্মের প্রেরণায় অশ্রু কম্প পুলক প্রভৃতি সাত্ত্বিকভাবে হৃদয়ে জাগিবে—ইহাই সংক্ষেপে কীর্তন সংগীতের অভিপ্রায়।' (খগেন্দ্রনাথ মিত্র ১৩৫২ঃ ৪৫-৪৬)।

ভক্তির দরুন লীলাকীর্তন ভাবময় সংগীত। গায়ক বাদক ও শ্রোতা সকলেই ভক্তজন। গানের প্রভাবে তাঁহাদের মনে অষ্টসাত্ত্বিকভাবের উদয় হইতে পারে অর্থাৎ অশ্রু, কম্প, স্বেদ, পুলক, বৈবর্ণ, স্তম্ভ, স্বরভঙ্গ ও মূর্চ্ছা ঘটা সম্ভব। ইহাই ভাব অর্থাৎ কি না আবেশ ও বিহ্বলতা। আনন্দে পুলকিত হইয়া কেহ কাঁদিতেছে, কাহারও দেহে মুহুর্মুহু রোমাঞ্চ হইতেছে, কাহারও শরীর কাঁপিতেছে আবার কেহ মাটিতে পড়িয়া গড়াগড়ি দিতেছে কীর্তনের আসরে এইরূপ দৃশ্য স্বাভাবিক। স্বয়ং

মূল গায়কেরও এইরূপ ভাববিকার হইতে পারে। হইলে সুর ও তালের নিয়ম-শৃঙ্খলা বিপর্য্যস্ত হইয়া যায়। 'কীর্তনগায়কের সুরশিল্পে এই লক্ষ্যটি (ভাববিহ্বলতা) থাকে। একথা স্বীকার করা যাইতে পারে। কিন্তু তাহাতে সুর বা তালের প্রতি উপেক্ষা আছে এরূপ বলা চলে না' (খগেন্দ্রনাথ মিত্র ১৩৫২ : ৪৫)। সঙ্কীর্তনকালে যখন অনেকে একত্রিত হইয়া গান করে তখন ভাববিহ্বলতার প্রবণতা একটু বেশী গাকে। নবদ্বীপে চৈতন্যদেবের নগর-সঙ্কীর্তনের যে বর্ণনা ইতিপূর্বে উদ্ধার করিয়াছি তাহাতে ভাববিহ্বলতা খুব দেখা গিয়াছে। সঙ্কীর্তনে বা কীর্তনের আসরে ভাববিকার ঘটা বৈষ্ণবের পক্ষে মহা-ভাগ্যের কথা। গায়ক, বাদক, শ্রোতা সকলেই ইহার জন্য উন্মুখ। ভাববিকারের আকাঙ্ক্ষা ভক্তিলাভের জন্য, সুর ও তালের প্রতি উপেক্ষাবশতঃ নয় এই কারণে লীলাকীর্তনকে ভাবমুখী সঙ্গীত বলা যাইতে পারে।

চৈতন্যদেবের সমসাময়িক কবিরা পদ লিখিয়াছেন বাঙ্গলা ভাষায়। সর্বজনের জন্য যে ভক্তি ভাবনা তাহার কাব্যরূপ বাঙ্গলায় হইবে ইহাই স্বাভাবিক। চৈতন্য-দেবের পরবর্তী প্রজন্মেও পদরচনার ভাষা ছিল বাঙ্গলা। কিন্তু গৌড়মণ্ডলে গোস্বামী সিদ্ধান্ত প্রচারের পর ষোড়শ শতকের শেষ দিক হইতে দেখিতেছি পদ-কর্তাদের মধ্যে ব্রজবুলি ভাষার দিকেই ঝোঁক বেশী। অবহট্‌ঠ ও মৈথিল ভাষা মিলাইয়া তৈরী ব্রজবুলি কৃত্রিম ভাষা। প্রধানতঃ এই ভাষাতেই পদকর্তাগণ গোস্বামী রসশাস্ত্র অনুযায়ী কৃষ্ণলীলা বিষয়ক পদ লিখিয়াছেন। গোবিন্দদাস, জ্ঞানদাস, বসন্ত রায়, মোহনদাস এবং নরোত্তমদাস ব্রজবুলিতে কৃষ্ণলীলার অগ্রগণ্য কবি। বস্তুতঃ গোস্বামী শাস্ত্র এবং সিদ্ধান্ত জনসমক্ষে সবচেয়ে বেশী প্রচারিত হইয়াছিল ব্রজবুলি পদের কীর্তনগানে। গোস্বামী সিদ্ধান্ত লীলাকীর্তনে গভীর-ভাবে প্রবিষ্ট হইয়াছিল বলিয়াই বৈষ্ণব সমাজে কীর্তনগান শাস্ত্রালোচনা ও আধ্যাত্মিক সাধনার প্রশস্ত উপায় বলিয়া গণ্য হইত। কীর্তনবিদ্যাও শাস্ত্র ও সাধনার পর্যায়ে উন্নীত হয়। ব্রজবুলি ইহার মাধ্যম বলিয়া বাঙ্গলার বৈষ্ণব সমাজে ব্রজবুলির বিশেষ মর্যাদা আছে, ইহার স্থান প্রায় দেবভাষার তুল্য।

ব্রজবুলি কৃত্রিম ভাষা। এই ভাষায় লোকে কথা বলিত না, সাধারণ লোকে ইহা বুঝিতও না। রাজসভায়, শিক্ষিত ও শিষ্টজনের মধ্যে ইহার চলন ছিল। এই ভাষায় লেখা নিগূঢ় গোস্বামী তত্ত্বমূলক পদ সকলে সহজে বুঝিতে পারিত না। তাহার উপর আবার কীর্তনীয়ারা গাহিবার সময় আবশ্যিক উপকরণ হিসাবে গোস্বামীশাস্ত্র হইতে কিছু শ্লোক, 'চৈতন্যচরিতামৃত' প্রমুখ প্রামাণিক গ্রন্থ হইতে কয়েকটি চরণ বা হিন্দী কবিদের দোঁহা আবৃত্তি করিয়া থাকেন। ফলে কীর্তন

সাধারণ ভক্তজনের কাছে একটু কঠিন লাগিতে পারে। তাই তত্ত্ব ও লীলার পারস্পরিক সম্পর্কের যে রহস্য পদাবলীতে নিহিত আছে তাহা খানিকটা সহজভাবে বুঝাইয়া দেওয়া প্রয়োজন হয়। এই জন্য লীলাকীর্তনে গানের ফাঁকে ফাঁকে কথা, আখর ও তুক দিবার প্রথা চালু আছে। কীর্তনগানের পাঁচটি অঙ্গ। তাহার মধ্যে তিনটি কথা, আখর ও তুক। অন্য দুইটির নাম ছুট ও ঝুমর।

লীলাকীর্তনের পালাগানে বিভিন্ন কবির লেখা পদ থাকে। এক পদ হইতে অন্য পদের ভাবব্যঞ্জনাময় যোগসূত্র বা পদাংশের অর্থ বুঝাইয়া অথবা ঘটনার ক্রম বুঝাইবার জন্য নায়ক, নায়িকা, দূতী, সখা ও সখীর উক্তি বলিয়া কীর্তনীয়া নিজের ভাষায় যাহা বলেন কীর্তনে তাহার নাম কথা। লীলাকীর্তনের এই ব্যাপারে পাঁচালী গানের আদল আছে। পাঁচালী গানের অঙ্গ দুইটি, নাচাড়ি ও শিকলি। মূল গায়েন নাচাড়ি বা গীত অংশটি গান করেন আর শিকলি সুর করিয়া আবৃত্তি করেন বা টানা গদ্যে কথার মতো বলিয়া যান। শিকলি বর্ণনাত্মক। ইহা দুই নাচাড়ির মধ্যে যোগসূত্র।

পদ বা পদাংশের অন্তর্নিহিত ভাব বুঝাইবার জন্য মূল গান থামাইয়া গায়ক সুর ও তালের পোষকতায় রসপুষ্টিকর যে সব উক্তি করেন তাহার নাম আখর। কীর্তনে আখরের ভূমিকা অন্য সব অঙ্গের চেয়ে বড়। তবে আদি লীলাকীর্তনে বোধ হয় আখর ছিল না। অনুমান হয় কীর্তনে আখর দেওয়ার প্রথা আসিয়াছে হিন্দুস্থানী ঠুংরী ও ভজনগানের প্রভাবে। ঠুংরি ও ভজনগানে মাঝে মাঝে মূল গান হইতে সরিয়া আসিয়া ভাবব্যঞ্জনাময় দু-এক পদ গাওয়ার রীতি ছিল। ইহাকে বলা হইত আখোরি। আখর বা আখোরি শব্দটি আরবী। শব্দটি ফার্সীর মাধ্যমে হিন্দুস্থানী, ও বাংলায় চালু হইয়াছে। আখর বা আখোরি শব্দের অর্থ অপর, পৃথক, পরবর্তী। একটু প্রসারিত অর্থে আখর শব্দটি কীর্তনে ব্যবহৃত হইতেছে। অষ্টাদশ শতকের প্রথম দিকে হিন্দুস্থানী সঙ্গীত বাংলায় প্রচলিত হইতে থাকে। সম্ভবতঃ সেই সময় হইতে হিন্দুস্থানী সঙ্গীতের অনুকরণে কীর্তন গানে আখর দেওয়ার প্রথা চালু হয়। আখর সব ধরনের লীলাকীর্তনেই দেওয়া হয়, এমন কি গরাণহাটি গানেও। তাই আখর ছাড়া কীর্তন কেমন হইত তাহা জানিবার উপায় কম। এক ব্যতিক্রম শ্রীখণ্ডের নিজস্ব গান। শ্রীখণ্ডের ঠাকুরবংশের পুরুষপরম্পরা শ্রীখণ্ডের আদি ঘরণায় গাওয়া হয়। এই গানে আখর দেওয়ার রীতি নাই।

কীর্তনে আখরের ভূমিকা কথা, তুক ও ছুটের চেয়ে অনেক বড়। আখরের তাৎপর্য সম্বন্ধে হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় চমৎকার ব্যাখ্যা দিয়াছেন। তাঁহার কয়েকটি কথা তুলিয়া দিতেছি। 'আখর পদাবলী-সাহিত্যের অন্তর্নিহিত রসভাণ্ডারের

কুলুপ খুলিবার কুঞ্চিকা। আখরকে পদের ব্যাখ্যা বলিলে আসল কথাটাই যেন বলা হয় না। পদে যাহা বলা হয় নাই, অনেক সময় আখরে তাহা প্রকাশ পায়। সুতরাং এক অর্থে আখরকে পদের ব্যঞ্জনা বলিতে পারি' (হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় ১৯৭১ ঃ ১০৭)। আখর পদ বা পদাংশ নয়, ইহার গড়ন অন্য রকম। আখরের দুই পংক্তির মধ্যে অন্তিম মিল থাকিতে পারে, তবে না থাকিলেও ক্ষতি নাই। আখরের গোটা কয়েক দৃষ্টান্ত দিই। গৌর নিতাইকে আবাহন করিয়া কীর্তনীয়া গাহিলেন

এস দুটি ভাই গৌর নিতাই
দ্বিজমণি দ্বিজরাজ হে
আমি পূজিব চরণ এই আকিঞ্চন
রাখিব হৃদয় মাঝে

গানের পরপরই আখর শুরু হইল 'আসতে হবে হে। একা যদি আসতে নার, ভাই নিতাইকে সঙ্গে কর, আমার হৃদয়ে নদীয়া কর' ইত্যাদি। প্রাণকিশোর গোস্বামী ১৩৭৫ ঃ ১১)।

রাধার রূপ বর্ণনা করিয়া গাওয়া হইল

অপরূপ পেখলুঁ রামা
কনকলতা অবলম্বনে উয়ল হরিণী হিম ধামা।

তাহার পর আখর দিয়া কীর্তনীয়া বলিলেন 'সোনার লতায় চাঁদের উদয়। ভাগ্যে ছিল তাই দেখিলাম। অকলঙ্ক চাঁদ উঠেছে। এমন অপরূপ কে দেখেছে।' পদে শ্রীকৃষ্ণের উক্তি আছে, 'রাধে জয় রাজপুত্রী মম জীবনদয়িতে'। এইটা গাহিবার পর কীর্তনীয়ার আখর 'আর আমার কেউ নাই, এইবার আমায় দয়া কর। স্থান দাও রাই শ্রীচরণে, কেনা দাস বলি এ অধীনে।' পূর্বরাগে রাধার অবস্থা বর্ণনা করিয়া পদে বলিয়াছে 'ঘরের বাহিরে দণ্ডে শতবার তিলে তিলে আইসে যায়।' ইহার পর আখর 'দণ্ডে শতবার রে, আসে যায় দণ্ডে শতবার। (কোথায় আসে, কোথায় যায় ?) অন্তপুর আর বাহির দুয়ার। (কে যায় আসে ? যিনি রাজাবরোধে বন্দিনী) আঙ্গিনা বিদেশ যাহার।'

কীর্তনে কতকগুলি বাঁধা আখর প্রচলিত আছে। প্রায় সকল কীর্তনীয়া এইসব আখর দিয়া থাকেন। যেমন কৃষ্ণের রূপ দেখিয়া রাধা বা রাধার রূপ দেখিয়া কৃষ্ণের উক্তির পর এইরূপ আখর দেওয়া হয় 'রূপ বর্ণনা হয় না। বর্ণনাতীত রূপ বর্ণনা হয় না। যে দেখেছে তার বাক্ নাই। যে বলবে তার নয়ন নাই। নয়ন

দেখেছে সে বলতে নারে। বদন বলবে দেখে নাই তারে।' বাঁধা আখরের আর একটা দৃষ্টান্ত দিতেছি। রাধিকার কটির কিঙ্কিনী বাজিতেছে পদে ইহা গাহিয়া কীর্তনীয়া আখর দেন 'বাজে কিঙ্কিনী। কিং কিনি কিনি বাজে কিঙ্কিনী। কি কিনি কি কিনি বাজে কিঙ্কিনী। রাধার মন কিনি। রাধার মন দিয়ে রাধারমণ কিনি।' এই আখরের উদ্দেশ্য মূল পদ হইতে ধ্বনিগত সাদৃশ্য ধরিয়া, বিষয়বস্তুর ব্যঞ্জনা ফুটাইয়া তোলা (হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় ১৯৭১ঃ ১০৭-১১)।

বাঁধা আখর ছাড়া কীর্তনীয়াগণ আখর তৈরী করিয়া নেন। বড় বড় কীর্তনীয়ারা তো প্রায়ই করেন। আখর তৈরী করিতে হইলে বৈষ্ণবশাস্ত্রে ভাল রকম দখল থাকা দরকার আর আসরভরা শ্রোতাদের মন ঠিক মতো বোঝা চাই। নচেৎ আখর ব্যর্থ। কীর্তনীয়া আখর তৈরী করিয়া দোহার ও বাদকের সঙ্গে আলোচনা করিয়া সুর বসাইয়া নেন। তারপর অভ্যাস করিয়া ঠিক করিয়া রাখেন। গুরুর তৈরী আখর শিষ্য গাহিয়া থাকেন। আখর শিষ্য পরম্পরা চলিতে থাকে। গরাণহাটি ও মনোহরসাহী ঢঙের কীর্তনে খুব আখর চলে। রেনেটি ঢঙের কীর্তনে আখর কম। অনেক কীর্তনীয়া যথাসম্ভব কম আখর দিয়া থাকেন, কিন্তু অনেকে প্রয়োজনের চেয়ে বেশী দিয়া ফেলেন। ধ্বনিসাদৃশ্য ধরিয়া আখর অনেক ক্ষেত্রেই তরল ও চটুল হইয়া উঠিতে দেখা যায়। আবার বেশী আখর দেওয়ার ঝোঁক থাকিলে তাহা রসের পরিপোষক না হইয়া বিপরীত হইয়া ওঠে। এইরূপ রসাভাসদোষ ঘটিলে কীর্তনের ভাব নষ্ট হইয়া যায় (খগেন্দ্রনাথ মিত্র ১৯৫৫ঃ ৫৩)।

তুক অনুপ্রাস বহুল ছন্দোময় মিলনাত্মক গাথা। বিশেষ বিশেষ পদের মাঝখানে তুক গাওয়া হয়। প্রচলিত বৈষ্ণব কবিতার অংশ বিশেষ অনেক সময় তুক হিসাবে ব্যবহৃত হয়। আবার অজ্ঞাত কবিদের লেখা পয়ার বা ত্রিপদী তুক বলিয়া চালু আছে। কলহান্তরিতা পালা হইতে তুকের একটা উদাহরণ দিই। মানময়ী রাধিকা প্রত্যাখ্যান করিলে কৃষ্ণ কুঞ্জ ছাড়িয়া মনের দুঃখে ভূমি শয্যায় শুইয়া আছেন। ওদিকে শ্রীমতীর মনে জাগিয়াছে অনুতাপ। তখন সখীরা কৃষ্ণের খোঁজে আসিয়াছেন। সখীর সঙ্গে কৃষ্ণর দেখা হইয়াছে। পদে এতটা গাহিবার পর কীর্তনীয়া তুক গাহিলেন

(সখী বলিতেছে) তোমায় নিতে আসিনি।
গায়ের ধূলো ঝেড়ে উঠছ কি হে। তোমায় নিতে আসি নি।
আমি ফুল নিতে এসেছি।
কৃষ্ণকলি ফুল নিতে এসেছি।

বাসি ফুলে হবে না।
ঝরা ফুলে হবে না।
মান রাজার পূজা হবে করবে পূজা কমলিনী।

গোষ্ঠযাত্রা হইতে তুকের আর একটা উদাহরণ দিতেছি। ব্রজবালকদের সঙ্গে কৃষ্ণ গোষ্ঠে যাইতেছেন। ইহার প্রসঙ্গে কীর্তনীয়া তুক গাহিলেন

ধ্বজ বজ্রাঙ্কুশ পায় রহি রহি চলি যায়
যায় পদ রহিয়া রহিয়া রহিয়া গো।
বুঝি উহার কেহ আসিতেছে অতি পাছে
তেঁঞে চায় ফিরিয়া ফিরিয়া ফিরিয়া গো ॥
হায় আমরা কি করিলাম নবনী পাসরি এলাম
খানিক রাখিতাম ননী দেখাইয়া দেখাইয়া দেখাইয়া গো ॥
যদি ব্রজের বালক হতাম নেচে নেচে সঙ্গে যেতাম
শ্যাম মাঝে যেত নাচিয়া নাচিয়া নাচিয়া গো ॥
রানী টানে ঘর পানে রাখাল টানে বন পানে
রাই টানে নয়নে নয়নে নয়নে গো।
যদি ফুলের মাথা হতাম শ্যাম অঙ্গে দুলে যেতাম
যেতাম হেলনে দোলনে দোলনে ভাসিয়া গো ॥
রবি বড় তাপ দিছে বন্ধু মুখ ঘামিয়াছে
কপালের তিলক যায় ভাসিয়া ভাসিয়া গো।
হেন মনে করি মায়া মেঘ হয়ে করি ছায়া
বন্ধু যাক জুড়াইয়া জুড়াইয়া জুড়াইয়া গো ॥

(হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় ১৯৭১ : ৮৬)।

ছুট একটু হালকা ধরনের গান। ভারী গান গাহিতে গাহিতে কীর্তনীয়ারা অনেক সময় একটু সহজভাবে গাহিয়া থাকেন। হয়ত তরল তালে একটা পদের কিছুটা গাহিয়া দিলেন। ইহাকে বলে ছুট। বড় তালের গানের মধ্যে তাল ফেরতায় ছোট তালের গানকেও ছুট বলে (হরিদাস দাস ৪৭১ : ১০৯৫-৯৬; হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় ১৯৭১ : ৮৪-৫)।

কীর্তনের পঞ্চম অঙ্গ ঝুমর। এমনিতে ঝুমর বা ঝুমরী একটি সুরের নাম। কিন্তু কীর্তনের আসরে ঝুমর বিশেষ অর্থে ব্যবহৃত হয়। লীলাকীর্তনের পালা রাধা ও কৃষ্ণের মিলন গাহিয়া শেষ করিতে হয়, ইহাই নিয়ম। কিন্তু অনেক সময় চার পাঁচজন কীর্তনীয়া এক আসরে একই রসের পালা গাহিয়া থাকেন।

গায়করা ক্রমান্বয়ে গাহিয়া পালাটি আগাইয়া নিয়া যাইতে থাকেন। মিলন গাহিয়া পালা সাঙ্গ করেন শেষ গায়ক। আগের গায়করা মিলন গাহিতে পারেন না। অথচ মিলন না গাহিয়া আসর ছাড়া সম্ভব নয়। এই রূপ ক্ষেত্রে আগের গায়করা নিজ নিজ অংশের শেষে মিলনাত্মক দুই এক ছত্র গান বা ঝুমর গাহিয়া উঠিয়া যান। এইভাবে আসর রাখা হয় অর্থাৎ আগের নিয়ম রক্ষা করিয়া পরবর্তী গায়ককে পৌর্বাপর্য অনুযায়ী গাহিবার সুযোগ করিয়া দেন। একটি পালা দুই বা তিন দিন ধরিয়া গাহিতে হইলেও কীর্তনীয়া ঝুমর গাহিয়া পালা স্থগিত রাখেন, শেষদিনে মিলন গাহিয়া পালা সমাপ্ত করেন।

(হরিদাস দাস ৪৭১ ঃ ১০১৬ ; হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় ১৯৭১ ঃ ৮৬-৮৭)

আখর দেওয়া হয় সুর ও তালের পোষকতায়, কিন্তু আখর দেওয়ার মূল গানে ছেদ পড়ে। আখরের পর কিছুক্ষণ খোলের বাজনায় কাটান হয়। সাধারণতঃ বাদকের কর্তব্য গানের আনুগত্য স্বীকার করিয়া লয় বাজান (অন্য গানে বলে ঠেকা দেওয়া)। কিন্তু কাটানে খোল বাদকের স্বাধীনতা আছে। বাদক তখন খোলে হাত, ঘাত, মাতান ও মান বাজাইয়া নানা রকম কায়দা কৌশল দেখাইতে থাকেন। মান বা মূর্ছন কাটানের শেষ পর্যায়। মান বাজিলেই বুঝিতে হইবে কাটান শেষ হইয়া আসিল। মান শেষ হওয়া মাত্র গায়ক ও বাদক সমের ঘরে ফিরিয়া যাইবেন। কীর্তনের পরিভাষায় ইহাকে বলে 'ঘরে যাওয়া'। সমের ঘরে গান ফিরাইয়া আনার দায়িত্ব খোল বাদকের। পালা সাঙ্গ করার ব্যাপারেও খোল বাদকের বিশিষ্ট ভূমিকা আছে। গান শেষ হওয়ার ইঙ্গিত দিয়া বাদকরা এক ধরনের বোল বাজান। ইহার নামও মূর্ছন। ময়নাডালের ঘরাণায় গানের যেখানে পরিসমাপ্তি হয় সেই অবস্থাকে বলে মূর্ছন এবং মূর্ছনের সময় যে বোল বাজান হয় তাহাকে বলে পরণ (পরেশচন্দ্র মজুমদার ১৩৬৯ ঃ গ)।

কীর্তন গানের দল (অনেকে বলেন সম্প্রদায়) মূলতঃ পাঁচজনকে নিয়া গঠিত। মূল গায়ক আসল লোক, দলের মুখ্য। গানের সময় তিনি থাকেন দলের মাঝখানে। তাঁহার ডান দিকে শির দোহার বা প্রধান দোহার ও শির বাদকের স্থান, বাম দিকে থাকেন কোল দোহার ও কোল বাদক। কীর্তনীয়ার ডান দিক ও বাম দিকে অবশ্য একাধিক দোহার ও বাদক থাকিতে পারে অনেক সময় বাড়তি দোহার ও বাদকরা মূল গায়েনের পিছনে থাকেন। দোহার ও বাদকদের নিয়া মূল গায়েন বসেন আসরের মাঝখানে অথবা একপাশ ঘেঁষিয়া। তাঁহার সামনে চৈতন্যদেব ও রাধাকৃষ্ণের মাল্যভূষিত পট এবং একটি তুলসীমঞ্চ স্থাপন করা হয়।

কীর্তনে দোহারের কাজ খুব গুরুত্বপূর্ণ। 'সঙ্গীতে গানের সূত্র ধরাইয়া দেওয়া, গানে মূল গায়কের অনুসরণ ও সহায়তা করা এবং আসরে সুরের রেশ জমাইয়া রাখা দোহারের কাজ' (হরিদাস দাস ৪৭১ ঃ ১০৯৬)। দায়িত্বটা প্রধানতঃ শির দোহারের। কোল দোহার শির দোহারের নিকট হইতে সুর ধরিয়া গান করেন।

শির বাদক সঙ্গীতে সদা সতর্ক প্রহরী। তালপদ্ধতি অনুসারে গান যাহাতে ঠিক মতো চলে শির বাদক সে দিকে নজর রাখিয়া লয় বাজান। গান যদি কখনও বেচালা হয়, শিরবাদকের বাজনাই তাহাকে ঠিক জায়গায় ফিরাইয়া আনে এবং বাঁধিয়া রাখে। কোল বাদকের কাজ শির বাদককে অনুসরণ করিয়া খোল বাজান। কোল বাদক অনুগামী বাদক বটে, কিন্তু গোড়ায় তাহার একটা বড় ভূমিকা আছে। কোল বাদকের একক বাজনা দিয়ে আসর আরম্ভ। শুরুতে কোল বাদক দাঁড়াইয়া খোলে হাতটি বাজাইতে থাকেন। হাতটি বাদ্য। চৈতন্যস্মরণ। চৈতন্যদেব কীর্তদের জনক বলিয়া হাতটি বাদ্যে আসরে তাঁহার আবাহন করা হয়। খেতুরী মহোৎসবে সপরিকর চৈতন্যদেব অলৌকিকভাবে সশরীরে উপস্থিত হইয়াছিলেন বলিয়া কথিত আছে। সব কীর্তনের আসরেই তাঁহার আবির্ভাব হয়, ভক্তজনের ইহাই বিশ্বাস। হাতটি বাজনা আর একটি কাজে লাগে। ইহার ছন্দোনির্দেশক বোল দিয়া প্রাথমিক সঙ্গত হয়। হাতটি বাদ্য সঙ্গীত ও ভক্তিরসের উদ্দীপনা সৃষ্টি করে। এই বাজনা বাজিতে থাকিলে শ্রোতারা একাগ্রচিত্ত হইয়া ওঠে। হাতটি বাজনা শেষ হইলে গাওয়া হয় তদুচিত গৌরচন্দ্রিকা। তাহার পর হয় মেল জমাট। লীলা গানের প্রারম্ভে মূল গায়ক ও দোহাররা আলাপের ভঙ্গীতে পরস্পরের সঙ্গে গলা মিলাইয়া সুরের জমাট করিয়া নেন। খেতুরী মহোৎসবে রীতিমত আলাপচারী হইয়াছিল। এখনকার আসরে সেভাবে আলাপ হয় না। মেল জমাট আলাপের অপভ্রংশ। দুই এক ক্ষেত্রে যথা, শ্রীখণ্ড ঘরণার গানে খোলা আসরেও রীতিমত আলাপ দিয়া গান শুরু হয়।

লীলাকীর্তনের আসরে গান শোনা ছাড়াও শ্রোতাদের কিছু ভূমিকা থাকে। সঙ্গীতজ্ঞ বোদ্ধা শ্রোতা কখনও কখনও আখর দিয়া বসেন। কীর্তনীয়া ইহাতে আপত্তি করেন না। রাধাকৃষ্ণের লীলাস্মরণ করিতে করিতে কাহারও কাহারও ভাব হয়। আসরে ইহা রসপুষ্টিকারক। পালাগানের এক একটা বিশেষ জায়গায় দোহাররা একই পদাংশ বা ধুয়া উচ্চকণ্ঠে বার বার গাহিতে থাকেন। সঙ্গে খুব জোরে খোল করতাল বাজিতে থাকে। ইহার ফলে মাতোয়ারা ভাব আসে বলিয়াই বোধ হয় এই ঘটনার নাম মাতন। এই সময় শ্রোতারাও মাতিয়া যায়। আসরে জোর হরিধ্বনি ওঠে, মেয়েরা উলু দেয়, শাঁখ বাজায়। পালা গান হইয়া গেলে

কীর্তনীয়া সদলে ঠাকুরের পট ডানদিকে রাখিয়া বেড় দিয়া ভুবনমঙ্গল গান করেন। তখন শ্রোতাদের মধ্যে যে পারে সে-ই দলে ভিড়িয়া দোয়ারকি করিতে থাকে।

আখর তুক ও ছুট লীলাকীর্তনের হালকা চাল। খোলা আসরের গানে এইগুলি অপরিহার্য। কিন্তু ইহার দরুন কীর্তন গানে উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের মূল ঠাট ক্ষুন্ন হয় নাই। বড় বড় কীর্তনীয়রা সঙ্গীতজ্ঞ গায়ক ছিলেন। তাঁহারা রীতিমত সঙ্গীতশাস্ত্রের চর্চা করিতেন। 'গীতপ্রকাশ', 'সঙ্গীতসার', 'সঙ্গীতদামোদর' প্রভৃতি গ্রন্থ কীর্তনীয়াদের মধ্যে পরাম্পরাক্রমে প্রচলিত ছিল। বাঙ্গলার বৈষ্ণব সাহিত্যেও সঙ্গীত বিষয়ে আলোচনার ধারা গড়িয়া উঠিয়াছিল। কবিকর্ণপুরের 'আনন্দ-বৃন্দাবনচম্পূ' (২০ অধ্যায়) এই ধারার সূচনা। তাহার পর কৃষ্ণদাস কবিরাজের 'গোবিন্দলীলামৃত' (২২ ও ২৩ সর্গ), রাধামোহন ঠাকুরকৃত 'পদামৃতসমুদ্রের' 'মহাভাবানুসারিণী' টীকা এবং নরহরি চক্রবর্তীর রচনাসমূহে এই ধারা পরিপুষ্ট হইয়াছে। নরহরি চক্রবর্তী যশস্বী গায়ক ও সঙ্গীতশাস্ত্রবিশারদ ছিলেন। 'গীতচন্দ্রোদয়' নামক পদসংহিতার গীত বিবরণ ও তালার্ণব অংশে 'ভক্তিরত্নাকরে' (৫ তরঙ্গ) নরহরি গীত, বাদ্য ও নৃত্য বিষয়ে আলোচনা করিয়াছেন। নরহরি 'সঙ্গীতসারসংগ্রহ' নামে একটি গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছিলেন। লীলাকীর্তনের খুব প্রসার হওয়াতে অল্পশিক্ষিত গায়করা বোধ হয় রাগরাগিনী ও তালের অপপ্রয়োগ করিতেছিলেন। তাই লীলাকীর্তন গানের রীতিনীতি লিপিবদ্ধ করার প্রয়োজন হইয়াছিল। তাহা ছাড়া কীর্তন শিক্ষার্থীদের উপযোগী গ্রন্থেরও অভাব ছিল। অনুমান হয় এই সব কারণে নরহরি চক্রবর্তী 'সঙ্গীতসারসংগ্রহ' রচনা করিয়াছিলেন। গ্রন্থটি ছয়টি স্বয়ংসম্পূর্ণ অংশে বিভক্ত : গীতপ্রকরণ, বাদ্যপ্রকরণ, নৃত্যনাট্যপ্রকরণ, আঙ্গিকাভিনয়প্রকরণ, ভাষাদিপ্রকরণ ও ছন্দপ্রকরণ (চৌধুরী কামিল্যা ১৯৮১ : ১৩৭-১৪৩)। নরহরি চক্রবর্তী 'সঙ্গীতসারসংগ্রহে' সঙ্গীতবিদ্যার সকল দিক সম্বন্ধে বিশদভাবে লিখিয়াছেন।

পাঁচালী গানের মতো লীলাকীর্তনেও নাচ আছে। পাঁচালী গানে মূল গায়েন একটু আধটু নাচ ও কিছুটা ভাবকালি (ভঙ্গীদ্বারা ভাবানুকরণ) দেখাইয়া ব্যঞ্জনা ফুটাইয়া তোলেন। পাঁচালী গানের এই উপাদানটি লীলাকীর্তনে আসিয়াছে। লীলাকীর্তনে নাচ বোধ হয় নরোত্তমদাসের সময় হইতেই প্রচলিত। খেতুরী মহোৎসবে লীলাকীর্তনের ঠাটে পাঁচালী গানের ধাঁচ কিছুটা ছিল। পাঁচালী গানে নাচ আসর জমানর উপায়। পাঁচালী গানের মতো লীলাকীর্তনের আসরও খোলা জায়গায় বসে, শ্রোতারা সমাজের সকল পর্যায়ভুক্ত। পাঁচালী গানের আসর জমানর পদ্ধতি লীলাকীর্তনে ব্যবহার করা হইয়াছে। তবে নরোত্তম প্রবর্তিত লীলাকীর্তনের

নাচ বোধ হয় পাঁচালী গানের ছন্দোভিত্তিক অঙ্গভঙ্গী ও ভাবকালি নয়, নাট্যশাস্ত্রের আঙ্গিকাভিনয়। নরহরি চক্রবর্তী অভিনয়ের কথা বলিতেছেন।

কীর্তনে নাচ অবশ্য আগে হইতেই ছিল। চৈতন্যদেবের কীর্তনে নাচ হইত। চৈতন্যদেব ও তাঁহার পরিকরদের মধ্যে বেশ কয়েকজন, বিশেষতঃ অদ্বৈত আচার্য, নিত্যানন্দ, নরহরি সরকার ও জগদীশ পণ্ডিত নাচে পারদর্শী ছিলেন। নবদ্বীপে ও নীলাচলে চৈতন্যমণ্ডলীতে উদ্দণ্ড বা তাণ্ডব এবং মধুর উভয় প্রকার নাচই হইত। তাণ্ডব পুরুষের নাচ, বলবীর্যব্যঞ্জক। নামকীর্তনে তাণ্ডব নাচের সুযোগ হয়। মধুর বা লাস্যনৃত্য রমণীর বা নারী পুরুষের যুগলনৃত্য। ইহা যৌবনসমৃদ্ধ দেহের নাচ, সুকোমলাঙ্গ ও কামবর্ধক। মধুরকোলকান্ত গীতগোবিন্দ পদগানের সঙ্গে লাস্য নৃত্য চলে।

চৈতন্যদেবের কীর্তনে কোন রীতিতে নাচ হইত তাহা জানিবার উপায় নাই। তখনকার দিনে প্রচলিত নাটগীতে যে নাচ হইত চৈতন্যদেব ও তাঁহার পরিকরগণ হয়ত সেই রীতিতেই নাচিতেন। এই অনুমানের একটু কারণ আছে। অদ্বৈত আচার্য নাটগীতে নিপুণ ছিলেন। নিত্যানন্দেরও এই গুণ ছিল। নিত্যানন্দ সম্পর্কে কথাই আছে, 'নাটের গুরু নিত্যানন্দ'। চৈতন্যমণ্ডলীতে নাটগীতের নাচ ইঁহাদের আমদানী হইতে পারে। সঙ্কীর্তনের নাচে ঢাকির নাচও বোধ হয় কিছুটা আসিয়া গিয়াছিল। মহেশ পণ্ডিত ঢাকের বাজনার সঙ্গে খুব ভাল নাচিতে পারিতেন। (চৈ.চ. ১।১১)।

লীলাকীর্তনে শাস্ত্র মানিয়া নাচ হইত। তবে লীলাকীর্তনে নাচ গানের পরিপোষক। গানে যে রসমূর্তি সৃষ্টি হয় নাচ তাল ও লয় সহযোগে সেই রসের প্রত্যক্ষগোচর লীলা। এই বিষয়ে শৈলজারঞ্জন মজুমদারের ব্যাখ্যা প্রনিধানযোগ্য। লীলাকীর্তনে নাচের ভূমিকা আলোচনা প্রসঙ্গে শৈলজারঞ্জন বলিয়াছেন এ ক্ষেত্রে নাচ 'ঘটনাস্রোতের উপর নির্ভর করে না। 'ঘটনাস্রোতকে আগাইয়া লইয়া যায় না। শুধু পাত্রপাত্রীর তৎকালীন হৃদয়াবেগকেই বিচিত্র বর্ণ ও গভীরতায় প্রকাশ করে' (মজুমদার ঃ ২৫০)।

শাস্ত্রীয় নাচের উত্তরাধিকার কীর্তনীয়ারা কি ভাবে পাইয়াছিলেন তাহা অনুমানের বিষয়। ওড়িশা, অন্ধ্রপ্রদেশ, তামিলনাড়ু, কর্ণাটক বা কেরলে মন্দিরে মন্দিরে বা ধর্মীয় অনুষ্ঠান উপলক্ষে শাস্ত্রানুযায়ী নাচের নিয়মিত ব্যবস্থা ছিল। বাঙ্গলায় সে রকম কিছু ছিল না। তবে নাট্য শাস্ত্রচর্চার কিছু প্রমাণ অন্ততঃ সপ্তদশ শতকের প্রথমার্ধ হইতে পাওয়া যাইতেছে। নদীয়ার জমিদার রাজা রাঘব রায় (জমিদারীপ্রাপ্তি ১৬৩২) সংস্কৃতভাষায় 'হস্তরত্নাবলী' নামে একখানি গ্রন্থ রচনা

করিয়াছিলেন। ইহার বিষয়বস্তু আঙ্গিকাভিনয়, বিশেষতঃ মুদ্রা। রাঘব রায়ের পোষকতায় সংস্কৃতে 'সর্বাভিনয়' নামে আর একটি গ্রন্থ রচিত হইয়াছিল। গ্রন্থাকারের নাম ও পরিচয় অজ্ঞাত। 'হস্তরত্নাবলী' গ্রন্থের একটি পুঁথিই পাওয়া গিয়াছে। পুঁথিটি অক্সফোর্ডের বোদ্‌লিয়ান লাইব্রেরীতে রাখা আছে। মহেশ্বর নিয়োগ কর্তৃক সম্পাদিত শুভঙ্কর কবি রচিত 'শ্রীহস্তমুক্তাবলী'র ভূমিকায় (প্রকাশন পরিষদ, গুয়াহাটি, ১৯৬৪) 'হস্তরত্নাবলী' সম্পর্কে আলোচনা আছে। পুঁথিটি ছাপা হয় নাই। 'সর্বাভিনয়' নামক গ্রন্থের কথা কাহারও জানা ছিল না। অল্প কিছুদিন আগে শ্রীনৃসিংহপ্রসাদ ভাদুড়ী নবদ্বীপ সাধারণ গ্রন্থাগারের সংগ্রহে ইহার পুঁথি আবিষ্কার করিয়াছেন। আর কোন পুঁথির সন্ধান এখনও নাই। 'হস্তরত্নাবলী'তে রাঘর রায় শুভঙ্কর কবি রচিত 'হস্তমুক্তাবলী' গ্রন্থে উল্লিখিত মুদ্রাসমূহের প্রয়োগবিধি নিয়া আলোচনা করিয়াছেন। শুভঙ্কর কবির গ্রন্থে বিভিন্ন ভাবব্যঞ্জক মুদ্রার বিন্যাস একটু এলোমেলো। রাঘব রায় মুদ্রাগুলি ভাবানুসারে সুবিন্যস্ত করিয়া নিয়াছেন। 'হস্তরত্নাবলী'র এই বিশিষ্টতা লক্ষ্যণীয়। 'সর্বাভিনয়' চার প্রকারের অভিনয় (নাট্যশাস্ত্রের অর্থে)—বাচিকাভিনয়, আহার্য্যাভিনয়, সাত্ত্বিকাভিনয় ও আঙ্গিকাভিনয়—সম্পর্কিত সঙ্কলন গ্রন্থ। আঙ্গিকাভিনয়, বিশেষতঃ মুদ্রার প্রসঙ্গই ইহাতে বেশী। 'সর্বাভিনয়' প্রণেতা নাট্যশাস্ত্র, সঙ্গীতশাস্ত্র ও অলঙ্কারশাস্ত্রে সুপণ্ডিত। তিনি ভরত-মুনির 'নাট্যশাস্ত্র,' নন্দিকেশ্বরের 'অভিনয়দর্পণ', শার্ঙ্গদেবের 'সঙ্গীতরত্নাকর' ও শুভঙ্কর কবির 'শ্রীহস্তমুক্তাবলী' হইতে বচন ও প্রয়োগবিধি সঙ্কলন করিয়া 'সর্বাভিনয়' প্রণয়ন করিয়াছিলেন (ভাদুড়ী ১৯৮৫ঃ ১-৯)। অষ্টাদশ শতকের প্রথম ভাগে লেখা নরহরি চক্রবর্তীর 'সঙ্গীতসারসংগ্রহ' গ্রন্থের নৃত্যনাট্য প্রকরণ ও আঙ্গিকাভিনয় প্রকরণ 'হস্তরত্নাবলী' ও সর্বাভিনয়ের' উত্তর সুরী।

নাট্য শাস্ত্রচর্চার সঙ্গে শাস্ত্রীয় নাচের চর্চা থাকা সম্ভব। শাস্ত্রীয় নাচের চর্চা হয়ত রাঘব রায়ের মতো বড় বড় জমিদারদের দরবারে হইত। কীর্তনীয়ারা এই সূত্র হইতে বিদ্যা আহরণ করিয়া থাকিতে পারেন। আর একটা সম্ভাব্য সূত্র নীলাচলের সঙ্গে বাঙ্গালী বৈষ্ণবদের ঘনিষ্ঠ সংযোগ। নীলাচলে মাহারি বা দেবদাসীদের শাস্ত্রীয় গীত ও নৃত্যের ঐতিহ্য সুবিদিত। বাঙ্গলা ও নীলাচল উভয় সূত্র হইতেই কীর্তনীয়ারা শাস্ত্রীয় নৃত্যকলা শিখিয়াছিলেন ইহাই সম্ভব।

রসের সৌন্দর্য ও গভীরতা ভালভাবে ফুটাইয়া তুলিবার জন্য কীর্তনীয়াদের গানের সঙ্গে শাস্ত্রীয় নাচের চর্চাও করিতে হইত। 'সঙ্গীতসারসংগ্রহের' নৃত্যনাট্য-প্রকরণ ও আঙ্গিকাভিনয়প্রকরণ অংশে নরহরি চক্রবর্তী শাস্ত্রীয় নাচ সম্পর্কে যে

ভাবে বিস্তারিত আলোচনা করিয়াছেন তাহা কীর্তনীয়াদের শাস্ত্রীয় নৃত্যকলায় পারদর্শী করিয়া তোলার জন্য লেখা বলিয়া মনে হয়। নৃত্যনাট্য প্রকরণে আছে শাস্ত্রীয় নাচের তিনটি উপাদান নৃত্ত (বিশুদ্ধ ছন্দাভিত্তিক নাচ), নৃত্য (রসপ্রকাশের উপযোগী নাচ) ও নাট্যের (অভিনয় সমৃদ্ধ নাচ) সংজ্ঞা, প্রত্যেকটি উপাদানের বিভিন্ন প্রকারের বিবরণ এবং নৃত্যনাট্যের মার্গ ও দেশী রীতির বিচার। আঙ্গিকাভিনয় প্রকরণের বিষয়বস্তু আঙ্গিকাভিনয়ের অর্থ, সাতটি অঙ্গ, নয়টি প্রত্যঙ্গ এবং বারটি উপাঙ্গের পরিচয়, আঙ্গিকাভিনয়ে বিভিন্ন অঙ্গ, প্রত্যঙ্গ ও উপাঙ্গের প্রয়োগবিধি ও তাহার প্রকারভেদ এবং আঙ্গিকাভিনয়ের রসব্যঞ্জনা (চৌধুরী কামিল্যা ১৯৮১ঃ ১৪০)। নরহরি চক্রবর্তীর 'ভক্তিরত্নাকরে' (৫ তরঙ্গ) শাস্ত্রীয় নাচের বিবরণ আছে। 'গীতচন্দ্রোদয়ের' গীত বিবরণ অংশেও নরহরি নৃত্য বিষয়ে আলোচনা ও নর্তকের লক্ষণ নির্দেশ করিয়াছেন। আগেকার দিনে অনেক কীর্তনীয়া কুশলী নর্তক ছিলেন। তাঁহাদের দৌলতে মার্গ সঙ্গীতের সঙ্গে শাস্ত্রীয় নৃত্যকলা লীলাকীর্তনের প্রকাশ্য আসরে সর্বজনভোগ্য হইয়া উঠিয়াছিল।

ইদানীং কীর্তন গানের নাচের রেওয়াজ বেশ কমিয়া গিয়াছে। প্রাচীনপন্থী গায়ক ও বাদকরা এখনও লীলাকীর্তনে নাচ কিছুটা বজায় রাখিয়াছেন, কিন্তু নব্য-পন্থীদের গানে নাচ হয় কদাচিৎ। দাঁড়াইয়া গান করিলে আধুনিক কীর্তনীয়াদের কিছু কিছু অঙ্গভঙ্গী করিতে দেখা যায় বটে, কিন্তু তাহা রসপ্রকাশের উপযোগী নয়। ঠায় গান করিলে (গায়ক ও বাদকরা বসিয়া গান বাজনা করিলে) এইটুকু করার সুযোগও কম। আজকাল ঠায় গাওয়ার চলন বাড়িয়াছে। মহিলা কীর্তনীরা সাধারণতঃ বসিয়াই গান করেন। অনেক সময় পুরুষ কীর্তনীয়াদেরও বসিয়া গান করিতে দেখা যায়। মাইক্রোফোনের সামনে গান করিলে নড়াচড়ার সুযোগ বিশেষ হয় না। এখন বেশীর ভাগ আসরেই মাইক্রোফোন থাকে। রেডিও এবং টেলিভিশনে বাঁধাবাঁধি তো আছেই। এই সব কারণে লীলাকীর্তনে নাচ প্রায় উঠিয়া যাইবার মুখে।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

লীলাকীর্তনের প্রকারভেদ

পদগান আসলে বৈঠকী গান। অল্প কয়েকজন সমজদার লোক এক জায়গায় বসিয়া পদগান শুনিত। নরোত্তমদাস বৈঠকী পদগানকে আসরে রূপান্তরিত করেন। আসর বসে ঠাকুরবাড়ীর নাটমণ্ডপ বা ধনীলোকের দুর্গা-দালানের মত প্রশস্ত আশ্রয়ে অথবা বাউল বৈষ্ণবের আখড়ার উঠানে। মোট কথা খোলামেলা ছড়ান জায়গায় কীর্তনের আসর বসে। সেখানে বহু লোকে একসঙ্গে বসিয়া গান শোনে। এই অবস্থায় বৈঠকী মেজাজ রাখা শক্ত। তাহার উপর গায়ন পদ্ধতি কঠিন হইলেও আরও অসুবিধা হইবার কথা। সম্ভবতঃ এই কারণেই আসরে গান করিবার উপযুক্ত সরলতর গায়নপদ্ধতি দরকার হইয়া পড়ে।

শ্রীখণ্ডের (বর্ধমান জেলা) বৈষ্ণব গোষ্ঠী কাব্য, সঙ্গীত ও নৃত্য চর্চার জন্য বিখ্যাত ছিল। এই গোষ্ঠীর প্রতিষ্ঠাতা চৈতন্যদের অন্যতম ঘনিষ্ঠ পরিকর নরহরি সরকার ঠাকুর শ্রেষ্ঠ পদকর্তা ছিলেন। সঙ্গীত ও নৃত্যেও তাঁহার বেশ অধিকার ছিল। নীলাচলে চৈতন্যদেব যে সাতটি সম্প্রদায় নিয়া রথাগ্রে কীর্তন করিতেন শ্রীখণ্ড সম্প্রদায় তাহার অন্যতম। শ্রীখণ্ড সম্প্রদায়ের প্রধান হিসাবে নরহরি রথাগ্রে কীর্তনে নাচিতেন। নরহরির সঙ্গে থাকিতেন তাঁহার ভাইপো ও আধ্যাত্মিক উত্তরাধিকারী রঘুনন্দন এবং তাঁহার শিষ্য সুলোচন ('চৈতন্যমঙ্গল' রচয়িতা লোচনদাসের আসল নাম) ও চিরঞ্জীব। নরহরির সময় হইতে কাব্য, সঙ্গীত ও নৃত্যে শ্রীখণ্ড-কেন্দ্রিক বৈষ্ণবগোষ্ঠীর খুব নামডাক শোনা যায়। শ্রীখণ্ড গোষ্ঠীর সঙ্গীতচর্চা হইতে মনোহরসাহী ঢঙের কীর্তন সৃষ্টি হয়। শ্রীখণ্ড মনোহর-সাহী পরগণার মধ্যে ছিল বলিয়া এই নামের চলন হইয়াছে। মনোহরসাহী

ঢঙের জন্মবৃত্তান্ত ঠিক জানা নাই। জনশ্রুতি এই যে শ্রীখণ্ডের নিকটবর্তী কাঁদরানিবাসী বংশীবদন ঠাকুরও তাঁহার সঙ্গীতগুরু আউলিয়া মনোহরদাস মনোহরসাহী ঢঙের উদ্ভাবক। আর এক জনশ্রুতি অনুসারে মনোহরসাহী ঢঙ প্রবর্তন করেন শ্রীনিবাস আচার্য। শ্রীনিবাস শ্রীখণ্ডের কাছে যাজিগ্রামে বাস করিতেন। নরহরি সরকার ঠাকুর ও তাঁহার গোষ্ঠীর সঙ্গে শ্রীনিবাসের হৃদ্যতা ছিল। গরাণহাটি গানের প্রত্যক্ষ উত্তরাধিকার নিয়া মনোহরসাহী ঢঙের উদ্ভব। সম্ভবতঃ গরাণহাটি ঢঙ প্রবর্তনের অল্প কিছুদিন পরেই মনোহরসাহী ঢঙের জন্ম হয়। শ্রীখণ্ড এলাকার মহান্ত ও মহাজনদের খেতুরীতে যাতায়াত ছিল। শ্রীনিবাস আচার্য ছিলেন নরোত্তমদাসের সতীর্থ ও পরম সুহৃদ। খেতুরীতে তিনি বেশ কয়েকবার গিয়াছিলেন। খেতুরী মহোৎসবে তিনিই ছিলেন প্রধান কর্মকর্তা। রঘুনন্দন খেতুরী মহোৎসবে উপস্থিত ছিলেন। আউলিয়া মনোহরদাসও খেতুরী মহোৎসবে যোগ দিয়াছিলেন বলিয়া শোনা যায়। অপরদিকে নরোত্তমদাস মাঝে মাঝে যাজিগ্রাম ও শ্রীখণ্ডে যাইতেন। দেখা যাইতেছে মনোহরসাহী ঢঙ প্রণেতাদের সঙ্গে গরাণহাটি ঢঙের প্রত্যক্ষ ও ঘনিষ্ঠ পরিচয় ছিল।

গরাণহাটির তুলনায় মনোহরসাহী একটু হালকা গান। গরাণহাটি ঢঙের লয় বিলম্বিত, ছন্দ দীর্ঘ এবং যাত্রা সরল। ইহাতে তালের সংখ্যা একশ আট। মনোহরসাহী ঢঙে লয় ও ছন্দ অপেক্ষাকৃত সংক্ষিপ্ত। কিন্তু সুরের কারুকার্য খুব আছে, যাত্রার জটিলতাও লক্ষ্যনীয়। মনোহরসাহী ঢঙে তাল চুয়ান্ন। মার্গ সঙ্গীতের প্রসঙ্গে মনোহরসাহী খেয়ালের সমতুল্য (হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় ১৯৭১ঃ৮৪, খগেন্দ্রনাথ মিত্র ১৩৫২ঃ৩৩)। ধর্মপ্রচারের ক্ষেত্রে নরোত্তমদাস গোস্বামীসিদ্ধান্তে বিশ্বাস রাখিয়াও বাঙ্গলায় প্রচলিত ঐতিহ্যের সঙ্গে তাহার সামঞ্জস্য বিধান করিয়াছিলেন। কীর্তনের ক্ষেত্রে তিনি উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতে পারদর্শী হইয়াও মার্গ সঙ্গীতের সঙ্গে দেশী সঙ্গীতের সামঞ্জস্যমূলক গায়ন পদ্ধতি প্রবর্তন করিয়াছিলেন। নরোত্তমদাস সামঞ্জস্যের পথ অবলম্বন করিয়াছিলেন বহুল প্রচারের উদ্দেশ্যে। কিন্তু গরাণহাটি গানে তাঁহার সে উদ্দেশ্য সফল হয় নাই, হইয়াছিল গরাণহাটির চেয়ে সহজ মনোহরসাহী কীর্তনে। আসরের পক্ষে বেশী উপযোগী বলিয়া লীলাকীর্তন গানে মনোহরসাহী ঢঙের ব্যাপক চলন হয়। শ্রীখণ্ডের ঠাকুরবংশ, কাঁদরার (বর্ধমান) ঠাকুরবাড়ী, ময়নাডালের (বীরভূম) মিত্রঠাকুর বংশ এবং ও পাঁচথুপী প্রমুখ কাঁদি-ভরতপুর অঞ্চলের কীর্তনীয়াদের যত্নে মনোহরসাহী ঢঙের খুব উৎকর্ষ হইয়াছিল।

শ্রীখণ্ডের সাঙ্গীতিক ঐতিহ্য হইতে মনোহরসাহী গানের উদ্ভব। কিন্তু

মনোহরসাহীর প্রভাবে শ্রীখণ্ডের স্বতন্ত্র গায়নপদ্ধতি লোপ পায় নাই। শ্রীখণ্ডের সংস্কৃতিবান ঠাকুরবংশের নিজস্ব ঘরাণার গান মনোহরসাহীর তুলনায় সংযত ও গম্ভীর। ঠাকুরবংশের লীলাকীর্তন একেবারে ঠাসবুনোট। তুক ও ছুট নাই, কথা খুব কম। প্রচলিত উপায়ে আখর দেওয়া হয় না। পালাকীর্তনে অবিচ্ছিন্ন গানের মধ্যে পদের সাহায্যে পদের ব্যঞ্জনা বিস্তার করাই শ্রীখণ্ড ঘরাণার রীতি। ক্রমান্বয়ে সাজান পদগুলি ভাবের দিক দিয়া পরস্পরের পরিপূরক। রসজ্ঞ মননশীল শ্রোতা তাহা বুঝিতে পারে বলিয়া শ্রীখণ্ডের গানে মূল গান হইতে সরিয়া আসিয়া আখর দেওয়া রীতি নাই। শ্রীখণ্ডের গানে খুব আভিজাত্য আছে।

শ্রীখণ্ড ঘরাণার গৌরব শেষ পর্যন্ত বজায় রাখিয়াছিলেন গৌরগুণানন্দ ঠাকুর। গৌরগুণানন্দ ঠাকুর ছিলেন সার্বভৌম কীর্তন গায়ক। শ্রীখণ্ডের ঘরাণা তো বটেই তাহা ছাড়া গরাণহাটি, মনোহরসাহী ও রেণেটি ঢঙে তিনি ছিলেন স্বচ্ছন্দবিহারী ও সিদ্ধকণ্ঠ। গরাণহাটি ঢঙের তিনিই শেষ বড় গায়ক। গৌরগুণানন্দর সঙ্গে মৃদঙ্গে সঙ্গত করিতেন তাঁহার ছেলে যশোদানন্দ ঠাকুর ও সুরেন্দ্রকিশোর কবিরাজ। মৃদঙ্গ বাদ্যে শ্রীখণ্ডের খ্যাতি এই দুইজনের হাতে অক্ষুন্ন ছিল (গৌরগুণানন্দ ঠাকুরের সঙ্গীতকৃতির জন্য দ্রষ্টব্য সীতানন্দ ঠাকুর ১৯৭৭ : ৪০-৫২)। গৌরগুণানন্দ ঠাকুরের লোকান্তর হয় ১৯৬৯ সালে। তাঁহার কয়েক বছর আগে গত হন সুরেন্দ্রকিশোর ও কয়েক বছর পরে যশোদানন্দ। এই দুই জনের পর শ্রীখণ্ডের মৃদঙ্গ বাদ্যের ঐতিহ্য লোপ পাইয়াছে। গৌরগুণানন্দ ঠাকুরের পর শ্রীখণ্ডের ঠাকুরবংশে গানের চর্চা কমিয়া আসিতে থাকে। এখন আর বিশেষ চর্চা কিছু হয় না। তবে এখনও দোল, জন্মাষ্টমী ও রাস উপলক্ষ্যে এবং অগ্রহায়ণ মাসে গৌরনরহরি মিলন মহোৎসবে শ্রীখণ্ড ঘরাণার গান শুনিতে পাওয়া যায়। চর্চার অভাব আছে ঠিকই, কিন্তু ঠাকুর বংশের গায়কদের কীর্তন গানে খুব পুরানো ঘরাণার ছাপ স্পষ্ট ধরা পড়ে।

শ্রীখণ্ডের মত কুলীনগ্রামেও গান, বাজনা ও নাচের চর্চা ছিল। রথাগ্রে কীর্তনের প্রসঙ্গে কুলীনগ্রাম সম্প্রদায়ের সত্যরাজ ও রামানন্দ বসুর নাম পাওয়া যাইতেছে। বসুরা প্রাচীন ও সম্ভ্রান্ত। এই বংশের বৈষ্ণবতা প্রসিদ্ধ কিন্তু বসুদের কীর্তনচর্চা বোধ হয় বেশী দিন চলে নাই। রামানন্দের পর গান বাজনাতেও বসু বংশের বিশেষ খ্যাতি শোনা যায় না। তবে কুলীনগ্রাম যে এলাকায় সেখানে গান-বাজনার চর্চা ভালই চলিত। কুলীনগ্রামের কাছে দেবীপুর গ্রামনিবাসী বিখ্যাত পদকর্তা বিপ্রদাস ঘোষ রেণেটি ঢঙের কীর্তন প্রবর্তন করেন বলিয়া জানা যায়। দেবীপুর রাণীহাটি পরগণার মধ্যে অবস্থিত ছিল বলিয়া এই নাম। রেণেটি

ঢঙ বোধ হয় অষ্টাদশ শতকের প্রথম দিকে গঠিত হইয়াছিল। রেণেটি ঢঙের সুর তরল, লয় ও ছন্দ সংক্ষিপ্ত, গতি ও মাত্রা দ্রুত। ইহার তালের সংখ্যা ছাব্বিশ। টেঞা বৈদ্যপুরের (মুর্শিদাবাদ) বৈষ্ণবদাস ('পদকল্পতরু' সঙ্কলক) ও উদ্ধবদাসের যত্নে রেণেটি ঢঙ সমৃদ্ধ হইয়াছিল (হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় ১৯৭১ঃ ৮৪)। সুর তরল বটে, কিন্তু রেণেটি ঢঙে মাধুর্য ও সৌন্দর্য খুব (রাজ্যেশ্বর মিত্র ১৯৫৫ঃ ২১)। রেণেটিকে অনেকে ঠুংরির সঙ্গে তুলনা করিয়া থাকেন। বৈষ্ণবদাস না কি এক ধরনের নূতন সুরও চালু করিয়াছিলেন ইহার নাম টেঞার ছপ (হরিদাস দাস ১৩৬৫ঃ ১০৯৪)। রেণেটির চেয়েও সহজ ও সুলভ সুরের গান মন্দারিণী ঢঙের কীর্তন। মন্দারণ বর্তমান হুগলী জেলার আরামবাগ মহকুমার পশ্চিম অংশে অবস্থিত। বংশীবদন নামে একজন কীর্তনীয়া মন্দারিণীর প্রবর্তক। পাঁচালী বা মঙ্গল গানের সুর নিয়া মন্দারিনী ঢঙ তৈরী হইয়াছিল। ইহাতে তালের সংখ্যা মাত্র নয়টি (হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় ১৯৭১ঃ ৮৩)। দক্ষিণ-পশ্চিম বাংলার প্রত্যন্তে ঝাড়খণ্ডের মধ্যে অবস্থিত সেরগড়ে (পুরুলিয়া জেলা) ঝাড়খণ্ডী কীর্তনের উদ্ভব। গোকুলানন্দ এই ঢঙ প্রবর্তন করেন। গোকুলানন্দর জন্মস্থান বর্ধমান জেলার কড়ুই নামক গ্রাম। এখান হইতে তিনি সেরগড়ে উঠিয়া যান। গোকুলানন্দ শ্রীনিবাস আচার্যর শিষ্য। এই কারণে আন্দাজ হয় যে ইনি ষোড়শ শতকের শেষ বা সপ্তদশ শতকের প্রথম দিকের লোক। ঝাড়খণ্ডী ঢঙ ঝাড়খণ্ডের আঞ্চলিক সুরে প্রভাবিত পদাবলী কীর্তন গান। গোকুলানন্দর জন্মস্থান কড়ুই কাটোয়া অঞ্চলে অবস্থিত। উচ্চাঙ্গ কীর্তনের সঙ্গে তাঁহার পরিচয় থাকাই সম্ভব। উচ্চাঙ্গ পদাবলী কীর্তনের সঙ্গে মানভূম সিংভূমের আঞ্চলিক সুর মিশাইয়া গোকুলানন্দ ঝাড়খণ্ডী সুর প্রবর্তন করিয়াছিলেন। এই অঞ্চলের সবচেয়ে বেশী প্রচলিত গান ঝুমুর। প্রায় সকলেই কিছু না কিছু ঝুমুর গাহিতে পারে। সর্বলোকে যে ঝুমুর গান করে তাহা সাধারণ লোকসঙ্গীত। কিন্তু এই আঞ্চলিক সুরের উৎকর্ষ পাওয়া যায় বৈঠকী ঝুমুর গানে। বৈঠকী ঝুমুর রাগসঙ্গীত, এ গানে সুরের সৌন্দর্য খুব আছে। বৈঠকী ঝুমুরে পদগান করা হয়। লীলাকীর্তনও পদগান। ফলে বৈঠকী ঝুমুরের সঙ্গে ঝাড়খণ্ডী কীর্তনের লেনদেন চলিয়াছে, সাদৃশ্যও যথেষ্ট।

অষ্টাদশ শতকে কীর্তনে খুব ভাঙ্গাচোরা শুরু হয়। রূপচাঁদ চাটুয্যে (১৭২২-১৭৯২) ছিলেন বিখ্যাত কথক ও গায়ক। তিনি মনোহরসাহী কীর্তনের সুর ভাঙ্গিয়া বেশ হালকা সুরের গান তৈরী করেন। এই গান ঢপ কীর্তন নামে পরিচিত। অষ্টাদশ শতকের শেষ দিকে ঢপ কীর্তনের খুব চলন হয়। ঢপ

কীর্তন উপলক্ষে কীর্তনে ব্রজবুলির বাঁধন কাটিবার চেষ্টা হইয়াছিল। বিখ্যাত ঢপ কীর্তন গায়কদের অনেকেই ছিলেন পদকর্তা। রূপচাঁদ চাটুয্যে ও মধু কানের (মধুসূদন কিন্নর) নাম এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। ইঁহাদের রচনা বাঙ্গলা ভাষায়। পদগুলি নূতন ঠাটে হালকা চালে লেখা। শশিশেখরের লেখা দূতী-সংবাদের মত পদও ঢপকীর্তনে গাওয়া হইত। এই সব পদ হইতে ঢপকীর্তনে বাঙ্গলাভাষার প্রাধান্য হয়। তবে ঢপকীর্তনের পদ ভাষা ও ভাবের দিক দিয়া আগেকার বাঙ্গলা ও ব্রজবুলি পদের তুলনায় ঢের নীরেস (হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় ১৯৭১ : ১১৮-১২৫)। তবে সরল অনুপ্রাসবর্জিত পদ ও সুরের মাধুর্যগুণে ঢপ কীর্তন সাধারণ লোকের মনোহরণ করিয়াছিল। ঢপ কীর্তনের চলন বাড়াতে ইহার বিভিন্ন স্থানীয় প্রকারভেদের উদ্ভব হয়। চন্দ্রকোণা ঢপ ইহার অন্যতম বিশিষ্ট উদাহরণ। মেদিনীপুর জেলার চন্দ্রকোণা পুরাণো সহর ও বাণিজ্যকেন্দ্র। এইখানে চন্দ্রকোণা ঢপের জন্ম। চন্দ্রকোণার বাহিরে অনেক দূর পর্যন্ত চন্দ্রকোণা ঢপের খ্যাতি ছিল (সিংহ ১৩৯২ ঃ ৪০)।

অষ্টাদশ শতকে কীর্তনের আর এক অভিনবত্ব মেয়ে কীর্তনীয়া বা কীর্তনওয়ালী। ইহারা বাইজীদের হাবভাব নকল করিয়া হালকা চালের ঢপকীর্তন আরও একটু চটুল ভঙ্গীতে গাহিত। সহর বাজারের নূতন পয়সাওয়ালা বাবুমহলে মেয়ে কীর্তনীয়াদের খুব প্রসার ছিল। আদ্যশ্রাদ্ধ বাসরের সভারোহণে বা অন্নপ্রাশন প্রভৃতি ধর্মীয়-সামাজিক অনুষ্ঠানে কীর্তনওয়ালীদের ডাক পড়িত। কীর্তনওয়ালীদের মধ্যে পান্নাময়ীর নাম খুব প্রসিদ্ধ। কিছু কিছু পুরুষ কীর্তনীয়া কীর্তনওয়ালীদের ঢঙ নকল করিতে শিখিয়াছিল (খগেন্দ্রনাথ মিত্র ১৯৫৫ ঃ ৩৫)

অষ্টাদশ শতকে পদাবলী কীর্তনের আদলে এক ধরনের হালকা গানের চলন হইয়াছিল। কৃষ্ণযাত্রায় এই গান গাওয়া হইত। ঢপের মতো কৃষ্ণযাত্রার গানও ভাবে ও ভাষায় সরল এবং সুরের দিক দিয়া মাধুর্যময়। তবে লোকের মন মাতাইবার ক্ষমতা ঢপের চেয়ে এই গানের বেশী। গানের জোরেই কৃষ্ণযাত্রা সারা বাঙ্গলায় খুব জনপ্রিয় হইয়া উঠিয়াছিল। পঞ্চাশ ষাট বছর আগে কৃষ্ণযাত্রার গান গ্রামে গ্রামে মানুষের মুখে মুখে ফিরিত। কৃষ্ণযাত্রা যাত্রাভিনয়। কৃষ্ণলীলা ও চৈতন্যলীলার আখ্যায়িকা নিয়া পালা বাঁধা হইত। পাত্রপাত্রীদের ভাবপ্রকাশ চলিত গানে। অধিকারীরা গান বাঁধিতেন। সুরও দিতেন তাঁহারাই। কৃষ্ণযাত্রায় যশস্বী হইয়াছিলেন পরমানন্দ অধিকারী, শ্রীদাম অধিকারী, গোবিন্দ অধিকারী, নীলকণ্ঠ মুখোপাধ্যায় ও কৃষ্ণকমল গোস্বামী। উনবিংশ শতকে সর্বজনীন বাঙ্গলা গানের ক্ষেত্রে শেষ তিনজনের খ্যাতি প্রবাদপ্রতিম। কৃষ্ণকমল

গোস্বামী সুকবি ছিলেন। তাঁহার রচিত পালা 'নিমাই সন্ন্যাস', 'স্বপ্নবিলাস', 'রাই উন্মাদিনী', ও 'সুবল সংবাদ' পূর্ব বাঙ্গলায় খুব জনপ্রিয় হইয়া উঠিয়াছিল। দীনেশচন্দ্র সেনের মতে কৃষ্ণকমল 'বৈষ্ণব-গীত-সাহিত্যের পুনরুত্থানকালের সর্বশ্রেষ্ঠ কবি' (দীনেশচন্দ্র সেন ১৯২০ ঃ ৫৩৮)।

কঠিন গায়ন পদ্ধতির জন্য খোলা আসরের পক্ষে গরাণহাটি ঢঙ খুব একটা উপযুক্ত নয়। ওস্তাদী গান হিসাবে গরাণহাটির কদর থাকিলেও সাধারণ্যে ইহার চলন কম ছিল। সহজতর গায়ন পদ্ধতিতে উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত ও দেশীয় রীতির মিশ্রণে তৈরী মনোহরসাহী ঢঙই বেশী জনপ্রিয় হইয়া ওঠে। বীরভূম, মুর্শিদাবাদ, বর্ধমান ও নদীয়া জেলার মধ্যে বিস্তৃত বৈষ্ণব সংস্কৃতির কেন্দ্রভূমিতে মনোহরসাহী গানের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হয়। রেণেটি ঢঙ মনোহরসাহীর চেয়ে সহজ। ইহার মিষ্টত্ব ও সৌন্দর্যও সহজে প্রতীয়মান। এই সব কারণে অনেকেই রেণেটি গান শুনিতে ভালবাসিত। মনোহরসাহী ঢঙের খোদ এলাকা ইলমবাজার (বীরভূম), কাঁদি (মুর্শিদাবাদ) ও কাটোয়া (বর্ধমান) অঞ্চল হইতে দক্ষিণ-পশ্চিমে বাঙ্গলা-ওড়িশা-বিহার সীমান্তবর্তী গোপীবল্লভপুর-ময়ূরভঞ্জ-ঘাটশিলা অঞ্চল পর্যন্ত রেণেটি ঢঙের চর্চা ও জনপ্রিয়তা ছড়াইয়া পড়ে। শ্যামানন্দী পরিবারে (গোষ্ঠী) রেণেটি গানের খুব আদর ছিল। গোপীবল্লভপুরে শ্যামানন্দী গোষ্ঠীর প্রধান মঠে রেণেটি গানের নিয়মিত চর্চা হইত। চেতুয়া এলাকাতেও (মেদিনীপুর জেলার উত্তরপূর্ব অংশ) রেণেটি গানের চর্চা ছিল। তবে রেণেটি গানের সমাদর বেশী দিন থাকে নাই। মন্দারণের বাহিরে মন্দারিণী ঢঙের চলন বিশেষ ছিল না। রেণেটির মতোই ইহার আয়ুষ্কালও কম। রেণেটি ও মন্দারিণীর ধারার স্বতন্ত্র গায়ক বর্তমান শতকের গোড়ার দিকেই দুর্লভ হইয়া উঠিয়াছিল। রেণেটি ঢঙের শেষ বড় গায়ক বাসুদেবপুর (হুগলী) নিবাসী বেণীদাস এই সময়ের কিছু আগে তিনি দেহত্যাগ করেন। মন্দারিণী গান এখন শোনাই যায় না। রেণেটির কিছুটা মর্যাদা আছে গোপীবল্লভপুর ও চেতুয়া এলাকায়। অন্যত্র রেণেটি গানের চলন খুব কম। ঢপ কীর্তনের নিজস্ব গায়ক পঞ্চাশ বৎসর হইল অবলুপ্ত।

একেবারে গোড়ার দিকে ছাড়া শুধু গরাণহাটি গান করেন এমন গায়ক বোধ হয় বেশী ছিল না। মনোহরসাহী ঢঙের বড় গাইয়েরাই গরাণহাটি ঢঙের চর্চা করিতেন এবং প্রয়োজন মতো গাহিতেন। বর্তমান শতকের প্রথম ভাগে গরাণহাটি ঢঙের প্রধান গায়ক ছিলেন অদ্বৈতদাস (পণ্ডিত) বাবাজী, নবদ্বীপ ব্রজবাসী এবং গৌরগুণানন্দ ঠাকুর। তিনজনেই মনোহরসাহী ঢঙের খ্যাতনামা গায়ক। গরাণহাটি ঢঙে পারদর্শী মনোহরসাহী গায়কদের দৌলতে গরাণহাটির কিছু কিছু বিশিষ্টতা,

যথা বিলম্বিত লয়, গাম্ভীর্য মনোহরসাহীর ঠাটে জুড়িয়া গিয়াছে। অনেক কীর্তনীয়া মনোহরসাহী ও রেণেটি দুইয়েতেই পারদর্শী ছিলেন। কোন কোন গায়ক মনোহরসাহী ও রেণেটি সুর মিশাইয়া গান করিতেন। বর্তমান শতকের প্রথমভাগে বিখ্যাত কীর্তনীয়া ফটিক চৌধুরীর গান ছিল এই রকম মিশ্র সুরের। তাঁহার মত গায়ক আরও ছিল। গৌরগুণানন্দ ঠাকুর একই আসরে তিন রকম ঢঙে গান করিতেন। তিনি শুরু করিতেন গরাণহাটি দিয়া, মাঝখানে গাহিতেন মনোহরসাহী আর শেষে রেণেটি। মন্দারিণীর সঙ্গেও মনোহরসাহীর অনুরূপ সংস্রব ঘটা সম্ভব। মন্দারিণী লোপ পাইয়াছে। রেণেটি বিলয়মান। কিন্তু রেণেটি ও মন্দারিণীর বেশ কিছু ভাঁজ মনোহরসাহীতে ঢুকিয়া পড়িয়াছে। মনোহরসাহীর গায়করা ঢপ কীর্তনও আয়ত্ব করিয়াছিলেন। মনোহরসাহীর কোন কোন গায়ক ঢপ কীর্তনের ঢঙে কিছু কিছু পদ গাহিয়া থাকেন। নানারকম মিশ্রণের ফলে মনোহরসাহী গানে বিভিন্ন ঢঙের বিশিষ্টতা যথা, গাম্ভীর্য, কারুকার্যময়তা, সৌন্দর্য-বৈচিত্র্য, মিষ্টতা ও চটুলতা দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু মনোহরসাহীর নিজস্ব বিশিষ্টতা নষ্ট হয় নাই। মনোহরসাহীর ঠাট বজায় আছে। এখনও মনোহরসাহীর কীর্তনে মেঘ, মালকোশ, শ্রী, মালবশ্রী, ধানসী, প্রভৃতি রাগ এবং ধামার দশকুশী, চৌতাল রুদ্রতাল, ব্রহ্মতাল তেওট প্রভৃতি কঠিন তালের শুদ্ধ গান শুনিতে পাওয়া যায় (হরিদাস দাস ১৩৫৬ ঃ ১০৯৪)। মনোহরসাহী গানেই বাঙ্গলা কীর্তনের মুখ্য ধারা। এখন লীলাকীর্তন বলিতে মনোহরসাহী গানই বোঝায়।

দেশ জুড়িয়া কদর বাড়ার ফলে মনোহরসাহী গানের ব্যাপক চর্চা হইতে থাকে। মনোহরসাহী কীর্তন চর্চার বড় বড় ঘাঁটিগুলি অবশ্য ভাগীরথীর পশ্চিমদিকে দ্বারকা ময়ূরাক্ষী ও অজয় নদ বিধৌত অঞ্চলে অবস্থিত। এই অঞ্চল গৌড়ীয় সংস্কৃতির প্রাণকেন্দ্র। মনোহরসাহীর উদ্ভবও হইয়াছিল এইখানে। প্রধান পদ সংহিতাগুলির সঙ্কলক রামগোপালদাস, বিশ্বনাথ চক্রবর্তী, রাধামোহন ঠাকুর, নরহরি চক্রবর্তী ও বৈষ্ণবদাসের জন্মস্থান এই অঞ্চলে বা ধারে কাছে। ষোড়শ শতকের শেষ দিক বা সপ্তদশ শতকের প্রথম দিক হইতে শ্রীখণ্ড, কাঁদরা ও ময়নাডাল মনোহরসাহী কীর্তনের প্রধান কেন্দ্র হইয়া ওঠে। দূর দূরান্ত হইতে শিক্ষার্থীরা এই সব জায়গায় গান শিখিতে আসিত। শ্রীখণ্ড ও ময়নাডালে কীর্তন শেখানর টোল ছিল। শ্রীখণ্ডের টোল ছিল বাদ্যশিক্ষার জন্য বিখ্যাত। সুদূর মণিপুর হইতে শিক্ষার্থীরা শ্রীখণ্ডে গানবাজনা শিখিতে আসিত। শ্রীখণ্ডের ঠাকুর বংশ ও ময়নাডালের মিত্র ঠাকুর বংশ খুব নামকরা সঙ্গীতশিল্পী বংশ। দুই বংশেই অনেক নামকরা গায়ক ও বাদক জন্মিয়াছেন বর্তমান শতকে প্রথম ভাগেও কাঁদরা, শ্রীখণ্ড ও ময়নাডালের

খ্যাতি শোনা যাইত। কাঁদরা ও শ্রীখণ্ডের গৌরব এখন অস্তমিত। তবে ময়নাডালে গানের চর্চা ও শিক্ষাদান এখনও চালু আছে।

অষ্টাদশ শতকে মনোহরসাহী গানের বেশ কয়েকটা নূতন ঘাঁটি তৈরী হইয়াছিল। ইহার মধ্যে গোটাকয়েক বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য ঃ বীরভূম জেলার ইলমবাজার, পায়ের ও মুলুক, মুর্শিদাবাদ জেলার পাঁচথুপী এবং বর্ধমান জেলার অণ্ডালের কাছে দক্ষিণখণ্ড (শ্রীখণ্ডের ঠাকুর বংশের এক শাখা এখানে উঠিয়া আসেন, ইঁহাদের দরুন এখানকার সঙ্গীতচর্চা)। বর্তমান শতকের প্রথমভাগেও এই সব কেন্দ্রের খ্যাতি ছিল। যশস্বী কীর্তনগুরু কৃষ্ণহরি হাজরা পাঁচথুপীর অধিবাসী। বীরভূম-মুর্শিদাবাদ-বর্ধমান ছাড়াইয়া অনেকটা দক্ষিণে মনোহরসাহী ঠাটের আর একটা কেন্দ্র গড়িয়া উঠিয়াছিল মেদিনীপুর জেলার চেতুয়া দাসপুর এলাকায়। ঊনবিংশ শতকে দাসপুর এলাকার মহবৎপুর, বোলিয়াঘাটা প্রভৃতি গ্রামে মনোহরসাহী গানের খুব চর্চা হইত। এখনও কিছুটা আছে।

ঊনবিংশ শতক ও বিংশ শতকের প্রথম ভাগে মনোহরসাহী ঢঙের অনেক বড় বড় কীর্তনীয়ার আবির্ভাব হইয়াছে। কয়েকজনের নাম করিতেছি ঃ ময়নাডালের (বীরভূম) মিত্র ঠাকুর বংশের রসিকানন্দ, বৈকুণ্ঠ, সুধাকৃষ্ণ, কিশোরী ও রাসবিহারী, পাঁচথুপীর (মুর্শিদাবাদ) কৃষ্ণহরি হাজরা ও কৃষ্ণদয়াল চন্দ, বিরহিমপুরের (বর্ধমান) যদুনন্দন দাস, দক্ষিণখণ্ডের (মুর্শিদাবাদ) রসিকদাস, মানিক্যহারের (মুর্শিদাবাদ) কৃষ্ণ সুন্দর ঠাকুর ও শচীনন্দনদাস, অদ্বৈতদাস (পণ্ডিত) বাবাজী (জন্ম পাবনা জেলা, বাংলাদেশ), কীর্তিপুরের (মুর্শিদাবাদ) ত্রিভঙ্গদাস (পরে বীরভূমের একচক্রাবাসী), ডোংরা-বরাই (বীরভূম) গ্রামের অবধূত বন্দ্যোপাধ্যায় (পরে মুর্শিদাবাদের শক্তিপুর নিবাসী), কাঁদীর (মুর্শিদাবাদ) দামোদর কুণ্ডু, ইলমবাজারের (বীরভূম) মনোহর চক্রবর্তী, তাঁতিপাড়ার (বীরভূম) নিতাইদাস, মানকরের (বর্ধমান) নন্দদাস, নিরোলের (বর্ধমান) রামানন্দ ও হৃষিকেশ এবং শ্রীখণ্ডের গৌরগুণানন্দ ঠাকুর। রসিকদাস, অবধূত বন্দ্যোপাধ্যায় ও গৌরগুণানন্দ ঠাকুরের মতো কয়েকজন গায়ক মনোহরসাহী ঢঙের স্বতন্ত্র গায়কী প্রবর্তন করেন। বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের ধারা বজায় রাখিয়াছেন তাঁহার শিষ্য দোপুখুরিয়ার (মুর্শিদাবাদ) নন্দকিশোর দাস ও পঞ্চানন দাস।

বিভিন্ন উৎসব অনুষ্ঠানে মনোহরসাহী কীর্তনের খুব ঘটা হইত। উৎসব উপলক্ষে বিভিন্ন শ্রীপাট, মন্দির, আখড়া বা জমিদারদের ঠাকুরবাড়ীতে কীর্তনের আসর বসিত। এখনও কয়েক জায়গায় বসে। নবদ্বীপে মাঘী পূর্ণিমায় ও ফাল্গুনী পূর্ণিমায় চৈতন্যদেবের জন্মতিথি উৎসব, শ্রীখণ্ডে (বড়ডাঙ্গা) নরহরি

সরকার ঠাকুরের তিরোভাব তিথি উপলক্ষে গৌরনরহরি মিলন মহোৎসব, কাঁদরার সাঁজা উৎসব, বিরাহিমপুরে (বর্ধমান) নবরাত্র উৎসব, ঝামটপুরে (বর্ধমান) কৃষ্ণদাস কবিরাজের স্মরণ মহোৎসব, কেঁদুলিতে (বীরভূম) জয়দেবের তিরোভাব উৎসব ও রামকেলিতে (মালদা জেলা) রূপসনাতনের স্মৃতিপূজা উৎসবের কীর্তন সমারোহ সুপ্রসিদ্ধ। শান্তিপুর (নদীয়া), কালনা, কাটোয়া (উভয়ই বর্ধমানে) ও মঙ্গলডিহিতেও (বীরভূম) পর্ব উপলক্ষে বড় বড় কীর্তনের আসর বসিত। রামকেলি ও শান্তিপুর ছাড়া সবগুলি জায়গাই মনোহরসাহী ঢঙের নিজস্ব অঞ্চলের মধ্যে পড়ে। দেশবিখ্যাত কীর্তনীয়ারা এই সব উৎসবে গান করিতে আসিতেন। বড় বড় কীর্তনীয়রা নিজেদের গায়ন কৌশল ও রসজ্ঞতার পরিচয় দিতেন। তাঁহাদের মধ্যে প্রতিযোগিতাও চলিত। এই সব উৎসবে লীলাকীর্তনের আসর উঠিত গায়কদের পরীক্ষাক্ষেত্র বিশেষ। খ্যাতনামা কীর্তনীয়াদের সামনে কীর্তন গাহিয়া তাঁহাদের খুশি করিতে পারিলে তবেই গায়ক বলিয়া স্বীকৃতি পাওয়া যাইত। এখনও শ্রীখণ্ড-বড়ডাঙ্গা, নবদ্বীপ, কেঁদুলি ও ঝামটপুরের উৎসবে গেলে এই সব ঘটনা দেখা যায়। ঝামটপুর উৎসবের আরও একটা বৈশিষ্ট্য আছে। এই উৎসব কীর্তনীয়াদের হালখাতা করার মতো ব্যাপার। সব কীর্তনীয়ারাই এখানে বছরের সাঁত করিতে আসেন। এই উৎসবে কাহাকেও ডাকিয়া বা বায়না করিয়া আনা হয় না। কীর্তনীয়ারা সকলেই নিজের গরজে আসেন এবং দলসহ নিজের খরচে থাকিয়া গান করিয়া যান।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ

কীর্তনীয়াদের পরিচয়

চৈতন্যদেবের ধারায় আদি কীর্তনীয়া চৈতন্যদেব স্বয়ং। তিনি ছিলেন কাব্য ও সঙ্গীতপ্রিয় এবং নৃত্য ও গীতকুশলী। নৃত্য গীত বাদ্য তিন মিলিয়া নামকীর্তন। ইহার উপরে লীলাকীর্তনে আছে কাব্য ও অভিনয়। কীর্তনগান ভক্তিধর্মের প্রাণ-প্রবাহ স্বরূপ। চৈতন্য পরিকরদের মধ্যে অনেক গায়ক, বাদক নর্তক ও কবি ছিলেন। সর্বপ্রধান চৈতন্যপরিকর দুইজন অদ্বৈত আচার্য ও নিত্যানন্দ। দুইজনেই নাচ ও গানে পারঙ্গম। তবে গায়ক হিসাবে প্রথমেই নাম করিতে হয় নবদ্বীপ-পর্বের মুকুন্দ দত্ত ও নীলাচলপর্বের স্বরূপ দামোদর। তাহার পর তিনভাই গোবিন্দ ঘোষ, মাধবানন্দ ঘোষ ও বাসুদেব ঘোষ। মুকুন্দ দত্ত নবদ্বীপের চৈতন্যপূর্ব বৈষ্ণবগোষ্ঠীর গায়ক। তিনি খুব বড় গায়েন ও নিষ্ঠাবান বৈষ্ণব। চৈতন্যগোষ্ঠীর সকলেই তাঁহার গানে মুগ্ধ হইত, 'মুকুন্দের গানে দ্রব সকল মহান্ত' (চৈ.ভা. ১।৭)। চৈতন্যদেবের ভাব মুকুন্দ ঠিক বুঝিতে পারিতেন এবং সেই মত গান করিতেন। 'প্রভুর অন্তর মুকুন্দ জানে ভাল মতে' (চৈ.চৈ. ২।৩)। স্বরূপ দামোদরও কম নন। তিনি 'প্রভুর অত্যন্ত মর্ম রসের সাগর' (চৈ.চ. ২।১০)। স্বরূপ দামোদর ও রায় রামানন্দর সঙ্গে মিলিয়া চৈতন্যদেব একান্তে জয়দেব, বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাসের পদাবলী গান করিতেন। আলাদা করিয়া পদাবলী গানে যেমন, সম্মেলক সংকীর্তনেও তেমনি মুকুন্দ দত্ত ও স্বরূপ দামোদর ছিলেন স্বচ্ছন্দাচারী। গোবিন্দ ঘোষ, মাধব ঘোষ ও বাসু ঘোষও চৈতন্যদেবের অতি প্রিয় গায়েন।

গোবিন্দ মাধব আর বাসুদেব ঘোষ।
তিন ভাইর কীর্ত্তনে প্রভু পায়েন সন্তোষ ॥ (চৈ.চ. ২।১১)

চৈতন্যদেবের অন্য পার্ষদদের মধ্যে গায়ক হিসাবে নাম ছিল শ্রীবাস ও তাঁহার ছোটভাই শ্রীরাম পণ্ডিত, গোবিন্দ দত্ত ও তাঁহার ছোটভাই বাসুদেব দত্ত এবং ছোট হরিদাসের। নীলাচলের রথাগ্রে কীর্তনে চৈতন্যদেবের নিজস্ব চার দলের মূল গায়েন ছিলেন মুকুন্দ দত্ত, স্বরূপ দামোদর, শ্রীবাস ও গোবিন্দ ঘোষ। শ্রীবাসের ভাই শ্রীরাম পণ্ডিত খুব ভাল গায়ক ছিলেন। তাঁহার গানে চৈতন্যদেব মুগ্ধ হইতেন। (চৈতন্যচরিতামৃতম্ ১৪।২৬)। চৈতন্যদেব বাসুদেব দত্তর গানেরও সমাদর করিতেন (চৈ.চ. ২।১৪)। ইহা ছাড়া ভাল কীর্তন করিতেন হরিদাস ঠাকুর, রাঘব পণ্ডিত, গোবিন্দানন্দ, জগদীশ পণ্ডিত, দামোদর পণ্ডিত, গোপীনাথ আচার্য, মুরারি গুপ্ত, বিষ্ণুদাস, শ্রীকান্ত সেন, শুভানন্দ ও গঙ্গাদাস। নাচে পটু ছিলেন জগদীশ পণ্ডিত বক্রেশ্বর পণ্ডিত, অদ্বৈত আচার্যর দুই ছেলে অচ্যুতানন্দ ও গোপাল, নরহরি সরকার ও তাঁহার ভাইপো রঘুনন্দন। 'গৌরগণোদ্দেশদীপিকায়' জগদীশ পণ্ডিতকে বলা হইয়াছে 'নৃত্যবিনোদী' (শ্লোক ১৪৩)।

নিত্যানন্দ নাচিয়া গাহিয়া প্রচার করিতেন। তাঁহার দলে বেশ কয়েকজন গায়েন ও বায়েন যোগ দিয়াছিলেন। সভ্রাত গোবিন্দ ঘোষ ছাড়া ছিলেন মীনকেতন রামদাস ও রাঘব পণ্ডিত। ঘোষরা তিনভাই গান ধরিলে নিত্যানন্দ সেই সঙ্গে নাচিতেন।

মাধব গোবিন্দ বাসুদেব তিনভাই।
গাইতে লাগিলা নাচে ঈশ্বর নিতাই ॥ (চৈ.ভা. ৩।৫)

তিন জনের মধ্যে মেজভাই মাধবের যশ ছিল সবচেয়ে বেশী। নিত্যানন্দ ছিলেন তাঁহার পরম অনুরাগী। বৃন্দাবনদাস মাধবের প্রশংসা করিয়া বলিতেছেন

সুকৃতি মাধব ঘোষ কীর্ত্তনে তৎপর।
হেন কীর্ত্তনীয়া নাহি পৃথিবী ভিতর ॥
যাঁহারে কহেন বৃন্দাবনের গায়েন।
নিত্যানন্দস্বরূপের মহাপ্রিয়তম ॥ (তদেব)

নিত্যানন্দর প্রচার পর্যটনের সময় এঁড়েদহে গদাধরদাসের বাড়ীতে মাধব ঘোষ দানখণ্ড কীর্তন করিয়াছিলেন। সে গান হইয়াছিল অপূর্ব।

ভাগ্যবন্ত মাধবের হেন দিব্যধ্বনি।
শুনিতে আবিষ্ট হয় অবধূতমণি ॥ (তদেব)

নিত্যানন্দর তিরোধানের পরও কীর্তনে তাঁহার গোষ্ঠীর খ্যাতি কিছুটা বজায় ছিল। খড়দহে নিত্যানন্দ গোষ্ঠীর সদরে ছিলেন গায়ক মীনকেতন রামদাস আর নৃত্যকুশল নৃসিংহ চৈতন্য। নিত্যানন্দর পুত্র বীরভদ্র নাচ গানে পারদর্শী ছিলেন।

শ্রীখণ্ডের মুকুন্দ এবং তাঁহার ভাই নরহরি ও ছেলে রঘুনন্দন তিনজনেই চৈতন্য-পরিকর। এই তিনজন এবং ইঁহাদের উত্তরাধিকারীরা নৃত্যগীতবাদ্যকুশল ছিলেন। নরহরি ও রঘুনন্দনের কথা আগে বলিয়াছি। কীর্তনকুশলতার জন্য রঘুনন্দন ছিলেন সম্মানিত ব্যক্তি। খেতুরী মহোৎসবে নরোত্তমদাস নিবদ্ধগীত শুরু করিবার উপক্রম করিলে রঘুনন্দন খোল ও করতালে মালা ও চন্দন স্পর্শ করাইয়া নরোত্তম ও তাঁহার চার সহযোগীকে মাল্যচন্দনে ভূষিত করেন। নীলাচলে চৈতন্যদেব স্বয়ং এইভাবে কীর্তনীয়াদের বরণ করিতেন। খেতুরী মহোৎসবের পর জাহ্নবা দেবী বৃন্দাবন ঘুরিয়া খড়দহ ফিরিবার পথে শ্রীখণ্ডে আসিলে রঘুনন্দন তাঁহার প্রীতির জন্য ভুবনমঙ্গল কীর্তন করিয়া সমবেত বৈষ্ণবদের মুগ্ধ করিয়াছিলেন। 'যৈছে গীতবাদ্য তৈছে করয়ে নর্ত্তন'। নিরূপম গীতবাদ্য নৃত্যে শ্রোতারা আত্ম-বিস্মৃত হইয়া গিয়াছিলেন (ন. বি. ৯ বিলাস)। রঘুনন্দনের পর শ্রীখণ্ডের ঠাকুর বংশের ধারায় উল্লেখযোগ্য তাঁহার পুত্র কানাই ঠাকুর ও কানাইয়ের ছেলে মদন ঠাকুর। 'ভক্তিরত্নাকর' গ্রন্থে (১৩।১৮৯) আছে শ্রীখণ্ডে রঘুনন্দনের স্মরণ মহোৎসবে 'তেঁহো (কানাই) সঙ্কীর্ত্তনে কৈলা অদ্ভুত নর্ত্তন'। শ্রীখণ্ডের ঠাকুরবংশ পুরুষানুক্রমিক কীর্তন চর্চার জন্য বিখ্যাত। তাঁহাদের ঘরাণা স্বতন্ত্র।

গোস্বামীশাস্ত্র শিখাইয়া যে তিনজনকে জীব গোস্বামী প্রচারের জন্য বাঙ্গলায় ফেরৎ পাঠাইয়াছিলেন তাঁহাদের মধ্যে নরোত্তমের কথা সবিস্তারে বলা হইয়াছে। শ্রীনিবাস আচার্য ভক্তিশাস্ত্র পড়াইতেন। কীর্তনে তাঁহার নাম খুব পাওয়া যায় না। খেতুরী মহোৎসবে তিনি নাচিয়াছিলেন বলিয়া জানা যায়। তবে নাচে বোধ হয় তাঁহার খুব একটা পটুতা ছিল না। গানের সঙ্গে খানিকটা নাচিবার পর শ্রীনিবাস 'নাচিতে না পারে হইল বাউলের পারা' (প্র.বি. ১৪ বিলাস)। সঙ্কীর্তনে খুব বড় ছিলেন শ্যামানন্দ। সঙ্কীর্তন দ্বারা সাধারণ্যে প্রেমভক্তি প্রচারে তাঁহার উৎসাহ ছিল নিত্যানন্দর তুল্য। দলবলসহ শ্যামানন্দ কীর্তন ঘুরিয়া বেড়াইতেন। নিত্যানন্দ প্রচার করিয়াছিলেন ভাগীরথী অঞ্চলে। শ্যামানন্দর প্রচারক্ষেত্র বাঙ্গলা, বিহার ও ওড়িশার সংযোগস্থলে মেদিনীপুর সিংভূম, বালেশ্বর ও ময়ূরভঞ্জ জেলায়। সুবর্ণরেখাবিধৌত অঞ্চল ইহার কেন্দ্রস্থল। সুবর্ণরেখা নদীর তীরে রোহিনী, গোবিন্দপুর, গোপীবল্লভপুর, থুরিয়া, নৃসিংহপুর (মেদিনীপুর) রাধাকৃষ্ণপুর, শ্যামসুন্দরপুর, মানগোবিন্দপুর, জয়দা ও ঘাটশিলায় (সিংভূম, বিহার) এবং সুবর্ণরেখা ছাড়িয়া ভিতরে ধারেন্দা বাহাদুরপুর, বলরামপুর (মেদিনীপুর) প্রভৃতি গ্রামে শ্যামানন্দ ভক্তিধর্মের ঘাঁটি স্থাপন করিয়াছিলেন। নিত্যানন্দর মত তিনিও মহাসমারোহে নাচিয়া গাহিয়া নাম:সংকীর্তন করিয়া স্থান হইতে স্থানান্তরে ঘুরিয়া

বেড়াইতেন এবং মাঝে মাঝে এক এক জায়গায় মহোৎসব করিতেন। কৃষ্ণদাস বিরচিত 'শ্যামানন্দপ্রকাশ,' 'প্রেমবিলাস' (১৯ বিলাস) ও 'ভক্তিরত্নাকর' (১৫ তরঙ্গ) গ্রন্থে শ্যামানন্দর কীর্তন ও মহোৎসব করিয়া প্রচারের বিবরণ আছে।

শ্রীশ্যামানন্দ গোঁসাই যেই পথে যায়
প্রেমে মত্ত হঞা লোক হরি বলি ধায় ॥ (শ্যা.প্র. ৫-৫)
নাম সঙ্কীর্ত্তন করে মহামত্ত রঙ্গে।
হরি হরি বলে সবে প্রেমের তরঙ্গে ॥
গ্রামের সব লোক শুনি উৎকণ্ঠে ধাইল।
কিবা মহাপ্রভু আসি পুন জাত হৈল ॥ (শ্যা.প্র.:১৪।৫-৬)

শ্যামানন্দর প্রধান শিষ্য রসিকমুরারি বা রসিকানন্দ। ইনিও গুরুর মতই সংকীর্তনপ্রৌঢ়।

শ্রীরসিকানন্দ সদা মত্ত সঙ্কীর্ত্তনে।
কেবা না বিহ্বল হয় তাঁর গুণগানে ॥ (ভ.র. ১৫।৮৬)

চৈতন্যপন্থী সকল গোষ্ঠীতেই গান বাজনা ও নাচের চলন ছিল। থাকিবারই কথা। খেতুরী মহোৎসবে সশিষ্য নরোত্তম ছাড়া আরও অনেকে গান করিয়াছিলেন।

নানা দেশী গায়ক গায়েন নানা গীত।
নদীয়া বিহার যাতে ব্রহ্মাদি মোহিত ॥
চতুর্দিকে নানা বাদ্য বায়েন বাদক।
নানা দেশ রীতে নাচে যতেক নর্তক ॥
কহিতে কি জানি সুখ সিন্ধু উথলয়ে।
যে জানে যে বিদ্যা তা কৌতুকে প্রকাশয়ে ॥
(ভ.র. ১০।৬৭১-৭৩)

খেতুরী উৎসবের বর্ণনায় নরোত্তমদাসের দল ছাড়া কীর্তনিয়া ষষ্ঠীবর ও নর্তক গোপালের নাম জানা যাইতেছে। 'প্রেমবিলাসের' (১৯ বিলাস) সাক্ষ্যে জানা যায় যে নিত্যানন্দর জামাই মাধব আচার্য নামী বাদক ছিলেন। পত্নী গঙ্গাকে তিনি বাজনা শিখাইয়াছিলেন। 'প্রেমবিলাস'-রচয়িতা নিত্যানন্দদাসও মাধব আচার্যের কাছে বাজনা শিখিয়াছিলেন (তদেব)।

খেতুরী মহোৎসবের পর হইতে নরোত্তমদাসের প্রেরণায় রীতিমত প্রণালীবদ্ধ কীর্তনচর্চা শুরু হয়। প্রথমে নরোত্তমের সঙ্গে ছিলেন গায়ক হিসাবে গোকুলদাস এবং বাদক হিসাবে দেবীদাস, বল্লভদাস ও গৌরাঙ্গদাস। খেতুরী মহোৎসবের

অল্প কিছুদিনের মধ্যে বড় ধরণের মহোৎসর হয় শ্রীখণ্ড ও বোরাকুলিতে। বোরাকুলি মহোৎসবে সশিষ্য নরোত্তমদাস কীর্তন করিয়াছিলেন। তাঁহার সঙ্গে ছিলেন গায়ক গোকুলদাস আর মৃদঙ্গ বাদক দেবীদাস ও শ্যামদাস। এই উৎসবে নর্তক ছিলেন নয়নানন্দ মিশ্র, রামাই ঠাকুর ও বীরভদ্র। উৎসবের উদ্যোক্তা গোবিন্দ চক্রবর্তী ছিলেন গীত ও বাদ্যনিপুণ (ভ.র. ১৪।৫১, ১২১-৩৩)।

'প্রেমবিলাস' অনুসারে বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা উপলক্ষে মহোৎসবের পর খেতুরীতে প্রতিবৎসর ফাল্গুনী পূর্ণিমায় মহোৎসব হইত। দ্বিতীয় বারের মহোৎসবেও অনেক মহান্ত আসিয়াছিলেন এবং কীর্তনের সমারোহ হয়। এবার নরোত্তমদাসের সঙ্গে মৃদঙ্গ বাজাইয়াছিলেন দেবীদাস ও মাধব আচার্য। করতালবাদক ছিলেন গৌরাঙ্গ দাস ও গোবিন্দদাস (ইনিই সম্ভবতঃ খ্যাতনামা পদকর্তা গোবিন্দদাস কবিরাজ, খেতুরীতে ইঁহার খুব যাতায়াত ছিল)। গান করিয়াছিলেন গোকুলদাস, গোবিন্দদাস এবং নরোত্তমের খুড়তুত ভাই, শিষ্য ও পোষ্য সন্তোষ দত্ত। অচ্যুতানন্দ, বীরভদ্র, শ্রীনিবাস, শ্যামানন্দ, নরোত্তম এবং রামচন্দ্রদাস নাচ ও গান করিয়াছিলেন।

সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতকে উচ্চাঙ্গ কীর্তনের খুব প্রসার হইয়াছিল। গরাণহাটি ঢঙের পর মনোহরসাহী, মন্দারিণী রেণেটি ও ঝড়খণ্ডী ঢঙের উদ্ভব ও বিকাশ ইহার প্রমাণ। তবে এই দুই শতকের বিখ্যাত কীর্তনীয়াদের কথা অল্পই জানা যায়। মনোহরসাহীর জন্মসূত্রে শোনা যায় কাঁদরার মঙ্গল ঠাকুরের নাম। মনোহরদাস আউলিয়ার নামও মনোহরসাহী ঢঙ উদ্ভাবনের সঙ্গে যুক্ত। মঙ্গল ঠাকুরের শিষ্য নৃসিংহ মিত্র সপ্তদশ শতকের মাঝামাঝি সময়ে ময়নাডালের কীর্তনীয়া বংশ প্রতিষ্ঠা করেন। শ্রীখণ্ডের ঠাকুর বংশের মতো ময়নাডালের মিত্র ঠাকুর বংশে গীত ও বাদ্যচর্চার ইতিহাস নিরবচ্ছিন্ন এবং গৌরবময়। ঝাড়খণ্ডী ঢঙের প্রবর্তক গোকুলানন্দ সপ্তদশ শতকের অন্যতম বিখ্যাত কীর্তনীয়া। সপ্তদশ শতকের আর একজন বিখ্যাত গায়ক শ্রীনিবাস আচার্যর পুত্র গতিগোবিন্দ ঠাকুর। অষ্টাদশ শতকের বড় কীর্তনীয়া হিসাবে রেণেটি ঢঙের উদ্ভাবক বিপ্রদাস ঘোষ এবং এই ঢঙের গায়ক বৈষ্ণবদাস ও উদ্ভবদাসের নাম করিতে হয়। 'পদামৃতসমুদ্রের' সঙ্কলক রাধামোহন ঠাকুর ও 'পদকল্পতরু'র সঙ্কলক বৈষ্ণবদাসও এই সময়ের নামকরা কীর্তনীয়া। ঢপ কীর্তনের প্রবর্তক রূপচাঁদ চাটুয্যেও অষ্টাদশ শতকের অন্যতম বিখ্যাত গায়ক।

অষ্টাদশ শতকের শেষ দিক হইতে সম্প্রতিকাল পর্যন্ত যে সব খ্যাতনামা কীর্তনীয়ার আবির্ভাব হইয়াছিল তাঁহাদের বেশ কয়েকজনের পরিচয় ও কীর্তির

বিবরণ সাহিত্যরত্ন হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় বাঙলার 'কীর্তন ও কীর্তনীয়া' গ্রন্থে প্রকাশ করিয়াছেন। বেশ কয়েকজন গায়ক ও বাদকের জাতি ও অন্যান্য সামাজিক পরিচয়ও সাহিত্যরত্ন মহাশয়ের লেখায় পাওয়া যায়। ষোড়শ হইতে অষ্টাদশ শতকের যতজন কীর্তনীয়ার নাম পাওয়া গিয়াছে তাঁহাদের বেশ কয়েকজনের সামাজিক পরিচয়ও জানা যায়। প্রায় সকলেই উচ্চজাতির লোক। সভ্রাত শ্রীবাস পণ্ডিত, জগদীশ পণ্ডিত, দামোদর পণ্ডিত, সপুত্র অদ্বৈত আচার্য, বক্রেশ্বর পণ্ডিত, শ্রীনিবাস আচার্য এবং মঙ্গল ঠাকুর জাতিতে ব্রাহ্মণ। নিত্যানন্দ, স্বরূপ দামোদর ও ছোট হরিদাস সন্ন্যাসী। সংসারশ্রমে তাঁহারা ব্রাহ্মণ ছিলেন। সন্ন্যাস ছাড়িবার পর নিত্যানন্দ ব্রাহ্মণ সমাজে গৃহীত হন। নিত্যানন্দর জামাই মাধব আচার্য, গোবিন্দ চক্রবর্তী ও নয়নানন্দ মিশ্র ব্রাহ্মণ। মুরারি গুপ্ত, সভ্রাত মুকুন্দ দত্ত, শ্রীখণ্ডের ঠাকুর বংশ ও গোবিন্দদাস কবিরাজ জাতিতে বৈদ্য। সভ্রাত গোবিন্দ ঘোষ, রামানন্দ বসু, নরোত্তমদাস ও ময়নাডালের মিত্র ঠাকুর বংশ কায়স্থ জাতিভুক্ত। রসিকানন্দ ছিলেন জাতিতে করণ। করণ জাতি কায়স্থর সমতুল্য। শ্যামানন্দ জাতিতে গোপ তবে সৎকুলপ্রসূত। বাঙ্গালায় ব্রাহ্মণ, বৈদ্য ও কায়স্থ উচ্চজাতি বলিয়া পরিচিত। এক শ্যামানন্দই ইহার বাহিরে।

অষ্টাদশ শতকের শেষ দিক হইতে যে সব তথ্য পাওয়া যাইতেছে তাহাতে বোঝা যায় অবস্থাটা বেশ বদলাইয়া গিয়াছে। ব্রাহ্মণ, বৈদ্য ও কায়স্থ জাতির কীর্তনীয়া ঢের আছেন ঠিকই, কিন্তু নবশাখ, জলাব্যবহার্য এমন কি অন্ত্যজ জাতির গায়ক ও বাদকরাও কীর্তনের ক্ষেত্রে বেশ প্রতিষ্ঠাপন্ন। এই রকম কয়েকজন কীর্তনীয়া ও বাদকের পরিচয় দিতেছি। পাঁচথুপীর (মুর্শিদাবাদ) কৃষ্ণদয়াল চন্দ ছিলেন জাতিতে সুবর্ণবণিক। মেরালা কোণ্ডারপুরের (বীরভূম) হারাধন সূত্রধর ও কান্দারকূলোর (বীরভূম) অখিল দাস জাতিতে ছুতার। কয়শ (বীরভূম) নিবাসী বিখ্যাত বাদক কোপা হরিদাসও ছুতার জাতির লোক। রামনগর-স্যাওড়া গ্রামের (বীরভূম) বহুবল্লভ সাধুর জন্ম গন্ধবণিক জাতিতে। পরে তিনি ভেকাশ্রয় করিয়া কান্দারকূলোয় বাস করেন। হাসনপুরের (মুর্শিদাবাদ) ফটিক চৌধুরী ছিলেন জাতিতে মাহিষ্য। কাঁদীর দামোদর কুণ্ডু তিলি জাতিভুক্ত। গঙ্গাধর নাপিতের জাতি তাঁহার নামেই বোঝা যাইতেছে। সিজগ্রামের (বীরভূম) প্রেমদাস, লাখুরিয়ার (বীরভূম) রাধারমণদাস ছিলেন জাতি বৈষ্ণব। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রিয় কীর্তনীয়া জানিপুরের (কুষ্ঠিয়া, বাংলাদেশ) শিবনাথ সাহা শুঁড়ি জাতির লোক। বীরভূম জেলার ইলমবাজার ও তাহার লাগোয়া পয়ের গ্রামের মুচিদের মধ্যে অনেক বিখ্যাত মৃদঙ্গ বাদকের আবির্ভাব হইয়াছিল। পায়েরের জটে কুঞ্জ ও

ইলমবাজারের নিকুঞ্জ বাইতি, বৈষ্ণব বাইতি, রামশরণ বাইতি ও উমেশ বাইতির নাম স্মরণীয়। কাঁদীর প্রসিদ্ধ বাদক গোষ্ঠ দাসও জাতিতে ছিলেন মুচি।

কীর্তনগান ও মৃদঙ্গ শিক্ষার ব্যাপারে জাতিভেদের বাধা ছিল না। এমন কি প্রতিলোম গুরুকরণের দৃষ্টান্তও যথেষ্ট। ইলমবাজারের কেশব চক্রবর্তী খুব নামকরা ব্রাহ্মণ কীর্তনীয়া বংশের সন্তান। তিনি কীর্তন শিক্ষা করেন নিকুঞ্জ বাইতির কাছে। নিকুঞ্জ বাইতি জাতিতে মুচি। সুবর্ণবণিক জাতিভুক্ত কৃষ্ণদয়াল চন্দ্রর বেশ কয়েকজন ব্রাহ্মণ শিষ্য ছিল। বিখ্যাত কীর্তনীয়া অদ্বৈতদাস বাবাজীর জন্ম হয় কায়স্থ জাতিতে। তাঁহার গুরু ছিলেন কৃষ্ণদয়াল চন্দ্র ও তিলি জাতির দামোদর কুণ্ডু। ডোংরা-বরাই গ্রামের (বীরভূম) অবধূত বন্দ্যোপাধ্যায় শ্রেষ্ঠ কীর্তনীয়া বলিয়া খ্যাত। তাঁহার দুই গুরু বহুবল্লভদাস ও দক্ষিণখণ্ডের (মুর্শিদাবাদ) রসিকদাস জাতি বৈষ্ণব। মুচি জাতির জটে কুঞ্জ বিখ্যাত বাদক ঠিবা (বীরভূম) নিবাসী অবধূত বন্দ্যোপাধ্যায়কে বাজনা শিখাইয়াছিলেন। বড়ঞার (মুর্শিদাবাদ) যশস্বী গায়ক সুরেন্দ্রনাথ আচার্য গ্রহাচার্য ব্রাহ্মণ। তাঁহার গুরু ছিলেন জাতি বৈষ্ণব কীর্তনাচার্য বিশ্বম্ভর মহান্ত। মাহিষ্যসন্তান ফটিক চৌধুরী গান শিখিয়াছিলেন কুঁকড়াজোল (মুর্শিদাবাদ) নিবাসী ব্রাহ্মণ সঙ্গীতগুরু জীবনকৃষ্ণ চাটুয্যে ও ময়নাডালের (বীরভূম) সুধাকৃষ্ণ মিত্র ঠাকুরের কাছে। মানিক্যহার গ্রামের (মুর্শিদাবাদ) শাস্ত্রজ্ঞ ও সঙ্গীতবিশারদ ব্রাহ্মণ কৃষ্ণসুন্দর ঠাকুর শিষ্য করিয়াছিলেন স্বগ্রামের জাতি বৈষ্ণব সন্তান শচীনন্দন দাসকে।

সঙ্গীতে পারদর্শিতার সঙ্গে শাস্ত্রজ্ঞান না থাকিলে ভাল কীর্তনীয়া হওয়া যায় না। ঠিকমত কীর্তন গাহিতে হইলে ভক্তিশাস্ত্রে ও রসশাস্ত্রে পারঙ্গম হইতে হয়। বড় বড় কীর্তনীয়াদের শাস্ত্রজ্ঞানেও খ্যাতি চিল। কৃষ্ণসুন্দর ঠাকুর ও অবধূত বন্দ্যোপাধ্যায়ের (গায়ক) নাম এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। ব্রাহ্মণ বলিয়া শাস্ত্রচর্চায় ইহাদের অধিকার স্বাভাবিক। শাস্ত্র সংস্কৃত ভাষায় লেখা। বাংলায় বৈদ্য ছাড়া অন্য কোন অব্রাহ্মণ জাতির সংস্কৃত পড়ার অধিকার ছিল না। কীর্তনীয়াদের বেলায় ইহার ব্যতিক্রম দেখা যাইতেছে। বৈদ্যদের চেয়ে নিম্নতর জাতির কীর্তনীয়ারাও ভক্তিশাস্ত্র ও রসশাস্ত্রচর্চা করিতেন। সুবর্ণবণিক জাতির কীর্তনীয়া কৃষ্ণদয়াল চন্দ্র নামকরা শাস্ত্রবিদ ছিলেন। তাঁহার পাণ্ডিত্যের খ্যাতি বহুব্যপ্ত হইয়াছিল। পায়েরনিবাসী কীর্তনীয়া অক্ষয়দাস ছিলেন জাতি বৈষ্ণব। তিনি শাস্ত্রাধ্যয়ন করিয়াছিলেন ঘুরিসার পণ্ডিত রামব্রহ্ম ন্যায়তীর্থের কাছে। ন্যায়তীর্থ মহাশয় ভক্তিশাস্ত্র, বিশেষতঃ ভাগবতপুরাণে, সুপণ্ডিত ছিলেন। খেসর মারগ্রাম নিবাসী কীর্তনীয়া রাধিকা সরকারের পণ্ডিত বলিয়া যশ ছিল।

বাংলার বিভিন্ন স্থানে, বিশেষতঃ রাঢ় অঞ্চলের মধ্যে, অনেক পরিবারে পুরুষানুক্রমে কীর্তনচর্চা হইত। শ্রীখণ্ডের ঠাকুর ও ময়নাডালের মিত্র ঠাকুরদের বংশগত প্রতিভা ও নিষ্ঠা সুবিদিত। এই দুই বংশের সাঙ্গীতিক খ্যাতি বর্তমান শতকের প্রথম ভাগেও শোনা যাইত। শ্রীখণ্ডের গৌরগুণানন্দ ঠাকুর এবং ময়না-ডালের কিশোরী মিত্র ঠাকুর ও রাসবিহারী মিত্র ঠাকুর এই সময়ের যশস্বী গায়ক ও সঙ্গীতশাস্ত্রজ্ঞ। পায়ের গামের (বীরভূম) চক্রবর্তী বংশ (পরে ইলমবাজারবাসী) এবং শ্রীখণ্ডের ঠাকুরদের জ্ঞাতি দক্ষিণখণ্ডের (বর্ধমান) ঠাকুর বংশেও বেশ কয়েক পুরুষ ধরিয়া কীর্তনচর্চার খ্যাতি ছিল। চক্রবর্তী বংশের মনোহর ও কেশব খ্যাতিমান গায়ক ছিলেন। মুর্শিদাবাদ জেলার যজান ও দক্ষিণখণ্ডের (এই নামের দ্বিতীয় গ্রাম) দাসবংশে বেশ কয়েকজন খ্যাতনামা গায়ক ছিলেন। এই বংশের অনুরাগীদাস, তাঁহার দুই ছেলে রসিকদাস ও গৌরদাস, রসিকদাসের পুত্র রাধাশ্যাম-দাস ও দৌহিত্র যশোদানন্দনদাস কীর্তন গানে খুব নাম করিয়াছিলেন। চেতুয়া-দাসপুর এলাকায় মহবৎপুর গ্রামের মণ্ডলবংশে পুরুষানুক্রমিক কীর্তনচর্চার ধারা ছিল (ব্যোমকেশ চক্রবর্তী ঃ ১২)। বিখ্যাত কয়েকটা কীর্তনীয়া বংশের নাম করিলাম। অবিচ্ছিন্নচর্চা ও সঙ্গীতানুরাগের জন্য এই সব বংশের গানে উচ্চমানের ঐতিহ্য অনেকদিন বজায় ছিল।

সব কীর্তনীয়া বংশেই যে নিষ্ঠাভরে গানবাজনার চর্চা ছিল তাহা বলা যায় না। অনেক ক্ষেত্রে গানবাজনা পুরুষানুক্রমিক বৃত্তিতে পরিণত হইয়াছিল। হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় সাহিত্যরত্ন জীবনে অনেক কীর্তনীয়ার গান শুনিয়াছেন। গায়ক ও বাদকের পারিবারিক পরিচয় তিনি ভালই জানিতেন। পুরুষানুক্রমিক কীর্তনীয়াদের সম্বন্ধে সাহিত্যরত্ন মহাশয়ের মত জানিয়া রাখা দরকার।

> "যাহারা বংশপরম্পরা কীর্তন গাহিয়া আসিতেছিলেন তাঁহারা বাড়ীর ছেলেদের জীবিকার্জনের অবলম্বনস্বরূপ হয় কীর্তন, না হয় খোলের বাজনা শিক্ষা দিতেন। কেহ…ভালই শিখিত। কেহ বা অল্পস্বল্প শিখিয়া পূর্বপুরুষের গৌরবে তরিয়া যাইত।…ইহারা লেখাপড়া প্রায় শিখিত না কোন রকমে পদাবলীটা আবৃত্তি করিতে পারিলেই খুব শিক্ষা হইয়াছে মনে করিত। এমন কীর্তনীয়াও দেখিয়াছি, ভাল গায়ক অথচ সমস্ত পদের অর্থ ভালরূপে জানে না।" (হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় ১৯৭১ ঃ ২৪২)।

বুঝিতে অসুবিধা হয় না যে এইরূপ পেশাদারী কীর্তনীয়াদের হাতে কীর্তনগানের খুব ক্ষতি হইয়াছে। সম্প্রতি কিছু কিছু পেশাদারী গায়ক লীলাকীর্তন গানকে

যতদূর সম্ভব সহজ ও সংক্ষিপ্ত করিয়া তুলিবার চেষ্টা করিতেছেন। ইহার ফলেও কীর্তন গানের যথেষ্ট ক্ষতি হইতেছে। এই প্রসঙ্গে শ্রীখণ্ডের সীতানন্দ ঠাকুরের উক্তি প্রণিধানযোগ্য।

> আজকাল পাঠকের স্থান পরিগ্রহ করেছেন কিছু মূল গায়ক। গৌরচন্দ্রসহ ৫।৬ খানি পদ গান করে বাকীটা বক্তৃতা দ্বারা বুঝিয়ে গায়ক লীলাটি জনসমক্ষে উপস্থাপিত করেন। বড় তালের গান কদাচিৎ শোনা যায়। দোঁহার সঙ্গে এবং ঢপ কীর্তনের সঙ্গে ছোট আখর ও ছুটকী বাজনায় বাজীমাৎ করার (চেষ্টা) প্রায়শই চোখে পড়ে। প্রথম থেকেই নায়ক ও নায়িকার ওপর ঈশ্বরত্ব আরোপ করে এবং নানা বিপরীত রসের অবতারণা করে শ্রোতার বাহবা আহরণের প্রচেষ্টাই বেশী (সীতানন্দ ঠাকুর ১৯৭৭ ঃ ৪৭-৪৮)।

চতুর্দশ পরিচ্ছেদ

কীর্তন ও গ্রামীণ কৃষ্টি

সংস্কৃতিমনস্কতা গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মের মহৎ গুণ। কাব্য, গীত বাদ্য ও নৃত্যচর্চা গৌড়ীয় বৈষ্ণব সাধনার অঙ্গ। বিদ্যাচর্চা ও তত্ত্বচিন্তা অধ্যাত্ম-অনুভাবের উপায়। গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের সংস্কৃতিনিষ্ঠা ও সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্যের দরুণ ষোড়শ-সপ্তদশ শতকে বাঙ্গালী সংস্কৃতির বহুমুখী ও অভিনব বিস্ফূরণ হইয়াছিল। বাঙ্গালীর প্রতিভায় যাহা কিছু ভালো এবং বড় তাহা গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মের প্রভাবে দীপ্তিমান হইয়া উঠিয়াছিল।

সাংস্কৃতিক স্ফূরণের সবচেয়ে বড় দৃষ্টান্ত বাঙ্গলা ভাষা ও সাহিত্যের অভূতপূর্ব সমৃদ্ধি। গৌড়ীয় বৈষ্ণব সাহিত্যের জোরে বাঙ্গলা ভাষা ও সাহিত্য একবারে শৈশব হইতে যৌবনে উপনীত হইয়াছিল। কাব্যের কথা আগেই বলিয়াছি। ষোড়শ সপ্তাদশ শতকের বৈষ্ণব পদাবলী প্রাক্ আধুনিক বাঙ্গলা সাহিত্যের চরম উৎকর্ষ। গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্ম তত্ত্বপরায়ণ। এই কারণে বাঙ্গলা ভাষায় তাত্ত্বিক রচনার আরম্ভ ও প্রসার হয়। তাত্ত্বিক রচনার শ্রেষ্ঠতম নিদর্শন কৃষ্ণদাস কবিরাজের 'চৈতন্য-চরিতামৃত।' কৃষ্ণদাস কবিরাজের হাতে বাঙ্গলা ভাষা গভীর ভাবপ্রকাশের উপযুক্ত হইয়া ওঠে। কৃষ্ণদাস কবিরাজের আগে অল্পস্বল্প, কিন্তু তাঁহার পরে বাঙ্গলা ভাষায় অনেক তত্ত্বগ্রন্থ লেখা হইয়াছে। কৃষ্ণদাসের মতো মননশীলতা বা ভাষার উপর দখল আর কাহারও ছিল না ঠিক, কিন্তু তাঁহার উত্তরাধিকার নিয়া তত্ত্বগ্রন্থ রচনা করিবার মত পারঙ্গম গ্রন্থকারের অভাব হয় নাই। 'চৈতন্যচরিতামৃতে'র ব্যাখ্যা হিসাবে লেখা মনোহরদাসের 'দিনমণিচন্দ্রোদয়' ও অকিঞ্চনদাসের 'বিবর্তবিলাস'

চমৎকার তত্ত্বমূলক রচনা। বৃন্দাবনদাসের ('চৈতন্যভাগবত'-কার নহেন, অন্যালোক) 'তত্ত্ববিলাস'ও উল্লেখযোগ্য তত্ত্বগ্রন্থ। ভাষার ব্যবহারে বৃন্দাবনদাসের বাহাদুরী আছে।

চৈতন্যদেবের জীবনকথা নিয়া রচিত কাব্যসমূহ হইতে বাঙ্গলা জীবনীসাহিত্যের শুরু। ষোড়শ, সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতকে বৈষ্ণব মহান্তদের অনেকগুলি জীবন-চরিত লেখা হইয়াছিল। বাঙ্গলাভাষায় ঐতিহাসিক নিবন্ধ পত্তন করিবার কৃতিত্বও গৌড়ীয় বৈষ্ণবদের প্রাপ্য। 'প্রেমবিলাস', 'অনুরাগাবল্লী' ও 'কর্ণানন্দ' বাঙ্গলায় আদি ঐতিহাসিক নিবন্ধ। এই গ্রন্থগুলিতে ভক্তি আন্দোলন ও গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের গোড়ার দিককার কাহিনী লিপিবদ্ধ আছে। বিস্তারিত ইতিহাস লিখিয়াছেন নরহরি চক্রবর্তী। তাঁহার লেখা 'ভক্তিরত্নাকর' অতি উপাদেয় ও সুবিন্যস্ত ঐতিহাসিক আখ্যায়িকা কাব্য।

গৌড়ীয় বৈষ্ণব তত্ত্বদর্শীরা শাস্ত্র প্রণয়ন করিয়া বাংলার স্বতন্ত্র শাস্ত্রচিন্তার পত্তন করেন। প্রথম দিকের তত্ত্বভাবক স্বরূপ দামোদর ও নরহরি সরকার ঠাকুর। স্বরূপ দামোদরের পঞ্চতত্ত্ব ও নরহরি সরকার ঠাকুরের 'শ্রীকৃষ্ণভজনামৃত' আধিবিদ্যা ভাবনামূলক। এই চিন্তা কবিকর্ণপূরেরও ছিল। পুরাপুরি শাস্ত্র রচনা করেন বৃন্দাবনের গোস্বামীরা—সনাতন, রূপ, গোপাল ভট্ট ও জীব। গৌরীয় বৈষ্ণব প্রেমভাবনা অর্থাৎ প্রেমই সাধ্য ও সাধন এই প্রপত্তি, বৈষ্ণব আধিবিদ্যার ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ নূতন পথনির্দেশ। বাঙ্গলার ভক্তি সাধনায় প্রেমভাবনার বীজীপুরুষ চৈতন্য-দেবের পরমগুরু মাধবেন্দ্র পুরী। তাঁহার প্রেমানুভবের বীজ হইতে গৌড়ীয় বৈষ্ণব শাস্ত্ররূপ মহীরুহের উদ্ভব। এই জন্যই জীব গোস্বামী বৈষ্ণব-বন্দনায় চৈতন্যপন্থীদের মাধব সম্প্রদায় বলিয়াছেন। প্রেমভাবনার দার্শনিক তত্ত্ব অচিন্ত্য-ভেদাভেদবাদ। ভারতীয় দর্শনচিন্তার ক্ষেত্রে এই মত অভিনব কেননা ইহাতে পরব্রহ্মের সঙ্গে জীবের যুগপৎ অভেদ ও ভেদ স্বীকার করিয়া অচিন্ত্যজ্ঞানগোচর ভেদাভেদ তত্ত্বের যুক্তিতে প্রেমকে পরমার্থরূপে স্থাপন করা হইয়াছে। প্রেমভাবনা হইতে গৌড়ীয় বৈষ্ণব রসশাস্ত্রের জন্ম। গৌড়ীয় বৈষ্ণব রসশাস্ত্র সংস্কৃত অলঙ্কার-শাস্ত্রের পরিভাষায় রচিত পরম অধ্যাত্ম প্রেমভক্তিরসের বিচার (একটু পরেই এই বিষয়ে কিছুটা আলোচনা করিয়াছি)। প্রেমভাবনায় অধ্যাত্ম উপলব্ধির নূতন দিক নির্দেশ করিয়া গৌড়ীয় বৈষ্ণব শাস্ত্রকারগণ বাঙ্গলার ভক্তি আন্দোলনের তাত্ত্বিক ভিত্তি গড়িয়া দিলেন। ইহার উপরেই গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্ম ও সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠা হয়।

ষোড়শ শতক হইতে ঊনবিংশ শতকের শেষ পর্যন্ত বাঙ্গলায় যত মন্দির তৈরী হইয়াছিল তাহার বেশীর ভাগ গৌড়ীয় বৈষ্ণব দেবালয়। ষোড়শ শতক ও সপ্তদশ

শতকের প্রথম দিকে মন্দিরের গঠনকৌশল ও আকার নিয়া পরীক্ষা-নিরীক্ষা হইয়াছে। ইহার ছড়ান ছিটান দৃষ্টান্ত অনেক জায়গাতেই আছে। কিন্তু মন্দির স্থাপত্য বিকাশের ধারা মল্লভূমের গৌড়ীয় বৈষ্ণব মন্দিরসমূহে যতটা স্পষ্টভাবে ধরা পড়ে অন্য সবগুলিকে একত্র করিলেও তাহা হইবে না। মল্ল রাজাদের বংশানুক্রমিক উৎসাহের দরুণ মল্লভূমের স্থপতিরা নানা প্রকার পরীক্ষা-নিরীক্ষা করিয়া সপ্তদশ শতকের শেষদিকে যে স্থাপত্যরূপ উদ্ভাবন করিয়াছিলেন বাঙ্গলায় আঞ্চলিক মন্দিরস্থাপত্যের বিচারে তাহাই উৎকর্ষের মানস্বরূপ।

মন্দিরের দেওয়াল সাজান হইত মাটির ভাস্কর্য দিয়া। শিব, ধর্ম বা বিভিন্ন শক্তি বিগ্রহের মন্দিরে ভাস্কর্যের অলঙ্কার দেখা যায় বটে, কিন্তু গৌড়ীয় বৈষ্ণব মন্দিরে গাত্রালঙ্কারের দৃষ্টান্ত অনেক বেশী। সপ্তদশ শতকের শেষ দিকে মৃৎভাস্কর্য পরিণত অবস্থায় উপনীত হয়। এই বিবর্তন প্রক্রিয়ার সাক্ষ্য পাওয়া যায় প্রধানতঃ গৌড়ীয় বৈষ্ণব মন্দিরে।

ভিত্তিচিত্র বাঙ্গলায় বেশী নাই। এদিক দিয়া প্রতিবেশী ওড়িশা বা অন্ধ্রপ্রদেশের তুলনায় বাঙ্গলার দৈন্য আছে। তবে পুঁথিতে মলাট দেওয়ার কাঠের পাটায় অনুচিত্র সজ্জার প্রচলন ছিল। পাটাচিত্রে বাঙ্গলার আঞ্চলিক চিত্রকলার বেশ সমৃদ্ধি হইয়াছিল। গৌড়ীয় বৈষ্ণবরা বিদ্যোৎসাহী সম্প্রদায়। লেখাপড়ার চলন গৌড়ীয় বৈষ্ণবদের মধ্যে বেশ ভালই ছিল। অনেকের ঘরেই পুঁথি থাকিত। রুচিবান ভক্তজন পুঁথির পাটায় ছবি আঁকাইয়া নিতেন। পুঁথির পাটায় ছবি আঁকান গৌড়ীয় বৈষ্ণবদের মধ্যে, বিশেষভাবে দক্ষিণ-পশ্চিম বাংলায়, রেওয়াজ হইয়া উঠিয়াছিল। পাটাচিত্রের ব্যাপারে দক্ষিণ-পশ্চিম বাঙ্গলার মধ্যে মল্লভূম সবচেয়ে বিশিষ্ট। সংখ্যা ও গুণগত উৎকর্ষ দুই দিকেই মল্লভূমের চিত্রসম্ভার অগ্রগণ্য।

গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের এই সংস্কৃতিপরায়ণতার সর্বজনীন পোষকতা ছিল। সম্প্রদায়ের ইতিহাসে ইহার কারণ নিহিত আছে। চৈতন্যদেবের সময়ে ভক্তিধর্মের বিরুদ্ধবাদীরা প্রবল তর্ক খাড়া করিয়াছিলেন। চৈতন্যদেব কাহারও সঙ্গে বিতণ্ডায় যান নাই। বাঙ্গলায় তাঁহার পরিকরগণও তর্ক পরিহার করিয়া চলিতেন। চৈতন্যদেবের ভাবাবেগময় ধর্মে তর্কের অবকাশ ছিল না। কিন্তু পরবর্তী সময়ে তর্কবিতর্ক অপরিহার্য হইয়া ওঠে। চৈতন্যদেব যে ভক্তিধর্ম প্রচার করিয়াছিলেন গোস্বামীসিদ্ধান্তে তাহা অনেকটাই পালটাইয়া গিয়াছিল। নরোত্তমদাস-শ্রীনিবাস আচার্য-শ্যামানন্দ প্রচারিত গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্ম গোস্বামীসিদ্ধান্তেরও পরিবর্তিত রূপ। নরোত্তম ও তাঁহার সহযোগীদের গোস্বামী শাস্ত্রভিত্তিক সামঞ্জস্যমূলক ধর্মমত বাঙ্গলার ভাবাবেগময় ভক্তিবাদের মহান্তরা সহজে মানিয়া নেন নাই। বোধ হয় অনেক

তর্কবিতর্ক ও বিচারের পর বাংলার মহান্তরা নূতন মতের উৎকর্ষ স্বীকার করিয়াছিলেন। নরোত্তমদাস ও তাঁহার সহযোগীদের ধর্মমত নিয়াই গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের সংগঠন। কৃষ্ণদাস কবিরাজের 'চৈতন্যচরিতামৃত' ইহার প্রধান শাস্ত্রগ্রন্থ। বিভিন্ন ধরণের সাধনপদ্ধতি এই সামঞ্জস্যমূলক ধর্মমতের ছত্রচ্ছায়ায় আশ্রয় লাভ করে। সহজপন্থী প্রমুখ নানান গৃহ্য সাধনের গোষ্ঠী ইহার মধ্যে ছিল। সহজসাধনের সঙ্গে গোস্বামীমতের তত্ত্বগত সামঞ্জস্য করিয়া কৃষ্ণদাস কবিরাজ গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায়ে সহজসাধনের স্থান পাকা করিয়া দিয়াছিলেন। সহজসাধক বৈষ্ণবদের কাছে 'চৈতন্যচরিতামৃত' অনুত্তর শাস্ত্রগ্রন্থ।

সহজসাধনে বৈচিত্র্যের ঝোঁক বেশী। এক গোষ্ঠীর সঙ্গে অন্য গোষ্ঠীর মত ও পথের অন্তর তো ছিলই, এক একটি গোষ্ঠীর মধ্যেও আভ্যন্তরিক প্রকারভেদ দেখা যায়। গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মের মধ্যে আসিয়া সহজসাধকদের কোন গোষ্ঠীই গোস্বামী-সিদ্ধান্তের প্রভাব এড়াইতে পারে নাই। আনকোরা সহজপন্থী মত শাস্ত্রীয় সিদ্ধান্ত, বিশেষতঃ রাগানুগা সাধনভক্তিসম্মত ভজন প্রণালীর ছাঁচে ফেলিয়া ভদ্রস্থ করিয়া নিবার চেষ্টা কম বেশী সব গোষ্ঠীই করিতেছিল। নরোত্তমদাসের নামে প্রচলিত 'রসসার' এবং মুকুন্দদাস গোস্বামীর লেখা 'সিদ্ধান্তচন্দ্রোদয়' পড়িলে এইরূপ চেষ্টার ধরন ভালভাবে বোঝা যাইবে। এ ব্যাপারেও অবশ্য গোষ্ঠীগত স্বাতন্ত্র্য লক্ষ্য করা যায়। সংস্কার ও প্রচেষ্টায় অগ্রগতিও সকলের ক্ষেত্রে সমান নয়। ফলে গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের অন্তর্গত বিভিন্ন সহজপন্থী গোষ্ঠীর মধ্যে পারস্পরিক পার্থক্য বেশ স্পষ্ট। তবে সহজপন্থীরা সকলেই পরমেশ্বর শ্রীকৃষ্ণকে রসস্বরূপ কল্পনা করেন এবং নিত্যবৃন্দাবনে রস ও রতি অর্থাৎ কৃষ্ণ ও রাধার মিলনে যে অপার্থিব অদ্বয়বোধের আনন্দ ঐহিক বন্ধনমুক্ত নর ও নারীর মিলনে সেই আনন্দের উপলব্ধিকে সহজ ও পরমার্থ বলিয়া মনে করেন। এই কারণে গোষ্ঠীনির্বিশেষে সব সহজপন্থীকে একলপ্তে রসিক বলা চলে। গোস্বামীসিদ্ধান্তের আওতায় সহজসাধনকে রূপান্তরিত করিয়া রসিক বৈষ্ণবরা গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মের সামঞ্জস্যের যুক্তিকেই কাজে লাগাইতেছিলেন। তবে গৌড়ীয় বৈষ্ণবদের মধ্যে যাহারা গোস্বামী-সিদ্ধান্তের দিকে একটু বেশী ঝুঁকিয়া চলিত নৈষ্ঠিক বলিয়া পরিচিত সেই শাস্ত্রাভিমানী বৈষ্ণবদের সঙ্গে রসিক বৈষ্ণবদের ফারাক যথেষ্ট। নৈষ্ঠিকদের বিচারে জীবের পক্ষে নিজের মধ্যে অপ্রাকৃত বৃন্দাবনলীলার উপলব্ধি একেবারেই অসম্ভব। মানস সাধনার দ্বারা রাধাকৃষ্ণের লীলাপুষ্টির উদ্দেশ্যে সেবাধিকার বাসনা অর্জন করাই নৈষ্ঠিকমতে জীবের চরম লক্ষ্য। বাহ্যতঃ নৈষ্ঠিক কিন্তু অন্তরে রসিক

থাকিবার এক ধরণের সাধন-পদ্ধতিও চালু হইয়াছিল। বাঘনাপাড়া পাটের গোষ্ঠী ইহার অন্যতম প্রবক্তা।

মতপার্থক্যের দরুন গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের মধ্যে সব সময় প্রত্যক্ষভাবে না হইলেও তর্ক বিতর্ক চলিতই। বিভিন্ন গোষ্ঠী নিজেদের মত ব্যাখ্যা করিয়া সাধনানিবন্ধ রচনা করিত। বাংলা পুঁথির সংগ্রহসমূহে অজস্র বৈষ্ণব সাধনানিবন্ধ দেখিতে পাওয়া যায়। অসংগৃহীত পুঁথি বোধ করি আরও বেশী (সুকুমার সেন ১৯৭৫ ঃ তৃতীয় পরিচ্ছেদ ; মণীন্দ্রমোহন বসুর লেখা 'সহজিয়া সাহিত্য', ১৩৯২, এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য)। বৈষ্ণব সহজসাধনানিবন্ধের বিপুল সংখ্যাধিক্য হইতে গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের মধ্যে ভজনপ্রণালী সংক্রান্ত বাদবিতণ্ডার ব্যাপকতা আন্দাজ করা যায়।

আর একটা জোর বিতর্ক গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের মধ্যে চলিত। স্বকীয়াবাদ ও পরকীয়াবাদ সংক্রান্ত মতানৈক্য ইহার বিষয়বস্তু। শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে গোপীদের সম্পর্ক নিয়া একটা সমস্যা গৌড়ীয় বৈষ্ণব শাস্ত্রে আছে। সমস্যাটা এই রকম ঃ গোপীদের সঙ্গে কৃষ্ণের দাম্পত্যসম্পর্ক না গোপীরা অপরের বিবাহিতা পত্নী হওয়া সত্ত্বেও কৃষ্ণ তাহাদের সঙ্গে প্রণয়লীলায় ব্যাপৃত। অর্থাৎ কৃষ্ণের স্বরূপশক্তি হিসাবে নিত্যসিদ্ধ গোপীদের কৃষ্ণের স্বকীয়া ভিন্ন অন্য কোন পরিচয় বা বন্ধন যথা, অপরের পত্নীত্ব সম্ভব কি না এবং স্বকীয়া না পরকীয়া কোন পরিচয় গোপীদের কৃষ্ণপ্রেমের পক্ষে প্রশস্ত। পরকীয়াবাদীদের মতে প্রেমের তীব্রতা ও মাধুর্য পরোঢ়া বা অনূঢ়া আসক্তিতেই ঠিক মত উপলব্ধি করা সম্ভব। অতএব পরকীয়া সম্পর্কই শ্রেষ্ঠ। শ্রীকৃষ্ণের ক্ষেত্রেও তাহাই। স্বকীয়াবাদীদের মত পরকীয়া রতি অবৈধ ও অসামাজিক বলিয়া এই পথে প্রেম পরিপূর্ণ হইতে পারে না। উপরন্তু শ্রীকৃষ্ণ নিখিল চরাচরেরা একান্ত উৎস বলিয়া তাঁহার পক্ষে ঔপপত্য দোষ সম্ভব নয়। গোস্বামীশাস্ত্রেই স্বকীয়া ও পরকীয়াবাদ নিয়া গুরুতর মতভেদ আছে। রূপ গোস্বামী কৃষ্ণের প্রকটলীলায় পরকীয়াত্ব ও অপ্রকটলীলায় স্বকীয়াত্বে বিশ্বাস করিতেন। জীব গোস্বামী কিন্তু এই মত মানেন নাই। তিনি প্রকট ও অপ্রকট দুই লীলাতেই স্বকীয়াভাব ধরিয়াছেন। কৃষ্ণদাস কবিরাজ পরকীয়াভাবের গোঁড়া সমর্থক। 'চৈতন্যচরিতামৃত' গ্রন্থে তিনি বলিয়াছেন 'পরকীয়াভাবে অতি রসের উল্লাস' (চৈ.চ. ১।৪)।

কৃষ্ণদাস কবিরাজের দৃষ্টিতে পরকীয়া প্রেম সম্পূর্ণরূপে আধ্যাত্ম-অনুভাব। ইহার কোনও ঐহিক সংস্রব নাই। কেননা 'ব্রজ বিনা ইহার অন্যত্র নাহি বাস' (তদেব)। সহজপন্থীয়া বলেন কোন অনির্দেশ্য কল্পলোকে নয়, মানুষের মধ্যেই নিত্য-

বৃন্দাবনের অবস্থান। সহজপন্থীরা ইহজীবনেই ব্রজের ভাব উপলব্ধি করিবার চেষ্টা করেন। আরোপ সাধনা দ্বারা ব্রজের কৃষ্ণলীলার অনুশীলন ইহার উপায়। আরোপ সাধনের তাৎপর্য হইল প্রত্যেক পুরুষ ও নারী স্বরূপতঃ কৃষ্ণ ও রাধা। ঐহিক রূপ স্বরূপকে আড়াল করিয়া আছে। আড়াল সরাইয়া স্বরূপে স্থিত হওয়াই সাধনার উদ্দেশ্য। এই যুক্তিতে সাধক নর ও নারী নিজেদের মধ্যে কৃষ্ণ ও রাধার ভাব আরোপ করিয়া দ্বীন্দ্রিয়সমাপত্তিযোগের সাধনায় দ্বয় হইতে অদ্বয়ে উপনীত হইবার চেষ্টা করেন। যৌনযৌগিক সাধনা বিবাহিত স্ত্রীর সঙ্গে করা উচিত, না তাহার জন্য আলাদা সাধনসঙ্গিনী গ্রহণ করা বিধেয় এ তর্ক আগে হইতেই ছিল। গৌড়ীয় বৈষ্ণব শাস্ত্রকারদের মতপার্থক্য সহজপন্থীদের এই তর্কটা একটু বাড়াইয়া দিল। শাস্ত্রীয় মতভেদের সূত্র ধরিয়া নৈষ্ঠিকরাও এই তর্কে জুটিয়া পড়িয়াছিলেন। তবে তাঁহাদের কাছে সমস্যাটা ছিল অধ্যাত্মভাবনার ব্যাপার। সহজপন্থীদের মধ্যে পরকীয়াবাদের দিকেই আগ্রহ বেশী। সম্ভবতঃ সহজপন্থীদের প্রভাবে বাংলার বৈষ্ণবসমাজে পরকীয়াবাদই প্রাধান্য লাভ করে। তবে বৃন্দাবনের বৈষ্ণবরা ছিলেন প্রধানতঃ স্বকীয়াবাদী। বাঙ্গলাতেও তাঁহাদের কিছু সমর্থক ছিল। উভয়পক্ষের উৎসাহে স্বকীয়া পরকীয়া তর্ক খুব জমিয়া ওঠে। তর্কটা না কি একেবারে রাজসভা পর্যন্ত গড়াইয়াছিল। অম্বরের (রাজস্থান) কচ্ছবাহ বংশীয় রাজারা গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। অষ্টাদশ শতকের প্রথম দিকে এই বংশের রাজা সওয়াই জয় সিংহ স্বকীয়া পরকীয়া বিতর্ক নিয়া তাঁহার রাজধানী জয়পুরে বিচারসভা বসাইয়াছিলেন। তাহার পর জয় সিংহ স্বকীয়াবাদীপক্ষের নেতা তাঁহার সভাপণ্ডিতকে বাঙ্গলায় পাঠাইয়া দেন। বাঙ্গলার তদানীন্তন শাসনকর্তা নবাব মুরশিদ কুলি খাঁর আনুকূল্যে ১৭১৯ সালে বাঙ্গলার বৈষ্ণব পণ্ডিতদের সঙ্গে অম্বররাজ পণ্ডিতের আর একদফা বিচার হয় (ত্রিবেদী ১৩০৬ ঃ ২৯৭-৩০১ এবং ১৩০৮ ঃ ৮-১০)।

গোস্বামীশাস্ত্রমতে বৃন্দাবনে কৃষ্ণপরিকরগণ শ্রীকৃষ্ণের অন্তরঙ্গা চিৎশক্তি বা স্বরূপশক্তি। ইঁহাদের অবস্থান কৃষ্ণের অভ্যন্তরে। এই কারণে ইঁহাদের কৃষ্ণপ্রেম নিত্যসিদ্ধ এবং সর্বাত্মক। জীব তটস্থ বহিরঙ্গাশক্তি, তাহার কৃষ্ণপ্রেম সাধনজাত এবং অতিশয় সীমাবদ্ধ। সুতরাং জীব কখনই শ্রীকৃষ্ণ বা তাঁহার স্বরূপশক্তি পরিকর-গণের সঙ্গে তাদাত্ম্যপ্রাপ্ত হইতে পারে না। সাধনদ্বারা প্রকৃতিদোষমুক্ত অপ্রাকৃত নিত্য বৃন্দাবনে লীলারত শ্রীকৃষ্ণের সেবাবাসনা সঞ্চারই জীবের কৃষ্ণপ্রেম অর্থাৎ পরমার্থ। অতএব স্বদেহে কৃষ্ণ ও রাধার ভাবনা অথবা কৃষ্ণপরিকর গোপী বা কৃষ্ণসখা গোপবালকদের মতো শ্রীকৃষ্ণের প্রেমলাভের প্রয়াস করিলে প্রত্যবায় ঘটে।

অথচ সহজপন্থী আরোপসাধনা ও গোপী বা সখার মতো করিয়া কৃষ্ণপ্রেম লাভের সাধনা গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায়ে বহুল প্রচলিত ছিল। চৈতন্যপ্রপত্তির প্রেমভক্তি তো শ্রীকৃষ্ণের সান্নিধ্যলাভের আনন্দ, সেবাবাসনামাত্র নয়। চৈতন্যভাবকদের অনেকেই এই অর্থে প্রেমসাধনা করিতেন। অতএব শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে জীবের সম্বন্ধ এবং পরমার্থের সংজ্ঞা ও তাৎপর্য গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের মধ্যে বিচার বিতণ্ডার বিষয় ছিল।

আর একটা বিতর্ক ছিল বর্ণাশ্রম ও অধিকারীভেদ নিয়া। চৈতন্যপ্রপত্তিতে প্রেমভক্তি সাধনা বর্ণাশ্রম দ্বারা নিয়ন্ত্রিত নয়, ইহাতে ব্রাহ্মণ চণ্ডালে ভেদ নাই। গোস্বামীদের বৈষ্ণবস্মৃতি গ্রন্থ 'হরিভক্তিবিলাসে' বর্ণাশ্রম ও অধিকারীভেদ স্বীকৃত। কিন্তু বাঙ্গলায় গোস্বামী সিদ্ধান্ত চালু হইবার পরেও অনেকেই চৈতন্যদেবের মত মানিয়া চলিতেন, পুঁথিপত্রে চৈতন্যদেবের মত উল্লেখও করা হইত। 'প্রেমবিলাস' রচয়িতা নিত্যানন্দদাস ছিলেন জাহ্নবা দেবীর শিষ্য। খেতুরী মহোৎসবের পর জাহ্নবা গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মে খুব উৎসাহী হইয়া ওঠেন। তিনি বৃন্দাবনে গিয়া গোস্বামীদের সঙ্গে দেখাসাক্ষাৎ করেন। বৃন্দাবনযাত্রায় তাঁহার সঙ্গে ছিলেন নিত্যানন্দদাস। 'প্রেমবিলাস' নিত্যানন্দদাসের বৃন্দাবন হইতে ফিরিবার পর পরিণত বয়সের রচনা। 'প্রেমবিলাসে' আছে চৈতন্যদেব লোকনাথ চক্রবর্তীকে উপদেশক্রমে বলিতেছেন

সর্ব্বত্যাগ করে যদি বর্ণাশ্রমধর্ম্ম।
সেই সে জানয়ে সেইরূপ ধর্ম্মমর্ম্ম ॥
বর্ণাশ্রমী নাহি হয় অনন্যশরণে।
তারে কৃষ্ণ অঙ্গীকার না করে আপনে ॥

(প্র.বি. সপ্তম বিলাস)

স্বয়ং নরোত্তমদাস এবং তাঁহার সতীর্থ ও সহযোগী শ্যামানন্দ বর্ণাশ্রম মানেন নাই। দুইজনেই শূদ্রবর্ণভুক্ত কিন্তু দুইজনেই ব্রাহ্মণ দীক্ষার্থীদের শিষ্য করিয়াছিলেন।

সর্বোপরি প্রবল মতভেদ ছিল উপাস্য নিয়া। এই মতভেদের মধ্যে চৈতন্যতত্ত্ব বিষয়ে বিতর্ক নিহিত আছে। ভক্তি আন্দোলনের গোড়ার দিকে চৈতন্যভাবকরা চৈতন্যদেবকে সর্বশক্তিমান পরমেশ্বর ভাবিয়া তাঁহাকে উপাস্য জ্ঞান করিতেন। বাঙ্গলায় চৈতন্যোপাসনাও চালু হইয়া গিয়াছিল। গোস্বামীশাস্ত্রের মতে শ্রীকৃষ্ণই অনন্য উপাস্য। চৈতন্যদেব ভক্তশ্রেষ্ঠ, তিনি ভক্তাবতার, কৃষ্ণপ্রেমলাভের উপায়। অতএব চৈতন্যোপাসনা অবিধেয়। পুরীতে যুগলাবতারতত্ত্ব দানা বাঁধিয়াছিল। ইহার মর্ম খুব ভালভাবে বুঝাইয়াছেন কৃষ্ণদাস কবিরাজ। এই মত অনুসারে

চৈতন্যদেব স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণ। এই অবতারে তিনি আপন হ্লাদিনী শক্তির মধ্যে নিহিত প্রেমের মাধুর্য উপলব্ধি করিবার জন্য রাধিকার ভাব ও কান্তি নিয়া চৈতন্যদেব রূপে আবির্ভূত হইয়াছেন। অবস্থাটা এইরূপ বলিয়া চৈতন্যবতারে কৃষ্ণ গোপন-বিহারী, তিনি আছেন চৈতন্যদেবের অন্তরে, বাহিরে তিনি রাধাভাব-দ্যুতি-সুবলিত। রাধা-কৃষ্ণের হ্লাদিনীশক্তি, কৃষ্ণের শক্তিবিক্ষেপের দরুন রাধার সৃষ্টি। রাধা উপলক্ষ, কৃষ্ণই লক্ষ্য। অতএব 'চৈতন্যচরিতামৃতে' চৈতন্যদেব নন, কৃষ্ণই উপাস্য। নরোত্তম যুগলাবতার তত্ত্ব মানিতেন। চৈতন্যদেবের বহুস্তুতি করিয়াও তিনি কৃষ্ণউপাসনার উপরেই জোর দিয়াছেন। পরিশেষে গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মের প্রভাবে বাঙ্গলায় কৃষ্ণের উপাসনাই প্রাধান্য পায়। কিন্তু গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্ম প্রচার শুরু করার সময় বাঙ্গলায় চৈতন্যোপাসনাই প্রবল ছিল, পরেও ইহা লোপ পায় নাই।

এত রকম মতভেদ ও তর্কবিতর্ক চালু ছিল বলিয়া সাধ্য সাধনের মর্ম বুঝিবার জন্য বৈষ্ণব সাধকের তো বটেই, সাধারণ বৈষ্ণব ভক্তরও তত্ত্বজ্ঞান অর্জন করা প্রয়োজন হইত। তাই গৌড়ীয় বৈষ্ণবদের দীক্ষামন্ত্রের জন্য মন্ত্রগুরু ছাড়া তত্ত্বগুরু ও শিক্ষাগুরুর শরণ নেওয়া প্রয়োজন। তত্ত্বগুরু শিষ্যকে তত্ত্বশিক্ষা দিতেন এবং তত্ত্বানুসারে ভজনপ্রণালী শিখাইয়া দিতেন শিক্ষাগুরু। তত্ত্বচিন্তা ও তত্ত্বালোচনা ছাড়া বৈষ্ণব সমাজে মান পাওয়া কঠিন।

গৌড়ীয় বৈষ্ণবদের মুখ্য শাস্ত্রগ্রন্থসমূহের মধ্যে শুধুমাত্র কৃষ্ণদাস কবিরাজের 'চৈতন্যচরিতামৃত' বাঙ্গলাভাষায় লেখা। বৃন্দাবনের গোস্বামীরা ও কবিকর্ণপুর গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন সংস্কৃতভাষায়। পরবর্তীকালে বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ও বলদেব বিদ্যাভূষণও সংস্কৃতে ভাষ্য লিখিয়াছিলেন। সাধারণ বৈষ্ণবরা এই সব গ্রন্থ পড়িতে পারিত না। অথচ সকলের মধ্যেই শাস্ত্রার্থ জানিবার আগ্রহ ছিল। তাই সংস্কৃতজ্ঞ বৈষ্ণব কবিরা শাস্ত্রগ্রন্থসমূহ বাঙ্গলায় ভাষান্তরিত করিয়া দিয়াছিলেন। তর্জমার কাজে প্রথম হাত দেন নরোত্তমদাস স্বয়ং। তিনি রূপ গোস্বামীর 'হংসদূত' কাব্যটি বাঙ্গলাকাব্যে রূপান্তরিত করেন। অতঃপর সংস্কৃত ভাষায় লেখা গৌড়ীয় বৈষ্ণব গ্রন্থাদি বাংলায় তর্জমা করিবার একটা ধারা গড়িয়া ওঠে। এই ধারায় সবচেয়ে বিখ্যাত নাম যদুনন্দনদাস। শ্রীনিবাস আচার্যর কন্যা হেমলতা ঠাকুরাণীর শিষ্য যদু-নন্দনদাস রূপ গোস্বামীর 'বিদগ্ধমাধব' ও 'হংসদূত', রঘুনাথদাস গোস্বামীর 'মুক্তচরিত', কৃষ্ণদাস কবিরাজের 'গোবিন্দলীলামৃত', রায় রামানন্দর 'জগন্নাথবল্লভ' নাটক এবং প্রবোধানন্দ সরস্বতীর চৈতন্যচন্দ্রামৃতম্' স্তোত্রকাব্য বাঙ্গলায় তর্জমা করিয়াছিলেন। 'উজ্জ্বলনীলমণি' ধরিয়া 'রসতত্ত্বসার' লিখিয়াছিলেন গোবিন্দদাস। রসময়দাসের লেখা 'প্রেমানন্দ-লহরী' গ্রন্থটি 'ভক্তিরসামৃতসিন্ধু' ও তাহার উপর জীব গোস্বামী

রচিত টীকার নিষ্কর্ষ। আরও কয়েকজন অজ্ঞাতনামা লেখক 'উজ্জ্বলনীলমণি' ও 'ভক্তিরসামৃতসিন্ধু' বাঙ্গলায় তর্জমা করিয়াছিলেন। সনাতন গোস্বামীর লেখা 'বৃহৎ ভাগবতামৃত' বাঙ্গলায় তর্জমা করিয়াছিলেন জয়গোবিন্দদাস। রাধানাথদাস মণ্ডল বাংলায় তর্জমা করিয়াছিলেন রঘুনাথদাস গোস্বামীর লেখা 'বিলাপকুসুমাঞ্জলি'। বিশ্বনাথ চক্রবর্তীর ভাষ্যগ্রন্থসমূহের বাঙ্গলা রূপান্তর করেন তাঁহার শিষ্য কৃষ্ণদাস। আর যাঁহারা তর্জমা করিয়াছিলেন তাঁহাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য অকিঞ্চন দাস, প্রেমদাস, রামগোপালদাস, স্বরূপচরণ গোস্বামী, নারায়ণদাস ও স্বরূপ ভূপতি। সংস্কৃতে লেখা গ্রন্থসমূহ বাঙ্গলায় ভাষান্তরিত হইবার ফলে খানিকটা লেখাপড়া জানিলেই সাধারণ বৈষ্ণবরাও তত্ত্বমূলক গ্রন্থাদি নিজেরাই পড়িয়া নিতে পারিত, পণ্ডিত ব্যক্তিদের দ্বারস্থ হইবার প্রয়োজন তাহাদের হইত না।

চৈতন্যপ্রপত্তি সরল বিশ্বাস ও সহজ পদ্ধতির ধর্মমত। সাধারণ মানুষের পক্ষে ইহা খুব উপযোগী। চৈতন্যদেবের ভক্তিধর্মে চণ্ডালও প্রেমভক্তি লাভে অধিকারী। চৈতন্যপ্রপত্তিতে সামাজিক পরিচয় নির্বিশেষে ব্যক্তির মর্যাদা ও অধিকার প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। তত্ত্বালোচনা ও পর্যায়ক্রমিক গূঢ় সাধনপদ্ধতি প্রবর্তনের ফলে গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মে তাত্ত্বিক জটিলতা ও অধিকারীভেদ সৃষ্টি হয়। ইহার ফলে ভক্তি আন্দোলনের উন্মাদনা ও খোলামেলা ভাবটা কমিয়া গিয়াছিল বটে কিন্তু গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মের বাঁধাবাঁধির মধ্যেও ভক্তিআন্দোলনের সর্বজনীনতা নষ্ট হয় নাই। নামকীর্তন তো অবাধ ছিলই, সাধনপথে ঠিকমতো অগ্রসর হইতে পারিলে সাধক-মাত্রই রাগানুগামার্গের রীতিসম্মত গূঢ় ভজনের অধিকারী হইতে পারিত। চৈতন্যদেব ভাবাবেগময় কীর্তনে সকল মানুষের সমান অধিকার প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মের আশ্রয়ে সাধারণ ভক্তও তত্ত্বালোচনা ও রীতিসম্মত ভজনের অধিকার লাভ করিয়াছিল।

ভক্তিলাভের উদ্দেশ্যে বিদ্যাচর্চা ও তত্ত্বালোচনার ঝোঁক গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায়ে কতটা প্রবল ছিল বাঙ্গলা পুঁথির সংগ্রহগুলি পর্যালোচনা করিলে তাহার প্রমাণ পাওয়া যাইবে। অনেকগুলি প্রতিষ্ঠানে বিপুল সংখ্যক বাঙ্গলা পুঁথির সংগ্রহ আছে। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, বিশ্বভারতী, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ, এশিয়াটিক সোসাইটি (কলিকাতা) ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সংগ্রহ খুব বড়। এই সব প্রতিষ্ঠানের সংগৃহীত পুঁথির কিছু বিবরণ প্রকাশ করা হইয়াছে। ছাপা বিবরণ হইতে বিষয় অনুসারে পুঁথিগুলি ভাগ করিলে দেখা যাইবে অধিকাংশ পুঁথিই বৈষ্ণব ধর্মগ্রন্থ। বেশ কিছু পুঁথিতে পুষ্পিকার সঙ্গে পুঁথির মালিক বা পাঠকের নাম লেখা আছে। নাম দেখিয়া অনেক ক্ষেত্রেই জাতি বোঝা যায়। কিছু

কিছু ক্ষেত্রে জাতিরও উল্লেখ আছে। গন্ধবণিক, তাম্বুলী, বারুই, কুমার, সদ্গোপ, তাঁতি, ময়রা, তেলি, কৈবর্ত, ছুতার, যোগী, শুঁড়ি, ভুঁইমালি, ডোম, কোটাল, বাগদী, মাল ও পোদ জাতির বহু নাম পাওয়া যায়। ব্রাহ্মণ, বৈদ্য ও কায়স্থ এই তিন উচ্চজাতির নাম আছে বটে, কিন্তু জলাচরণীয়, জলাব্যবহার্য ও অন্ত্যজ জাতিরই সংখ্যাধিক্য। এই সব জাতির বিদ্যোৎসাহী লোক পয়সা খরচ করিয়া পুঁথি লিখাইয়া নিতেন অথবা পুঁথি কিনিয়া নিতেন। কেহ কেহ পুঁথি জোগাড় করিতেন অপরকে দিয়া পড়াইয়া নিবার জন্য। তবে বেশীরভাগ ক্ষেত্রে পুঁথি পাঠ করিতেন মালিক নিজেই। সবই বৈষ্ণবগ্রন্থ বটে, কিন্তু বিষয়বস্তুর বেশ রকমফের আছে। 'শ্রীমদ্ভাগবতের' তর্জমা, 'চৈতন্যভাগবত', 'চৈতন্যমঙ্গল', 'গোবিন্দমঙ্গলের' মত আখ্যায়িকা কাব্য, 'চৈতন্যচরিতামৃত', বিভিন্ন গোস্বামী গ্রন্থের বাঙ্গলা তর্জমা এবং নানা ধরনের সহজপন্থী সাধনতত্ত্ব নিবন্ধ সংশ্লিষ্ট গ্রন্থসম্ভারের অন্তর্গত।

গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায়ে লেখাপড়ার ব্যাপক চলন ঊনবিংশ শতকের কয়েক-জন পর্যবেক্ষকের নজরেও পড়িয়াছে। শ্রীরামপুরের মিশনারী উইলিয়াম ওয়ার্ড বলিতেছেন তাঁতি, নাপিত, তেলি, সোনার, পোদ্দার (সুবর্ণবণিক), চাষী এবং ছোটখাট দোকানদার শ্রেণীর লোক বেশীর ভাগই বৈষ্ণব। ইহারা লেখাপড়া জানে এবং পুরাণ প্রভৃতি ধর্মগ্রন্থের বাঙ্গলা তর্জমা পড়ে। (ওয়ার্ড, ৪র্থ খণ্ড, ১৯৮১ঃ ৭১)। অনুরূপ সাক্ষ্য দিতেছেন লুসিংটন। ঊনবিংশ শতকের গোড়ার দিকে সরকারী নির্দেশে বাঙ্গলায় লেখাপড়ার প্রসার সম্বন্ধে খোঁজখবর করিতে গিয়া লুসিংটন বৈষ্ণবদের মধ্যে লেখাপড়ার বহুল প্রচলন দেখিতে পাইয়া-ছিলেন (পাল ১৯৬২ঃ ৩৩)। বিপিনচন্দ্র পালের (১৮৫৮-১৯৩২) আত্মজীবনীতেও এই কথার সমর্থন পাওয়া যায়। শৈশবকালের স্মৃতিচারণ করিয়া বিপিনচন্দ্র বলিতেছেন তখনকার দিনে ধর্মগ্রন্থ পড়িবার জন্য 'মহাপ্রভুর অনুগত বৈষ্ণবমণ্ডলে স্ত্রীপুরুষ সকলেই প্রায় বর্ণজ্ঞান লাভ করিতেন' (পাল ১৯৬২ঃ ৩২)। কথাটা ঠিক। গৌড়ীয় বৈষ্ণব সমাজে স্ত্রীপুরুষ নির্বিশেষে বিদ্যাচর্চার চলন ছিল।

স্ত্রীশিক্ষার ব্যাপক চলন থাকার দরুন গৌড়ীয় বৈষ্ণব সমাজে বিদ্যাচর্চা সর্বজনীন ছিল বলা চলে। ঊনবিংশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধ হইতে সমাজ সংস্কারকদের উদ্যোগে বাঙ্গলায় নিয়মিত স্ত্রীশিক্ষার অল্পস্বল্প আয়োজন শুরু হয়। তাহার আগে স্ত্রীশিক্ষার কোন ব্যবস্থা সাধারণতঃ ছিল না। মেয়েদের লেখাপড়া শেখা রীতিবহির্ভূত বলিয়া গণ্য হইত। ব্যতিক্রম ছিল শুধু গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায়। গৌড়ীয় বৈষ্ণব স্ত্রীলোকেরা নিজেরা লেখাপড়া শিখিত আবার

মেয়েদের শিক্ষকতাও করিত। ঘরের মেয়েদের লেখাপড়া শিখাইতে হইলে বৈষ্ণবীদের ডাকিয়া ভার দেওয়া হইত। কলিকাতার পোস্তা নিবাসী রাজা শিবচন্দ্র রায়ের (অষ্টাদশ শতকের শেষ দিকে) কন্যা হরসুন্দরী দাসী একজন বৈষ্ণবীর কাছে লেখাপড়া শিখিয়াছিলেন (রমাকান্ত চক্রবর্তী ১৯৮৫ : ৩৪১)। দ্বারকানাথ ঠাকুরের সময় জোড়াসাঁকো ঠাকুর বাড়ীতে বৈষ্ণব গৃহশিক্ষিকা ছিল (দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ১৯৬২ ঃ ২৫২)। বৈষ্ণবীরা শিক্ষকতার কাজে অভ্যস্ত ছিল বলিয়া উনবিংশ শতকের মাঝামাঝি সময়ে কলিকাতার ফিমেল জুভেনাইল সোসাইটি মেয়েদের লেখাপড়া শিখাইব্যর জন্য বৈষ্ণবীদের শিক্ষয়িত্রী নিযুক্ত করিয়াছিল (রমাকান্ত চক্রবর্তী ১৯৮৫ ঃ ৩৪১)। উচ্চশিক্ষিত বৈষ্ণব মহিলারা প্রকাশ্যে শাস্ত্রপাঠ, ব্যাখ্যা এবং তাত্ত্বিকবিচার করিতেন (পাল ১৯৬২ ঃ ৩২-৩৩)। তত্ত্ববিদ শাস্ত্রজ্ঞ বৈষ্ণব মহিলাগণ আচার্য হিসাবে সম্মান ও প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছিলেন। জাহ্নবী দেবী ও হেমলতা ঠাকুরাণীর নাম সর্বাগ্রগণ্য। আরও অনেক খ্যাতিমান বৈষ্ণব মহিলার নাম শোনা যায়, যথা বর্ধমানের সুলোচনা (রমাকন্ত চক্রবর্তী ১৯৮৫ ঃ ১৯৯)। গৌড়ীয় বৈষ্ণব ভিন্ন অন্য কোন সম্প্রদায়ে স্ত্রীলোকদের এইরূপ শিক্ষা ও স্বাধীনতা তখনকার দিনে অভাবনীয় ছিল।

গৌড়ীয় বৈষ্ণব সমাজে সর্বজনীন শিক্ষা প্রসারের আর একটা প্রমাণ পাওয়া যাইবে কীর্তনীয়াদের পরিচয় হইতে (দ্বাদশ পরিচ্ছেদ দ্রষ্টব্য)। অনেক নামকরা কীর্তনীয়া ছিলেন জলাচরণীয়, জলাব্যবহার্য এবং অন্ত্যজ জাতির লোক অর্থাৎ নীচু জাত। বড় কীর্তনীয়া হইতে গেলে শাস্ত্র, কাব্য ও সঙ্গীতে ভাল জ্ঞান থাকা দরকার। নীচু জাতের কীর্তনীয়াদের সামাজিক পরিচয় এই সব বিদ্যা অর্জনের পক্ষে বাধা হইয়া ওঠে নাই। উঁচুজাতের গুরুরা তাঁহাদের শিক্ষা দিয়াছেন, এমন কি সংস্কৃত ভাষায় লেখা শাস্ত্র পর্যন্ত পড়াইয়াছেন। আবার নীচু জাতের গুরুর কাছে শিক্ষা লাভ করিয়াছেন উঁচু জাতের শিষ্য। ব্রাহ্মণ্যস্মৃতিশাসিত হিন্দুসমাজের অন্যান্য অংশের মতো গৌড়ীয় বৈষ্ণবরাও জাত মানিতেন, কিন্তু বিদ্যা ও সাধনার ক্ষেত্রে জাতের পরিচয় তাঁহারা অতিক্রম করিতে পারিয়াছিলেন। প্রথাবদ্ধ গ্রামীণ সমাজের মধ্যেই ইহা সম্ভব হইয়াছিল, এ কথা মনে রাখিতে হইবে। ইহা আমাদের সভ্যতার বৈশিষ্ট্যসূচক।

ভারতবর্ষের গ্রামীণ সভ্যতায় যে ঐতিহ্যগত লোকশিক্ষা ব্যবস্থা চালু ছিল সে বিষয়ে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর খুব মনোগ্রাহী আলোচনা করিয়াছেন। তাঁহার লেখা হইতে কয়েক ছত্র উদ্ধার করিতেছি।

শিক্ষার বিশেষ চর্চা টোলে চতুষ্পাঠীতে, কিন্তু সমস্ত দেশেই বিস্তৃত ছিল বিদ্যার ভূমিকা। বিশিষ্ট জ্ঞানের সঙ্গে সাধারণ জ্ঞানের নিত্যই ছিল চলাচল।... দেশে এমন কোন অনাদৃত অংশ ছিল না যেখানে রামায়ণ মহাভারত পুরাণকথা ধর্মব্যাখ্যা নানা প্রণালী বেয়ে ছড়িয়ে না পড়ত। এমন-কি, যে-সকল তত্ত্বজ্ঞান দর্শনশাস্ত্রে কঠোর অধ্যবসায়ে আলোচিত তারও সেচন চলছিল সর্বক্ষণ জনসাধারণের চিত্তভূমিতে...কঠিন বিদ্যাকে রসে বিগলিত করে সর্বজনের মনে সঞ্চারিত করা হয়েছে। যে সময় আমাদের দেশে পূর্তকর্ম ধর্মের অঙ্গ ছিল তখন গ্রামে গ্রামে জলাশয়ের আয়োজন স্বতই ছিল বিস্তৃত, সর্বজনে মিলে আপনিই আপনার তৃষ্ণার জল জুগিয়েছে...তেমনি করেই সমাজ দেশের বিদ্যা আপনিই দেশময় বিতরণ করেছে।

(রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ১৯৬২ ঃ ১৫৫)

ভারতবর্ষের গ্রামীণ সমাজে শিক্ষা বিস্তারের এই রকম ব্যবস্থা প্রচলিত ছিল সাধারণভাবে ইহা সত্য। তবে রবীন্দ্রনাথের এই উক্তি বোধ হয় গৌড়ীয় বৈষ্ণব সমাজ সম্পর্কে বিশেষভাবে খাটে। তত্ত্বজ্ঞানের কঠিন বিদ্যাকে রসে বিগলিত করিয়া সর্বসাধারণের পক্ষে বোধ্য ও উপভোগ্য করিয়া তোলার চেষ্টা লীলাকীর্তনে যতটা সার্থক অন্য কোন ব্যাপারে কিন্তু ততটা নয়। কথকতা, পাঁচালী গান প্রভৃতি শাস্ত্রার্থজ্ঞাপক সন্দেহ নাই। কিন্তু এই সব ক্ষেত্রে নীতির কথাই বেশী বলা হয়, তত্ত্বকথা কম। কথকতা ও পাঁচালী গান উপাদেয় হইতে পারে কিন্তু মননের অবকাশ ইহাতে অল্প। লীলাকীর্তন তত্ত্বমূলক। সর্বজনীন শিক্ষা এবং তত্ত্বচিন্তা প্রসারে লীলাকীর্তন ও বিদ্যাচর্চা পরস্পরের পরিপূরক। তত্ত্বকথা বাদে লীলাকীর্তনের অন্য যে সব বিশিষ্টতা আছে তাহার মূল্যও যথেষ্ট। বৈষ্ণবপদ উৎকৃষ্ট গীতিকবিতা। বড় বড় মহাজনদের লেখা পদসমূহের কাব্যরূপ বেশ উঁচুদরের। মহাজনরা তত্ত্বকথাকে কাব্যরূপ দিয়াছেন। পদাবলী তত্ত্বকথার আধার। লীলাকীর্তনে দোঁহা, কথা, আখর ও তুক সহযোগে পদ গাহিয়া কঠিন কথা সহজতর করিয়া দেওয়া হয়। কিন্তু তত্ত্বের গাম্ভীর্য বা কাব্যের সৌন্দর্য তাহাতে ক্ষুণ্ণ হয় না। লীলাকীর্তনে শাস্ত্রীয় রাগ-রাগিনীর সঙ্গে কঠিন তালের সমন্বয় হয়। তাহার সঙ্গে চলে শাস্ত্রসম্মত নাচ। কীর্তনীয়া মাঝে মাঝে হালকা ছাঁদে গাহিয়া থাকেন বটে, কিন্তু তাহার পরেই উচ্চাঙ্গের পর্যায়ে ফিরিয়া আসেন। লীলাকীর্তনের সাঙ্গীতিক পরিবেশ মূলতঃ উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের পরিবেশ। শ্রোতারা দীর্ঘ সময় এক জায়গায় বসিয়া গান শোনে। সঙ্গীত রসের সঙ্গে পরিবেশিত তত্ত্বকথার মর্ম তাহারা গ্রহণ করে। আধ্যাত্মিকার

নাটকীয়তা, তত্ত্বজ্ঞানের গাম্ভীর্য, কাব্যের সুষমা, গানের সুর, নাচের ছন্দ ও আধ্যাত্মঅনুভাবের পারস্পরিক সংশ্লেষে যে অখণ্ড রসমূর্তি সৃষ্টি হয় তাহার সৌন্দর্যেই লীলাকীর্তনের রূপসম্পদ।

লীলাকীর্তনের কীর্তনীয়ারা রস পরিবেশন করেন গৌড়ীয় বৈষ্ণব রসশাস্ত্রের বিধান অনুসারে। রসশাস্ত্রের মতে ভক্তি নিখিল জগৎপ্রপঞ্চের অমৃতস্বরূপ, অতএব ভক্তি সর্বরসসার। কৃষ্ণের প্রতি প্রেমসঞ্চারই ভক্তির চরম পরিণতি, প্রেমভক্তি সর্বোত্তম ভক্তি। রসশাস্ত্র নিগূঢ় ভক্তি রহস্যের বোধিকা, প্রেমসাধনার পথনির্দেশিকা। সংস্কৃত অলঙ্কারশাস্ত্রে কাব্যের চরম আস্বাদ রস নামে অভিহিত। অলঙ্কারশাস্ত্রে রসসাক্ষাৎকারের পদ্ধতি ও তাৎপর্য সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা আছে। গৌড়ীয় বৈষ্ণব রসশাস্ত্র অলঙ্কার শাস্ত্রের আদলে গঠিত। কিন্তু ভক্তিরসের তাৎপর্য আধ্যাত্মিক। অলঙ্কারশাস্ত্রের রসকে আধ্যাত্মিকতায় মণ্ডিত করিয়া গৌড়ীয় বৈষ্ণব রসশাস্ত্রকারগণ অভিনব রসতত্ত্বের অবতারণা করিয়াছেন। এই প্রসঙ্গে সুশীলকুমার দে মহাশয়ের উক্তি প্রণিধানযোগ্য।

> "A new turn was thus given rot only to the old Rasa-theory of conventionᵃl Poetics but also to the religious emotion underlying the older Vaishnava faith. Rupa Gosvamin (সর্বশ্রেষ্ঠ রসশাস্ত্রকার) gives an elaborate exposition to the medieval sentiment of Love, snblimated into deeply religious sentiment, by bringing in erotico-religious ideas to bear upon the general theme of literary Rasa, especially the Erotic Rasa."
>
> (দে ১৯৬১ : ১৬৬)।

রসশাস্ত্রের মূল বিষয় প্রেম। প্রেমের দৃষ্টিতে ভক্তির ব্যাখ্যান করিতে গিয়া বৈষ্ণব রসশাস্ত্রকারগণ অলঙ্কারশাস্ত্র হইতে একটু আলাদাভাবে রসতত্ত্বের বিচার বিশ্লেষণ করিয়াছেন। রসশাস্ত্র অনুযায়ী রসের প্রকারভেদ বেশী। অলঙ্কার-শাস্ত্রমতে রসের সংখ্যা নয়, রসশাস্ত্রে বারো। যে পাঁচটি রস ভক্তিসাধনের পক্ষে বেশী উপযোগী সেইগুলি মুখ্যরস, অন্যগুলি গৌণ। প্রতিটি রসের বিভাব, অনুভাব সঞ্চারীভাব ও স্থায়ীভাবের প্রকৃতি ও তাৎপর্যও প্রেমভক্তিসাধনের উপকরণ হিসাবে কল্পিত। রসশাস্ত্রমতে প্রেমভক্তির আশ্রয় শ্রীকৃষ্ণ, কৃষ্ণপরিকরগণ কৃষ্ণপ্রেমের আদর্শ। বৃন্দাবনলীলার এই প্রেম অলৌকিক। কিন্তু মানবহৃদয়ের ভাব ও অনুভূতি ছাড়া প্রেমাকাঙ্ক্ষা ও প্রেমোপলব্ধি বুঝান যায় না। গৌড়ীয়

বৈষ্ণব রসশাস্ত্রকারগণ সুগভীর অন্তর্দৃষ্টি ও সহমর্মিতা দ্বারা মানবহৃদয়ের ভাব ও অনুভূতির বিচারে বিভিন্ন রস এবং প্রতিটি রসের বিভাব, অনুভাব ও ভাবের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম ব্যাখ্যা করিয়াছেন। ভালবাসার বিশেষতঃ, নরনারীর পারস্পরিক আকর্ষণের, যতরকম অবস্থান্তর এবং বিভিন্ন অবস্থায় প্রণয়াসক্ত চিত্তের গভীর উপলব্ধি ও নিগূঢ় বৈচিত্র্য যেভাবে গৌড়ীয় বৈষ্ণব রসশাস্ত্রে কল্পনা করা হইয়াছে তাহার তুলনা মেলা ভার। সুশীলকুমার দে এই বিষয়ে চমৎকার আলোচনা করিয়াছেন। তাঁহার উক্তিটি কিছুটা উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি।

> The fervent quasi-amorous attitude, in spite of its subtle and elusive juggling with psychological complexes and theological refinements, inspires not only the Sastras are professedly devotional works of Bengal Vaisnavism, but also enlivens its mass of resplendent lyrics in Sanskrit, as well as in Bengali, with the practical possibilities of its mystical erotic impulse. Whatever may be the devotional value of this attitude, the literary gain was immense. The last reach of Vaishnava Bhakti, transmuted in Bengal Vaishnavism into Preman or Love, became an unfailing ınd rich sources of literary inspiration, as well as of religious emotion ; for it was personal in ardour, concrete in expression and original in appeal. Along with its metaphysics and theology was also produced a psychological rhetoric of the endless diversity of the passionate condition, which reproduced, no doubt, the classical phraseology and ideas of Sanskrit rhetoric of Rasa, but whose erotico-religious application and subtilising of emotional details were novel, intimate and inspiring. These aesthetic and emotional conventions were implicitly accepted in its literary productions. In spite of its psychological formalism, its rhetoric of ornament and conceits and its pedontry of metaphysical

sentimentalism, there can be no doubt that the inspiration supplied by the erotic emotionalism of such works as those of Rupa Gosvamin...to later Vaishnava literature, especially the lyrics composed in Bengali, must have been of a deep and far-reaching character. Even the abstruse dogmas, formulas and shibbole they have had their effect on literary conception and phrasing, but there was an essentially human appeal in its religious attitude, which imparted to its literary effusions an enduring emotional and poetical value. This wistfulness and amazement of its devotional ecstasy, the richly romantic idealism of its mystical erotic sensibility, lifted the lyric literature of Caitanyaism into a high level of artistic and passionate expression, which was endowed, by virtue of these attributes, with as much human as transcedental value (দে ১৯৬১ঃ ২২৪)।

সুখ-দুঃখ, আনন্দ-বিষাদ, কামনা-বাসনা, প্রবৃত্তি-নিবৃত্তি মিলন-বিরহ জনিত যে সব ভাব বাহ্যিক চেতনার অগোচরে গুপ্ত থাকে হৃদয়ের অতল গহনে রস সিঞ্চন করিয়া লীলাকীর্তন সেই সব অব্যক্ত, অনাস্বাদিত ভাবকে গূঢ় মনস্তাত্ত্বিক প্রক্রিয়া দ্বারা জাগাইয়া তুলিয়া মানুষের মনে অসম্ভাবিত অনুভূতি সঞ্চার করে। এই অনুভূতি স্বাভাবিক, স্বচ্ছন্দ এবং সর্বজনীন। গোষ্ঠযাত্রায় দুরন্ত শিশু কৃষ্ণের জন্য যশোদার উৎকণ্ঠা, নিমাইসন্ন্যাসে শচীমাতার হৃদয় বিদারক হাহাকার, রাধাকৃষ্ণ বিষয়ক পালায় প্রিয়মিলনের আকুল আকাঙ্ক্ষা, সম্ভোগের অনির্বচনীয় আনন্দ ও বিরহের বেদনাময় ব্যাকুলতা ভক্তজনের তো বটেই, যে ভক্ত নয় সংবেদনশীল হইলে তাহার চিত্তও স্বতোৎসারিত অনুভূতির আবেগে আপ্লুত করিয়া দেয়। প্রগাঢ় মানবিক অনুভূতিসঞ্জাত আবেগই পরমঅধ্যাত্মরসতত্ত্ববোধের উৎস কেননা সর্বজনীন অনুভূতিতে বিশ্বজীবনের ইঙ্গিত আছে। অখণ্ড বিশ্বজীবনের উপলব্ধিই পরানন্দময় প্রেম। গৌড়ীয় বৈষ্ণব দর্শনে পরানন্দময় প্রেমই সর্বোত্তম বস্তু। শ্রীকৃষ্ণ অখণ্ড সর্বব্যাপী বিশ্বজীবনের বিগ্রহস্বরূপ। অতএব তিনিই পরম প্রেমাস্পদ। শ্রীকৃষ্ণের মুরলীধ্বনি মহত্তম সত্তার আভাস দিয়া মানুষের মনে প্রেমাকাঙ্ক্ষা সঞ্চার করে।

কীর্তন প্রেমসাধনার সঙ্গীত। ব্যক্তিগত ভাবের অনুভূতিতে বিশ্বজীবনের যে ইঙ্গিত থাকে তাহাই কীর্তনের বাণী, সুর ও নৃত্যে ফুটিয়া ওঠে। ব্যক্তিজীবনের মধ্যে প্রেমের ইঙ্গিত শ্রোতার মনে গভীর আলোড়ন সৃষ্টি করে। কীর্তনের আসরে বসিয়া কাহারও চোখে জল আসে, কেহ বিহ্বল হইয়া পড়ে, কেহ বা মূর্ছা যায়। এ ব্যাপারে ছোটবড় পণ্ডিতমূর্খ ভেদ নাই। ভাবের অনুভূতি সর্বজনীন। প্রেমাকাঙ্ক্ষাও তাহাই। গ্রামের সাধারণ মানুষ বৃন্দাবনলীলা স্মরণ করিয়া বলে

দিন গেল বৃথা কাজে রাত্রি গেল নিদে।
না ভজিনু রাধাকৃষ্ণ চরণারবিন্দে॥

সাদামাটা ভাষায় ইহা সাধারণ লোকের আকুতির কথা। একই কথা একটু অন্যভাবে সংস্কৃত শ্লোকে বলিয়াছেন বিশ্রুতকীর্তি মহাধুরন্ধর দর্শনবিদ বাসুদেব সার্বভৌম। রূপ গোস্বামীর পদ্যাবলীতে ধৃত এই শ্লোকটিতে বাঙ্গলায় নব্যন্যায়ের প্রবর্তক ও অদ্বৈত বেদান্তের অগ্রগণ্য ভাষ্যকার সার্বভৌম প্রেমাকাঙ্ক্ষা ব্যক্ত করিয়া বলিতেছেন

জ্ঞাতং কাণভুজাং মতং পরিচিতৈবান্বীক্ষিকী শিক্ষিতা
মীমাংসা বিদিতৈব সাংখ্যসরণির্যোগে বিস্তীর্ণা মতিঃ।
বেদান্তাঃ পরিশীলিতাঃ সরভসং কিন্তু স্ফুরন্-মাধুরী-
-ধারা কাচন নন্দসূনুমুরলী মচ্চিত্তমাকর্ষতি॥

(পদ্যাবলী, শ্লোক ৯৯)

[কণাদের (বৈশেষিক) মত আমি জানি, ন্যায়শাস্ত্র আমার পরিচিত, মীমাংসা-শাস্ত্রও শিক্ষা করিয়াছি, সাংখ্যমত আমার কাছে বিদিত আছে, যোগদর্শনও আমি চর্চা করিয়াছি, আর সাড়ম্বরে অনুশীলন করিয়াছি বেদান্তশাস্ত্র। কিন্তু নন্দনন্দনের (শ্রীকৃষ্ণের) বংশীধ্বনিতে যে মাধুরী ধারা তাহা আমার চিত্তকে একান্তভাবে আকর্ষণ করিয়া নিয়া গেছে।]

লীলাকীর্তন গান হয় খোলা আসরে। কাহারও আসিবার বাধা নাই। মান্যগণ্য ধনবান বিদ্যাবান লোক যেমন, তেমনই চাষাভুষা, কামারকুমার তেলীমালী ছুতার ময়রা বাগদী বাউড়ী সকলেই আসরে আসিয়া বসে। আসর চলে চার পাঁচ ঘণ্টা পর্যন্ত, কখনও আরও বেশী। আসরভরা লোক এতটা সময় ঠায় বসিয়া গান শোনে। লীলাকীর্তন রাধাকৃষ্ণের লীলাস্মরণ, প্রেমসাধনার সরণি। লীলাকীর্তন আবার গূঢ়তম ব্যক্তিগত অনুভূতির আস্বাদও বটে। লীলাকীর্তন ঐহিক জীবন-বোধকে নিয়া অধ্যাত্মভাবনায় উত্তরণের উপায়। খুব গভীর এবং সূক্ষ্ম বিষয়। এই জিনিষ নিশ্চয়ই লোকের মন টানে। তাহা না হইলে আসরভরা লোক ঘণ্টার

পর ঘণ্টা ঠায় বসিয়া গান শুনিত না। এ তো গেল এক দিকের কথা। অন্য দিকটা দেখিলে বলিতে হইবে লীলাকীর্তনের আসর লোক-শিক্ষার আসর। আসরে বসিয়া শ্রোতারা অনেক কিছু শিখিয়া নেয়। উচ্চাঙ্গের কাব্য ও গীত শোনে, শাস্ত্রীয় নৃত্য দেখে এবং তত্ত্বকথায় জ্ঞানলাভ করে। ছেলেবেলা হইতে যাহারা লীলাকীর্তন শুনিয়া আসিতেছে তাহাদের মন ও রুচি উচ্চতর সংস্কৃতির পরিপোষক হইয়া ওঠে। সাধারণ্যে উচ্চতর সংস্কৃতি জ্ঞাপন ও পরিশীলিত সাংস্কৃতিক পরিবেশ সৃষ্টি করার ব্যাপারে লীলাকীর্তনের উপযোগিতা অতুলনীয়। আধ্যাত্মিক ও সাংস্কৃতিক দুই দিক দিয়াই লীলাকীর্তন গ্রামীণ সমাজে সভ্যতার উপকরণ। বৈঠকী পদগানকে খোলা আসরে আনিয়া নরোত্তমদাস একটা খুব বড় কাজ করিয়া গিয়াছেন।

লীলাকীর্তনের চেয়ে নামকীর্তনের অনুষ্ঠান অনেক বেশী হয়। কোন একটা শুভ তিথি পাইলে বা সাধুমহান্তদের আবির্ভাব ও তিরোভাব উপলক্ষে বৈষ্ণবরা নামকীর্তন করিয়া থাকেন। অনেক মন্দিরে এমন কি ভক্তর বাড়ীতে সন্ধ্যাবেলা নিত্যনিয়মিত নামগান হয়। নামকীর্তন যুগপৎ ধর্মীয় ও সামাজিক অনুষ্ঠান। বহু জায়গায় গ্রামের লোকেরা মিলিয়া বছরে একটা নির্দিষ্ট সময়ে অষ্টপ্রহর (একদিন), চব্বিশপ্রহর (তিনদিন) কি নবরাত্রব্যাপী অখণ্ড নামসঙ্কীর্তনের আয়োজন করে। লোকে পালা করিয়া নামকীর্তন গায়। কোথাও কোথাও সারা বৈশাখ বা কার্তিক মাস ধরিয়া সন্ধ্যাবেলা সর্বজনীন নামসঙ্কীর্তন হয়। কোথাও বা কীর্তনের দল সন্ধ্যাবেলা হইতে শুরু করিয়া গ্রামের প্রতিটি বাড়ীর দুয়ারে একবার করিয়া ঘুরিয়া আসে। অনেক গ্রামেই নামকীর্তনের জন্য গ্রাম বা দেশের ষোল-আনা (অর্থাৎ সংশ্লিষ্ট সকলের যৌথ উদ্যোগে স্থাপিত) হরিমেলা বা মাড়োতলা (মণ্ডপ হইতে মাড়ো) বা বারয়ারীতলা আছে। বন্যা, অনাবৃষ্টি বা মহামারী হইলে বিপদ কাটাইবার জন্য লোকে দল বাঁধিয়া সঙ্কীর্তন করিতে করিতে গ্রাম পরিক্রম করে। এইরূপ কীর্তন পরিক্রম অবশ্য বিভিন্ন উৎসব উপলক্ষেও হইয়া থাকে।

গ্রামের সঙ্কীর্তন গ্রামস্থ সকলের সম্মিলিত অনুষ্ঠান। মেয়েরা দলে ভিড়িয়া নাচগান করে না বটে, কিন্তু পাশে থাকিয়া উলু দেয়, ধূপ দীপ ফুল দিয়া শোভা-বর্দ্ধন করে। ব্যবহারিক জীবনের উচ্চনীচ ভেদ সঙ্কীর্তনস্থলে থাকে না। ব্রাহ্মণ হইতে অন্ত্যজ সকলেরই সঙ্কীর্তনে যোগদানের অধিকার অবাধ। সঙ্কীর্তনস্থলে স্পর্শদোষ ঘটে না। জাতি এবং আর্থিক প্রশ্নে উচ্চনীচ ভেদজ্ঞান প্রবল থাকা সত্ত্বেও গ্রামীণ জীবনে যে সমবায়বুদ্ধি ছিল সঙ্কীর্তন তাহার অন্যতম আনুষ্ঠানিক

রূপ। ক্রিয়াকর্মে বিপদআপদে এই সংহতিই গ্রামের জীবনে সর্বসাধারণের অবলম্বন ছিল।

নামগুণযশোগানের সঙ্কীর্তন দিয়া চৈতন্যপন্থী ভক্তি আন্দোলনের সূচনা হইয়াছিল। চৈতন্যপ্রপত্তিতে সঙ্কীর্তন পরমার্থের সাধনা। চৈতন্যদেব যে সঙ্কীর্তন প্রবর্তন করিয়াছিলেন তাহা প্রকাশ্য এবং সর্বজনসাধ্য। চৈতন্যপ্রপত্তির টানে এবং নিত্যানন্দ প্রমুখ চৈতন্যপরিকরদের চেষ্টায় বহু লোক ভক্তি আন্দোলনে যোগ দিয়াছিল। কীর্তন ছিল ক্রমবর্ধমান ভক্তমণ্ডলীকে সংগঠিত করিবার উপায়। কীর্তনের প্রভাবে ভক্তিধর্মের আশ্রয়ে বৈষ্ণবদের সংঘশক্তি গড়িয়া উঠিতেছিল। এই সংঘশক্তির জোরেই চৈতন্যপন্থীরা রাষ্ট্রশক্তির আঘাত ও সামাজিক বিরুদ্ধতা প্রতিরোধ করিতে পারিয়াছিলেন।

আসলে চৈতন্যদেব সাধারণ মানুষের মধ্যে খুব একটা ভরসা জাগাইয়া তুলিয়াছিলেন, তাহাদের মনে গভীর আত্মবিশ্বাস আনিয়া দিয়াছিলেন। চৈতন্যদেব সমাজপতি বা পণ্ডিতমণ্ডলীর সঙ্গে সরাসরি বিবাদ করেন নাই। বরঞ্চ ইহাদের এড়াইয়া আলাদাভাবে কাজ করাই ছিল তাঁহার উদ্দেশ্য। কিন্তু চৈতন্যপ্রপত্তি বৈদান্তিক ও নৈয়ায়িক চিন্তা এবং স্মৃতিশাসিত ব্রাহ্মণ্যবাদের পরিপন্থী ছিল বলিয়া চৈতন্যদেব নবদ্বীপে বাধা পাইয়াছিলেন। প্রতিপক্ষের সঙ্গে বিরোধও বোধ হয় তাঁহার বাধিয়া গিয়াছিল। চৈতন্যদেব সন্ন্যাস নিবার আগে বিরোধ ঘনীভূত হইবার আভাস মেলে। চৈতন্যদেব যে হঠাৎ করিয়া সন্ন্যাস নিলেন তাহার একটা কারণ হয়ত বিরোধ পরিহার করার ইচ্ছা। বৃন্দাবনদাসের কাব্য অনুসারে চৈতন্যদেব নিজেই এই কথা বলিয়াছেন (চৈ.ভা. ২।১৫)। সন্ন্যাস নিয়া চৈতন্যদেব বাঙ্গলা ছাড়িয়া চলিয়া গেলেও ভক্তি আন্দোলন সম্পর্কে সামাজিক ও তত্ত্বগত বিরুদ্ধতার অবসান হয় নাই। বৈষ্ণবদের জীবনী ও ঐতিহাসিক নিবন্ধে ইহার অনেক প্রমাণ আছে (উদাহরণস্বরূপ উল্লেখযোগ্য প্র.বি., ১৯ বিলাস; ন.বি. ১০ বিলাস; অভিরামলীলামৃত, ৮ পরিচ্ছেদে)। ভক্তি আন্দোলনের প্রসর্যমান সংঘশক্তি শাসকদেরও পছন্দ হয় নাই। এই দিক হইতেও বড় রকমের বাধা আসিতেছিল। চৈতন্যদেবের পরে নিত্যানন্দ, গদাধরদাস, গৌরীদাস পণ্ডিত, অভিরাম গোস্বামী, শ্যামানন্দ প্রমুখ মহান্তরা শাসকদের প্রাতিকূলতার সম্মুখীন হইয়াছিলেন (এই বিষয়ে ইতিপূর্বে যে উল্লেখ আছে তাহা ছাড়া দ্রষ্টব্য নিত্যানন্দবংশবিস্তার, ৭ বিলাস এবং অভিরামলীলামৃত, ৮ পরিচ্ছেদ)। চৈতন্যপন্থীদের এই সব বাধাবিপত্তি কাটাইয়া চলিতে হইয়াছিল। মনের মধ্যে ভরসা ও বাহিরে সংঘশক্তি ছিল বলিয়াই

চৈতন্যপন্থীরা দীর্ঘদিন ধরিয়া এই সব প্রতিকূলতা প্রতিরোধ করিয়া চলিতে পারিয়াছিলেন। কীর্তন ভিতরে বাহিরে মানুষের বল যোগাইবার সংগঠন।

প্রকাশ্য সম্মেলক কীর্তন মানুষের মনে বলভরসা ও সাহস সঞ্চার করে। এখনও বিপদআপদ বাধিলে লোকে কীর্তন লাগাইয়া দেয়। প্রাকৃতিক বিপর্যয় হইলে বা মহামারী দেখা দিলে গ্রামের লোকে অসহায় হইয়া পড়িত, তাহাদের বাঁচাইবার কোন ব্যবস্থা আগেকার দিনে ছিল না। এখনও যে খুব আছে তাহা বলা চলে না। এই অবস্থায় মনের জোরে যেটুকু রক্ষা পাওয়া যায়। স্বাধীনতা সংগ্রামের সময় দেখা গিয়াছে গান্ধীবাদী গণআন্দোলনের সত্যাগ্রহীরা সঙ্কীর্তন করিতেন। সত্যাগ্রহ করা বেশ কঠিন কাজ। সরকারের আইন ও হুকুম অমান্য করিলে কঠোর নির্যাতন অবশ্যম্ভাবী। মারধর, গুলিগালা, জেল-জরিমানা ছিল, আবার অস্থাবর সম্পত্তি মায় হালবলদ পর্যন্ত বাজেয়াপ্ত হইত। এই রকম অবস্থার সম্মুখীন হইবার সময় গৃহস্থলোকের মনে কিছুটা আশঙ্কা হওয়া অসম্ভব নয়। দুইচার জন হয়ত ভয়ে পিছাইয়া পড়িত। আশঙ্কা দূর করিয়া সাহস সঞ্চয় করা এবং সংঘশক্তি পাকা করিয়া নেওয়ার উদ্দেশ্যে সত্যাগ্রহী গ্রামবাসীরা সকলে মিলিয়া সঙ্কীর্তন করিতেন।

দুর্বল বা বিচ্ছিন্ন দেখিলে যে যাহার মত পাইয়া বসে। মানুষের মর্যাদা নিয়া বাঁচিতে হইলে আত্মবিশ্বাস ও আত্মরক্ষার শক্তি থাকা চাই। চৈতন্যদের সাধারণ মানুষের মধ্যে আত্মবিশ্বাস ও আত্মশক্তির উদ্বোধন করিয়াছিলেন। সামাজিক পরিচয় নির্বিশেষে স্ত্রী-পুরুষ সকলেই মুক্তিলাভের অধিকারী, পূজাপাঠ আচার অনুষ্ঠানের কোন প্রয়োজন নাই, তন্ময় হইয়া কীর্তন করিলেই পরমার্থ লাভ হইবে, এই সব কথা স্মৃতিশাস্ত্রের বিধানে যাহারা পতিত অধম, ব্যবহারিক জীবনে যাহারা দৈন্যপীড়িত অভাজন কিংবা বিদ্যাহীন মূর্খ, গুহ্য সম্প্রদায়সমূহের গোপন ধর্মাচরণে নিবিষ্ট যাহারা হেয় অবজ্ঞাত সেই সব মানুষের মনে গভীর উদ্দীপনা ও প্রবল ভরসা সঞ্চার করিয়াছিল। সম্মেলক কীর্তনের জনসংঘে ইহাদেরই সংখ্যাধিক্য। অদ্বৈত আচার্যের কথায় এই সব মানুষের জন্য প্রেমভক্তি প্রচারের প্রতিজ্ঞা চৈতন্যদেব করিয়াছিলেন এবং নিত্যানন্দ প্রমুখ পরিকরদের সহায়তায় সেই প্রতিজ্ঞা তিনি পালন করিয়াছিলেন। চৈতন্যদেবের ভক্তি আন্দোলন সম্পর্কে এইটাই সবচেয়ে বড় কথা। চৈতন্যদেবের পরে গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্ম শাস্ত্রনির্ভর ও স্মৃতিঘেঁষা হইয়া উঠিলেও তাহার ফলে সর্বজনীন সঙ্কীর্তনে কোন বাধা জন্মে নাই। সংগঠিত গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মে জাতিবদ্ধ সমাজের উচ্চনীচ ভেদবুদ্ধি প্রশ্রয় পাইয়াছে বটে কিন্তু এই ধর্মই ভক্তিসাধনের অঙ্গ হিসাবে লীলাকীর্তন ও

বিদ্যাচর্চায় সকলকে সমান অধিকার দিয়াছে। চৈতন্যপ্রবর্তিত সাধারণ মানুষের মধ্যে আত্মবিশ্বাস ও আত্মপ্রতিষ্ঠা অর্জনের প্রেরণা জাগাইয়াছিল, গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্ম তাহাদের শিক্ষিত মননশীল ও সংস্কৃতিবান করিয়া তুলিবার ব্যবস্থা করিয়াছে। ইহাও আত্মমর্যাদা প্রতিষ্ঠার উপায়।

সাধারণ মানুষের জীবনে কীর্তনের উপযোগিতা বুঝিয়া ইহার সামাজিক মূল্য বিচার করিতে হইবে। কীর্তনের অনেক বিরুদ্ধ সমালোচনা আছে। গোড়ার দিকে যাঁহারা ভক্তিধর্মের বিরোধিতা করিয়াছিলেন তাঁহাদের কথা বাদ দিলাম। নূতন কোন ধ্যানধারণা প্রবল হইয়া উঠিতে থাকিলে প্রচলিত চিন্তাভাবনার ধারক ও বাহকরা তাহাকে ঠেকাইবার চেষ্টা করিবে ইহাতে আশ্চর্য হইবার কিছু নাই। শাক্তরা খুব কীর্তন বিরোধী। বিরোধিতায় তাহাদের প্রকাশভঙ্গি সাম্প্রদায়িকতা দোষদুষ্ট। তবে বৈষ্ণবদের কীর্তনের বিরোধিতা করিবার পক্ষে শাক্তদের নিজস্ব একটা যুক্তি আছে। বৈষ্ণব সাধনায় ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত দুই দিকের গুরুত্বই সমান। কিন্তু শক্তিসাধনা মূলতঃ ব্যক্তিগত ব্যাপার। সমষ্টিগত ভাবনা শাক্ত সংস্কৃতিতে কিছুটা আছে বটে, তবে সে খুব আলগা। শাক্তরাও কালীকীর্তন করিয়া থাকে, কিন্তু তাহাদের সাধনায় ইহা অবান্তর। জোরে বাজনা বাজাইয়া উচ্চকণ্ঠে সমষ্টিগত সম্মেলক কীর্তন এবং কীর্তনের সময় বৈষ্ণবদের উন্মাদনা শাক্তদের সম্পূর্ণ অনভিপ্রেত। বিশুদ্ধ রাগ সঙ্গীতরসিকরা লীলাকীর্তন অপছন্দ করেন। বিলম্বিত তাল এবং আখর, ছুট ও তুকের জন্য লীলাকীর্তন তাঁহাদের একঘেয়ে এবং বিরক্তিকর লাগে।

আধুনিক কালের শিক্ষিত মণ্ডলীতে কীর্তনের প্রতি শ্রদ্ধা নাই, পরন্তু অবজ্ঞা ও অপরাগের লক্ষণ আছে। দুই একটা দৃষ্টান্ত দিলেই মনোভাবটা স্পষ্ট হইবে। ১৯৪৬ সালে নোয়াখালিতে বীভৎস হত্যাকাণ্ডের পর মহাত্মা গন্ধী সেখানে শান্তি স্থাপন করিতে গিয়াছিলেন। তাঁহার নির্দেশে প্রত্যেকটি বিধ্বস্ত গ্রামে দুই তিন জন করিয়া রাজনৈতিক কর্মী কাজ করিতে গেলেন। লোকের মনে সাহস সঞ্চার করা ও পুনর্বাসনে সহায়তা করিবার দায়িত্ব এই কর্মীদের উপর দেওয়া হইয়াছিল। প্রখ্যাত সন্ত্রাসবাদী বিপ্লবী বীণা দাস গিয়াছিলেন রামগঞ্জ থানার নোয়াখালা গ্রামে। তাঁহার সঙ্গীদের মধ্যে ছিলেন মৃদুলা দত্ত। ইনি তখন সদ্য এম.এ. পাশ। নোয়াখালার অভিজ্ঞতা বর্ণনা প্রসঙ্গে বীণা দাস একটা ঘটনার উল্লেখ করিয়াছেন। ঘটনাটির বিবরণ উদ্ধার করিতেছি।

> গ্রামে যে আবার সহজ জীবন ফিরে এসেছে সেইটাই প্রমাণ করবার জন্য গ্রামের লোকেরা একদিন হরিসংকীর্তনের ব্যবস্থা করলেন।

...হারমনিয়াম, ঢাক ঢোল বাজিয়ে গলা ফাটিয়ে সে কি কীর্তনের ধূম! মৃদুলা কানে কানে ফিস ফিস করে বললো "বীণাদি, এরাই যখন ক্যাম্পে টাকার দরখাস্ত নিয়ে যায় কি রকম মিন মিন করে। এখন তো দেখি খুব তেজ!"

(বীণা দাস ১৩৫৫ ঃ পৃ. ১৮৩)।

বাঙ্গলার অন্য সব এলাকার মত নোয়াখালিতেও হিন্দুদের মধ্যে বৈষ্ণবের সংখ্যাধিক্য। বৈষ্ণবতার প্রসার দেখিয়া বীণা দাসের মনে একটা প্রশ্ন জাগিয়াছিল। —'আমার কেমন সন্দেহ হ'ত অন্য বহুবিধ কারণের সঙ্গে নোয়াখালির হিন্দুদের এই চরম দুর্দশা ও ভীরুতার পিছনে এই বৈষ্ণব ধারাও খানিকটা ছিল না তো?' —(তদেব)।

দীনেশচন্দ্র সেন কীর্তনানুরাগী ছিলেন। তাঁহার বাড়ীতে প্রায়ই লীলাকীর্তনের আসর বসিত। ঠাকুরদার বাড়ীতে বার বার এই গান শুনিয়া দীনেশচন্দ্রর নাতি সমর সেন অল্প বয়সেই কীর্তনের উপর খুব নারাজ হইয়া উঠিয়াছিলেন। সেই স্মৃতি তিনি পরে লিখিয়াছেন "আবেগপ্রধান পুনরাবৃত্তিতে কেন জানি না বিদ্রূপের ভাব জেগে উঠত" (সমর সেন ১৯৭৮ ঃ ১৩)।

মৃদুলা দত্ত, বীণা দাস ও সমর সেনের মনোভাব সাধারণভাবে শিক্ষিত লোকের সমর্থন পাইবে। আধুনিক শিক্ষিত মণ্ডলীতে এমনিতেই সমষ্টিগত সামাজিকতা কম। তাহার উপরে গ্রামীণ সমাজের সঙ্গে তাহার মানসিক ও সাংস্কৃতিক যোগ ছিন্ন হইয়া গিয়াছে। তাই গ্রামীণ লোকের আচরণ শিক্ষিত লোকে ঠিকমত বুঝিতে পারে না, তাহাদের কাছে বিসদৃশ ও বিরক্তিকর লাগে। নোয়াখালার বিপন্ন মানুষ ঠাকুরবাড়ীতে কীর্তন করিয়া সংঘশক্তির আবাহন করিতেছিল। চৈতন্যদেবের সময় হইতে বিপদে পড়িলে সাধারণ লোকে কীর্তন করিয়া মনোবল সঞ্চয়ের চেষ্টা করিয়াছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চশিক্ষাপ্রাপ্ত স্বেচ্ছাকর্মী তাহা বুঝিতে পারেন নাই। যে আবেগময় পুনরাবৃত্তি সমর সেনের কাছে বিদ্রূপের বিষয় তাহাই ছিল সর্বজনীন লোকশিক্ষার পদ্ধতি। ছেলেবেলা হইতে যাহাদের খাটিয়া-খুটিয়া দিন যায়, কলেজ বা বিশ্ববিদ্যালয়ে নিয়মিত শিক্ষালাভের সুযোগ যাহাদের হয় না, উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের সুর, কাব্যের সৌন্দর্য ও তত্ত্বকথার জটিলতা তাহাদের বোধগম্য করিয়া তুলিতে হইলে আবেগময় পুনরাবৃত্তির প্রয়োজন হয়। আধুনিক শিক্ষিত মনের কাছে ইহা অবোধ্য কারণ গ্রামীণ জীবনে সর্বজনীন লোকশিক্ষার সাবেক ব্যবস্থা তাহার দৃষ্টিতে মূল্যহীন হইয়া পড়িয়াছে। সঙ্কীর্তন লোকে কি জন্য করে, লীলাকীর্তনের আসরে লোকে এতটা সময় কেন বসিয়া থাকে এই সব ঠিক

মত না বুঝিলে কীর্তনের বিচার করা অনুচিত। কীর্তন শুধুমাত্র গান নয়। কীর্তনগানে ভক্তিসাধন হয়, কীর্তন আবার সামাজিক সংগঠনও বটে। গায়ক ভাল হইলে লীলাকীর্তন সঙ্গীত হিসাবে সুন্দর হয়, রসজ্ঞ গায়ক শ্রোতার মনে ভাব ও অনুভূতি জাগাইতে পারেন। এ সব উঁচুদরের কথা। এই দিক দিয়া উঁচুদরের না হইলেও কীর্তন নিরর্থক হইবে না, শ্রোতার কাছে তাহার অন্য দাম আছে। সম্মেলক সঙ্কীর্তনে একসঙ্গে অনেক লোকে গানবাজনা করে। সকলের সুর ও তাল জ্ঞান সমান হয় না, কেহ হয়ত একেবারেই গুণহীন। এই ধরণের লোক অনেক সময় প্রাণপণে গলা চড়াইয়া ঘাটতি পোষাইয়া নিতে চায়। কিন্তু অনেকে মিলিয়া যেখানে গান করিতেছে সেখানে দুইচার জনের বিচ্যুতি বা বাড়াবাড়ি নিয়া কেহ মাথা ঘামায় না। সম্মেলক আচরণটাই আসল কথা। সে ব্যাপারে সকলেরই ভূমিকা সমান।

কীর্তনগানের সুসময় চলিয়া গিয়াছে। যে সামাজিক সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলে কীর্তনের বিকাশ হইয়াছিল তাহা দ্রুত বিলয়মান। শ্রীখণ্ডের টোল উঠিয়া গিয়াছে। ময়নাডালের টোলও নিবু নিবু। বংশপরম্পরা যাঁহারা কীর্তন গাহিতেন সেই সব বংশে কীর্তনচর্চা নামমাত্র বজায় আছে নয়ত একেবারেই উঠিয়া গিয়াছে। এখনকার বড় গাইয়েরা সকলেই প্রায় বৃদ্ধ। নতুন কালের বড় কীর্তনীয়া বেশী নাই। দ্রুতগতিময় জীবনযাত্রায় বিলম্বিত লয়ের কীর্তনগান দীর্ঘসময় ধরিয়া শুনিবার অবকাশ কমিয়া যাইতেছে, দিনে আরও কমিয়া যাইবে। কীর্তনের পোষকতাও ক্ষয়িষ্ণু। বিভিন্ন গণপ্রচারের মাধ্যম চালু হইয়াছে। সময়োপযোগী আমোদ-প্রমোদের উপায়ও এখন সহজলভ্য। ইহাদের আকর্ষণও ঢের। অন্যদিকে গ্রামীণ সংঘশক্তি ও সমবায় নষ্ট হইবার পথে। এখন গ্রামে গ্রামে রাজনৈতিক দলগত সমাবেশ বাড়িয়া চলিয়াছে। এই অবস্থায় লীলাকীর্তনের প্রসার আগের মত আর নাই। নাম সংকীর্তনের আয়োজনও সংক্ষিপ্ত হইয়া আসিতেছে। পরিস্থিতি প্রতিকূল তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু আসর বসিলে ঢের লোক জুটিয়া যায়। অনেক ঝামেলার মধ্যে মানুষের দিনপাত হয় তাই আগের মত আর জমে না বটে, কিন্তু এখনও সন্ধ্যাবেলা গ্রামে গ্রামে সঙ্কীর্তনের ধ্বনি ওঠে, হরিবাসর হয় এবং দুই একটা উপলক্ষে লোকে দল করিয়া সঙ্কীর্তন পরিক্রম করে। এইভাবে কীর্তনসংস্কৃতি হয়ত আরও কিছুদিন টিকিয়া থাকিবে কিন্তু তাহার অবস্থা পলিপড়া স্রোতস্বতীর মতন। বাঙ্গলার নদীপ্রবাহের মতো কীর্তনের প্রবাহেও টান পড়িয়াছে। আমোদ-প্রমোদের নূতন ব্যবস্থা যা চালু হইয়াছে তাহাতে সাময়িক উত্তেজনার খোরাক বেশী, চিত্তবিকাশের উপাদান কম।

কীর্তনের মতো গ্রামীণ সংস্কৃতি সম্পর্কে শহরের শিক্ষিত সমাজ বীতরাগ। কীর্তনের বিকাশ হইয়াছিল আত্মনির্ভরশীল গ্রামীণ সমাজের আশ্রয়ে। সেই সমাজ বজায় থাকিলে শিক্ষিত নাগরিকের উপেক্ষা বা উপহাসে ক্ষতি ছিল না। ভক্তিধর্ম ও কীর্তন তো অনেক প্রতিকূলতার সম্মুখীন হইয়াছিল। কিন্তু তাহাতে কোথাও আটকায় নাই কেননা বাহিরের চাপ সহ্য করিয়া নিজস্ব সংস্কৃতিতে ধারণ ও পোষণ করিবার মত শক্তি গ্রামীণ সমাজের যথেষ্ট পরিমাণে ছিল। সে দিনের আত্মনির্ভরতা ও আত্মরক্ষার শক্তি গ্রামীণ সমাজের আজ আর নাই। প্রায় সব ব্যপারেই গ্রাম আজ শহরের মুখাপেক্ষী। শহরের যে শিক্ষিত সমাজ দেশ চালায় কীর্তনের মতো গ্রামীণ সংস্কৃতির প্রতি তাহার বিরূপতা গ্রামের জীবনকে প্রভাবিত করিবেই। ইহার ফলে অপচীয়মান কীর্তনের ধারা ক্রমশ শীর্ণতর হইয়া উঠিবে। অবস্থান্তরের দরুন ইহাই হয়ত অনিবার্য। কিন্তু দেশের চিত্তভূমিতে রসসিঞ্চন করিবার এবং মননশক্তিকে জাগ্রত রাখিবার অন্য কোন সর্বজনীন আয়োজন এখনও হয় নাই। মানুষের স্বাভাবিক আত্মমর্যাদাবোধ ও সমবায় বুদ্ধিকে নিয়মিত অনুশীলন দ্বারা সজীব রাখিবার জন্য সঙ্কীর্তনের মতো গ্রামের লোকের নিজস্ব কোন সংগঠনও নূতন করিয়া তৈরী হয় নাই। চিন্তার কথা ইহাই।

উল্লিখিত রচনাপঞ্জী

অনুরাগবল্লী, মনোহরদাস-বিরচিত

গৌরাব্দ ৪৪৫ (১৯৩১)—মৃণালকান্তি ঘোষ সংরক্ষণ।

(সম্পাদক) মৃণালকান্তি ঘোষ। কলিকাতা।

অভিরামলীলামৃত, তিলকরামদাস-বিরচিত

বঙ্গাব্দ ১৩৮৮ শ্রীশ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণবশাস্ত্র (গ্রন্থমালা), শ্রীশ্রীনিতাই গৌরাঙ্গ গুরুধাম সংস্করণ।

(সম্পাদক) কিশোরীদাস বাবাজী। চৈতন্যডোবা, হালিসহর, উত্তর চব্বিশ পরগণা।

আনন্দবৃন্দাবনচম্পূ, কবিকর্ণপুর-কৃত

১৮৬৭—শ্যামলাল কৃষ্ণলাল গুপ্ত সংস্করণ।

(সম্পাদক) মুকুন্দদেব শাস্ত্রী। বোম্বাই।

আনিসুজ্জামান

১৯৭৬—স্বরূপের সন্ধানে। ঢাকা।

উজ্জ্বলনীলমণি, রূপগোস্বামী-কৃত

গৌরাব্দ ৪৬৯ (১৯৫৫)—হরিবোল কুটীর সংস্করণ।

(সম্পাদক) হরিদাসদাস। নবদ্বীপ।

ওয়ার্ড, উইলিয়ম

১৮১১—*Account of the Writings, Religion and Manners of the Hindus*, Vol. V.। শ্রীরামপুর।

কর্ণানন্দ, যদুনন্দনদাস-বিরচিত

১৯৭৬—শান্তিলতা রায় (সম্পাদিত) বৈষ্ণবসাহিত্য ও যদুনন্দন গ্রন্থে বিধৃত। কলিকাতা।

কৃষ্ণচৈতন্যচরিতামৃতম্ (কড়চা), মুরারি গুপ্ত-বিরচিত

১৯৮৬—পুষ্পরাণী মণ্ডল সংস্করণ।

(সম্পাদক) মদনমোহন গোস্বামী। কলিকাতা।

কৃষ্ণভজনামৃতম্, নরহরি সরকার-প্রণীত
১৩৩৯—রঘুনন্দন সমিতি সংস্করণ।
(সম্পাদক) নিত্যানন্দদাস কাব্যতীর্থ। শ্রীখণ্ড, বর্ধমান।

ক্রমসন্দর্ভঃ, জীব গোস্বামী-কৃত
১৯৫২—হরিদাস শর্মণ সংস্করণ।
(সম্পাদক) পুরীদাস মহাশয়। বৃন্দাবন।

গজেন্দ্রগদকার, কে ভি
১৯৫৬—'Maharastra Saints and their Teachings', হরিদাস ভট্টাচার্য্য (সম্পাদিত) *The Cultural Heritage of India*, Vol. IV গ্রন্থে বিধৃত। কলিকাতা।

গুপ্ত, নির্মলনারায়ণ
বঙ্গাব্দ ১৩৯৩—'ব্রজভাষায় গৌরপদাবলী'
বরুণকুমার চক্রবর্তী (সম্পাদিত) চৈতন্য-পরিক্রমা গ্রন্থে বিধৃত। কলিকাতা।

গোবিন্দলীলামৃতম্, কৃষ্ণদাস কবিরাজ-প্রণীত
১৯০৮
(সম্পাদক) শচীনন্দন গোস্বামী। বৃন্দাবন।

গোল, সুসান
১৯৮৩—*India Within the Ganges*। দিল্লী।

গোস্বামী, প্রাণকিশোর
বঙ্গাব্দ ১৩৭৫—কথকথার কথা। কলিকাতা।

গোস্বামী, নবীগোপাল
বঙ্গাব্দ ১৩৭৯—চৈতন্যোত্তর যুগে গৌড়ীয় বৈষ্ণব। কলিকাতা।

গৌরগণোদ্দেশদীপিকা, কবিকর্ণপুর-বিরচিত
বঙ্গাব্দ ১৩২৯—হরিভক্তিপ্রদায়িনী সভা সংস্করণ।
(সম্পাদক) রামনারায়ণ বিদ্যারত্ন। বহরমপুর, মুর্শিদাবাদ।

গৌরাঙ্গবিজয়, চূড়ামণিদাস-বিরচিত
১৯৫৭—বিবলিওথেকা ইণ্ডিকা, এশিয়াটিক সোসাইটি সংস্করণ।
সম্পাদক) সুকুমার সেন। কলিকাতা।

ঘোষ, ডি পি
১৯৮২—*Mediaeval Indian Painting : Eastern School*। দিল্লী।

চক্রবর্তী, বাণী
১৯৭০—সমাজসংস্কারক রঘুনন্দন। কলিকাতা।

চক্রবর্তী, রমাকান্ত
১৯৮৫—*Vaisnavism in Bengal 1486-1901*। কলিকাতা।

চৈতন্যচকড়া (ওড়িয়া), গোবিন্দদাস বাবাজী-প্রণীত
১৯৮৫—কৈলাস প্রকাশন সংস্করণ।
(সম্পাদক) সদাশিব রথশর্মা। কলিকাতা।

চৈতন্যচন্দ্রামৃতম্, প্রবোধানন্দ সরস্বতী-বিরচিত
বঙ্গাব্দ ১৩৬০—বৈষ্ণব সম্মিলনী সংস্করণ।
(সম্পাদক) অনাদিমোহন গোস্বামী। কলিকাতা।

চৈতন্যচন্দ্রোদয়ম্, কবিকর্ণপুর-বিরচিত
গৌরাব্দ ৪৮৮ (১৯৭৪)—শ্রীচৈতন্য মঠ সংস্করণ।
(সম্পাদক) ত্রিদণ্ডী গোস্বামী ভক্তিবিলাসতীর্থ মহারাজ। শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

চৈতন্যচরিতামৃত, কৃষ্ণদাস কবিরাজ-বিরচিত
বঙ্গাব্দ ১৩৯২—আনন্দ পাবলিশার্স সংস্করণ।
(সম্পাদক) সুকুমার সেন, তারাপদ মুখোপাধ্যায়। কলিকাতা।

চৈতন্যচরিতামৃতম্ (মহাকাব্য), কবিকর্ণপুর-বিরচিত
তারিখ বিহীন—শ্রীগৌরাঙ্গ মন্দির সংস্করণ।
(সম্পাদক) প্রাণকিশোর গোস্বামী। কলিকাতা।

চৈতন্যমঙ্গল, জয়ানন্দ-বিরচিত
১৯৭১—বিবলিওথেকা ইণ্ডিকা, এশিয়াটিক সোসাইটি সংরক্ষণ।
(সম্পাদক) বিমানবিহারী মজুমদার ও সুখময় মুখোপাধ্যায়। কলিকাতা।

চৈতন্যমঙ্গল, লোচনদাস-বিরচিত
বঙ্গাব্দ ১৩৮৮—আনন্দগোপাল শাস্ত্রী সংস্করণ।
(সম্পাদক) ভগবানদাস কাব্য ব্যাকরণতীর্থ। বুড়ি আমবাগান, নবদ্বীপ।

চৈতন্যভাগবত, বৃন্দাবনদাস-রচিত
১৯৩৮—গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্মিলনী সংস্করণ।
(সম্পাদক) অতুলকৃষ্ণ গোস্বামী। কলিকাতা।

চৌধুরী-কামিল্যা, মিহির
১৯৮১—নরহরি চক্রবর্তী জীবনী ও রচনাসংগ্রহ, ১ ও ২ খণ্ড। বর্ধমান।

জানা, নরেশচন্দ্র
১৯৭০—বৃন্দাবনের ছয় গোস্বামী। কলিকাতা।

ঠাকুর, গৌরগুণানন্দ
১৯৮৬—শ্রীখণ্ডের প্রাচীন বৈষ্ণব। শ্রীখণ্ড, বর্ধমান।

ঠাকুর, দেবেন্দ্রনাথ
১৯৬২—আত্মজীবনী। বিশ্বভারতী ৪র্থ সংস্করণ। কলিকাতা।

ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ
১৯৬২—'শিক্ষার বিকিরণ', পল্লীপ্রকৃতি গ্রন্থে বিধৃত। কলিকাতা।

ঠাকুর, সীতানন্দ
১৯৭৭—'পণ্ডিত গৌরগুণানন্দ ঠাকুর কীর্তনাচার্যের কীর্তনশিক্ষাগ্রহণ ও শিক্ষাদান'।
নিত্যনিরঞ্জন কবিরাজ, আমার দেখা শ্রীখণ্ড গ্রন্থে ধৃত। নবদ্বীপ।

ত্রিবেদী, রামেন্দ্রসুন্দর
বঙ্গাব্দ ১৩০৬—'একখানি প্রাচীন দলিল'।
সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা, ষষ্ঠভাগ, চতুর্থ সংখ্যা। কলিকাতা।

ত্রিবেদী, রামেন্দ্রসুন্দর
বঙ্গাব্দ ১৩০৮—'আর একখানি প্রাচীন দলিল'।
সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা। অষ্টম ভাগ, প্রথম সংখ্যা। কলিকাতা।

দাশগুপ্ত, শশিভূষণ
বঙ্গাব্দ ১৩৬৭—ভারতের শক্তিসাধনা ও শাক্তসাহিত্য। কলিকাতা।

দাস, বীণা
বঙ্গাব্দ ১৩৫৫—শৃঙ্খল ঝংকার। কলিকাতা।

দে, সুশীলকুমার

১৯৬১—*Early History of the Vaisnava Faith and Movement in Bengal*। কলিকাতা।

নরোত্তমবিলাস, নরহরি চক্রবর্তী-বিরচিত

বঙ্গাব্দ ১২৬২—কানাইলাল শীল সংস্করণ। কলিকাতা।

নাথ, নীরদভূষণ

১৯৭৫—নরোত্তমদাস ও তাঁহার রচনাবলী। কলিকাতা।

নিত্যানন্দবংশবিস্তার, বৃন্দাবনদাসের নামে আরোপিত।

বঙ্গাব্দ ১৩৮৭—গৌড়ীয় বৈষ্ণবশাস্ত্র (গ্রন্থমালা)। শ্রীশ্রীনিতাই গৌরাঙ্গ গুরুধাম সংস্করণ।

(সম্পাদক) কিশোরী দাস বাবাজী। চৈতন্যডোবা, হালিসহর, উত্তর চব্বিশ পরগণা।

পদকল্পতরু, বৈষ্ণবদাস-সঙ্কলিত

বঙ্গাব্দ ১৩০৪—ভারত-গ্রন্থ-প্রচার-সমিতি।

(সম্পাদক) সতীশচন্দ্র রায়। কলিকাতা।

পদ্যাবলী, রূপগোস্বামী-সঙ্কলিত

১৯৩৪—ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সংস্করণ।

(সম্পাদক) সুশীলকুমার দে। ঢাকা।

পাল, বিপিনচন্দ্র

১৯৬২—সত্তর বৎসর। কলিকাতা।

প্রজ্ঞানানন্দ, স্বামী

১৯৭০—পদাবলী কীর্তনের ইতিহাস, ১ ভাগ। কলিকাতা।

প্রেমবিলাস, নিত্যানন্দদাস-বিরচিত

১৩১৮—হরিভক্তি প্রদায়িনী সভা সংস্করণ।

রাসবিহারী সাংখ্যতীর্থ কর্তৃক সংশোধিত। বহরমপুর, মুর্শিদাবাদ।

বন্দ্যোপাধ্যায়, সুরেশচন্দ্র

বঙ্গাব্দ ১৩৬৮—স্মৃতিশাস্ত্রে বাঙ্গালী। কলিকাতা।

বসুভক্তিসাগর, অযোধ্যানাথ

বঙ্গাব্দ ১৩৬৬—প্রভুপাদ শ্রীল ভক্তিতীর্থ ঠাকুরের সংক্ষিপ্ত জীবনী। সাউরী, মেদিনীপুর।

বসু, মণীন্দ্রনাথ

১৯৩২—সহজিয়া সাহিত্য। কলিকাতা।

বসু, নির্মলকুমার

১৯৪৯—হিন্দুসমাজের গড়ন। লোকশিক্ষা গ্রন্থমালা, বিশ্বভারতী। কলিকাতা।

বংশীশিক্ষা, প্রেমদাস মিশ্র-বিরচিত

বঙ্গাব্দ…যোগেন্দ্রনাথ দে সংস্করণ। হরেকৃষ্ণদাস কর্তৃক সংশোধিত। কলিকাতা।

বাসু ঘোষের পদাবলী

বঙ্গাব্দ ১৩৬৮—বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ সংস্করণ।

(সম্পাদক) মালবিকা চাকী। কলিকাতা।

বিবর্ত বিলাস, আকিঞ্চনদাস-কৃত

বঙ্গাব্দ ১৩১১—বিদ্যারত্ন যন্ত্র সংস্করণ। কলিকাতা।

বৃহৎবৈষ্ণবতোষিণী, সনাতন গোস্বামী-কৃত

১৯৫১—হরিদাস শর্মণ সংস্করণ।

(সম্পাদক) পুরীদাস মহাশয়। বৃন্দাবন।

বৃহৎভাগবতামৃতম্, সনাতন গোস্বামী-কৃত

বঙ্গাব্দ ১৩৬২—প্রপন্ন মঠ সংস্করণ।

(সম্পাদক) ভক্তিরত্ন গোস্বামী, ভক্তিশাস্ত্রী গোস্বামী। সাউরী, মেদিনীপুর।

ব্রহ্মাণ্ডপুরাণম্

বঙ্গাব্দ ১৩১৫—বঙ্গবাসী সংস্করণ।

(সম্পাদক) পঞ্চানন তর্করত্ন। কলিকাতা।

ভক্তিরত্নাকর, নরহরি চক্রবর্তী-বিরচিত

১৯৬০—গৌড়ীয় মিশন সংস্করণ।

(সম্পাদক) নন্দলাল বিদ্যাসাগর। কলিকাতা।

ভক্তিরসামৃতসিন্ধু, রূপ গোস্বামীকৃত
বঙ্গাব্দ ১৩২০—হরিভক্তিপ্রদায়িনী সভা সংস্করণ।
(সম্পাদক) রামদেব মিশ্র। বহরমপুর, মুর্শিদাবাদ।

ভক্তিসন্দর্ভঃ, জীব গোস্বামী-প্রণীত
১৯৬২—কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় সংস্করণ।
(সম্পাদক) কৃষ্ণগোপাল গোস্বামী। কলিকাতা।

ভক্তিসারসমুচ্চয়, লোকানন্দ আচার্য-প্রণীত
১৯২০—রাখালানন্দ ঠাকুর সংস্করণ।
(সম্পাদক) রাখালানন্দ ঠাকুর। শ্রীখণ্ড, বর্ধমান।

ভট্টাচার্য, দীনেশচন্দ্র
বঙ্গাব্দ ১৩৫৮—বাঙ্গালীর সারস্বত অবদান, প্রথমভাগ, বঙ্গে নব্যন্যায় চর্চা। কলিকাতা।

ভাগবতপুরাণম্ (শ্রীমদ্ভাগবতম্)
বঙ্গাব্দ ১৩২২—বঙ্গবাসী সংস্করণ।
(সম্পাদক) পঞ্চানন তর্করত্ন। কলিকাতা।

ভাদুড়ী, নৃসিংহপ্রসাদ
১৯৮৫—'A Typical Case of Plagiarism'
Vishveshvaranand Indological Journal, Vol. XXIII, Pts. i-ii.
পাঞ্জাব ইউনিভার্সিটি, হোসিয়ারপুর।

মজুমদার, বিমানবিহারী
১৯৫৯—শ্রীচৈতন্যচরিতের উপাদান। কলিকাতা।

মজুমদার, শৈলজারঞ্জন
তারিখ অনুল্লিখিত—নৃত্যনাট্য।
ভারত কোষ, চতুর্থ খণ্ডে বিধৃত।
বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, কলিকাতা।

মনসাবিজয়, বিপ্রদাস পিপলাই-বিরচিত
১৯৫৩—বিব্লিওথেকা ইণ্ডিকা, এশিয়াটিক সোসাইটি সংস্করণ।
(সম্পাদক) সুকুমার সেন। কলিকাতা।

মহানির্বাণতন্ত্রম্
বঙ্গাব্দ ১৩৩৩—বঙ্গবাসী সংস্করণ।
(সম্পাদক) পঞ্চানন তর্করত্ন। কলিকাতা।

মিত্র, খগেন্দ্রনাথ
বঙ্গাব্দ ১৩৫২—কীর্তন। বিশ্ববিদ্যাসংগ্রহ, বিশ্বভারতী। কলিকাতা।

মিত্র, খগেন্দ্রনাথ
১৯৫৬—'Diffusion of Socio-Religious Culture in North India'. (সম্পাদক) হরিদাস ভট্টাচার্য, *The Cultural Heritage of India*, Vol. IV. গ্রন্থে বিধৃত। কলিকাতা।

মিত্র, রাজ্যেশ্বর
১৯৫৫—বাংলার সঙ্গীত, মধ্যযুগ। কলিকাতা।

মুখোপাধ্যায়, তারাপদ
বঙ্গাব্দ ১৩৮৯—'অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথমার্ধের কয়েকখানি বাংলা পত্র'
সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা, ৮৯ বর্ষ, তৃতীয়-চতুর্থ সংখ্যা। কলিকাতা।

মুখোপাধ্যায়, প্রভাতকুমার
১৯৮০—শ্রীচৈতন্যাষ্টক। কলিকাতা।

মুখোপাধ্যায়, হরেকৃষ্ণ
১৯৭১—বাঙ্গলার কীর্তন ও কীর্তনীয়া। কলিকাতা।

মুখোপাধ্যায়, সুখময়
১৯৮৪—চৈতন্যদেব জীবনী : কালক্রম : পরিমণ্ডল : প্রিয়মণ্ডল। কলিকাতা।

রসকদম্ব, কবিবল্লভ-বিরচিত
বঙ্গাব্দ ১৩৩২—বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ সংস্করণ।
(সম্পাদক) তারকেশ্বর ভট্টাচার্য ও আশুতোষ চট্টোপাধ্যায়। কলিকাতা

রাণা, সুমঙ্গল
১৯৮৫—'ভূমিকা'
পদরত্নাকর গ্রন্থে সংযুক্ত। সাহিত্য প্রকাশিকা (গ্রন্থমালা) ৮ খণ্ড।
বিশ্বভারতী। শান্তিনিকেতন।

রায়, উমা
বঙ্গাব্দ ১৩৯১—'রাধামোহন ঠাকুর সম্বন্ধে দু'-চার কথা'।
শ্রীপদামৃতসমুদ্র গ্রন্থে সংযুক্ত। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় সংস্করণ।
(সম্পাদক) উমা রায়। কলিকাতা।

রায়, জীমূতবাহন
১৯৮৪—শ্রীনিবাস আচার্য ও ষোড়শ শতাব্দীর গৌড়ীয় বৈষ্ণব সমাজ।
বিশ্বভারতী গবেষণা গ্রন্থমালা। শান্তিনিকেতন।

রায়, নীহাররঞ্জন
১৯৪৯—বাঙ্গালীর ইতিহাস। কলিকাতা।

লঘুভাগবতামৃতম্, রূপ গোস্বামী-কৃত
১৯৩৩—শ্রীচৈতন্য মঠ সংস্করণ।
(সম্পাদক) ভক্তিবিলাস তীর্থ। শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

শাস্ত্রী, হরপ্রসাদ
১৩৬৬—বৌদ্ধগান ও দোহা।
বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ নূতন সংস্করণ। কলিকাতা।

শ্যামানন্দপ্রকাশ, কৃষ্ণচরণদাস-বিরচিত
চৈতন্যাব্দ ৪৯৭ (১৯৮৩)—শ্রীপাট গোপীবল্লভপুর সংস্করণ।
(সম্পাদক) গোপালগোবিন্দানন্দ দেব গোস্বামী। গোপীবল্লভপুর, মেদিনীপুর।

সর্বসম্বাদিনী, জীব গোস্বামী-কৃত
বঙ্গাব্দ ১৩২৮—বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ সংস্করণ।
(সম্পাদক) রসিকমোহন বিদ্যাভূষণ। কলিকাতা।

সারার্থদর্শিনী, বিশ্বনাথ চক্রবর্তী-কৃত
১৯১৫—শাস্ত্রপ্রকাশ কার্যালয় সংস্করণ।
(সম্পাদক) হরিপদ চট্টোপাধ্যায়। শ্রীমদ্ভাগবত, ১০ম স্কন্ধের সঙ্গে টীকা হিসাবে প্রকাশিত। কল্যাণপুর।

সাঁতরা, তারাপদ
১৯৮৭—মেদিনীপুর ঃ সংস্কৃতি ও সমাজ। কলিকাতা।

সান্যাল, হিতেশরঞ্জন

১৯৮৪—"The Nature of Peasant Culture in India: A Study of the Pat Painting and Clay Sculpture of Bengal", *FOLK*, Vol. 26। কোপেনহাগেন।

সিংহ, রাধারমন

বঙ্গাব্দ ১৩৮৩—চন্দ্রকোণায় নবকুঞ্জ মহোৎসব। চন্দ্রকোণা, মেদিনীপুর।

সেন, সমর

বঙ্গাব্দ ১৩৮৫—বাবু বৃত্তান্ত। কলিকাতা।

সেন, সুকুমার

১৯৫৯—বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, ১ম খণ্ড, পূর্বার্ধ।

পুনর্লিখিত তৃতীয় সংস্করণ। কলিকাতা।

সেন, সুকুমার

১৯৭০—'চণ্ডীদাস সমস্যা' এবং 'শ্রীখণ্ডের সম্প্রদায় ও চণ্ডীদাস'

বৈষ্ণবীয় নিবন্ধ গ্রন্থে ধৃত। কলিকাতা।

স্তবমালা, রূপ গোস্বামী-বিরচিত

বঙ্গাব্দ ১২৯২—হরিভক্তি প্রদায়িনী সভা সংস্করণ।

(সম্পাদক) রামনারায়ণ বিদ্যারত্ন। বহরমপুর, মুর্শিদাবাদ।

স্তবাবলী, রঘুনাথদাস গোস্বামী-বিরচিত

বঙ্গাব্দ ১৩২৯—হরিভক্তিপ্রদায়িনী সভা দ্বিতীয় সংস্করণ

(সম্পাদক) রামনারায়ণ বিদ্যারত্ন। বহরমপুর, মুর্শিদাবাদ।

স্তবামৃতলহরী, বিশ্বনাথ চক্রবর্তী-বিরচিত

১৯০৮—...সংস্করণ। বৃন্দাবন।

হরিদাস দাস

চৈতন্যাব্দ ৪৭১ (১৯৫৭) শ্রীশ্রীগৌড়ীয়-বৈষ্ণব-অভিধান। নবদ্বীপ।

হরিভক্তিবিলাসঃ, গোপাল ভট্ট-সমাহৃত

১৯৪৬—শচীনাথ রায় চতুর্ধরী সংস্করণ।

(সম্পাদক) পুরীদাস মহাশয়। ময়মনসিংহ।

অনুক্রমণিকা